Bible text from পবিত্র বাইবেল - জুবিলী বাইবেল

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2018-2023

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition: March 13, 2018

Version 2.1.1 (June 14, 2023)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

এবং বাণী হলেন মাংস

যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

মানচিত্র

মুখবন্ধ

ভূমিকা

- সুসমাচার
- সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের সঙ্গে যোহনের সম্পর্ক
- চতুর্থ সুসমাচারের উৎপত্তি ও তার রচয়িতা
- যোহনের সময়ে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি
- যোহনের সুসমাচারের ঐশতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
- চতুর্থ সুসমাচারের কাঠামো

যোহনের সুসমাচারের ধারাবাহিক ব্যাখ্যা

সূচনা : বাণী-বন্দনা (১:১-১৮)

১ম খণ্ড (১:১৯—১২:৫০) : জগতের সামনে যিশুর আত্মপ্রকাশ

- বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্যদান (১:১৯-৫১)
- যিশুর আত্মপ্রকাশকর্মের সূচনা (২—৪ অধ্যায়)
- পঞ্চাশত্তমী পর্ব (৫ অধ্যায়)
- দ্বিতীয় পাস্কা পর্ব (৬ অধ্যায়)
- পর্ণকুটির পর্ব (৭—৯ অধ্যায়)
- মন্দিরের উৎসর্গ-পর্ব (১০:১—১১:৫৪)
- তৃতীয় পাস্কা পর্ব (১১:৫৫—২০:৩১)

২য় খণ্ড (১৩—২১) : আপনজনদের কাছে যিশুর আত্মপ্রকাশ, তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান

- যিশুর বিদায় ভোজ (১৩ অধ্যায়)

বিদায় উপদেশ - ১ম খণ্ড (১৪ অধ্যায়)

বিদায় উপদেশ - ২য় খণ্ড (১৫:১—১৬:৪)

বিদায় উপদেশ - ৩য় খণ্ড (১৬:৫-৩৩)

বিদায় উপদেশ - ৪র্থ খণ্ড (১৭ অধ্যায়)

যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু (১৮—১৯ অধ্যায়)

যিশুর পুনরুত্থান (২০ অধ্যায়)

সম্পাদকমণ্ডলীর উপসংহার (২১ অধ্যায়)

পরিশিষ্ট

১। 'বাণী' ধারণার ঐতিহাসিক ও ঐশতাত্ত্বিক পটভূমি

২। যোহনের সুসমাচারের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য

৩। যোহনের সুসমাচারে চিহ্নকর্ম

৪। যোহনের সুসমাচারে 'মানবপুত্র' যিশু

৫। যোহন অনুসারে 'বিশ্বাস করা'

৬। যোহন অনুসারে পুত্ররূপে যিশুর আত্মপ্রকাশ

৭। যোহন অনুসারে এউখারিস্তিয়া

৮। যোহন অনুসারে 'সত্য'

৯। মানুষের দায়িত্ব ও ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারণ

১০। যোহন অনুসারে 'জীবন'

১১। যিশুর উত্তোলন ও গৌরবায়ন

১২। যোহন অনুসারে 'অন্তিমকাল' ধারণা

১৩। যোহন অনুসারে যিশুর বিদায় ভোজ

১৪। আঙুরলতা

১৫। যোহনের সুসমাচারে 'সহায়ক' পবিত্র আত্মা

১৬। যাচনা বিষয়ে যোহনের শিক্ষা

১৭। যোহনের সুসমাচারের বর্তমান তাৎপর্য

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)

যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)

লেবীয় (লেবীয় পুস্তক)

গণনা (গণনাপুস্তক

দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)

১ শামু (শামুয়েল ১ম পুস্তক)

২ শামু (শামুয়েল ২য় পুস্তক)

১ মাকা (মাকাবীয় বংশচরিত, ১ম পুস্তক)

২ মাকা (মাকাবীয় বংশচরিত, ২য় পুস্তক)

সাম (সামসঙ্গীত-মালা)

প্রবচন (প্রবচনমালা)

প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)

সিরা (বেন-সিরা)

ইশা (ইশাইয়া)

যেরে (যেরেমিয়া)

এজে (এজেকিয়েল)

দা (দানিয়েল)

হো (হোশেয়া)

জেফা (জেফানিয়া)

জাখা (জাখারিয়া)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)

মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)

লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)

যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)

প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)

রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)

এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)

ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)

কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)

১ পি (পিতরের ১ম পত্র)

২ পি (পিতরের ২য় পত্র)

১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)

প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

মানচিত্র

নূতন নিয়মকালে যিশুর দেশ

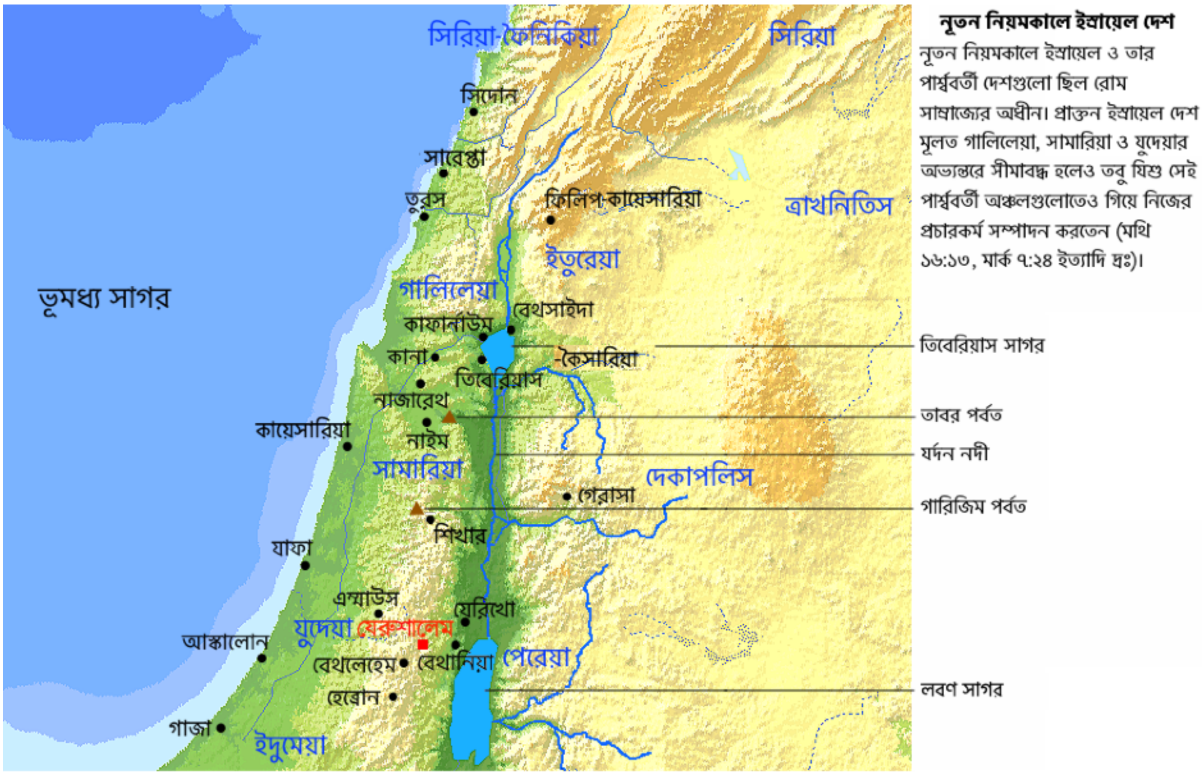

সুসমাচারে উল্লিখিত নিচের স্থানগুলোর নাম ক্লিক করলে স্থানগুলো Maps অ্যাপ-এ প্রদর্শিত হবে।

কানা গ্রাম সম্পর্কে তিনটে স্থান উপস্থাপিত যা প্রাচীনকাল থেকে সমর্থিত: ‘কানা ১’ (কানা), ‘কানা ২’ (কাফ্র্ কান্না) ও ‘কানা ৩’ (খির্বেৎ কানা অর্থাৎ কানার ধ্বংসাবেশষ)।

কানা ১, কানা ২, কানা ৩, কাফার্নাউম, তিবেরিয়াস, নাজারেথ, যর্দন নদীর ওপারে অবস্থিত বেথানিয়া, যেরুশালেমের নিকটস্থ গ্রাম বেথানিয়া, যেরুশালেম, শিখার

যেরুশালেমের মন্দির

প্রকৃত মন্দির ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমীয়দের দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল।

সেকালের বর্ণনা অনুসারে মন্দিরটা দেখতে সম্ভবত এরূপই ছিল।

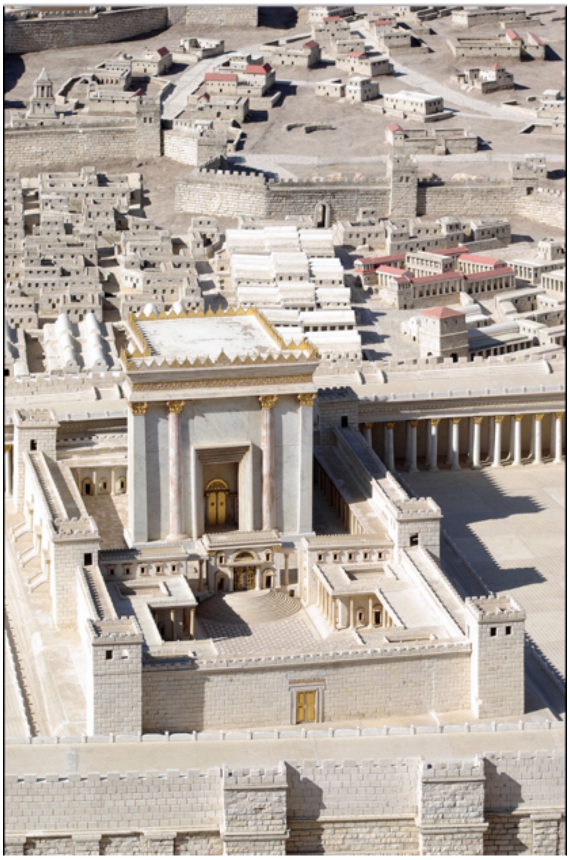

মুখবন্ধ

একথা সমর্থন করা যায় যে, আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর সময় থেকে সুসমাচার-চতুষ্টয়ের মধ্যে যোহন-রচিত সুসমাচারই শীর্ষস্থানের মর্যাদা অধিকার করে আসছে। এর অর্থ হল এই যে, মার্ক, মথি ও লুকের সুসমাচার অপেক্ষা এটিই অতিগভীর ধারণামণ্ডিত এবং ফলত পাঠকের কাছে দুরূহ বা সহজপাঠ্য নয়। এই প্রথম মন্তব্য থেকে একটা সিদ্ধান্তের উৎপত্তি হয়: পাঠকের যদি সদৃশ সুসমাচারত্রয় অর্থাৎ মার্ক, মথি ও লুকের সুসমাচার বিষয়ে যথাযথ জানা না থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে চতুর্থ সুসমাচার পাঠ করা তত উপকারী নাও হতে পারে, কেননা সদৃশ সুসমাচারগুলোর বর্ণনা অপেক্ষা যোহন অভিনব ধরনের একটা 'সুসমাচার' পুস্তক রচনা করলেন, যে পুস্তক বাহ্যত 'যিশুর জীবনী', কিন্তু বস্তুতপক্ষে মানবেশ্বর যিশু সম্পর্কিত প্রচ্ছন্ন ও গভীর মর্মসত্যের আধ্যাত্মিক অনুধ্যান যার মধ্য দিয়ে যে খ্রিষ্টবিশ্বাসী যিশু বিষয় আগে থেকে অবগত ও তাঁর মঙ্গলবাণীর অনুসরণকারী, সেই বিশ্বাসীর বিশ্বাস যেন জাগরিত ও অধিকতরভাবে উদ্দীপিত হয়, অর্থাৎ সেই বিশ্বাসী যেন নিজের বিশ্বাসের গভীরতম পর্যায় আবিষ্কার করতে পারে।

একথা থেকে দ্বিতীয় একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তথা: যখন চতুর্থ সুসমাচার যোহনের ধ্যানেরই কথা উপস্থাপন করে, তখন পাঠকের পক্ষে যোহনের পুস্তক ধ্যান-পুস্তক বলেই বিবেচনা ও গ্রহণ করা উচিত, যে ধ্যান প্রকৃতই ধ্যান, অর্থাৎ যে ধ্যানের নামান্তর হল যিশুর সঙ্গে জীবন্ত ও ভক্তিপূর্ণ ঐক্য সৃষ্টি করা, তাঁর বাস্তব উপস্থিতি সম্বন্ধে সদাবৃদ্ধিশীল সচেতনতায় সচেতন হওয়া এবং ফলত নিজের জীবন-বাস্তবায়নে তাঁকে দৃশ্যমান করে তোলা।

এখানে উপস্থাপিত ব্যাখ্যা উল্লিখিত লক্ষ্যগুলো অনুসারে চলতে চেষ্টা করে, যাতে করে যে পাঠক যিশুকে অবগত, যিশুর আকর্ষণ অনুভব করেন ও দৈনন্দিন জীবনে যোহনের নিবেদিত ধ্যানের কথা বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়াসী, তিনি যেন এই ব্যাখ্যার সাহায্যে উপকৃত হন। সুতরাং, সাহিত্য করা নয়, পাণ্ডিত্য দেখানোও নয়, যোহনের গভীর ধারণাগুলো অতিসহজ করাও নয় এবং তৈরি করা উপদেশ উপস্থাপন করাও নয়, বরং যোহনের পথের পথিক সেই পাঠকের সহায়তা করাই এই ব্যাখ্যার একমাত্র

উদ্দেশ্য। ব্যাখ্যা পাঠ করার সময়ে (৩য় অধ্যায়ের কথাই বিশেষভাবে মনে পড়ছে!) পাঠক সম্ভবত একাধিকবার মনে করবেন, কিছুই বুঝা যাচ্ছে না, সাধু যোহনের কথাও কঠিন, ব্যাখ্যাও কঠিন। সেসময় তিনি যেন হতাশ না হন, বরং অধ্যবসায় ও মনের স্থিরতার সঙ্গে পবিত্র আত্মার কাছে আলো প্রার্থনা করুন, কেননা আমরা যা অন্ধকার বোধ করি তা বহুবার স্বয়ং ঈশ্বরের তেজময় আলোর প্রভা। আমরা ঈশ্বরকে একটা পদার্থের মত নির্ণয় করতে দাবি রাখি, তাঁর সম্বন্ধে সবকিছু সুস্পষ্টভাবে জানতে চাই, অর্থাৎ কিনা সনাতন অসীম যিনি তাঁকে আমাদের সঙ্কীর্ণ মানবীয় বুদ্ধি-বিচারের অধীনে সীমাবদ্ধ ও সঙ্কুচিত করতে চাই। কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ে 'নেতি নেতি' অর্থাৎ 'এরকম নয় সেরকম নয়' ছাড়া অন্য প্রকৃত সংজ্ঞা নেই; আজ যে পর্যায়ের নাগাল পেয়েছি তা চরম গন্তব্যস্থান নয়, বরং সেই ঐশমর্মসত্যের উদ্দেশে অগ্রবর্তী নতুন এক পদক্ষেপ মাত্র, যে মর্মসত্য কিন্তু আরও বেশি রহস্যময় হয়ে উঠবে এবং সদা নতুন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের আহ্বান করবে। কেননা সুসমাচারের একটামাত্র পৃষ্ঠাও পাঠ করে অতীতের মত জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। আর তা যদি হয় তবে এর কারণ এই যে, আমরা ঈশ্বরের ভালবাসা—যে ভালবাসার খাতিরে তিনি নিজের একমাত্র পুত্রকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়েছেন—অবাস্তব কিছু বলে মূল্যায়ন করি। এমনকি, যিনি অবিরত আমাদের আহ্বান করেন আমরা যেন পবিত্র আত্মার পরাক্রম গুণে যিশুর অনুসরণ করি, তাঁকেও আমরা অবাস্তব কিছু বলে গণ্য করি।

পাঠকের সুবিধার জন্য কয়েকটি পরামর্শ দান করা হোক, যেগুলো প্রাচীন খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসীদের অভিজ্ঞতার উপরে স্থাপিত: সর্বপ্রথমে পাঠক বার বার মূল পুস্তক (অর্থাৎ সুসমাচারের বাণী) পড়ুন, তারপর উপস্থাপিত ব্যাখ্যা মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করুন। অবশেষে আবার মূল পুস্তক ধীরে ধীরে পাঠ, এমনকি ধ্যান করাই প্রয়োজন যেন যোহনের সাক্ষ্যবাণীর মাধ্যমে যিশুর সঙ্গে জীবন্ত সাক্ষাৎ ঘটে, যে সাক্ষাৎ ধ্যানের একমাত্র উদ্দেশ্য: মূল পুস্তক ধ্যানপূর্ণ পুনঃপুনঃ পাঠের সময়েই ঈশ্বরের বাণী কার্যকর হন এবং পবিত্র আত্মা পূর্ণ সত্যের মধ্যে আমাদের চালনা করবেন। কিন্তু এ প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় আর একটা বিষয়ও উল্লেখযোগ্য, তথা: যেহেতু যোহন যিশুর ক্রম-বৃদ্ধিশীল আত্মপ্রকাশের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, সেজন্য আমরা এলোমেলোভাবে

এ-অধ্যায় ও-অধ্যায় পাঠ করব না, বরং প্রথম অধ্যায় থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবেই পুস্তকটি পাঠ করব।

প্রকৃত ব্যাখ্যা ছাড়া কতগুলো 'পরিশিষ্ট'ও রয়েছে, যেগুলোর কয়েকটি সহজ, কয়েকটি কম সহজ, কয়েকটি কঠিন। যাই হোক, সেগুলোর উদ্দেশ্যই যোহনের সুসমাচারের প্রধান প্রধান ধারণা সাংশ্লেষিকভাবে উপস্থাপন করা। পাঠক ধৈর্যের সঙ্গে সেগুলোও পাঠ করুন: যদি তাঁর কাছে সেগুলোর কথা বোধগম্য হয়, তাহলে তিনি সুসমাচারের গভীরতর উপলব্ধি লাভ করবেন; যদি তাঁর পক্ষে সেগুলো অতিশয় কঠিন লাগে, তবে আপাতত সেগুলো পাঠ করাটা স্থগিত করে পরবর্তী বিষয় পাঠে এগিয়ে যান।

ব্যাখ্যা লেখায় বিশেষত নিম্নলিখিত শাস্ত্রবিদ্‌গণের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা হয়েছে: প্রধানত স্নাকেংবুর্গ, তারপর ভান-দেন-বুশ, মাজ্জনি, মার্তিনি, ভাউটের, ব্রাউন ও লেওঁ-দুফুর।

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

ভূমিকা

সুসমাচার

যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা শুরু করার আগে একটি কথার অর্থ স্পষ্টভাবে আলোচনা করা চাই, কথাটি হল 'সুসমাচার'। বাস্তবিক, খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিহাসে একাধিকবার অনেকে ধারণা করেছে চারিটি সুসমাচার পুস্তক যিশুর কার্যাবলির সাধারণ ধারাবিবরণী বা যিশু বিষয়ে সাহিত্যিক রচনা। বলা বাহুল্য যে এ ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করলে সুসমাচার-চতুষ্টয় থেকে কয়েকটা কাহিনী বা কাব্য ছাড়া আর বেশি কিছু প্রত্যাশা করা যায় না।

কিন্তু 'সুসমাচার' বিষয়বস্তু উপরোক্ত ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে পরিত্রাণের শুভসংবাদকে ঈশ্বরের শেষ ও চরম প্রকাশকর্তারূপে যিশুখ্রিষ্ট মানবজাতির কাছে ঘোষণা করেছেন, সেটাই প্রকৃতপক্ষে 'সুসমাচার'। এ ধারণাটিকে আদিখ্রিষ্টমণ্ডলী পুনরুত্থিত যিশুর আত্মার প্রেরণায়ই বাস্তবায়িত করেছে ক্রুশবিদ্ধ, পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত যিশুর কথা প্রচারের মাধ্যমে; এমনকি, যিশু নিজেই ঈশ্বরের শুভসংবাদ বলে অভিহিত হলেন। শুধু পরবর্তীকালেই এই জীবন্ত শুভসংবাদকে আমাদের কাছে সাধারণত 'সুসমাচার' বলে পরিচিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হল। সুতরাং একথা স্বীকার্য যে, লিপিবদ্ধ শুভসংবাদ বা 'সুসমাচার' পুস্তকের উদ্দেশ্য উপরোল্লিখিত সুসমাচারের সংজ্ঞা অনুসারে অনুধাবনযোগ্য; অর্থাৎ আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রচার ও সুসমাচার পুস্তকগুলোর উদ্দেশ্যই যাতে মানুষ যিশুর উপদেশ ও কার্যকলাপে, তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস ক'রে ঐশপরিত্রাণ পায়। এ সকল কথা দিয়ে আমরা বলতে চাই না যে সুসমাচারে বিবৃত যিশুর জীবনী ইতিহাসের ঘটনার বিরোধী, বরং ইতিহাসই এর প্রধান লক্ষ্য নয়। সুসমাচার-চতুষ্টয়ের আসল বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বাস: বিশ্বাসজনিত হয়ে ও পাঠকের বিশ্বাস বৃদ্ধি করার জন্যই লিখিত হয়ে এগুলি ঈশ্বরপুত্র যিশুর জীবনী বর্ণনা করে। কিন্তু যেহেতু চারিটি সুসমাচারের লেখক এক নন, এজন্য তাঁদের মধ্যে—রচনা-ভঙ্গি, ঐশতাত্ত্বিক

দিক প্রভৃতি বিষয়ে—কিছুটা পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। এখন যোহনের সুসমাচারের পার্থক্য ও তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলির একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হোক:

– যোহন যিশুর জন্মের বিবরণ দেন না। বাপ্তিস্ম থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত, শুধু এ নির্দিষ্ট কাল তাঁর লেখা যিশুর জীবনীতে বর্ণিত হয়; কারণ তাঁর ধারণা যে, ঠিক তেমন কালেই পরিত্রাণের শুভসংবাদ শ্রেষ্ঠ রূপ লাভ করেছিল।

– অপরাপর সুসমাচারের মত এই সুসমাচারেও যিশুর যেরুশালেম যাত্রা বর্ণিত। ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছাড়া এ যাত্রায় গভীরতর একটি তাৎপর্য সূচিত, তথা: যেরুশালেম হল যিশুকে অগ্রাহ্যকারী ইহুদীধর্মের প্রতীক ও ঈশ্বরের পবিত্র নগরী।

– এই সুসমাচারে যিশু উপদেশ ও চিহ্নকর্মের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেন। যিশুর উপদেশগুলো তাঁর আশ্চর্য কাজগুলির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এমনকি সেগুলির অন্তর্নিহিত সত্যকে ব্যক্ত করে যাতে সেই কাজগুলি 'চিহ্ন' হয়ে বিশ্বাসীর কাছে যিশুর গৌরব অর্থাৎ তাঁর কার্যকলাপের পরিত্রাণদায়ী ভূমিকা প্রকাশ করে (এবিষয়ে 'যোহনের সুসমাচারে চিহ্নকর্ম' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। আবার অন্য দিক দিয়ে বলতে পারি যে যিশুর সাধিত কাজগুলো ঈশ্বর দ্বারা যিশুর উপর ন্যস্ত বিশেষ কাজ (প্রেরণকর্ম) বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে (৫:৩৬; ১০:২৫ ইত্যাদি)। যোহন এ সকল চিহ্ন স্বচক্ষে দেখে লিপিবদ্ধ করলেন যেন যুগ যুগান্তরে সেগুলোর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, যিশু সত্যি ঈশ্বরের সেই খ্রিষ্ট বা মশীহ (অর্থাৎ জগতের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের তৈলাভিষিক্ত ব্যক্তি)।

– একথা যোহনের আপন কথার মাধ্যমে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, কেননা তাঁর লেখা শেষে (২০:৩০) তিনি সরাসরি বলেন যে যিশু শিষ্যদের চোখের সামনে আরও বহু চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন; কিন্তু সুসমাচার পুস্তকে যেগুলো লেখা হল, সেগুলো যাতে পাঠক বিশ্বাস করেন যে যিশুই ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্ট তবে যথেষ্ট, কারণ তাঁর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য। সুতরাং যোহনের দৃঢ় ধারণা যে, তাঁর সাক্ষ্য থেকে উদ্গত ঘোষণাই যিশুতে বিশ্বাস জাগরণের জন্য উপযুক্ত।

– পূর্বে একথা বলা হয়েছিল যে, সুসমাচার পুস্তক বিশ্বাসজনিত। তাতে আমরা বুঝি যে যিশুতে তাঁর নিজের বিশ্বাসের ভিত্তিতেই যোহন যিশুর জীবনী লিখেছিলেন, বা অন্য

কথায় বলতে পারি যে, এই যিশুর জীবনী যোহনের গভীর ধারণা থেকে উদ্গত, এমনকি বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই যোহন ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর অন্তর্নিবিষ্ট বা প্রচ্ছন্ন ঐশসত্য প্রকাশ করতে পেরেছেন। যোহনের সুসমাচার যে যথার্থই ঐশতাত্ত্বিক একটা রচনা এর প্রমাণ হল যিশুর উপদেশগুলো। যোহন অনুসারে যিশু হলেন ঐশপ্রকাশ-বহনকারী বা ঐশপ্রকাশকর্তা, অর্থাৎ তাঁর একমাত্র ও অবিরত কাজই ঈশ্বরকে ও নিজেকে প্রকাশ করা; একথা স্বয়ং যিশুর একটি উপদেশে (১৪:৪-১১) ব্যক্ত: শুধু তাঁর মধ্য দিয়েই মানুষ পিতার কাছে যেতে পারে; স্বয়ং যিশুই পথ, কেননা তিনি পিতার একমাত্র সত্যাশ্রয়ী ও পূর্ণ প্রকাশ এবং কেবল তিনি নিজের বিশ্বাসীদের ঐশরাজ্যে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম। যোহন যিশুর মুখনিঃসৃত বাক্য নয়, বরং যিশুর উপদেশের সার বা যিশুর মন জানাবার জন্য ব্যাপৃত; এজন্য যিশুর উপদেশগুলি সহজ উপদেশ অপেক্ষা গভীর ও কঠিন তাৎপর্যপূর্ণ ঐশতাত্ত্বিক আলোচনাই বলে প্রতীয়মান হয়। যোহনের সঙ্গে অপরাপর সুসমাচারে বর্ণিত উপদেশগুলো তুলনা করলে এ বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এখন সম্ভবত কারও কারও মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে: তাহলে যিশুর উপদেশগুলি কি যিশুরই, না যোহনের কথা? কিংবা, সেই উপদেশগুলি হয় ত কি যোহনের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর কাছে পুনরুত্থিত যিশুর উপদেশ? এপ্রসঙ্গে উত্তর এ: সুসমাচারের উপদেশগুলি সত্যিই মাংসে আগত ঐশবাণী যিশুর উপদেশ; কিন্তু একথার অর্থ এই নয় যে উপদেশগুলির প্রত্যেকটি কথা যিশুর মুখনিঃসৃত; আসলে, সুসমাচারের বেলায় এ সমস্যা অপ্রাসঙ্গিক, কেননা যদি যিশু আপন উচ্চারিত বচনগুলি অক্ষুণ্নভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে দিয়ে যেতে চাইতেন তাহলে নিজেই একটি পুস্তক লিখতেন। তাছাড়া আমরা সবাই স্বীকার করি যে, শব্দ হিসাবে একটি কথার মূল্য নগণ্য; কথাদির উদ্দেশ্যই যাতে একটি ধারণা সৃষ্ট বা প্রকাশিত হয়। কাজেই যিশুর প্রকৃত মনই আমাদের লক্ষ্য। সুতরাং আমরা যখন বলি যে সুসমাচারের উপদেশগুলি স্বয়ং যিশুর সুখ-নিঃসৃত কথা না হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরই কথা তখন এ সত্য সমর্থন করি যে, যোহন—এবং সুসমাচারের লেখকগণ—মাংসে আগত ঐশবাণী যিশুর সকল উপদেশ অনুধ্যান করে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় সেই উপদেশগুলির গভীর তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করেছেন।

উপরন্তু যোহনের ধারণা যে, বাহ্যিক ধারাবিবরণী দেওয়া বিশ্বাস জাগরণের জন্য অর্থহীন কাজ; সেজন্যই তিনি নিজ লেখা প্রারম্ভ থেকেই পাঠকের মন নিজ বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণে কেন্দ্রীভূত করেন, যাতে আপন বিশ্বাস-সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে পাঠকও বিশ্বাস লাভ করেন।

সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের সঙ্গে যোহনের সম্পর্ক

সুসমাচার-চতুষ্টয় পড়ে সম্ভবত আমরা সবাই এগুলির কতিপয় পরস্পর সাদৃশ্য লক্ষ করেছি যথা, বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্যদান, মন্দির-শুচীকরণ, রুটির অলৌকিক কাজ, জলের উপর দিয়ে হাঁটা, যন্ত্রণাভোগের বিবরণ প্রভৃতি। কিন্তু এ সকল সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক ও গুরুত্বপূর্ণ বৈসাদৃশ্যও স্বীকার না করে পারি না; বৈসাদৃশ্যগুলি যিশুর উপদেশগুলিতে ও যোহনের স্বীয় ধারণায়ই বিশেষত দেখা দেয়, আর ঠিক এখানেই সমস্যা জাগে।

যেহেতু যোহনের সুসমাচার অপরাপর সুসমাচারত্রয়ের পরবর্তীকালীন রচনা, এজন্য কি এ প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য যে যোহন অন্য সুসমাচারত্রয় অবগত হয়ে এগুলিই দ্বারা উপকৃত হয়েছেন? আরও, যদি যোহন সুসমাচারত্রয় বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন, তাহলে কি তিনি সেগুলির সংশোধন বা পূরণের জন্যই আপন সুসমাচার লিখেছেন? এপ্রসঙ্গে মতান্তর রয়েছে। আগেকার ধারণা যে, যোহন ঠিক উল্লিখিত উদ্দেশ্যেই নিজ সুসমাচার লিখেছিলেন; কিন্তু বর্তমানকালের প্রায় সকল শাস্ত্রবিদগণের মত এই যে, যোহনের সুসমাচার প্রত্যক্ষভাবে সুসমাচারত্রয় সাপেক্ষ নয়, অর্থাৎ আপন লেখার জন্য যোহন সেগুলির উপর বা সেগুলির ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করেননি, বরং ব্যক্তিগত একটি ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে যিশুর জীবনী রচনা করেছেন। একথার অর্থ এই নয় যে তিনি তখনকার প্রচলিত ধর্মশিক্ষা বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন না, বরং শ্রুতি-শিক্ষা যাকে বলে —অর্থাৎ আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীকালে যিশু সম্পর্কে প্রচলিত সাধারণ মৌখিক শিক্ষা— সেসম্বন্ধে অবশ্যই অবগত ছিলেন। কিন্তু যদিও তিনি কোন রকমে সুসমাচারত্রয়ের কথা জেনে থাকতেন, তবুও সেগুলির সংশোধন বা পূরণের এমন উদ্দেশ্য তিনি পোষণ করেননি।

এই মত সমর্থনে শাস্ত্রবিদগণ যোহনের রচনার কতিপয় স্বীয় বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেন। এগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত ঐশতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যই প্রধান:

১। যিশুর কাজকর্মে ও উপদেশাবলিতে যিশুকে উত্তম প্রকাশকর্তা ও শেষ ও চরম ত্রাণকর্তারূপে ঘোষণা করা;

২। ঈশ্বরের যে বাণী মানুষের মাঝে বাস করতে এসেছেন, সেই বাণীর গৌরবের উপর আলোকপাত করা;

৩। অতীতকালের ঘটনাগুলির চিরপরিত্রাণদায়ী তাৎপর্য নির্দেশ করা: মাংসে আগত ঐশবাণী যিশু যে সকল কথা বলেছিলেন, এখনও সেই সকল কথা জীবন্ত; অর্থাৎ তিনি এখনও বাস্তবেই সেই সকল কথার মাধ্যমে আমাদের, এমনকি প্রত্যেকজনকেই পরিত্রাণলাভের জন্য আহ্বান করেন। যিশু এখনও তাঁর মণ্ডলীতে উপস্থিত, বিশেষত বাণীপ্রচার ও উপাসনার সময়ে। বা অন্য কথায় বলতে পারি, যোহন (১৬:১৩…) যিশুর কালের সঙ্গে (১:৩৩) পবিত্র আত্মার কাল (৭:৩৯) সংযুক্ত করেছেন; কিন্তু এই আত্মা মণ্ডলীর মধ্য দিয়েই বিশ্বাসীদের কাছে এসে বর্তমান হয়ে থাকেন, কেননা মণ্ডলীর কাছে—যিশুকে বাণীপ্রচারে (৬:৬৩) ও সাক্রামেন্তগুলি সম্পাদনে (১৯:৩৪; ১ যোহন ৫:৬…)—যিশু আপন দায়িত্বভার, শিক্ষাদান ও পরিত্রাণদায়ী পূর্ণ অধিকার ন্যস্ত করে গেছেন (২০:২২…)।

৪। যোহনের সুসমাচারের স্বকীয়তা বিষয়ে বলতে গিয়ে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, খ্রিষ্টমণ্ডলীর আদিকাল থেকে যোহনের সুসমাচার 'আত্মিক সুসমাচার' বলে আখ্যায়িত হয়েছে (প্রথমে এ সংজ্ঞা তৃতীয় শতাব্দীর আলেক্সান্দ্রিয়ার মহাচার্য ক্লেমেণ্ট উত্থাপন করেন)। এর কারণ, অপরাপর সুসমাচার অপেক্ষা ঐশতাত্ত্বিক, গভীর ও কঠিন হওয়া ব্যতীত যোহনের সুসমাচারেই পবিত্র আত্মার প্রেরণা প্রকাশ পায়: সকলের চেয়ে

যোহনই যিশুর মর্মসত্যকে উত্তমরূপে অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন। যোহনের বর্ণনায় তাঁর নিজের মনপরিবর্তন, এমনকি তাঁর নিজের জীবনপরিবর্তন প্রকাশ পায়। ফলে যেমন তিনি যিশুর সাক্ষাতে জীবনপরিবর্তন করেছিলেন তেমনি এখনও নিজের লেখার মাধ্যমে

তিনি পাঠককে অবিরত বলেন, ‘এক্ষুণি জীবনপরিবর্তন কর, এক্ষুণি পুনরুত্থান কর, এক্ষুণি ঐশপরিত্রাণ পেতে পার।’

চতুর্থ সুসমাচারের উৎপত্তি ও তার রচয়িতা

পূর্বে সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের ‘ঐতিহ্যের’ কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন যোহন সুসমাচারের ক্ষেত্রেও একথা ওঠে। ‘যোহন-ঐতিহ্য’ কথাটির মাধ্যমে শাস্ত্রবিদগণ বলতে চান যে যোহনের সুসমাচার পুস্তক অল্প দিনের মধ্যে রচিত হয়নি, বরং পরম্পরাগতভাবে বা ক্রমশ তার শেষ আকার—বর্তমান আকার—পরিগ্রহ করেছে। ঐতিহ্য গঠনের এ প্রক্রিয়াবিশেষে সম্ভবত যোহন যিশু-সম্পর্কিত অন্যান্য ঐতিহ্যকে অবলম্বন করেছেন; শাস্ত্রবিদগণ এবিষয়ে ‘চিহ্ন মালা’র কথা উপস্থাপন করেন। অর্থাৎ তাঁরা অনুমান করে বলেন যে আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর সময়ে যিশুর চিহ্নকর্মসমূহ বিশেষ একটা পুস্তকে সঙ্কলিত হয়েছিল যার নাম ‘চিহ্ন মালা’; হয় ত যোহনের ঐতিহ্য এ সঙ্কলনের কয়েকটা অংশ আপন করে নিয়েছিল। তাছাড়া—যেমন আগেও বলা হয়েছিল—যোহন-ঐতিহ্য অবশ্যই উপকৃত হয়েছিল আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর সাধারণ মৌখিক শিক্ষা দ্বারা। এই ঐতিহ্য কি করে সংগঠিত হয়েছিল? এপ্রসঙ্গে একথা বলা চলে যে, যোহনের মৌখিক ধর্মশিক্ষায়ই এই ঐতিহ্যের সূত্রপাত; পরে এই ধর্মশিক্ষা যোহনের বিশেষ অধ্যয়ন ও গবেষণার মধ্য দিয়েই নিজের স্বকীয়তা লাভ করে যায়; এর পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে রূপায়িত হয় এবং ক্রমে ক্রমে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধগুলি যোহনের বিশেষ ধারণা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে বৃহৎ তিনটি নিম্নলিখিত সঙ্কলন-পুস্তকে পরিণত হয়:

–‘চিহ্নকর্ম’ পুস্তক (যা উপরোল্লিখিত ‘চিহ্ন মালা’ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন),

–‘উপদেশ’ পুস্তক,

–‘যন্ত্রণাভোগ’ বিবরণী।

এই পর্যায়ে শুরু হয় সম্পাদনকর্ম: পূর্ব রচনাগুলো পরিবর্তিত, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়। সম্পাদনকর্মের প্রধান প্রমাণ হলো ২১ অধ্যায়, যা শাস্ত্রবিদগণ সম্পাদক মণ্ডলীর রচনা বলে মনে করেন।

চতুর্থ সুসমাচারের উৎপত্তির সমস্যার সঙ্গে প্রকৃত রচয়িতার সমস্যাও উল্লেখযোগ্য। খ্রিষ্টমণ্ডলীর দ্বিতীয় যুগ থেকে দু'টো অভিমত উপস্থিত: আছেন তাঁরা যাঁরা একথা সমর্থন করেন যে, যে শিষ্যকে যিশু বিশেষ স্নেহে ভালবাসতেন সেই প্রেরিতদূত যোহনই চতুর্থ সুসমাচারের রচয়িতা; এবং আছেন তাঁরা যাঁরা দ্বিতীয় শতকের সাধু ইরেনেউসের অভিমত অনুসারে বলেন যে, যে যোহন সুসমাচারের রচয়িতা তিনি প্রেরিতদূত যোহন নন বরং সেকালের 'প্রবীণ যোহন' বলে পরিচিত কে যেন একজন (এবিষয়ে একথা স্মরণযোগ্য যে, সাধু ইরেনেউস ছিলেন সাধু পলিকার্পের শিষ্য, যে পলিকার্প যোহনেরই শিষ্য)। এপ্রসঙ্গে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়; বাস্তবিকই, যে যে শাস্ত্রবিদ দশ বছর আগে প্রেরিতদূত যোহনেরই কথা সমর্থন করতেন, আজ তাঁরা মত পাল্টিয়ে বলেন যে, সুসমাচারের রচয়িতা আসলে হলেন সেই প্রবীণ যোহন; একই প্রকারে, দশ বছর আগে যাঁরা প্রবীণ যোহনেরই কথা সমর্থন করতেন, তাঁরা আজ প্রেরিতদূত যোহনকেই সুসমাচার-রচয়িতা বলে সমর্থন করেন। তবু সেই যোহন যে-ই হোন না কেন, আমরা যখন বলি যে যোহনই সুসমাচার লিখেছেন, তখন আমরা যেন একথা না বুঝি যে, চতুর্থ সুসমাচার পুস্তক সম্পূর্ণরূপে যোহনের হাতের লেখা। আগে 'যোহন-ঐতিহ্যের' বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল; এখন একথা উপস্থাপন করা যাক যে, যোহনই 'যোহন-ঐতিহ্যের' প্রবর্তক, প্রভাবকারী ও পরিচালক হয়েছেন, কিন্তু রচনা ও সম্পাদনকর্মে তিনি আপন গ্রীকভাষী শিষ্যদের সাহায্য দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন (উল্লেখযোগ্য যে যোহনের মাতৃভাষা আরামীয় ভাষা এবং চতুর্থ সুসমাচারের মূল রচনা গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল)।

যোহনের সময়ে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি

ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপস্থিতি যোহনের সময়ের পরিস্থিতিকে বিচিত্র বলে চিহ্নিত করেছে। এ বিচিত্র পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক চতুর্থ সুসমাচারে রেখাপাত করেছে বিধায় সেই দিকগুলির উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা একান্ত প্রয়োজন। বাস্তবিকই আগে বলা হয়েছিল যে, চতুর্থ সুসমাচার-পুস্তক গ্রীক ভাষায় লিখিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও একথাও লক্ষণীয় যে, তার ধারণাগুলো হিব্রু দৃষ্টিভঙ্গিই

অনুসরণ করে। আমাদের এই আলোচনায় শুধু কয়েকটা দিক তুলে ধরা হবে, এবং চতুর্থ সুসমাচারের সঙ্গে সেগুলোর যে কতখানি সম্পর্ক রয়েছে তা স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করা হবে। আমাদের আলোচ্য দিক এগুলি :

– পুরাতন নিয়ম,

– যোহনের সমকালীন ইহুদীধর্ম,

– যোহনের সমকালীন বিভিন্ন ধর্ম ও গ্রীক সংস্কৃতি।

পুরাতন নিয়ম : যোহনের সুসমাচার পুরাতন নিয়মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যদিও এখানে এবিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা সম্ভব নয় ও স্থানাভাবে এখানে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রমাণ করাও সম্ভব নয়, তবু শাস্ত্রবিদগণের এই মত গ্রহণযোগ্য মনে করব যে, পুরাতন নিয়মের মাধ্যমেই বিশেষত যোহন যিশুখ্রিষ্টকে প্রচার করেন, তথা : যিশু পুরাতন নিয়মের প্রতিশ্রুত মশীহ বা ঈশ্বরের তৈলাভিষিক্ত ত্রাণকর্তা (১:৪৫; ৫:৩৯ ··· ; ৭:৪২ প্রভৃতি)। যোহনের অধিক উল্লিখিত পুস্তকাদি হল যথাক্রমে, সামসঙ্গীত-মালা, নবী ইশাইয়া, যাত্রাপুস্তক এবং নবী জাখারিয়া। তবু এই প্রত্যক্ষ উল্লেখগুলো অপেক্ষা যোহনের স্বকীয় ভাষা বা দৃষ্টিভঙ্গিই বিশেষভাবে পুরাতন নিয়মের প্রভাব প্রমাণ করে : মোশি, যাত্রাপুস্তকের মহাঘটনাগুলো, মশীহ, ইস্রায়েলের রাজা, ঈশ্বরের দাস, মানবপুত্র ও মেষপালকের কথা যোহনের সুসমাচারে অবিরতই বর্তমান। তথাপি বিশেষত পুরাতন নিয়মের প্রজ্ঞাধর্মী পুস্তকাদিই (প্রবচন, বেন-সিরা, প্রজ্ঞা-পুস্তক ও বারুক) চতুর্থ সুসমাচারে ব্যবহৃত। এগুলি দ্বারা 'বাণী বন্দনা'র (১:১-১৮) প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হয় : ঐশপ্রজ্ঞার মত ঈশ্বরজনিত ঐশবাণীও সৃষ্টিকর্মের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন; বাণীও জগৎ কর্তৃক পরিত্যক্ত হলেন; মাংসে আগমন করে বাণীও আপনজনদের মধ্যে অনুগ্রহপূর্ণ তাঁবু খাটালেন; ঐশবাণীও স্বয়ং ঈশ্বরের গৌরবপ্রকাশ, প্রভৃতি। অবশেষে এ বৈশিষ্ট্যও স্মরণযোগ্য : যিশুর আত্মপ্রকাশ বর্ণনার জন্য যোহন পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের ভঙ্গি অনুসরণ করেন। সেসময় প্রভু ঈশ্বর বলতেন 'আমিই প্রভু', 'আমিই সেই পবিত্রজন', 'আমিই ইস্রায়েলের ত্রাণকর্তা' প্রভৃতি। এভঙ্গি অনুসারে যিশু বলেন, 'আমিই মেষপালক', 'আমিই জগতের আলো' প্রভৃতি। এই

সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, চতুর্থ সুসমাচার ক্ষেত্রে পুরাতন নিয়মের ভূমিকা অপরিহার্য।

যোহনের সমকালীন ইহুদীধর্ম: আমাদের সুবিধার জন্য ইহুদী ধর্মকে মোটামুটি তিনটে শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে: ১। গ্রীক কৃষ্টির প্রভাবান্বিত ইহুদীধর্ম, ২। ফরিশী ও শাস্ত্রী সম্প্রদায়, ৩। কুম্রান সম্প্রদায়। এগুলি বিষয়ে দু' একটা কথা বলা উপযোগী হতে পারে।

১। গ্রীক দৃষ্টির প্রভাবান্বিত ইহুদীধর্ম: ইহুদীদের দ্বিতীয় প্রবাসকাল থেকে ইহুদী অনেকে বিদেশেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিল। এরা 'দিয়াস্পরার ইহুদী' বলেও পরিচিত। আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীকালে রোম-সাম্রাজ্যের সমস্ত জনবহুল শহরে ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থলে ইহুদীদের উপস্থিতি নগণ্য নয়। তারা গ্রীক ভাষী ছিল ও গ্রীক কৃষ্টির সঙ্গে ধর্মীয় সংলাপ করত। চতুর্থ সুসমাচারে নিহিত গ্রীক দর্শনের শব্দগুলো যথা বাণী, সত্য, আলো, জীবন ইত্যাদি শব্দ স্বীকার করে গ্রীক কৃষ্টি দ্বারা প্রভাবান্বিত ইহুদীধর্মের সঙ্গে যোহনের সম্পর্ক।

২। ফরিশী ও শাস্ত্রী সম্প্রদায়: সেইকালে পুরাতন নিয়ম আরামীয় ভাষায় ভাষান্তরিত এবং সময় সময় ব্যাখ্যাও করা হত। এই ব্যাখ্যামূলক ভাষান্তরকে 'তার্গুম' বলা হত। যোহনের সুসমাচারে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তার্গুমের তিনটি প্রধান ধারণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

– **ঐশবাণী** (হিব্রু ভাষায় 'দাবার' ও আরামীয় ভাষায় 'মেম্রা') ছিল ঈশ্বরের নামান্তর।
– **ঈশ্বরের উপস্থিতি** (হিব্রু ভাষায় 'শেখিনাহ্') ইস্রায়েল জাতির মাঝে—যেরুশালেমের মন্দিরেই—অবস্থান করে (যাত্রা ২৫:৯ ও ২৯:৪৫ দ্রষ্টব্য)। যোহন এধারণা প্রয়োগ করে দেখান যে ঐশবাণী মাংসে আগমন করে আমাদের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি হয়ে ওঠেন (১:১৪)।

– **ঈশ্বরের গৌরব** (হিব্রু ভাষায় ‘কাবোধ্’) : ঐশবাণী ও ঈশ্বরের উপস্থিতির মত এ শব্দও ঈশ্বরের নামান্তর। বিশেষভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতির মত ঈশ্বরের গৌরবও ইস্রায়েল জাতির মাঝে—মন্দিরেই—অবস্থান করে।

এ ধারণা তিনটে ছাড়া অন্য কতগুলো শব্দ রয়েছে যেগুলো দিয়ে প্রমাণিত হয় যে যোহনের দৃষ্টিভঙ্গি ইহুদী ঐতিহ্যে রোপিত। একথা অধিক সমর্থন পেত যদি ‘মিদ্রাস’ বলে পরিচিত ইহুদী শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যোহনের সুসমাচারের সম্পর্ক দেখানো যেতে পারত ; কিন্তু স্থানাভাবে এখানে এধরনের আলোচনা করা সম্ভব নয়।

উল্লিখিত সম্পর্ক ছাড়া ফরিশী ও শাস্ত্রীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোহনের ভিন্নরূপ সম্পর্কও রয়েছে: যেহেতু এরা যিশুর বিরোধিতা করেছিল ও যোহনের সময়ে খ্রিষ্টমণ্ডলীরও বিরোধিতা করত, সেজন্য চতুর্থ সুসমাচারে তারা যিশুতে অবিশ্বাসীদের প্রতীকস্বরূপ।

৩। **কুম্রান সম্প্রদায় :** যিশুর দেশে কুম্রান নামক একটা স্থান আছে যেখানে সেইকালে একটা ধর্মীয় সম্প্রদায় বাস করত। সম্প্রতিকালে এই স্থানে কতিপয় পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে (এবং এখনও হচ্ছে)। শাস্ত্রবিদগণের বিবেচনায় ওই সকল পাণ্ডুলিপি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সেগুলির মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল দেশে আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীকালীন প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় ধারণা প্রকাশিত হয়। উপরন্তু এই পাণ্ডুলিপিগুলো যোহনের সুসমাচারের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখায়: শুচীকরণ, মনপরিবর্তন ও বাপ্তিস্মে দেওয়া গুরুত্ব এবং রচনাশৈলী মুখ্য সাদৃশ্যগুলোর অভিব্যক্তি ঘটায়। রচনাশৈলী সম্পর্কিত সাদৃশ্য ফুটে ওঠে বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহারে, যেমন আলো-অন্ধকার, সত্য-মিথ্যা, আত্মা-মাংস ইত্যাদি দ্বৈবাদী শব্দ। তা সত্ত্বেও চতুর্থ সুসমাচারের সঙ্গে কুম্রানের পাণ্ডুলিপিগুলোতে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্যও বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ‘জীবন-মৃত্যু’ যোহনের এই প্রধান ধারণার উল্লেখ নেই। আরও, কুম্রান সম্প্রদায়ের মতে জীবন বলতে একমাত্র শারীরিক জীবন বোঝায়, অপর দিকে যোহনের কাছে জীবন হল যিশুর প্রকাশিত ও দেওয়া পরিত্রাণ। আবার, কুম্রান ভক্তগণ সমর্থন করত যে, জন্মলগ্নে মানুষে প্রবিষ্ট ঐশআত্মা পরবর্তীকালে ক্ষীণ হয়ে পড়েন, মানুষ শুচীকরণ, মনপরিবর্তন ও বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে ক্ষীণ আত্মাকে পুনরায় বলবান করে তুলতে পারে। কিন্তু একথা

উল্লেখযোগ্য যে, এক্ষেত্রে 'মনপরিবর্তন' ইহুদী ধর্মশাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ পালনেই প্রকাশ পায়, এবং বাপ্তিস্ম যিশুর নামে দেওয়া নয়। এবিষয়ে যোহনের মত সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ: খ্রিষ্টবিশ্বাসী 'আত্মা' থেকে জনিত (৩:৩, ৫, ৮), অর্থাৎ যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখায়ই মানুষ ঐশজীবনের সহভাগী হয়ে ওঠে (৬:৬৩; ৭:৩৮)।

উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে, কুম্রান সম্প্রদায় সম্বন্ধে যোহন অবশ্যই জ্ঞাত ছিলেন, এমনকি তাদের যে বিশিষ্ট ধারণাধারা উপযোগী মনে করেছিলেন সেগুলি নির্ভয়েই আপন করে নিয়ে নিজের 'সুসমাচার' পুস্তকে উপস্থাপন করেছিলেন। সম্ভবত যোহনের স্থানীয় মণ্ডলীর অনেকে কুম্রান সম্প্রদায়ের প্রাক্তন সদস্য হয়েছিল।

যোহনের সমকালীন বিভিন্ন ধর্ম ও গ্রীক সংস্কৃতি: এখানে শুধু 'মান্দায় সম্প্রদায়' ও 'জ্ঞানমার্গপন্থীদের' বিষয়ে আলোচনা করা হবে:

১। মান্দায় সম্প্রদায়: এটিও ছিল আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর সময় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্যতম। এদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে জগৎ হল অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্গুণ একটা স্থান। কেবল 'ঊর্ধ্বলোকেই' 'আলোর প্রভু' বিরাজমান আছেন। এই অন্ধকারময় জগতের মায়া থেকে মুক্তি পেতে হলে মানুষকে 'সত্য'-এর উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং সত্যপরায়ণ হলে তবেই মানুষ সহধর্মীদের সঙ্গে এবং পরম সত্তার সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবনমুক্তি পায়। সময় সময় ত্রাণকর্তা 'ঊর্ধ্বলোক' থেকে এজগতে নেমে আসা বলে উপস্থাপিত; তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্যই সত্যকে দান করা যাতে সত্যাগত মানুষ নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

চতুর্থ সুসমাচারেও এধরনের কয়েকটা শব্দ স্থান পেয়েছে, তবু একই শব্দ হলেও অর্থই সম্পূর্ণ ভিন্ন, তথা ত্রাণকর্তা যিশুও ঊর্ধ্বলোক থেকে এজগতে আলো, জীবন ও সত্য বলে নেমে এলেন, কিন্তু তথাপি তিনি নিজেকেই দান করে আমাদের ত্রাণ করেন। উপরন্তু একথা উল্লেখযোগ্য যে, সত্য নয়, প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক ভালবাসা-ই খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের একাত্ম করে তোলে।

২। জ্ঞানমার্গ: মান্দায় সম্প্রদায়ের মত জ্ঞানমার্গপন্থীরাও সত্যকে পরিত্রাণদায়ী মনে করত। ঐশমুক্তিদাতা মানবজাতির কাছে জ্ঞান দান করার জন্য এ পৃথিবীতে আসেন। এ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে মানুষ জানতে পারে সে কোথা থেকে আসে এবং তার গন্তব্যস্থান কোথায়। যেমন আগে বলা হয়েছিল, যোহন যিশুকে এত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে রাজি নন। কখনও জ্ঞানই পরিত্রাণদায়ী হতে পারে না। সেই যিশুখ্রিষ্ট, যিনি মানব ইতিহাসে মাংসে আগত ঐশবাণী হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, কেবল তিনিই তাঁর বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ করতে সক্ষম।

উপসংহার: এ সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে চতুর্থ সুসমাচার তখনকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির সঙ্গে একপ্রকার সম্পর্ক রেখেছে। যোহন অন্যান্য মত বা ধর্মের কতিপয় উপাদান আপন করে নিয়েছেন, কিন্তু বারংবার বলা হয়েছে যে, একথার অর্থ এই নয় যে তিনি সেই উপাদানগুলো নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন, বরং সেই সকল উপাদানের মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে একমাত্র যিশুই পথ, সত্য ও জীবন। সমকালীন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আপন করে নিয়ে প্রকৃত উত্তর বা সমাধান দিয়েছেন; নিজ লেখার মাধ্যমে মুক্তকণ্ঠে সত্য ও জ্ঞান-মার্গপন্থীদের বলেছেন যে, পরিত্রাণ লাভের জন্য মাংসে আগত ঈশ্বরকে গ্রাহ্য করে তাঁকে ও সকল মানুষকে ভালবাসতে হয় এবং যারা মোশির বিধি-ব্যবস্থাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার উত্তম অভিব্যক্তি বা ঐশপ্রকাশ বলে মানত, সেই ইহুদীদের কাছে নাজারেথীয় যিশুকেই ঈশ্বরের শেষ ও চরম অভিব্যক্তি এমনকি ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ বলে ঘোষণা করেছেন।

এ সকল কথা থেকে যোহনের ধর্মশিক্ষা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, তথা: তিনি যাঁর সাক্ষী, সেই নাজারেথীয় যিশুর প্রতিই মানুষ বিশ্বাস রাখুক।

যোহনের সুসমাচারের ঐশতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

আগে আমরা দেখেছি কিরূপে যোহন সমসাময়িক বিচিত্র পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলাতে পেরেছেন। কিন্তু নিজের সময়ের সঙ্গে তাল মেলানো অবশ্যই যোহনের লেখার

প্রধান উদ্দেশ্য নয়, বরং মুখ্য উদ্দেশ্য হল এ: যে মণ্ডলীর তিনি সদস্য সেই মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সেই ত্রাণকর্তা যিশুতে নিজের বিশ্বাস স্বীকার করা। সুতরাং আসুন, এখন চতুর্থ সুসমাচারের প্রধান প্রধান ঐশতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করি।

যিশুখ্রিষ্ট: যোহনের মর্মকথা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের পক্ষে তাঁর দৃষ্টিকোণ অবগত হওয়া দরকার। দৃষ্টিকোণটা সুসমাচারের শেষের দিকে যোহনের নিজের কথায় ব্যক্ত, তথা: 'যিশুর এই চিহ্নকর্মগুলো লেখা হয়েছে যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে, যিশুই খ্রিষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, এবং বিশ্বাস করে যেন তোমরা তাঁর নামে জীবন পেতে পার' (২০:২১)। সুতরাং যোহনের লেখার মূল বিষয়বস্তু হল যিশুতে বিশ্বাস এবং তেমন বিশ্বাসের পরিত্রাণদায়ী তাৎপর্য। এখন এপ্রসঙ্গে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব।

১। তিনি যা লিখেছেন তা হল যিশুর সাধিত কয়েকটা চিহ্নকর্ম। এ চিহ্নকর্মগুলো বর্ণনাকে একটা শুভসংবাদ বলে আমাদের পরিগণিত করতে হয়, যে শুভসংবাদ হবে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি।

২। যিশুর চিহ্নকর্মগুলিতে ও আত্মপ্রকাশে স্থাপিত বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু এ: যিশুই খ্রিষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র। 'যিশুই খ্রিষ্ট' কথাটি দ্বারা আমরা বুঝি যে, নাজারেথীয় যিশুই হলেন পুরাতন নিয়মের সকল ভাববাণীর প্রতিশ্রুত এবং ইহুদীদের অপেক্ষিত ত্রাণকর্তা। কিন্তু, যাতে আমরা যিশুকে মানুষ বলেই শুধু না দেখি এজন্য যোহন তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলেও চিহ্নিত করেন। অর্থাৎ যিশু মানুষ শুধু নন, বরং নিজেই ঈশ্বর এবং তা-ই বলে গ্রহণযোগ্য।

৩। যোহনের লেখার উদ্দেশ্য নতুন নতুন শিষ্যকে অর্জন করা নয় বরং খ্রিষ্টভক্তদের বিশ্বাস সুদৃঢ় করে তোলা তারাও যেন যোহনের গভীর বিশ্বাসের সহভাগী হয়। যোহন হলেন মাংসে আগত ঐশবাণী যিশুর সাক্ষী (৩:১১; ১৫:২৭…) এবং তাঁর সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্য—অর্থাৎ সুসমাচারের উদ্দেশ্য—হল মাংসে আগত ঐশবাণী যিশুকে কথা বলতে দেওয়া যাতে মাংসে আগত ঐশবাণী যিশুরই কথার মধ্য দিয়ে আমরা চিরজীবনময়

চিরজীবন্ত গৌরবান্বিত যিশুকে বিশ্বাস করি, কেননা গৌরবান্বিত বলেই তিনি শেষ ও চরম ত্রাণকর্তা (১৭:২)।

৪। এই বিশ্বাস-ই পরিত্রাণদায়ী; এই বিশ্বাস-ই 'তাঁর নামে জীবন' দান করে। অর্থাৎ বিশ্বাসের পরিত্রাণদায়ী শক্তি ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্ট যিশুতেই অধিষ্ঠিত। অন্য কথায় বলতে পারি, ঈশ্বর বলেই যিশু আমাদের পরিত্রাণ করেন। যে সকল কাজ তিনি সাধন করেন ও যে সকল কথা তিনি বলেন, সেগুলি আমাদের পরিত্রাণেরই জন্য, আমরা যেন ঐশজীবনের সহভাগী হই। স্বয়ং যিশুই জীবন, সুতরাং তিনিই আমাদের পরিত্রাণ। ফলত যে কোন কাজ তিনি করেন না কেন, সেই কাজ পরিত্রাণদায়ী। এই দৃষ্টিকোণ অনুসারেই যোহন 'যিশুর জীবনী' লিখেছেন, তাই এই দৃষ্টিকোণ অনুসারেই আমাদের পক্ষে তাঁর লেখা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়ে উঠবে।

চতুর্থ সুসমাচারের কতিপয় অনুচ্ছেদ উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণ করে, যথা: যিশুর চিহ্নকর্মগুলো তাঁর গৌরব প্রকাশ করে বটে, তথাপি সেগুলোর মাধ্যমে যিশুতে বিশ্বাস-ই রাখতে হয় (২:১১)। বিশ্বাসী যারা কেবল তারাই চিহ্নকর্মগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম; এ তাৎপর্য স্বয়ং যিশু দ্বারা ব্যক্ত হয় যখন তিনি 'জগতের আলো' (৯:৫) এবং 'পুনরুত্থান ও জীবন' (১১:২৫…) হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু তবুও তাঁর পুনরুত্থানই হল সেই প্রকৃত ঘটনা যে ঘটনায় এই জীবনকে (অর্থাৎ পবিত্র আত্মাকেই) বিশ্বাসীদের কাছে দান করা হয় (৭:৩৯; ২০:২২)।

এক্ষেত্রে যিশুর উপদেশগুলিও গুরুত্বপূর্ণ; উপদেশগুলি এ কাঠামো অনুযায়ী গঠিত: (ক) যিশুর আত্মপ্রকাশ, (খ) সিদ্ধান্তের জন্য মানুষকে আহ্বান, (গ) তাঁর অনুগামীদের কাছে পরিত্রাণলাভের প্রতিশ্রুতি। যিশুর পরিত্রাণদায়ী ভূমিকা অতিশয় স্পষ্ট প্রকাশ পায় ৩:১৩-২১ এবং ১২:৪৪-৫০-এ উপদেশ দু'টোতে। বলা বাহুল্য যে এ উপদেশ দু'টো অনুসারেও ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র (৩:১৮) এবং স্বর্গ থেকে নেমে আসা মানবপুত্র বলেই যিশু ত্রাণকর্তা।

উপসংহারে একথা বলা বাঞ্ছনীয়: বর্তমানকালেও আমরা যিশুকে আমাদের ত্রাণকর্তারূপে বিশ্বাস করতে পারি, কেননা খ্রিষ্টমণ্ডলীতে পবিত্র আত্মা উপস্থিত আছেন, যে আত্মাকে স্বয়ং যিশু প্রেরণ করেছিলেন যাতে আমরা তাঁর কথা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম ও বাস্তবায়িত করতে পারি। পবিত্র আত্মা যেমন যোহনের বিশ্বাসজনিত সাক্ষ্য স্থাপন করেছিলেন তেমনি—সেই সাক্ষ্য অনুসারে—বর্তমানকালেও আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে থাকেন আমরাও যেন যিশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি।

পরিত্রাণ: যোহনের সুসমাচারে যিশু শুধু মানুষের নন, জগতেরও ত্রাণকর্তা। পূর্বালোচিত বিভিন্ন ধর্মীয় মত দ্বারা প্রভাবান্বিত যোহনের ধারণায় জগৎ বা নিম্নলোক হল ঊর্ধ্বলোক থেকে বিচ্ছিন্ন এবং মায়াচ্ছন্ন ও মৃত্যুচ্ছায়ায় নিক্ষিপ্ত মানবজাতি। শুধু ঈশ্বরের প্রেরিত প্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তা দ্বারাই এই জগৎ ঊর্ধ্বলোকের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে (১:৪; ৩:১৩, ১৬, ১৯… ; ৫:২৪ ইত্যাদি); একমাত্র যিশুতেই ও কেবল তাঁর মধ্যস্থতায়ই মানবজাতি ঊর্ধ্বলোকের সঙ্গে একীভূত হয়। অর্থাৎ: যিশুই তাঁর পরিত্রাণের পথে এই লোক দু'টো মিলিত করেন কেননা তিনি ঊর্ধ্বলোক থেকে নিম্নলোকে 'নেমে আসেন' এমনকি মাংসে আগমন করে মানুষ হন এবং পুনরায় স্বর্গলোকে 'আরোহণ' করেন (৬:৬২) যাতে তাঁর সকল বিশ্বাসী তাঁকে প্রকৃত 'পথ' রূপে অনুসরণ করে (১৪:২-৬)। পিতা ঈশ্বরের প্রেমপূর্ণ কৃপায় অর্থাৎ যিশুর আবির্ভাবে 'অন্ধকার ঘুচে যাচ্ছে ও সত্যকার আলো এর মধ্যেই দেদীপ্যমান' (১ যোহন ২:৮), সৎ অসৎকে পরাজিত করে এবং ক্রুশের মাধ্যমে 'এখন এই জগতের অধিপতিকে বের করে দেওয়া হচ্ছে' (১২:৩১); বাস্তবিকই ক্রুশের উপরেই যিশু জগতের জীবনের জন্য নিজের মাংস দান করেন। যদিও এখনও এই জগৎ যিশুকে অস্বীকার করে ও তাঁর শিষ্যদের নির্যাতন করে (১৫:১৮), তবুও বিশ্বাস করতে হয় যে ঈশ্বরদ্রোহী জগৎ যিশু দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছে: ঈশ্বর জগতের সকল শক্তির চেয়ে মহান এবং যিশুই জগতের শেষ ও চরম ত্রাণকর্তা। সুতরাং স্বল্প কথায় বলতে পারি যে, মাংসে আগমন করায় ও তাঁর মাংস জগতের জীবনের জন্য সঁপে দেওয়ায় ঐশবাণী-যিশু এই জগৎকে পরিত্রাণ করেন।

সম্ভবত এবিষয়ে দু' একটা প্রশ্নের উদয় হতে পারে: কি করে আমরা যিশুর দেওয়া পরিত্রাণ পেতে পারি? স্বয়ং যিশু থেকেই অবিরত উত্তর আসে, তথা: 'যে পুত্রের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে' (৩:১৬, ৩৬; ৫:২৪; ৬:৪০, ৪৭…)। কিন্তু 'পুত্রের প্রতি বিশ্বাস রাখা'-র অর্থ কি? এ বচনের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝি যে ঐশপ্রকাশকর্তা যিশুর সকল বাণীতে বিশ্বাস রাখতে হয়। অথচ ঐশপ্রকাশকর্তা যিশু একজন দার্শনিক নন, মহর্ষি বা মহান এক নবীও নন এবং তাঁর প্রকাশিত বাণী দর্শনশাস্ত্রের তুল্য নয়। যিশু নিজেকেই প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ করেন এবং এ-ই শিক্ষা দান করেন যে, শুধু তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় আমরা পরিত্রাণ পাই। তাঁর বাণী থেকে যিশুকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, কেননা উভয়েই একমাত্র জিনিস। সুতরাং, যদি তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকার সচেষ্ট থাকি এবং তাঁকে আমাদের ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করি, তবেই পরিত্রাণ পাই।

বর্তমানকাল ও চরমকাল: আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর সময় এধারণা প্রচলিত ছিল যে, যিশুর পরিত্রাণ বর্তমানকালেও বিদ্যমান হলেও তবু শুধু চরমকালেই পূর্ণতা লাভ করবে। তখনকার এ সাধারণ ধারণাকে যোহনও সমর্থন করেন, তথাপি তিনি ভাবী পূর্ণতা অপেক্ষা পরিত্রাণের বর্তমান বাস্তবতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন: 'যে পুত্রের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে'। এবিষয়ে যোহনের সমস্যা একটা প্রশ্নে পরিণত করা যায়, তথা: বর্তমানকালের ভূমিকা কি? বাস্তবিকপক্ষে অনেকে মনে করে বর্তমানকালের গুরুত্ব গৌণ, যিশুর পুনরাগমনের কালই (অর্থাৎ চরমকাল) প্রধান; ফলে খ্রিষ্টমণ্ডলীরও বর্তমানকালের গুরুত্ব গৌণ, কেননা এখনও আমরা যিশুর পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় আছি। অন্য দিকে যোহন এধারণা সমর্থন করেন যে, বর্তমানকালও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সেইকালের চেয়ে আজই যিশু আমাদের মাঝে অধিকতর সক্রিয়ভাবে উপস্থিত। অর্থাৎ মাংসে তাঁর সেই আগমন এখনই ও ইতিমধ্যেই কার্যকর এবং তাঁর প্রকাশকারী ও পরিত্রাণকারী তাৎপর্য এখনই ও ইতিমধ্যেই পূর্ণপ্রকাশিত হতে চলছে। অন্য কথায়, সেইকাল অপেক্ষা এখনই খ্রিষ্টমণ্ডলী যিশুকে পূর্ণতরভাবে উপলব্ধি করতে পারে; বাস্তবিকই তাঁর পুনরুত্থানের পর থেকেই শিষ্যেরা

যিশু-রহস্য অনুভব করতে আরম্ভ করেছিলেন এবং পবিত্র আত্মা পূর্ণ সত্যের মধ্যে বিশ্বাসীদের চালনা করতে শুরু করলেন।

যিশুর পরিত্রাণ বোধগম্য করে তোলার জন্য যোহন বিবিধ শব্দ ব্যবহার করেন, আর 'জীবন' হল সেই শব্দগুলোর অন্যতম। মানুষের কাছে যিশু যে জীবন এখন দান করে থাকেন, সেটাই হল ঐশজীবন; ঈশ্বরের দান বলে শুধু নয়, বরং ঈশ্বরের জীবনের সঙ্গে সহভাগিতা বলেই এই জীবন ঐশ। তার আর একটা নাম হল 'অনন্ত জীবন', কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমাদের কাছে তা চরমকালেই দেওয়া হবে, বরং আমরা এ সত্য বিশ্বাস করি যে, চরমকাল বা ঐশলোক এই বর্তমানকালেই উন্মুক্ত, অর্থাৎ আমাদের কাছে পূর্বপ্রকাশিত ও পূর্বনিবেদিত হয়, অর্থাৎ (যেভাবে বলা হয়েছিল) অনন্ত জীবন বর্তমানকালেই যদিও অপূর্ণাঙ্গ, কিন্তু তথাপি সত্যিই বিদ্যমান। এই নিগূঢ় সত্য কিঞ্চিৎ স্পষ্টতরভাবে উপলব্ধি করার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক: ঈশ্বর হয়ে মাংসে আগত ঐশবাণী যিশু ঐশগৌরবপ্রাপ্ত ছিলেন, তবুও কেবল 'মৃত্যু-পুনরুত্থান ক্ষণেই' সেই গৌরব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং আমরাও বর্তমানকালে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হই, তবু শুধু চরমকালে এই জীবন পূর্ণ প্রকাশ পাবে।

পরিত্রাণদায়ী যিশুর সম্মুখীন হয়ে আমরা একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আহূত: যিশুকে ত্যাগ করব, না তাঁকে অনুসরণ করব। এই সিদ্ধান্ত অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তার মধ্য দিয়ে হয় মৃত্যু না হয় জীবনের উদ্দেশে নিজেদের বিচার করি। বলা বাহুল্য যে প্রতিনিয়তই এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে আমরা আহূত।

উপসংহারে একথা বলতে পারি যে, যোহন পরিত্রাণের বর্তমানকালের দিকের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন: ঐশগৌরব, অনন্ত জীবন, পুনরুত্থান এবং শেষ বিচার বর্তমানকালেরই ব্যাপার। খ্রিষ্টমণ্ডলীর কাল মাংসে আগত ঐশবাণী যিশুর কালের তুলনায় গৌণ নয়, তাঁর পুনরাগমনকালের তুলনায়ও নয়। চতুর্থ সুসমাচারের বিশেষ অনুপ্রেরণা এই, যাতে আমরা এই বর্তমানকাল সম্পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সঙ্গে অতিবাহিত করি, কারণ এই বর্তমানকালেও উত্তোলিত-গৌরবান্বিত যিশুর পরিত্রাণদায়ী মহাশক্তি বিদ্যমান ও কার্যকর। বস্তুতই, যিশু আমাদের পূর্বনিবেদিত চরমকালস্বরূপ।

বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া: চতুর্থ সুসমাচারে কয়েকটা উদ্ধৃতি রয়েছে যেগুলি স্পষ্টভাবে বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্ত দু'টোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। উদ্ধৃতি হল এ এ: ৩:৩; ৬:৫১-৫৮; ১৯:৩৪। শাস্ত্রবিদগণের মত অনুসারে, যোহন তাঁর লেখায় আপন কালে প্রচলিত ধর্মোপাসনা এবং মাংসে আগত ঐশবাণী যিশুর ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছেন। এমনকি তিনি খ্রিষ্টমণ্ডলীতে উপস্থিত ও সক্রিয় পুনরুত্থিত যিশুর সঙ্গে মাংসে আগত ঐশবাণী যিশুর অভিন্নতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। সুতরাং, এক্ষেত্রেও একথা স্বীকার্য যে, চতুর্থ সুসমাচারের মূল ধারণা বা মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল 'ত্রাণকর্তা রূপে যিশু'। সেইকালে চিহ্নকর্মগুলির মধ্য দিয়েই যিশু ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তা ছিলেন; এখন, পুনরুত্থানের পর, সাক্রামেন্তগুলোর মাধ্যমেই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন ও আমাদের পরিত্রাণ করেন, অর্থাৎ নিজের কাজ সাধন করে থাকেন।

এ প্রেক্ষিতে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, যোহন উল্লিখিত সাক্রামেন্ত দু'টোর প্রতিষ্ঠার কথার প্রত্যক্ষ বর্ণনা করেন না। এর কারণ এটিই হতে পারে যে তিনি সেই সাক্রামেন্ত দু'টো সমকালীন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কাছে জ্ঞাত বিষয় বিবেচনা করেন। অধিকন্তু তিনি যিশু-সম্পর্কিত সমগ্র রহস্যের সঙ্গে সেগুলি সংযুক্ত করেন, যে-রহস্যের কেন্দ্রস্থল হল যিশুর 'মৃত্যু-পুনরুত্থান': যিশুর বিদ্ধ বুক থেকে রক্ত ও জল নিঃসৃত হল (১৯:৩৪), এই 'ক্ষণেই' তাঁর গৌরব ও আমাদের পরিত্রাণ সূচিত বিধায় সাক্রামেন্তগুলির মাধ্যমে খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণও যিশু-রহস্যের সহভাগী হয়। এ সকল কথার ফলে আমরা বলতে পারি যে, বিশ্বাস না থাকলে আমাদের পক্ষে সাক্রামেন্তগুলি গ্রহণ করা বৃথা কাজ। বাস্তবিক, বিশ্বাসের মাধ্যমেই আমরা সাক্রামেন্তগুলোতে ব্যক্তিরূপে যিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি ও তাঁর সঙ্গে সংযোগ লাভ করি।

খ্রিষ্টমণ্ডলী: যদিও যোহনের সুসমাচারে 'খ্রিষ্টমণ্ডলী' শব্দটা উল্লেখ না পায়, তথাপি স্বীকার করতে হয় যে সমগ্র সুসমাচার অবিরত মণ্ডলীকে লক্ষ করে। যোহনের আগে মথি নিজের সুসমাচারে প্রচার করেছিলেন যে, যে ঐশরাজ্য যিশু প্রতিষ্ঠা করলেন সেই রাজ্যের চিহ্ন খ্রিষ্টমণ্ডলীতে প্রকাশ পায়। যোহন এধারণা অবগত ছিলেন, কিন্তু

গভীরতর একটা পদক্ষেপ নিলেন। তিনি যিশুর বাণী ও কার্যকলাপের তাৎপর্য এতই সূক্ষ্মরূপে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করলেন যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন: মণ্ডলীভুক্ত হওয়ায় খ্রিষ্টভক্তগণ বিশ্বাসের মাধ্যমে সেই একই বাস্তবতাগুলি লাভ করে যে-বাস্তবতা প্রেরিতদূতগণ যিশুর সাহচর্যে লাভ করেছিলেন (১ যোহন ১:১-৪)। সুসমাচারের পরম পরিণতিতে—থোমাসের স্বীকারোক্তি ও প্রভু যিশুর উত্তরে (২০:২৪-২৯) আমরা সমগ্র সুসমাচারব্যাপী পরিলক্ষিত যোহনের মর্মকথা সরাসরি অনুভব করি: জীবনকালে যিশু যা যা বললেন ও সাধন করলেন তা এমন বর্তমান বাস্তবতার চিহ্ন যে-বাস্তবতা খ্রিষ্টমণ্ডলীতেই আমরা লাভ করি। বস্তুতপক্ষে যিশুর বাণী ও কাজগুলোর যথাযথ তাৎপর্য এই বর্তমানকালেই শুধু সম্পূর্ণরূপে অনুধাবনযোগ্য, কারণ এই বর্তমানকালেই পবিত্র আত্মার উপস্থিতি আমাদের মন উদ্বুদ্ধ করে (২:২২; ৭:৩৯; ১৬:২৫)। যেমন পুত্র পিতার কাজ সম্পন্ন করেন (৮:২৮), তেমনি পবিত্র আত্মা যিশুর কাজ সম্পন্ন করেন: মণ্ডলীর জীবন হল যিশুরই জীবন।

বিষয়টা এত গুরুত্বপূর্ণ যে এখন স্বয়ং যোহনেরই কথার মাধ্যমে যিশুর সঙ্গে মণ্ডলীর সম্পর্ক পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করব। মেষপাল ও আঙুরলতার উদাহরণেই আপন শিষ্যদের ও ভাবী বিশ্বাসীদের সঙ্গে যিশুর ঐক্য প্রকাশিত: যিশুই ভক্তমণ্ডলীর পরিচালক, এমনকি তিনিই তার জীবনকেন্দ্র ও ঐক্য-বন্ধন। একমাত্র যিশুরই হাতে পিতা ঈশ্বর মেষপালকে ন্যস্ত করলেন, যিশু যেন প্রকৃত ও বিশ্বস্ত মেষপালকরূপে নিজ প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত তাকে জীবনের চারণভূমির দিকে চালনা করেন (১০ অধ্যায়)। যিশু ও তাঁর আপনজনদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা, আস্থা ও জানার উপর স্থাপিত একটা গভীর ও অন্তরঙ্গ বন্ধন রয়েছে। পিতরের সঙ্গে সংলাপে (২১ অধ্যায়) পুনরুত্থিত যিশু স্পষ্টভাবে বলেন যে, পিতরের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত মেষগুলি প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজেরই: যিশুই ঈশ্বরের নির্ধারিত মেষপালক, তিনি সর্বদাই তাঁর আপনজনদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবেন। আঙুরলতা সংক্রান্ত উপদেশে (১৫ অধ্যায়) যিশু গম্ভীরভাবে ঘোষণা করেন তিনিই নিজের বিশ্বাসীদের জীবন, কারণ তিনিই আঙুরলতা, এবং আঙুরলতায় সংযুক্ত না থাকলে শাখা-প্রশাখা শুকিয়ে যায়। উপরন্তু যিশু নিজেকেই উপাসনার প্রকৃত স্থান বলে প্রচার করেন, কেননা তিনিই সেই নব পবিত্রধাম যেখানে ‘ঈশ্বরের উপস্থিতি’ বিরাজ

করে, ফলত শুধু তাঁতেই ঈশ্বরের উপাসনা করা যায় (২:২১)। যেভাবে পূর্বে বলেছিলাম, সাক্রামেন্তগুলিও যিশু থেকে উদ্গত; বিশেষভাবে এউখারিস্তিয়ার মাধ্যমেই আমরা যিশুর সঙ্গে একীভূত হই (৬ অধ্যায়)। পরিশেষে, ক্রুশে উত্তোলিত যিশুই মণ্ডলীর বাণীপ্রচারকর্মের ভিত্তি, কেননা তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব' (১২:৩২)। এক কথায় বলা চলে যে, যিশু থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মণ্ডলীর কোন অস্তিত্বই আর থাকে না।

চতুর্থ সুসমাচারের কাঠামো

চতুর্থ সুসমাচারের জন্য প্রস্তাবিত বহু কাঠামো রয়েছে। সাধারণত সবগুলো সুসমাচারকে তিন ভাগে ভাগ করে, যেমন:

– সূচনা (১:১-১৮): বাণী-বন্দনা।

– প্রথম খণ্ড (১:১৯–১২:৫০): যিশুর চিহ্নকর্মের পুস্তক: যিশুর আত্মপ্রকাশকর্ম।

– দ্বিতীয় খণ্ড (১৩:১–২১:২৫): যিশুর গৌরবের পুস্তক: যিশুর পরিত্রাণকর্মের সিদ্ধি।

কিন্তু সম্প্রতিকালে অনেক শাস্ত্রবিদ লক্ষ করলেন যে নিজের লেখায় যোহন বিশেষ কয়েকটা ইহুদী পর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন, তিনি যেন দেখাতে চান যে যিশুর আগমনে সেই ইহুদী পর্বগুলি প্রাক্তন তাৎপর্যবিহীন হয়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পক্ষে খ্রিষ্টসম্বন্ধীয় নব একটা তাৎপর্য অর্জন করল। এধারণা অনুসরণ করে এমন প্রকল্প উত্থাপন করা যায় যা অনুসারে সেই পর্বগুলি থেকে যোহনের সুসমাচারের নিম্নলিখিত কাঠামোও অনুমেয়:

পর্বগুলোর প্রাক্তন তাৎপর্য ও নব তাৎপর্য

১ম পাস্কা পর্ব (২:১৩–৩:২১)

- প্রাক্তন তাৎপর্য: বিভিন্ন জন্তুই পাস্কা-বলি।

- নব তাৎপর্য : যিশুই নব পাস্কা-বলি।

পঞ্চাশত্তমী পর্ব (৫:১-৪৬)

- প্রাক্তন তাৎপর্য : ইস্রায়েল ও ঈশ্বরের মধ্যকার সন্ধি ;
  সাব্বাৎ ; মোশির মাধ্যমে বিধান।
- নব তাৎপর্য : পুত্রের মধ্য দিয়েই পিতা আপন জীবনদানকর্ম সাধন করে যান।

২য় পাস্কা পর্ব (৬:৪-৬৬)

- প্রাক্তন তাৎপর্য : মোশির মধ্য দিয়ে পাওয়া রুটি এবং মান্না।
- নব তাৎপর্য : যিশুর মধ্য দিয়ে পাওয়া জীবনের রুটি।

পর্ণকুটির পর্ব (৭:১-৫২)

- প্রাক্তন তাৎপর্য : মরুপ্রান্তরের জল ও মন্দিরের ঝরনা।
- নব তাৎপর্য : যিশুই জীবন-জলদাতা।

মন্দিরের উৎসর্গপর্ব (১০:২২-৪০)

- প্রাক্তন তাৎপর্য : মন্দিরই পবিত্র স্থান।
  রাজাই তৈলাভিষিক্ত মশীহ।
- নব তাৎপর্য : যিশুই পবিত্র।
  তিনিই ঈশ্বরের প্রেরিতজন ও তৈলাভিষিক্তজন।

৩য় পাস্কা পর্ব (১১:৫৫–১২:৫০)

- প্রাক্তন তাৎপর্য : রক্তগুণে পাস্কা-মেষ ইস্রায়েল জনগণকে রক্ষা করেছিল।
- নব তাৎপর্য : রক্তগুণে যিশুই নব পাস্কা-মেষরূপে চরম পরিত্রাণকর্ম সাধন করেন।

এই পুস্তকের প্রস্তাবিত কাঠামো মোটামুটি উপরে প্রথম কাঠামো অনুসরণ করে :

– সূচনা (১:১-১৮) : বাণী-বন্দনা।
– প্রথম খন্ড (১:১৯–১২:৫০) : জগতের সামনে যিশুর আত্মপ্রকাশ।

– দ্বিতীয় খণ্ড (১৩:১–২১:২৫): আপনজনদের কাছে যিশুর আত্মপ্রকাশ,তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান।

যোহন-রচিত সুসমাচার

বাণী-বন্দনা

(১:১-১৮)

‘সুসমাচার’ পুস্তকগুলোর প্রতিটি লেখক নিজ নিজ লেখার প্রারম্ভে একটা প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন যাতে তাঁদের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ব্যক্ত হয়। মার্ক একটামাত্র বাক্যের মাধ্যমে নিজ লেখার মূল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন, তথা: ‘ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রিষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ’ (মার্ক ১:১)। মথি একটা বংশতালিকার মধ্য দিয়ে (মথি ১:১-১৭) পুরাতন নিয়মের সঙ্গে যিশুর সংযোজন ঘটান এবং যিশু সম্পর্কীয় দ্বিমুখী সত্য প্রকাশ করেন: তিনি মানবজাতির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে জড়িত ও ঈশ্বর হতে জনিত। লুক ঐতিহাসিক প্রস্তাবনার মাধ্যমে যিশু বিষয়ে আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর শিক্ষা উপযুক্ত ও সত্যাশ্রয়ী বলে ঘোষণা করেন। চতুর্থ সুসমাচারের ক্ষেত্রে এরূপ প্রস্তাবনা নেই: যোহন একটি বন্দনা দিয়েই শুরু করেন, যে-বন্দনায় যিশুর রহস্যাবৃত সত্য ও সেই সত্যের তাৎপর্য সংক্ষিপ্তভাবে কেন্দ্রীভূত। সুতরাং, বন্দনাটি যোহনের সুসমাচারের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ: এর মাধ্যমে যোহন মাংসে আগত যিশুর প্রকৃত উদ্ভবই প্রকাশ করতে চান, যে-যিশুর কথা তিনি পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। এজন্য তিনি ‘যিশুর জীবনী’ তাঁর জন্ম থেকে নয়, প্রকাশ্য জীবন থেকেও নয় বরং জগৎসৃষ্টির পূর্ব থেকেই শুরু করেন। বাস্তবিকই যিশু হলেন ঈশ্বর, এবং ঈশ্বর বলে সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ও সত্যকার ত্রাণকর্তা।

আদিমণ্ডলীর খ্রিষ্টভক্তগণ ধর্মানুষ্ঠানে যে যে খ্রিষ্টবন্দনা গান করত, সেগুলির একটা বেছে নিয়ে যোহন কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করে ও নতুন নতুন ধারণা উপস্থাপন করে সেটাকে তাঁর রচিত ‘যিশুর জীবনী’র সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। এ হল অধিকাংশ শাস্ত্রবিদগণের মত। তাঁদের গবেষণার ফলে আমরাও সেই খ্রিষ্টবন্দনার প্রকৃত রূপও মোটামুটি জানতে

পারি। বন্দনাটি বর্তমান প্রথম অধ্যায়ের ১, ৩, ৪, ৯খ, ১০ ক গ, ১৬ পদ নিয়ে সংগঠিত ছিল:

১। আদিতে ছিলেন বাণী:
বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী,
বাণী ছিলেন ঈশ্বর।
সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল,
আর যা কিছু হয়েছে,
তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি।

২। তাঁর মধ্যে ছিল জীবন,
আর সেই জীবন ছিল মানুষের আলো;
তিনিই ছিলেন সেই সত্যকার আলো,
যা প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে।

৩। তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন,
অথচ জগৎ তাঁকে চিনল না।
তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এলেন,
অথচ তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করল না।

৪। এবং বাণী হলেন মাংস,
ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন,
অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ হয়ে।
সত্যিই আমরা সকলে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে লাভবান হয়েছি:
লাভ করেছি অনুগ্রহের পরে আরও অনুগ্রহ।

এই প্রাচীন বন্দনা ব্যাখ্যা করে আমরা দেখি যে প্রথম অংশে ঘোষিত হয় জগৎসৃষ্টির পূর্ব থেকেও ঐশবাণীর অস্তিত্ব, তাঁর ঐশস্বরূপ এবং তাঁর সৃষ্টিমূলক ভূমিকা; দ্বিতীয় অংশে মানুষের পক্ষে ঐশবাণীর গুরুত্ব; তৃতীয় অংশে, মাংসে যিশুর আগমনের

পূর্বকালে মানবজাতি কর্তৃক ঐশবাণীকে প্রত্যাখ্যান, এবং চতুর্থ অংশে, মাংসে ঐশবাণীর পরিত্রাণদায়ী আগমন। এ বন্দনায় ঐশবাণীকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় বিধায় আমরা তা 'বাণী বন্দনা' বলে অভিহিত করতে পারি।

এখন যোহনের পরিবর্ধিত বাণী-বন্দনা বিশ্লেষণ করা যাক। বন্দনাটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে:

১:১-৫, ঐশবাণীর পূর্বাস্তিত্ব, তাঁর পরিচয় ও ভূমিকা,

১:৬-১৩, জগতে ঐশবাণীর আবির্ভাব এবং মানুষের বাণী-অস্বীকৃতি,

১:১৪-১৮, মাংসে ঐশবাণীর আগমন এবং মানব-পরিত্রাণের পক্ষে এই ঘটনার গুরুত্ব।

একথা বলা যায় যে, যোহনের পরিবর্ধন-কাজের মধ্য দিয়ে বাণী-বন্দনা একটি বিষয়ের দিকেই বিশেষত অঙ্গুলি নির্দেশ করে, তথা, মাংসে তাঁর আগমন। উপরন্তু, 'সুসমাচার' লেখার অবশিষ্টাংশের সঙ্গে বন্দনার সম্বন্ধ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে: যোহনের বাণী-বন্দনায় ঘোষিত হয় যে বাণী হলেন অন্ধকারে জাজ্বল্যমান আলো, বাণী অস্বীকৃতির সম্মুখীন হয়েছেন, মাংসে এসেছেন এবং নিজের গৌরব প্রকাশ করেছেন; সুসমাচারের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয় কি করে এবং কোথায় এই বাণী আলো বলে আবির্ভূত হলেন, পরিত্যক্ত হলেন এবং নিজের গৌরব প্রকাশ করলেন।

ভূমিকাস্বরূপ এ কথাও উল্লেখ্য যে, বাণী-বন্দনায় যা যা ঘোষিত, সেই সকল ধারণা পুরাতন নিয়মের উপরেই বিশেষভাবে ভিত্তি করে, ফলে যোহনের এই বিশিষ্ট ধারণা স্পষ্টভাবে বিকশিত হয় যে, পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের কতিপয় পরিত্রাণদায়ী প্রচেষ্টার পরে ঐশবাণী মাংসে আগমন করে ঐশঅনুগ্রহের নব, অপূর্ব ও বাস্তব অভিব্যক্তি বলে আবির্ভূত হন।

১ [১] আদিতে ছিলেন বাণী:
বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী,
বাণী ছিলেন ঈশ্বর।

[২] আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরমুখী।
[৩] সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল,
আর যা কিছু হয়েছে,
তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি।
[৪] তাঁর মধ্যে ছিল জীবন,
আর সেই জীবন ছিল মানুষের আলো ;
[৫] অন্ধকারে সেই আলোর উদ্ভাস,
অথচ অন্ধকার তা ধারণ করেনি !
[৬] ঈশ্বর-প্রেরিত একজন মানুষ আবির্ভূত হলেন ;
তাঁর নাম যোহন ;
[৭] তিনি এলেন সাক্ষ্য দিতে,
আলোরই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে,
যেন তাঁর দ্বারা সকলে বিশ্বাস করতে পারে।
[৮] তিনি তো সেই আলো ছিলেন না,
আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেই তিনি ছিলেন।
[৯] বাণীই ছিলেন সেই সত্যকার আলো,
যা জগতে এসে প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে।
[১০] তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন,
আর জগৎ তাঁরই দ্বারা হয়েছিল,
অথচ জগৎ তাঁকে চিনল না।
[১১] তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এলেন,
অথচ তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করল না।
[১২] কিন্তু যারা তাঁকে গ্রহণ করল,
সেই সকলকে, তাঁর নামে বিশ্বাসী যারা,
তাদের তিনি ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন :
[১৩] তারা রক্ত থেকে নয়,
মাংসের বাসনা হতেও নয়,
পুরুষের বাসনা হতেও নয়,
ঈশ্বর হতেই জনিত।

[১৪] এবং বাণী হলেন মাংস,
ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন।
আর আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম:
এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব,
যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।

[১৫] তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে যোহন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁর সম্বন্ধে বলেছিলাম: যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ ইনি আমার আগেও ছিলেন।'
[১৬] সত্যিই আমরা সকলে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে লাভবান হয়েছি: লাভ করেছি অনুগ্রহের পরে আরও অনুগ্রহ। [১৭] মোশি দ্বারা বিধান দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে। [১৮] ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

ঐশবাণীর পূর্বাস্তিত্ব, তাঁর পরিচয় ও ভূমিকা (১:১-৫)

এখানে ঘোষিত হয় ঈশ্বর ও জগতের সঙ্গে ঐশবাণীর সম্পর্ক।

১:১ক—আদিতে ছিলেন বাণী: সুসমাচারের এই উদ্বোধনী পদ আদিপুস্তকের প্রথম পদের প্রতিধ্বনি: বাণী-বন্দনার কীর্তিত বাণী সেই একই বাণী যাঁর মাধ্যমে 'আদিতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন (গ্রীক ভাষায় অনুবাদ অনুযায়ী আদি ১:১)। কিন্তু, আদিপুস্তকের ধারণা অপেক্ষা যোহন আরও গভীরে এগিয়ে যান: জগতের উৎপত্তি নয়, বরং জগৎসৃষ্টির আগে বাণীর অস্তিত্বই অনুধাবিত: জগৎ সৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু ঐশবাণী অসৃষ্ট, ঈশ্বরের মতই সেই বাণী চিরকালীন ঐশস্বরূপমণ্ডিত। এই বাণী হলেন মাংস, অর্থাৎ তিনি মাংসে আগত সেই যিশু যিনি এপ্রসঙ্গেই বলেছিলেন 'আব্রাহাম জন্মাবার আগে আমিই আছি' (৮:৫৮)। 'আদিতে ছিলেন' (১:১) এবং 'ঊর্ধ্বলোক থেকে আগত' (৩:৩১) বিধায় বাণী-যিশুই ঈশ্বর বিষয়ে যথাযথ ও পূর্ণ সত্য প্রকাশ করতে সক্ষম, সুতরাং তিনিই একমাত্র পরিত্রাণদায়ী ঐশপ্রকাশকর্তা।

১:১খ—বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী: এখানে ঈশ্বরের সঙ্গে বাণীর ব্যক্তিময় ঐক্য ও সম্পর্ক প্রকাশিত। উল্লেখযোগ্য যে আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীকালে ঈশ্বর বলতে পিতা ঈশ্বর বোঝাত। ফলে ঈশ্বরমুখী হওয়ায় যিশু সর্বদা পিতার সান্নিধ্যে ও পিতার সঙ্গেই আছেন: কথাটা সুসমাচারে বার বার উল্লিখিত (১০:৩০; ১৭:১০; ১৭:১৫), কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যিশু স্থিতিশীলভাবে পিতার পাশাপাশি অবস্থান করেন, বরং আদি থেকে তিনি পিতা ঈশ্বরের ভালবাসা হতে উদ্গত বা, অন্য কথায়, ঈশ্বরত্বে পরিপূর্ণ ও পিতার গৌরবের সহভাগী। এইভাবে পদের পূর্বালোচিত অংশের অর্থ এই অংশ দ্বারা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে: সৃষ্টির আগে থেকে ঐশবাণী পিতা ঈশ্বরের ঐক্যপ্রাপ্ত, পিতাতে অধিষ্ঠিত এবং পিতা হতে উদ্গত। এই অর্থ অনুসারেই যিশু বলেন 'আমি পিতাতে আছি' (১৪:১১ ইত্যাদি); জগতে থাকা সত্ত্বেও তিনি পিতার সঙ্গেই সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত, কারণ ঈশ্বরমুখী হওয়ায় তিনি অনাদিকাল থেকেই ঈশ্বর। কিন্তু তবুও ঈশ্বরমুখী কথাটা পিতার সঙ্গে বাণীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কও বিশেষভাবে তুলে ধরে; কেমন যেন পিতা যেই দিকে তাকান বা যেইখানে যান না কেন ঐশবাণী সর্বদাই সেইদিকেই ফিরে আছেন; পিতা যা কিছু ভাবেন বা বলেন, বাণী সেই সব সাথে সাথেই অনুভব করেন; এজন্যই যিশু সুসমাচারে বলেন যে তাঁর চিন্তা, ইচ্ছা ও কাজ পিতারই একই চিন্তা, ইচ্ছা ও কাজ। এক কথায়, তিনি ও পিতা এক (১০:৩০; ১৭:১০)।

যোহনের কাছে এই 'ঈশ্বরমুখী' কথা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও ফলদায়ী। এতে তিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ঐশজীবনের সহভাগিতা প্রমাণ করেন: সনাতন বাণী অর্থাৎ জীবনদায়ী বাণী ঈশ্বরমুখী ছিলেন বলে তাঁর মাধ্যমেই বিশ্বাসীগণ পিতা ও পুত্রের সহভাগিতা-প্রাপ্ত (১ যোহন ১:১…) ও তাঁদের গৌরবের অংশী।

১:১গ—বাণী ছিলেন ঈশ্বর: এই বাক্য প্রথম পদের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। তার মাধ্যমে বাণীর ঐশস্বরূপ সরাসরিভাবে প্রচারিত: বাণী এবং পিতা সম্পূর্ণরূপে এক, উভয় একই ঐশস্বরূপ ও জীবনের সহভাগী, উভয়ই অদ্বিতীয় ঈশ্বর। পিতার প্রেম-দেওয়া ঐশস্বরূপের পূর্ণতা-সহভাগিতায়ই যিশু অনন্য ঐশপ্রকাশকর্তা ও বিশ্বত্রাতার পরিচয়

নিজের জন্যই দাবি করেন (৩:৩৫); একই কারণে যিশুই মানবের প্রকৃত 'আলো' ও 'জীবন' এবং মাংসে আগমন করে 'অনুগ্রহের পরে আরও অনুগ্রহ' দান করতে পারেন।

এক্ষেত্রে একথা স্মরণীয় যে, সুসমাচারের এই সূচীলগ্নে যিশুর ঐশস্বরূপ বিষয়ে যে গম্ভীর ঘোষণা স্থান পায়, সেই একই ঘোষণা সুসমাচার-শেষেও প্রেরিতদূত থোমাস দ্বারা উচ্চারিত হয়, 'প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার' (২০:২৮) এবং যোহনের অন্য একটি লেখায়ও পুনরাবৃত্ত হয়, 'তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন (১ যোহন ৫:২০)।

১:২—আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরমুখী: এই পদ পূর্ববর্তী পদের কথা সংক্ষিপ্তভাবে পুনরাবৃত্তি করে। উপরে দেওয়া ব্যাখ্যা ছাড়া একথাও বলতে পারি যে, 'ঈশ্বরমুখী' কথাটা পিতার প্রতি যিশুর বাধ্যতাও ইঙ্গিত করে; বাস্তবিকই ফিলিপ্পীয়দের কাছে পত্রে প্রেরিতদূত পল বলেন যে ঈশ্বর হয়েও যিশু মৃত্যু পর্যন্ত এমনকি ক্রুশ-মৃত্যু পর্যন্তই বাধ্যতা দেখালেন; আর তেমন বাধ্যতাকে তিনি যিশুর মনোভাব বলে চিহ্নিত করেন, যে-মনোভাব আমাদেরও থাকার কথা। সুতরাং ঈশ্বরমুখী ঐশবাণী হলেন আমাদের আদর্শ: যেমন ঈশ্বরমুখী হওয়ায়ই তিনি পিতার ইচ্ছা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে পেরেছিলেন, তেমনি তাঁর শিষ্য আমরাও তাঁর আদর্শে ঈশ্বরমুখী হয়েই পিতার ইচ্ছা আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারব।

আবার, বাণী যে ঈশ্বরমুখী, তাতে পিতার সান্নিধ্যে তাঁর অবস্থানও ব্যক্ত করে; তাই এদিক দিয়ে বলতে পারি: এই পদেই যিশুর পরিত্রাণদায়ী যাত্রা শুরু হয়: পিতামুখী যিনি, তিনি পিতা হতে উদ্গত হয়ে (৮:৪২; ১৩:৩; ১৬:২৭…, ৩০; ১৭:৮) মানবজাতির মাঝে ত্রাণকর্ম সম্পন্ন করে আবার পিতার কাছে ফিরে যান (১৭:২৪)। ঈশ্বরের প্রেরিতজন সেই যিশু আদি থেকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের অধিকারী বলে নিজেই ঈশ্বর এবং ঐশগৌরবে ও ঐশ-অধিকারে পরিপূর্ণ।

যোহনের সুসমাচার অনুসারে ঐশবাণীর কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শাস্ত্রবিদগণ পুরাতন নিয়মের সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্য তুলে ধরেন। সামঞ্জস্য বিশেষত ঐশপ্রজ্ঞারই সঙ্গে লক্ষণীয়:

তোমারই সঙ্গে রয়েছে সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার সাধিত কাজ জানে,
যা তখনও উপস্থিত ছিল যখন তুমি জগৎ নির্মাণ করলে। [প্রজ্ঞা ৯:৯]

আপন সৃষ্টিকর্মের সূচনা থেকেই প্রভু আমাকে সৃষ্টি করেছেন,
তাঁর কর্মসাধনের প্রারম্ভে—সেসময় থেকেই! [প্রবচন ৮:২২]

অনাদিকাল থেকে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি,
আদি থেকেই, পৃথিবীর উদ্ভবের সময় থেকেই। [প্রবচন ৮:২৩]

আমি দক্ষ কারিগরের মত তাঁর পাশে ছিলাম, (…)
ক্ষণে ক্ষণে তাঁর সম্মুখে আমোদপ্রমোদ করতাম। [প্রবচন ৮:৩০]

আমাকে দান কর সেই প্রজ্ঞা,
যা তোমার আসনে তোমার সঙ্গে আসীন। [প্রজ্ঞা ৯:৪]

আমি পরাৎপরের মুখনিঃসৃত (সুতরাং প্রজ্ঞাও বাণী)। [সিরা ২৪:৩]

এবিষয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য যে, পুরাতন নিয়মকালে ঐশপ্রজ্ঞা সম্বন্ধে যা যা প্রতীকমূলকভাবে ঘোষিত হয়েছিল, বাণী-যিশুর আগমনেই তা বাস্তব রূপ লাভ করেছে। এমনকি ঐশবাণী যিশু ঐশপ্রজ্ঞার প্রতীকমূলক ভূমিকা অতিক্রমও করেছেন: প্রজ্ঞা নয়, তিনিই মাংস হলেন, এটিই যোহনের বাণী-বন্দনার প্রচারিত নবীনত্ব।

১:৩—সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল: সৃষ্টিকর্মে বাণীর ভূমিকা ছিল। অবশ্যই আমরা এমনটি কল্পনা করব না যে, পিতা ঈশ্বর এবং বাণী শারীরিক পরিশ্রম করে জগতের নির্মাণকর্ম সাধন করেছিলেন। এক্ষেত্রে আদিপুস্তক বলে যে, ঈশ্বর বাণীর মাধ্যমেই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। আবার জগৎসৃষ্টি বিষয়ে পুরাতন নিয়ম ঐশপ্রজ্ঞার মধ্যস্থতা প্রচার করেছিল:

তুমি তোমার বাণী দ্বারা সমস্তই নির্মাণ করলে,
(…) তোমার প্রজ্ঞা দ্বারা মানুষকে গড়লে। [প্রজ্ঞা ৯:১-২]

প্রজ্ঞা তখনও উপস্থিত ছিল
যখন তুমি জগৎ নির্মাণ করলে। [প্রজ্ঞা ৯:৯]

যখন তিনি পৃথিবীর ভিত্তিমূল নিরূপণ করেন,
তখন আমি (প্রজ্ঞা) দক্ষ কারিগরের মত
তাঁর পাশে ছিলাম। [প্রবচন ৩:১৯-২০]

প্রভু প্রজ্ঞা দ্বারা পৃথিবীর ভিত স্থাপন করলেন,
(…) প্রজ্ঞা দ্বারা অতল গহ্বর উদ্ঘাটিত হল। [প্রবচন ৮:২৬]

নিখিলের নির্মাতা সেই প্রজ্ঞাই (…) আমাকে উদ্বুদ্ধ করল। [প্রজ্ঞা ৭:২১]

প্রজ্ঞা সনাতন জ্যোতির প্রতিবিম্ব,
ঈশ্বরের কর্মসাধনার কলঙ্কমুক্ত দর্পণ,
তাঁর মঙ্গলময়তার প্রতিমূর্তি। [প্রজ্ঞা ৭:২৬]

এ সকল উদ্ধৃতি থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পুরাতন নিয়মে পূর্বঘোষিত ঐশপ্রজ্ঞার প্রতীক ঐশবাণীতে পূর্ণতা লাভ করে: সৃষ্টিকর্ম-ক্ষেত্রে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে বাণীরূপে পূর্ববিদ্যমান বাণী-যিশুর ভূমিকাও অপরিহার্য। কিন্তু, জগৎ-সৃষ্টিকর্মে বাণীর বিশিষ্ট ভূমিকার রূপ কি, এসম্পর্কে সুসমাচারে কোন উল্লেখ নেই। তবু, উদাহরণযোগে একথা সমর্থন করতে পারি যে, যেমন পরিত্রাণ ক্ষেত্রে আমরা বলি, পিতা যিশু দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ সাধন করেছেন, তেমনিভাবে সৃষ্টিকর্মক্ষেত্রেও পিতা বাণীর মাধ্যমে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করলেন। সামসঙ্গীত-মালায় ঐশবাণীর তেমন ভূমিকা বহুবার উল্লিখিত; একটা উদ্ধৃতি যথেষ্ট হোক:

প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল,
তাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব। [সাম ৩৩:৬]

ঐশবাণীর এই সহ-স্রষ্টা ভূমিকার জন্যই আমরা যিশুকে ইতিহাসের ও বিশ্বজগতের প্রভু বলে আখ্যায়িত করে থাকি।

উপসংহারস্বরূপ একথা বলা চলে যে, এই পদে যোহন সৃষ্টিকর্ম বিষয় সম্পর্কিত কোন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে চাননি। তিনি একটা বন্দনাই লিখেছেন, যে-বন্দনা মাংসে আগত বাণীর গৌরব দেখাবে ও কীর্তন করবে। আরও, এই পদে, খ্রিষ্টবাণী-বন্দনায় সূচিত ঈশ্বরের সঙ্গে বাণী-যিশুর সম্পর্কের ঘোষণা সমাপ্ত হয়।

১:৪—তাঁর মধ্যে ছিল জীবন: এই পদে বাণী ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক-বর্ণনা শুরু হয়। যেভাবে সৃষ্টিকর্মে বাণীর ছিল মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা, তেমনিভাবে এখনও তাঁর মধ্যস্থতায় মানুষ নিজের অস্তিত্বের পূর্ণতা লাভ করে, অর্থাৎ যিশুতেই আমরা ঐশজীবনপ্রাপ্ত: বাণী-যিশুতেই মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনের অর্থ উদ্দেশ্য ও শেষ-জিজ্ঞাসা—এক কথায়, মানুষের মুক্তি ও পরিত্রাণ সাধিত হয়। উপরন্তু, এই পদে বলা হয় যে, বাণীই মানুষের আলো। আলোময় বাণী দ্বারা উদ্ভাসিত বলেই আমরা আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে, ঈশ্বর ও তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে জ্ঞাত। সুতরাং, এক্ষেত্রেও বলতে পারি, বাণী-যিশুর আলোই আমাদের পরিত্রাণ। পুরাতন নিয়মে আলোর কথা বার বার উল্লিখিত:

> প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ,
> কাকে ভয় করব আমি?
> প্রভুই আমার জীবনের আশ্রয়দুর্গ,
> কার ভয়ে কম্পিত হব আমি? [সাম ২৭:১]

> তোমাতেই জীবনের উৎস,
> তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো। [সাম ৩৬:১০]

> জীবন-ফলের জন্যই সংগ্রহ কর,
> প্রজ্ঞার আলোতেই নিজেদের উদ্বুদ্ধ কর (গ্রীক ভাষায় বাইবেল)। [হোশেয়া ১০:১২]

আবার পুরাতন নিয়মে ঐশপ্রজ্ঞা দিব্য আলো বলে প্রচারিত হয়েছিল:

> প্রজ্ঞা সনাতন জ্যোতির প্রতিবিম্ব। [প্রজ্ঞা ৭:২৬]

আলোর চেয়েও প্রজ্ঞালাভে প্রীত হলাম,
কারণ প্রজ্ঞা থেকে বিকীর্ণ যে উজ্জ্বল দীপ্তি, তা নিদ্রাহীন। [প্রজ্ঞা ৭:১০]

নিজে অভিন্ন হয়ে থেকেও প্রজ্ঞা সবকিছু নবীন করে তোলে,
ও যুগের পর যুগ পুণ্যবানদের প্রাণে প্রবেশ ক'রে
তাদের করে তোলে ঈশ্বরের বন্ধু, তাদের করে তোলে নবী। [প্রজ্ঞা ৭:২৭]

এবং ঐশপরিত্রাণও আলো বলে পূর্বঘোষিত হয়েছিল :

যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত,
তারা মহান এক আলো দেখতে পেল ;
যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল,
তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল। [ইশা ৯:১]

উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশগুলি ছাড়া পুরাতন নিয়মের আর কতিপয় পদ রয়েছে যেগুলো যিশুর কথা পূর্বঘোষণা করে। সেই সকল কথা অনুসারেই বাণী-যিশু নিজের ঐশজীবনে আমাদের পরিপূর্ণ করেন আমরা যেন জানতে পারি যে, মানুষ হয়েও আমরা ঐশসাদৃশ্যে ভূষিত এবং যাতে পবিত্র জীবন যাপনে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের অন্তর্গত সম্পর্কের জন্য আনন্দ ভোগ করি।

তেমন কিছু সম্ভব হতে পারে কেননা ঈশ্বর হয়ে বাণী ঐশজীবনে পূর্ণ, এবং সৃষ্টির আগে থেকেই তাঁর বিশেষ কাজ ছিল আমাদের পরিত্রাণ সাধন করা। এপ্রসঙ্গে যিশু বলেছিলেন, 'আমিই জগতের আলো : যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে' (৮:১১)।

সুতরাং জীবন-আলো বলে যিশু শেষ ও চরম ত্রাণকর্তা: বাস্তবিকই ঐশবাণীর আলোতেই আমরা ঐশজীবন জ্ঞাত ও প্রাপ্ত, পাপের অন্ধকার ও অনিষ্ট থেকে মুক্ত (৩:১৯…)।

১:৫—অন্ধকারে সেই আলোর উদ্ভাস: মানবেতিহাস দ্বন্দ্ববিশিষ্টই ইতিহাস। এখনও আমাদের ইতিহাসে অন্ধকার ও আলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব চলে আসছে, ঐশপ্রকাশের অভিব্যক্তি বিভিন্ন বিঘ্ন দ্বারা বিঘ্নিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে যোহনের প্রথম কথা এ, 'অন্ধকারে সেই আলোর উদ্ভাস', অর্থাৎ ঈশ্বরের আলো সর্বত্র ও সর্বকালে জ্বলতে থাকে। অন্ধকার হল ঈশ্বরের যত শত্রু। পদের দ্বিতীয় পদে এ সত্য ব্যক্ত হয়: অন্ধকার আলোর উদ্ভাস বুঝতে না পেরে তা গ্রহণ করল না, তবুও অন্ধকার আলোকে বিনাশ করতে পারল না। এইভাবে যোহন অন্ধকার-আলোর দ্বন্দ্ব ব্যতীত এই দ্বন্দ্বের পরিণাম সম্বন্ধেও আমাদের অবগত করেন, তথা: আলো বিজয়ী হয় এবং হয়েও থাকবে। সময় সময় মনে করতে পারি অমঙ্গল আমাদের গ্রাস করেছে এবং ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে দূরে গেছেন; সেসময় হতাশ হতে নেই, বরং দৃঢ়তার সঙ্গে সদাবিজয়ী ও জয়দাতা যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখব। এই বিশ্বাস আমাদের মন উদ্বুদ্ধ করে যিশুর চরম বিজয় আমাদের কাছে প্রকাশ করবে।

বাণী-বন্দনার অন্যান্য পদ ব্যাখ্যা করার আগে, আসুন, এই প্রথম পাঁচটি পদের মুখ্য বিষয়বস্তুর উপর দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করি:

– বাণীর ঐশস্বরূপ বিষয়ে যোহনের মহাবাক্যসমূহ (১:১-২) শুধু তাত্ত্বিক কথা নয়, বরং সেগুলির মাধ্যমেই আমরা ঐশপ্রকাশকারী যিশুর ভূমিকা বুঝতে পারব: ঈশ্বর হতে উদ্গত বলেই যিশু ঈশ্বরের প্রকৃত সাক্ষী ও বর্ণনাকারী, এবং তাঁর সাক্ষ্য স্বীকার্য (১:১৮; ৭:২৯…)।

– ঠিক এই পদগুলিতেই সুসমাচারব্যাপী উল্লিখিত সার্বজনীনতার ভাবের সূত্রপাত হয়। মানবেতিহাসের উপর বাণী-যিশুর কর্তৃত্ব থাকায়ই পিতা ঈশ্বর নিজের প্রিয় পুত্রকে জগতের কাছে দান করেছেন (৩:৩৬), মানবপুত্র জগতের জীবনের জন্য নিজের মাংস সঁপে দিয়েছেন (৬:৫১) এবং ক্রুশের উপর থেকে সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করেছেন (১২:৩২)।

– একথা স্বীকার্য যে, যোহনের এই সমস্ত কথা আশ্বাসজনক। মানবেতিহাসের ঘটনাদি যত সঙ্কীর্ণ হোক না কেন, তবু আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, সবকিছু

বাণী-যিশু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আলো ও জীবন হয়ে তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

– অবশেষে এ ধারণা স্মরণযোগ্য: ঈশ্বরেরই আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে মানবেতিহাস অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, তা না হলে, অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করে মানবকেন্দ্রীক হলে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়, জগতের মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

জগতে ঐশবাণীর আবির্ভাব (১:৬-১৩)

বাণী-বন্দনার এই পর্যায়ে আলো-অন্ধকার দ্বন্দ্বের মধ্যবর্ণনায় বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথাকে উপস্থাপন করা হয়। তা করার কি কোন কারণ আছে? প্রকৃতপক্ষে কারণ দু'টোই। স্মরণ করতে হয় যে খ্রিষ্টমণ্ডলীর আদিকালে বাপ্তিস্মদাতা যোহনপন্থীরা তাদের গুরুর মৃত্যুর পর সমর্থন করত তিনিই মশীহ অর্থাৎ খ্রিষ্ট। এবিষয়ে সুসমাচারের এই পদ তিনটি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহন নন, যিশুই সেই খ্রিষ্ট, অর্থাৎ তিনিই সেই মশীহ বা ঈশ্বরের তৈলাভিষিক্তজন। তথাপি এই পদসমূহের প্রকৃত হেতু এই: এগুলির মাধ্যমে সুসমাচারের রচয়িতা যোহন প্রচার করেন যে, আদিতে ছিলেন যিনি, সেই ঐশবাণী ঐতিহাসিক যিশুতে আবির্ভূত হলেন; মানবেশ্বর-যিশুতে মানবেতিহাসের সঙ্গে ঐশপরিকল্পনার সংযোগ ঘটেছে। এখানে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দান করা বাঞ্ছনীয়। সর্বপ্রথমে একথা ঘোষিত হয় যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহন ঈশ্বরের আদেশ অনুসারেই ইস্রায়েল জাতির কাছে ঈশ্বরের তৈলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে জ্ঞাত করতে (১:২৬, ৩১) এবং মাংসে আগত বাণী (১:৩০) ও বিশ্বত্রাতার বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করতে (১:২৯, ৩৬) এসেছেন। সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের ভাষা অনুযায়ী যোহন হয়েছিলেন যিশুর অগ্রদূত। অপর দিকে চতুর্থ সুসমাচার তাঁকে জগতের আলো যিশুর সাক্ষ্যদাতারূপে উপস্থাপন করে। বাস্তবিকপক্ষে তিনি আনুষ্ঠানিক ইহুদীধর্ম (১:১৯-২৮), সমস্ত ইস্রায়েল জাতি (১:৩১), এবং নিজের শিষ্যদের কাছে (১:৩৫…) যিশুর মহা সাক্ষ্যদাতারূপে দাঁড়ান; স্বয়ং যিশু পিতা ঈশ্বরের সাক্ষ্যদানে ব্যতিরেকে, বাপ্তিস্মদাতার সাক্ষ্যদানে প্রাধান্য আরোপ করেন (৫:৩৪)।

এভাবে যোহনের সুসমাচারে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের উদয় হয়, তথা: সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গ। কেননা যোহনের ধারণাই যে, যিশুর প্রতি যে কোন মানুষের বিশ্বাস সাক্ষ্যদান থেকেই উদ্গত। সাক্ষ্যদানের বিষয়বস্তু সর্বদাই যিশু, ফলে আমরা যিশুকে ঈশ্বরের তৈলাভিষিক্তজন ও ঈশ্বরপুত্র বলে অনুভব ও গ্রহণ করতে পারি। সাক্ষ্যদান শ্রোতার কাছে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রয়োজনীয় বলে দাবি করে: এক্ষেত্রে আমাদের হয় আলো না হয় অন্ধকার বেছে নিতেই হয়। উপরন্তু, সাক্ষ্যদান সীমাবদ্ধ নয়, অর্থাৎ তা সকলের জন্য; সুতরাং, বাপ্তিস্মদাতা যোহন শুধু ইস্রায়েল জাতির জন্য যিশুর সাক্ষ্যদান করলেন না, বরং তিনি এখনও এবং জাতি-কাল-স্থান-নির্বিশেষে বিশ্বত্রাণকর্তা যিশুর সাক্ষ্য বহন করে যাবেন (১:২৯)।

আলো-প্রসঙ্গ যা ৫ পদের মধ্যবর্ণনায় ভঙ্গ হয়েছিল, ৯ পদে পুনরায় শুরু হয়। সর্বপ্রথমে একথা ঘোষিত যে, বাণী-যিশুই একমাত্র সত্যকার প্রকৃত আলো। তা ঘোষণা করার কারণ কি? আগে বলা হয়েছিল যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহনপন্থীরা তাদের গুরুকে মশীহ অর্থাৎ খ্রিষ্ট বিবেচনা করত, তবুও তাছাড়া অন্যান্য মহাপুরুষ বা ধর্ম যা নিজেদের আলো মনে করত, তাদের আপেক্ষিকতাকেই এখানে ইঙ্গিত করা হয়: একটা আলো যদি থাকে, সেটা ঐশবাণী-যিশুই। ঠিক এপদ্ধতি অনুসারেই যোহন সুসমাচারের অন্যত্রও যিশুর শ্রেষ্ঠতা নির্দেশ করেন: পুরাতন নিয়মের মান্না নয়, যিশুই সত্যকার রুটি (৬:৩২); ইস্রায়েল জাতি নয়, যিশুই সত্যকার আঙুরলতা (১৫:১); ইস্রায়েল জাতির ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নয়, যিশুই প্রকৃত মেষপালক (১০:১৪)।

১০ পদে ব্যক্ত হয় জগৎ দ্বারা বাণীকে প্রত্যাখ্যান। এখানে জগৎ বলতে সকল মানুষকে বোঝায়। বাণী মানবজাতির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, তাদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, তাঁকে অনুসরণ করে তারা পরিত্রাণ পেতে পারত, অথচ তাঁকে চিনল না: মানবেতিহাসে এটাই হল মস্ত বড় কলঙ্ক। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ইহুদীদের দ্বারা যিশুকে প্রত্যাখ্যান ব্যতীত, বিশেষত মাংসে যিশুর আগমনের পূর্ব ইতিহাসে অর্থাৎ পুরাতন নিয়মের ইতিহাসে ইস্রায়েল জাতি দ্বারা ঐশপ্রজ্ঞা ও ঐশবিধানকে প্রত্যাখ্যান এখানে নির্দেশিত। বলা বাহুল্য যে, ঐশপ্রজ্ঞা ও ঐশবিধান যিশুরই প্রতীক। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রমাণ অনেক, যথা:

তারা কেউই পায়নি প্রজ্ঞার পথ,
স্মরণও করেনি তার মার্গ সকল।
ছেলেরা এড়িয়েছে তাদের পিতাদের পথ। [বারুক ৩:২০]

ফিরে এসো, যাকোব, তাকে গ্রহণ করে নাও,
তার আলোর প্রভায় পথ চল। [বারুক ৪:২]

সুতরাং, ঐশপ্রজ্ঞা হয়ে ঐশবাণী জগতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু মানুষ প্রজ্ঞাকে পরিত্যাগ করায় ঈশ্বরকেই প্রত্যাখ্যান করেছে, ফলে ঐশপরিত্রাণ থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদীদের দ্বারা যিশুকে প্রত্যাখ্যান তাদের আলোবর্জনকারী ও অন্ধকার-আকাঙ্ক্ষী পূর্বপুরুষদের ঘটমান নির্বুদ্ধিতা পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছেছে।

১:১১—তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এলেন: এই বাক্যও এই প্রসঙ্গের সঙ্গে জড়িত, এমনকি দৃঢ়তার সঙ্গে এ সত্য সমর্থন করে যে, বাণী নিজের অধিকারের মধ্যে এলে তাঁর আপনজনেরা তাঁকে তাদের মধ্যে থাকতে দিল না, তাঁকে গ্রহণ করল না। এখানে শুধু এমন কথা বলা হয় না যে, মানুষ একটা ধর্মতত্ত্ব মেনে চলতে চাইল না, বরং মানুষ দ্বারা বাণীর অস্বীকৃতি ঐতিহাসিক বাস্তব একটা ঘটনা: মানুষ মুক্তিদাতা প্রভুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অগ্রাহ্য করল। এই সত্যও পুরাতন নিয়মে বার বার উল্লিখিত, যেমন,

(ঐশপ্রজ্ঞা বলছেন) সাগরের ঊর্মিমালার উপরে,
সারা পৃথিবীর উপরে,
সমস্ত জাতি ও দেশের উপরেই কর্তৃত্ব নিলাম।
এসকলের মধ্যে একটা বিশ্রামস্থান খুঁজে বেড়ালাম,
সন্ধান করছিলাম,
কার্ অঞ্চলে [অধিকারে] বসতি করব। [সিরা ২৪:৬…]

কিন্তু ইতিহাস বলে যে, ঐশপ্রজ্ঞা বাস করার মত এমন স্থান কোথাও পেলেন না: ইস্রায়েল জাতি ঐশবিধান ও নবীদের প্রত্যাখ্যান করে চলল।

১:১২ক, খ—কিন্তু যারা তাঁকে গ্রহণ করল: জগৎ যিশুকে চিনল না, একথা ঠিক। অথচ একথাও উল্লেখ্য যে, কয়েকজন তাঁকে চিনল: এটিই পদটিতে সূচিত সত্য। তথাপি এবিষয়ে স্মরণযোগ্য যে, মানুষ হিসাবে মানুষের পক্ষে যিশুকে চিনবার বা গ্রহণ করার সাধ্য নেই, যিশুকে গ্রহণ করাই হল পিতা ঈশ্বরের বিশেষ একটা অনুগ্রহদান। কিন্তু এখনও অনেকে যিশুকে গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। কেবলমাত্র বিশ্বাসের সঙ্গেই ঈশ্বরের অনুগ্রহদান গ্রহণ করে মানুষ যিশুকে চিনতে, খ্রিষ্টবিশ্বাসী হতে সক্ষম। এমনকি, যাদের ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মিক ও আন্তরিক একটা সম্পর্ক রয়েছে, কেবল তারাই বিশ্বাসের সঙ্গে সেই ঐশদান গ্রহণ করতে সক্ষম (৮:৪৭; ১০:২৬; ৮:২৩; ১০:৪; ১৮:৩৭)। যখন মানুষ বিশ্বাসের মাধ্যমে যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত ও একাত্ম হয়, তখনই ঘটে নবসৃষ্টির অভিব্যক্তি: মানুষ ঈশ্বরের সন্তান হয়।

১:১২গ—ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার: এই উক্তি গভীরভাবে অনুভব করা আমাদের পক্ষে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এধারণা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম না করলে ঈশ্বরের অনুগ্রহদানও হৃদয়ঙ্গম করতে পারব না। সুতরাং, এবিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রদান করা হোক। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে যারা, পিতা ঈশ্বর তাঁর অসীম ভালবাসায় তাদের তাঁর সন্তান হওয়ার অধিকার নিবেদন করেন। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি বলে আমরা যিশুর সঙ্গে আমাদের সংযোগ ও ঐক্য ঘোষণা করি এবং এইভাবে ঈশ্বরসন্তান হয়ে উঠি। বাপ্তিস্মের মাধ্যমে ঈশ্বরের কৃপায় নবমানুষ হয়ে আমরা নবসৃষ্টির নব আজ্ঞা অনুসারে জীবন ধারণ করতে সক্ষম; নব আজ্ঞাটি হল যিশুর দেওয়া ভালবাসার আজ্ঞা, তথা: 'আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাস।' তারাই যিশুর শিষ্য, তারাই খ্রিষ্টমণ্ডলী যারা ঈশ্বরসন্তান ও নবমানুষ বলে জীবনযাপন করে: এ সত্য বাস্তবায়িত হচ্ছে পারস্পরিক ভালবাসায়, বাস্তব ভালবাসায়। অপর দিকে যারা নিজের

ভাইকে ভালবাসে না, তারা ঈশ্বরের দান পরিত্যাগ করে, নবমানুষ হতে অস্বীকার ক'রে ঈশ্বরসন্তান হওয়ার বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, এক দিকে ঐশ দত্তকপুত্রত্ব ও পারস্পরিক ভালবাসার ঐশদান গ্রহণ করার জন্য যখন যিশুর সঙ্গে আমাদের সংযোগ অপরিহার্য শর্ত, অপর দিকে একথাও স্বীকার্য যে, পারস্পরিক ভালবাসা ও ঐশদত্তকপুত্রত্বলাভ যিশুর সঙ্গে আমাদের সংযোগের বাস্তব প্রমাণ (১ যোহন ৩:১০; ৪:৭, ১২, ২০…)।

১:১৩—তারা রক্ত থেকে নয়… : এটি হল পূর্ববর্তী পদের ব্যাখ্যা: কেবল পিতা ঈশ্বরের কৃপায়ই আমরা ঈশ্বরসন্তান হয়ে উঠতে পারি। মানবীয় বুদ্ধির পক্ষে এসত্য চিন্তার অতীত, বোধগম্য নয়। অপর দিকে, যোহন অনুসারে খ্রিষ্টবিশ্বাসী জানে সে ঈশ্বর থেকে জনিত, ঐশবাণীর সঙ্গে একতাবদ্ধ এবং জগতের উপর বিজয়ী (১ যোহন ৪:৪; ৫:৪)। এক্ষেত্রে, 'ঈশ্বর থেকেই জনিত' উক্তির তাৎপর্য এই যে, আমরা জানি ও স্বীকার করি যে, বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত হওয়ায়ই ঈশ্বর হতে জনিত হয়েছি। সুতরাং, বাপ্তিস্ম গ্রহণে মানুষ ঈশ্বরসন্তান হয়ে ওঠে (৩:৫)।

এবিষয়ে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে: রক্ত-সম্পর্কের চেয়ে শক্তিশালী কি কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে? এই পদের আলোতে উত্তর হল: রক্ত-মাংস থেকে সৃষ্ট সম্পর্কের চেয়ে পবিত্র আত্মার সৃষ্ট নব-সম্পর্কই শক্তিশালী; আর খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ তেমন শক্তিশালী ও অপূর্ব সম্পর্ক তাদের পারস্পরিক ভালবাসায়ই দেখাতে আহূত (১:১২ পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

অবশেষে, যোহনের সুসমাচারে বার বার পুনরাবৃত্ত উক্তি দু'টোর উপর সুধী পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার। উক্তি দু'টো হল 'যিশুকে চেনা' ও 'যিশুকে গ্রহণ করা'। 'যিশুকে চেনা' বলতে শুধু যিশুর বচনাদি শোনা বা সেগুলির অর্থ উপলব্ধি করা নয়, বরং সেগুলিকে ঈশ্বর থেকে উদ্গত বাণী বলে হৃদয়ঙ্গম করা বোঝায়। এজন্য, যখন যিশুর শিক্ষা ও নির্দেশাবলির কথা শুনি, তখন এ সত্য অনুভব করব যে, তিনি সত্যি পিতা

ঈশ্বর হতে উদ্গত পুত্র, সেই তৈলাভিষিক্তজন। 'যিশুকে গ্রহণ করা' কথাটির অর্থ এরূপ: যিশুকে কেবল পূজা করব না, তাঁকে বরং অনুসরণই করব।

মাংসে ঐশবাণীর আগমন (১:১৪-১৮)

১:১৪ক—এবং বাণী হলেন মাংস…: এই পদ হল বাণী-বন্দনার শীর্ষপদ। লক্ষণীয় যে 'বাণী' শব্দ ১ম পদের পর শুধু এইখানে দ্বিতীয়বারের মত উল্লিখিত, এজন্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ১ম ও ১৪শ পদ দু'টোর মধ্যে গভীর একটা সম্পর্ক বর্তমান। ১ম পদে ঈশ্বরত্বের মধ্যে বাণীর অনাদিকালীন অবস্থান ঘোষিত হয়েছিল; এই ১৪ পদে ঘোষিত হয় মাংসে ঐশবাণীর আগমন, তথা: সকল মানুষের মত বাণীও ঐতিহাসিকই অস্তিত্ব ধারণ করেন, তার মানে যে সেই অস্তিত্ব স্থান, কাল, মানবীয় দীনতা ও সঙ্কীর্ণতার সীমাবদ্ধতা দ্বারা চিহ্নিত। মাংসে ঐশবাণীর আগমন একটা রহস্যাবৃত তথ্য বটে, অথচ বাস্তব ও ঐতিহাসিকই তথ্য। লেখকের রচনা-ভঙ্গি থেকেও এধারণা সমর্থন পায়, কেননা এই পদের শুরুতে যে 'এবং' রয়েছে, সেটা পদটির সঙ্গে ১ম পদের ধারাবাহিকতা ঘটায়: 'বাণী ছিলেন ঈশ্বর এবং বাণী হলেন মাংস', অর্থাৎ বাণী আদিতে জগতে বর্তমান ও ক্রিয়াশীল ছিলেন 'এবং' ইতিহাসের নির্দিষ্ট এক দিনে মাংস হলেন ও মানবজাতির মাঝে তাঁবু খাটালেন। মণ্ডলীর ইতিহাসে এই পদের ব্যাখ্যা বিবিধ ঐশতাত্ত্বিক মারাত্মক ভুল-ভ্রান্তির কারণ হল। যেহেতু সেই সমস্ত ভুল এখনও বর্তমান হতে পারে, সেজন্য এখানে সেসম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন হতে পারে। প্রথম ভুলধারণাপন্থী যারা তারা একথা সমর্থন করত যে, ঐশবাণী সম্পূর্ণরূপে মানবদেহে রূপান্তরিত হলেন, এমনকি ঐশস্বরূপকে হারিয়ে সাধারণ মানুষে পরিণত হলেন। কিন্তু তা-ই যদি হত তবে যিশু আর ঈশ্বর না হয়ে মানুষের ঐশমুক্তিকর্ম আর সাধন করতে পারতেন না। অপর ভুলধারণা এ: ঐশবাণী কেবল মানুষের বাহ্যিক আকৃতি ধারণ করলেন, কেমন যেন বাণী সম্পূর্ণরূপে মানুষ না হয়ে মানুষের ছদ্মবেশ ধারণ করলেন, ঠিক যেন দেবতাদের অবতারের মত যখন একটা দেবতা মানব অবস্থা সংস্কার করার জন্য জগতে অবতীর্ণ হয় ও মানবীয় ইন্দ্রিয়গোচরে আসবার জন্য মানবীয় আকৃতি মুখোসের মত ধারণ করে।

কিন্তু খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস এ সকল ধারণা থেকে ভিন্ন: মাংসে আগমন করে ঐশবাণী সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর হয়ে থাকেন এবং একাধারে সম্পূর্ণরূপে মানুষ হন। যিশু ঐশ ও মানবীয় স্বরূপের অধিকারী; এই অর্থ অনুসারে আমরা বলি, যিশু মানবেশ্বর। এ সত্য রহস্যময়, আর মানুষের পক্ষে চিন্তার অতীত এবং অসাধ্য, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কি অসাধ্য কিছু আছে? সুতরাং, মাংসে ঐশবাণীর আগমন-সত্যের সম্মুখীন হয়ে আমরা শুধু বিশ্বাসের সঙ্গে, এমনকি আরাধনাপূর্ণ ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক বিশ্বাসের সঙ্গে সাড়া দেব। এপ্রসঙ্গে আর একটা কথা বলার প্রয়োজন আছে: সুসমাচার ব্যাখ্যায় বার বার 'মাংসে আগত' (বা 'ঐতিহাসিক') যিশু ও 'পুনরুত্থিত যিশু' এ শব্দ দু'টো ব্যবহৃত হবে। 'পুনরুত্থিত যিশু' সংজ্ঞা দ্বারা আমরা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে এখনও আমাদের মাঝে উপস্থিত পুনরুত্থিত যিশু আর জীবনকালে অর্থাৎ মানব-জীবনধারী যিশুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে চাই; 'মাংসে আগত যিশু' বা 'ঐতিহাসিক যিশু', এ সকল কথা অবশ্যই যিশুর ঐশস্বরূপ অস্বীকার করতে চায় না, বরং মানব-জীবনকালীন যিশুকে নির্দেশ করে, অন্য শব্দ ব্যবহার করে লিখতে পারতাম 'মাংসে আগত বাণী'।

আসুন, প্রকৃত ব্যাখ্যায় ফিরে আসি। মাংসে ঐশবাণীর আগমনের উদ্দেশ্যই যাতে সকল মানুষ ঐশআত্মপ্রকাশ ও ঐশজীবন পেতে পারে (৩:৩১-৩৬)। সুতরাং, মাংসে ঐশবাণীর আগমন হল ঐশপরিত্রাণ-ইতিহাসের নতুন এক দিক, এমনকি ঐশপরিত্রাণ পাবার জন্য সেটা হল মানুষের কাছে ঈশ্বরের শেষ সুযোগদান: ত্রাণকর্তা যিশু যে মাংসে আগত হয়ে মাংসের মধ্য দিয়ে ঐশগৌরবে ফিরে যান, যিশুর এই পথ সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসীর পথ হয়ে ওঠে (১৪:২…, ৬)।

এক্ষেত্রে একটা প্রশ্নের উদয় হতে পারে: 'মাংস' শব্দটা অনেকের কাছে সন্তোষজনক শব্দ নয়; আজকালে শুধু নয়, প্রাচীনকালেও নয়। তাহলে শব্দের স্থানে যোহন 'মানুষ' কিংবা 'রক্তমাংসের মানুষ' শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন, কিন্তু তা করলেন না। এর কারণ কী হতে পারে? উত্তর পুরাতন নিয়মের ঐতিহ্যে এবং যোহনের স্বীয় ঐশতাত্ত্বিক ধারণায় নিহিত। পুরাতন নিয়মে 'মাংস' বলতে ঈশ্বরের বাণীর মহাশক্তি অপেক্ষা মানবীয় সঙ্কীর্ণতা, দীনতা, দুর্বলতা বোঝায় (আদি ৬:৩; ইশা ৩১:৩; যেরে ১৭:৫; সাম ৭৮:৩৯ প্রভৃতি)।

প্রতিটি মাংস [অর্থাৎ মানুষ] ঘাসের মত,
আর তার সমস্ত কান্তি মাঠের ফুলের মত।
শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কারণ প্রভুর ফুৎকার তার উপর বয়ে যায়।
—সত্যি, মানবকুল ঘাসেরই মত।
শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কিন্তু আমাদের পরমেশ্বরের বাণী চিরস্থায়ী। [ইশা ৪০:৬-৮]

উপরন্তু, এই শব্দে ইতিহাস ও জগতের সকল সৃষ্টবস্তুর সঙ্গে মানুষের সংযোগও সূচিত। ঈশ্বরের পবিত্রতার বৈসাদৃশ্যে 'মাংস'ই অপরাপর সৃষ্টবস্তুর সঙ্গে মানুষের সাধারণ উপাদান, এবং ক্ষয়সাপেক্ষ মাংসই মানবজাতির ইতিহাসে প্রত্যেক মানুষকে জড়িত করে। যোহনও এধারণা অনুসরণ করেন: দিব্য, আত্মিক, স্বয়ংসম্পূর্ণ ঐশসত্তার বৈপরীত্যে যা যা মানবীয়, দুর্বল, ক্ষয়সাপেক্ষ, সেই সবই 'মাংস'। উল্লেখ্য যে, এই ধারণা ভাষান্তরে যোহন আবার এ দ্বিমুখী শব্দ ব্যবহার করেন তথা: 'স্বর্গ-পৃথিবী' ও 'ঊর্ধ্বলোক-নিম্নলোক' (৩:৩১; ৩:৩; ৮:২৩)। যোহন যিশুর মানবতার এই বৈশিষ্ট্য বরাবর নির্দেশ করেন, তাঁর রচনায় আমরা শ্রান্ত, পিপাসিত (৪:৬, ৭; ১৯:২৮), অশ্রুসিক্ত (১১:৩৫), শোকার্ত (১২:২৭; ১৩:৩১) যিশুর পরিচয় পাই। তবুও স্মরণযোগ্য বিষয় যে, 'মাংস' কথা প্রয়োগে যোহন ও পলের ধারণা পৃথক। বস্তুত, পল 'মাংসের' স্থানে 'দেহ' শব্দটা ব্যবহার করেন এবং তাঁর কাছে 'দেহ' হল পাপ, কাজেই পলের ধারণা অনুসারে, মানবদেহে যিশু মানবজাতির পাপরাশি আপন করেন (রো ৮:৩)। অপর দিকে, যোহন অনুসারে যিশু হলেন ঐশজীবন ও গৌরবের ঐশলোক অভিমুখে নিম্নলোকে আবদ্ধ মানুষের পরিচালক (৬:৬২…; ১৪:৬; ১৭:২৪)। উপরন্তু, একথা উপস্থাপন করে সেই প্রসঙ্গ যা জীবন-রুটি বর্ণনায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়, তথা: ঐশবাণী যে মাংসে আগমন করলেন, সেই মাংস হল ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মৃত্যুর অবতারণা (১৯:৩৪)। অবশেষে যোহন এই কথা-বিশেষের মাধ্যমে মানবতার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেন: যিশু সকল মানুষের মত মানুষ।

আর একটা প্রশ্ন: ‘বাণী হলেন মাংস’ বাক্যটি ব্যবহার না করে যোহন কি ‘বাণী মাংস ধারণ করলেন’ বা ‘বাণী মাংস গ্রহণ করলেন’ ইত্যাদি ধরনের বাক্য ব্যবহার করতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন, কিন্তু তা করলেন না। কেন? কারণ তাঁর ঐতিহ্যে মানুষ যা যা ‘ধারণ’ বা ‘গ্রহণ’ করতে পারে তা আবার ছাড়তেও পারে; অপর দিকে মানুষ যা হয়ে যায় সে মৃত্যু পর্যন্তই তাতে থাকতে বাধ্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ‘মাংসধারণ’ (বা দেহধারণ, দেহগ্রহণ, দেহবরণ ইত্যাদি) শব্দ যোহনের পক্ষেই তত সন্তোষজনক নয়, ফলে যোহনের মন অনুসারে যোহনের লেখা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা স্বয়ং যোহনেরই ভাষা ব্যবহার করে যাব, তথা: ‘মাংসে আগত যিশু’ (১ যোহন ৪:২…), বা মাংসে বাণীর আগমন।

১:১৪খ—আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন: আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি-স্থাপনই হল মাংসে ঐশবাণীর আগমনের উদ্দেশ্য। এই বাক্যও পুরাতন নিয়মের কতিপয় উক্তির প্রতিধ্বনি। সেইকালে ঈশ্বর ইস্রায়েল জনগণের মধ্যে একটা তাঁবুতে বাস করতেন (গণনা ১২:৫; ২ শামু ৭:৬; যাত্রা ২৫:৮-৯); ঐশপ্রজ্ঞা মানুষদের মাঝে নিজের তাঁবু খাটিয়েছিলেন; নবীগণ ঠিক এই বাক্যের মাধ্যমেই মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের ভাবী ও চরম উপস্থিতি নির্দেশ করেছিলেন (যোনা ৪:১৭-১৮; হোশেয়া ২:১৪…); ঐশপ্রকাশ পুস্তকও একই ভাষা ব্যবহার করে (প্রকাশ ২১:৩)। সুতরাং, যিশুতে ঈশ্বর চিরকালের মত সকল মানুষেরই মাঝে নিজের উপস্থিতি স্থাপন করলেন: যিশু অল্প লোকদের জন্যই শুধু আসেননি, তিনি প্রত্যেক মানুষেরই জন্য আলো, সকল মানুষকেই অন্ধকার থেকে মুক্ত করার জন্য মাংসে আগত আলো। বলা বাহুল্য, আলো-যিশু কেবল বিশ্বাসের চোখেই দৃশ্যমান।

১:১৪গ, ঘ—আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এই উক্তির ‘আমরা’ কাদের নির্দেশ করে? তাঁরা হলেন যোহন ও তাঁর স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলী। যখন যোহন পালেস্তাইনব্যাপী ভ্রমণকারী যিশুর অনুসরণ করতেন, তখন যিশুর চিহ্নকর্মগুলি দেখেও

কিছুই অনুভব করতে পারলেন না, ‘দেখতে’ ও ‘প্রত্যক্ষ করতে’ পারলেন না। কেবল যিশুর পুনরুত্থানের পরেই তাঁর সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে উঠলেন ও সেই সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়ালেন এবং তা-ই করে আমরাও যাতে বিশ্বাস করতে পারি, এজন্য মাংসে আগত যিশুর ক্রিয়াকলাপে তাঁর ঐশগৌরব প্রত্যক্ষ করতে আমাদের শিক্ষা দেন। কিন্তু, এ সত্যও এখানে লক্ষণীয় যে, যোহন শুধু নিজের অভিজ্ঞতার কথা নয়, অন্যান্য প্রেরিতদূতগণের অভিজ্ঞতার কথাও বলেন: যিশুর পুনরুত্থানের পর সমবেতভাবেই তাঁরা যিশুর ক্রিয়াকলাপে তাঁর গৌরব ‘প্রত্যক্ষ করতে’ পারলেন; সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে নয়, মণ্ডলীগতভাবেই যিশুকে উপলব্ধি করা সম্ভব। ফলে, যিশুর ‘গৌরব প্রত্যক্ষ করা’ বলতে যিশু সম্বন্ধে ধ্যান করা বা তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করা বোঝায় না। বরং এর অর্থ হল, মাংসে আগত যিশুতে তাঁর গৌরব, এমনকি পিতার অদ্বিতীয় পুত্রের গৌরব প্রত্যক্ষ করা, বা—পুরাতন নিয়মের ঐতিহ্য অনুসারে—পুত্রের কাছে পিতা ঈশ্বরের দেওয়া প্রভুত্ব, গৌরব ও নেতৃত্ব প্রত্যক্ষ করা। যিশুই পিতার বাধ্য পুত্র, এজন্যই পিতা নিজের প্রভুত্ব তাঁকে অর্পণ করেন, আর যিশুর কাছে পিতার দেওয়া এই গৌরব যিশুর দুর্বল মাংসেই আবিষ্কার করতে আমরা আহূত। এই কথাও উল্লেখ্য যে, যোহনের সুসমাচারে ‘পিতা’ ঈশ্বরের এই নাম, এইখানে প্রথমবারের মত ব্যবহৃত হয়।

১:১৪ঙ—অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ: এই কথাও পুরাতন নিয়মের ধারণায় সূচিত ছিল। সেইকালে ইস্রায়েল জনগণ ঈশ্বরের ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা কীর্তন করত (যাত্রা ৩৪:৬; ২ শামু ২:৬; সাম ২৫:১০ ইত্যাদি)। তাদের ধারণাই যে, ঈশ্বরের ভালবাসা চিরস্থায়ী, সহানুভূতিশীল এবং তাঁর বিশ্বস্ততা দৃঢ়, অনন্তকালস্থায়ী: মানুষ যত পাপকর্ম করুক না কেন ঈশ্বর তাকে সর্বদাই ভালবেসে থাকবেন। সুসমাচার-ক্ষেত্রে যোহন এই সকল তাৎপর্য অধিক গভীরতরভাবে ব্যবহার করেন। ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে নিজের ভালবাসা কখনও ফিরিয়ে নেবেন না শুধু নয়, তিনি যিশুকে নিজের প্রভুত্ব, অনুগ্রহ ও জীবনে পরিপূর্ণ করলেন: এই সত্যই ‘অনুগ্রহ’ উক্তিতে সংগৃহীত। উপরন্তু যিশু ‘সত্যে পরিপূর্ণ’ বলেই ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন এমন নয়, বরং পিতার কৃপায় তিনি নিজেরই মাংসে ঐশসত্তার অধিকারী। পিতা এ সমুদয় অনুগ্রহদান যিশুর হাতে ন্যস্ত করলেন

যাতে তিনি সেগুলি সকল মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন। অদ্বিতীয় পুত্রের গৌরবে সূচিত এই সবকিছু প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা আমাদের উপর নির্ভর করে। কিন্তু শুধু প্রত্যক্ষ করব কেন? যাতে আমরা সেগুলি লাভ করি এই মর্মেই যিশুর কাছে দেওয়া হয়েছিল।

১:১৫—তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে… : এই পদ ৮ পদে ঘোষিত বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্য স্পষ্টতরভাবে পুনরাবৃত্তি করে।

১:১৬—আমরা সকলে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে… : মাংসে ঐশবাণীর আগমনের মধ্য দিয়ে ঐশবাণী মানুষদের মাঝেই আগমন করলেন। সেই আগমনের ফলস্বরূপে খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ তাঁর অনুগ্রহের পূর্ণতার সহভাগী হল। পুরাতন নিয়মকালেও ঈশ্বর মানুষের উপর নিজের অনুগ্রহের পূর্ণতা অর্থাৎ নিজের অসীম কৃপা বর্ষণ করতেন (সাম ৫:৮; ৬৯:১৪; ১০৬:৪৫)। এখন কিন্তু অনুগ্রহের পূর্ণতাকে স্বয়ং যিশু দ্বারা অবিরত বহন ও প্রদান করা হয়, এবং অনুগ্রহের পূর্ণতা ঈশ্বরের কৃপা শুধু নয়, যিশুকে দেওয়া পিতার ঐশজীবনও বোঝায়।

যোহনের সময়ে গ্রীক জ্ঞান-মার্গপন্থীরা (ভূমিকা দ্রষ্টব্য) ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাত কারণ 'তোমার কৃপায় জ্ঞান অর্জন করেছি…। তুমি ত মন, বুদ্ধি ও জ্ঞান আমাদের দান করেছ। মন, যাতে তোমাকে বুঝতে পারি; বুদ্ধি, যাতে অনুসন্ধান করে তোমাকে পেতে পারি; জ্ঞান, যাতে তোমাকে জেনে আনন্দ লাভ করি।' অপর দিকে খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ মানবীয় দানসমূহের জন্য নয়, স্বয়ং ঐশমুক্তির অশেষ অনুগ্রহধারার জন্যই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়, যে-অনুগ্রহধারা তারা মাংসে আগত ঐশবাণীর কাছ থেকে বা পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে পুনরুত্থিত প্রভুর কাছ থেকে লাভ করেছে।

১:১৭—মোশি দ্বারা বিধান… : যোহনের সুসমাচারে 'যিশু' নামটি (যে নাম ঐশবাণীর ঐতিহাসিক নাম) এখানে প্রথম উল্লিখিত হয়। প্রসঙ্গটা হল মোশি ও যিশুর মধ্যকার সম্পর্ক। তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, ধারাবাহিকতাই বিরাজিত; কেননা মোশি

বিধান দেওয়ায় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করেছিলেন। তবু যিশু অনুগ্রহের প্রকৃত পূর্ণতা প্রদান করে ইহুদীধর্মের ঐতিহ্যগত প্রথা সকল অনাবশ্যক করে দিয়েছেন।

১:১৮—ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি: এই পদে পুনরায় বাণী-বন্দনায় উপনীত হই। পুরাতন নিয়মের তুলনায় নূতন নিয়মের ঐশআত্মপ্রকাশ শ্রেয়, এমনকি সম্পূর্ণরূপে অপূর্ব, কেননা যিনি পিতা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে জানেন, সেই একমাত্র জনিতজন দ্বারাই তা বহন করা হল। যিনি স্বর্গ থেকে নিম্নলোকে নেমে এলেন, কেবল তিনিই নিজের অভিজ্ঞতায় স্বর্গলোকের প্রকৃত বর্ণনা দিতে সক্ষম (৩:৩১…)। এবিষয়ে জ্ঞান-মার্গপন্থীরা সমর্থন করত, জ্ঞান ও ধ্যানের মাধ্যমেই ইহলোকেও ঈশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান ও সহভাগিতা, অর্থাৎ ঐশপরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব। কিন্তু তা-ই যদি হত, তাহলে কেন ঈশ্বর নিজ পুত্রকে ঐশপ্রকাশকারী ও ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করলেন? সুতরাং, যে ধর্ম ঐশজ্ঞান বা পরিত্রাণ ইহলোকেই ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে অর্জনসাধ্য মনে করে, সেই সকল ধর্ম অপূর্ণাঙ্গই কেবল একটা সত্য বর্ণনা করে: বিভিন্ন ধর্মীয় মার্গের প্রয়োজনীয়তা সীমাবদ্ধ, সেগুলোর মাধ্যমে মানুষের মন শুদ্ধ হয়, যিশুর রহস্য উপলব্ধির জন্যও সেগুলি কার্যকর হতে পারে, তথাপি একথা স্পষ্ট হোক যে, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে স্বয়ং যিশু যা দান করেন না (অর্থাৎ ইহলোকেই পূর্ণ ঐশপরিত্রাণপ্রাপ্তি), অন্যান্য ধর্মও অবশ্যই তা দান করতে অক্ষম। ঐশজীবন বা ঐশপরিত্রাণ এমন এক অনুগ্রহ যা ঈশ্বর কেবল মৃত্যুর পরেই সম্পূর্ণরূপে দান করেন।

সকল ধর্মে এ সত্য বর্তমান, তথা: মানুষ অদৃশ্যমান ঈশ্বরকে দেখতে চায়; মানুষের এই বাসনা হল মানবীয় সকল বাসনার প্রধান। এজন্য যোহন মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতির কথা বর্ণনা করেন: নাজারেথের যিশু যিনি, তিনিই পিতা ঈশ্বরের একমাত্র প্রকাশকর্তা; যিশুর সমুদয় কার্যকলাপে অদৃশ্যমান ঈশ্বরই আত্মপ্রকাশ করেন। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার বাসনা ভাল, তবুও মানুষ ঈশ্বরকে ধরার দাবি কখনও করতে পারে না, বরং ঈশ্বরই মানুষের কাছে আসেন ও মানবেশ্বর যিশুতে আত্মপ্রকাশ করেন। এই রহস্যাবৃত অপূর্ব সত্য কি করে বাস্তবে ঘটেছে, একথাই সুসমাচারের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যোহন বর্ণনা করেন, ও সেই বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন।

বাণী-বন্দনার প্রধান প্রধান বিষয়বস্তু

বাণী-বন্দনার সমষ্টিগত ব্যাখ্যা স্পষ্টতর করার জন্য তার প্রধান প্রধান বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা যাক:

– সাধারণ বিষয়বস্তু হল ঐশপ্রকাশ। এই ঐশআত্মপ্রকাশ তাত্ত্বিক নয়, বরং বাস্তব, এবং যিশুতে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত। কেননা বন্দনায় যে অধিকাংশ শব্দ ব্যবহৃত, সেগুলি হল প্রকাশসূচক শব্দ যথা: প্রকাশ, বর্ণনা, প্রেরণ, প্রত্যক্ষ, বিশ্বাস, সাক্ষ্যদান ইত্যাদি শব্দ।

– নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু হল ঐশআত্মপ্রকাশ ও বিশ্বাস: এক দিকে আছেন ঐশআত্মপ্রকাশকারী বাণী, অপর দিকে রয়েছে মানুষ যার কর্তব্য হল বাণীর আত্মপ্রকাশে সাড়া দেওয়া। কিন্তু তিনবার করে মানুষের সাড়া হল অবিশ্বাস: অন্ধকার, জগৎ ও মানুষ ঐশবাণীকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করল। একই বিষয়ে ঐশপরিত্রাণের বিষয়ও সূচিত: তাঁর বিশ্বাসীদের কাছে যিশু জীবনদাতা বলে আত্মপ্রকাশ করেন। 'পরিত্রাণ' বিষয়টা এই সকল কথা দ্বারাই ব্যক্ত: অনুগ্রহ, জীবন, ঐশদত্তকপুত্রত্ব, ঈশ্বর হতে উদ্গত হওয়া ইত্যাদি শব্দ।

– মানুষের কাছে ঐশআত্মপ্রকাশ হল ইতিহাস-চিহ্নিত ঐশআত্মপ্রকাশ: তিনি আদিকাল থেকে আত্মপ্রকাশ করে আসছেন: মানবজাতির ইতিহাসে, ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসে ও নাজারেথের যিশুতে। কিন্তু এক একবার ঐশআত্মপ্রকাশের একই প্রতিক্রিয়া ঘটল, তথা: মানুষ ঐশপ্রকাশ অগ্রাহ্য করল এমনকি অবশেষে যিশুকে ক্রুশে দিল।

– যিশু ঈশ্বরের নানা ঐশপ্রকাশকর্তাদের মধ্যে একজন এমন নয়, তিনি একমাত্র ও চরমই প্রকাশকর্তা (১১:১৭-১৮)। সুতরাং ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে জানবার জন্য যিশুর মধ্যস্থতা অপরিহার্য।

– সুসমাচারে যে যে বিষয়বস্তু আলোচিত হয়, বাণী-বন্দনায় সেগুলির পূর্বাভাস ঘটে যেমন, যিশুখ্রিষ্ট সম্বন্ধীয় মূল রহস্য, পিতা ও পুত্রের মধ্যকার সম্পর্ক, এবং ঐশবাণী ও মাংসের মধ্যকার সম্বন্ধ অর্থাৎ যিশুর ঐশ ও মানবীয় স্বরূপের বিষয়।

– অবশেষে, বাণী-বন্দনায় সম্পাদনকর্ম বর্তমান, আর সেই কর্ম দ্বিবিধ: প্রথমত, পুরাতন নিয়মের সমুদয় বিষয়ের পূর্ণতা যিশুতেই প্রকাশ পায়; দ্বিতীয়ত, সুসমাচারের সকল চরিত্রকে গৌণ যত বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত করা, যিশুর সঙ্গে তাদের যে সংশ্লিষ্ট ভূমিকা রয়েছে সেটাই মাত্র যেন প্রকাশমান হয়।

পরিশিষ্ট

'বাণী' ধারণার ঐতিহাসিক ও ঐশতাত্ত্বিক পটভূমি

এই পরিশিষ্টের মাধ্যমে বিশেষ কয়েকটা ধারণার প্রতি সুধী পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার, যে-ধারণাগুলোর মধ্য দিয়ে বাণী-বন্দনা ছাড়া গোটা সুসমাচারের কথা স্পষ্টতর হয়ে উঠতে পারবে।

বাণী-বন্দনা ছাড়া চতুর্থ সুসমাচারে যিশু আর কখনও বাণী বলে অভিহিত হন না; তবু এসত্য লক্ষণীয় যে, তা সত্ত্বেও যিশু যে বাণী এ বিষয়টা সর্বদা বর্তমান, এমনকি সমাপ্তি পর্যন্ত সুসমাচার পুস্তকের অনুসরণ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই সেটাই হল বাণী-বন্দনার একই সিদ্ধান্ত, তথা: যিশুই বাণী। একথা বলা চলে যে, বাণী-বন্দনা সুসমাচার পুস্তকের শুরুতে নয়, শেষেও উপসংহাররূপে দেওয়া যেতে পারত, কেননা বন্দনায় সুসমাচারের সকল মহাবাক্য সংক্ষিপ্তভাবে বর্তমান। প্রকৃতপক্ষে এ-ই হল যিশু-উপলব্ধিতে যোহনের পথ: তিন বছর ব্যাপী যিশুর অনুসরণ করে কেবল তাঁর পুনরুত্থানের পরেই তিনি অনুভব ও ঘোষণা করেন, যিশুই ঐশবাণী।

পুরাতন নিয়মের ঐতিহ্য

পুরাতন নিয়মে বারংবার 'প্রভুর বাণী'র কথা উল্লিখিত। 'প্রভুর বাণী' যে প্রভুর মুখ দিয়ে উচ্চারিত একটি শব্দ তা নয়, বরং প্রভুর সেই উদ্বোধক ও জীবন্ত বাণী, যে-বাণী জীবন দান করে, ইতিহাসের পরিচালনা করে, সে যা ব্যক্ত করে তা বাস্তবায়িত করে এবং যা বাস্তবায়িত করে তা ব্যাখ্যা করে যাতে মানুষ ইতিহাসের ঘটনাদির মধ্যে

ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারে। এমর্মেই পবিত্র বাইবেল বলে যে, 'প্রভুর বাণী' জগৎকে সৃষ্টি করল এবং ঐশমুক্তি-পরিকল্পনা সৃষ্টি করে প্রকাশ করল। অধিকন্তু 'প্রভুর বাণী' ছিল 'আজ্ঞা': বাণীকে পালন করে মুক্তিলাভ করা যায়। অবশেষে 'প্রভুর বাণী' উক্তিতে প্রতিশ্রুতির ভাব সূচিত: মানুষের পাপকর্ম সত্ত্বেও প্রভুর প্রতিশ্রুতিসকল বিশ্বস্রষ্টা ও ইতিহাসের পরিচালক ঐশবাণীর মত বিশ্বাস্য, অনন্তকালস্থায়ী ও সৃজনশীল। 'প্রভুর বাণী'তে মানুষ বিশ্বাসের মাধ্যমে সাড়া দিতে আহূত বটে, তবুও 'বাণী' মানুষের উপর নির্ভরশীল নয়, মানুষ 'প্রভুর বাণী'কে অগ্রাহ্য করলেও বাণী ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে যেমনটি নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি ব্যক্ত করে:

> বৃষ্টি ও তুষার যেমন আকাশ থেকে নেমে আসে,
> এবং মাটি জলসিক্ত না করে,
> ও সেই মাটি যেন বীজবুনিয়েকে বীজ ও মানুষকে খাদ্য দান করে
> তা উর্বর ও অঙ্কুরিত না করে সেখানে ফিরে যায় না,
> তেমনি ঘটে আমার মুখনিঃসৃত বাণীর বেলায়:
> আমি যা ইচ্ছা করি, তা সম্পন্ন না করে,
> এবং যে উদ্দেশ্যে আমি তা প্রেরণ করেছি,
> তা সাফল্যমণ্ডিত না করে
> আমার বাণী নিষ্ফল হয়ে
> আমার কাছে ফিরে আসবে না। [ইশা ৫৫:১০-১১]

এই উদ্ধৃতাংশ থেকে দেখা যায় যে 'প্রভুর বাণী' পৃথিবীতে এসে পুনরায় প্রভুর কাছে ফিরে গেল, ঠিক যেভাবে বাণী-বন্দনায়ও ঘটে। আবার, বাণীর দ্বিগুণ বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়: বাণী সৃষ্টি করে ও সকল বাধাবিঘ্নের উপর জয়ী হয়ে ইতিহাস পরিচালনা করে। পুরাতন নিয়মে নির্দেশিত ঐশপ্রজ্ঞার ধারণাও বাণী-বন্দনায় প্রযোজ্য। ধারণাটা সুন্দরভাবে প্রকাশ পায় হিব্রুদের কাছে পত্রে ও বেন-সিরা পুস্তকে। এ উদ্ধৃতাংশ দু'টোর সঙ্গে বাণী-বন্দনা তুলনা করে নিম্নলিখিত সম্পর্ক-বিন্দুগুলো দেখতে পাই: প্রজ্ঞা ও বাণী উভয় আদিতে ছিল, সৃষ্টিকর্মে তাদের ভূমিকা আছে, ঈশ্বরের সম্মুখে থাকে, মানুষদের মাঝে নেমে এসে (সিরা ২৪:৭-২২; হিব্রু ৮:৩১) তাঁবু স্থাপন করে (সিরা ২৪:৮)।

পরবর্তীকালে ইহুদীধর্ম 'প্রভুর বাণী' ও 'ঐশপ্রজ্ঞা' ধারণা দু'টো 'ঐশবিধান' ধারণায় একত্রিত করে প্রকাশ করল: ঐশবিধানই প্রভুর বাণী ও ঐশবিধানই মানুষদের মাঝে অবস্থানকারী ঐশপ্রজ্ঞা।

গ্রীক কৃষ্টির ঐতিহ্য

গ্রীক দার্শনিকগণ স্রষ্টা, মুক্তিদাতা ও সর্বনিয়ন্তা ভূমিকা 'বাণী'র উপর আরোপ করতেন। তবুও তাঁদের কাছে 'বাণী' সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর ছিল না।

যোহনের অবদান

যোহন নিজের ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেই এই সকল ধারণা ব্যবহার করলেন। যিশুই প্রভুর শেষ ও চরম বাণী এবং পুরাতন নিয়মের সকল বাণী পূর্ণ করেন; মানবেতিহাসে নেমে আসা ঐশপ্রজ্ঞার কথা যিশুতেই বাস্তবায়িত, এবং ঐতিহাসিক একটা ঘটনা হয়; বাণী শব্দটা প্রয়োগ করায় যোহন গ্রীক কৃষ্টির কাছে যিশুর রহস্য বোধগম্য করে তুলেছেন। অবশ্যই যোহন গ্রীক দার্শনিকগণের কাছে বাণী-যিশুর সম্পূর্ণ ঐশস্বরূপও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন।

উপসংহারস্বরূপ একথা বলা বাঞ্ছনীয়: যিশু প্রভুর বাণী উচ্চারণ করেন বিধায় নিজেই ঐশবাণী এমন নয়, বরং যিশুই বাণী, ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তা বিধায়ই তাঁর বাণীসকল বিশ্বাসযোগ্য ও জীবনদায়ী।

প্রথম খণ্ড

জগতের সামনে যিশুর আত্মপ্রকাশ

(১:১৯–১২:৫০)

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্যদান
ও যিশুর প্রথম শিষ্যেরা

(১:১৯-৫১)

এখান থেকে শুরু হয় সুসমাচারের প্রথম অংশ যা ১২ অধ্যায়ে সমাপ্ত হয় : জগতের সামনে যিশুর আত্মপ্রকাশ। সুসমাচারের এই অংশে (১:১৯-৫১) ইস্রায়েলের সামনে মশীহ বলে যিশুর প্রথম অভিব্যক্তি সূচিত। এখানে বিবৃত ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক বটে, তা সত্ত্বেও যোহনের বর্ণনায় এমন আভাস পাওয়া যায় যা দিয়ে আমরা বুঝি যে, এই সকল ঘটনা ঐতিহাসিক হলেও গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত; একথা প্রমাণিত হয় তিনবার করে পুনরাবৃত্ত 'পর দিন' উক্তির মাধ্যমে (১:১৯, ৩৫, ৫৩)। ঠিক এই গভীর তাৎপর্য উদ্ঘাটন করা আমাদের লক্ষ্য :

উদ্ধৃতাংশটা দু' ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে :

ক। ইহুদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ এবং শিষ্যদের সম্মুখে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্যদান (১:১৯-৩৪)।

খ। যিশুর প্রথম শিষ্যেরা (১:৩৫-৫১)।

ইহুদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সম্মুখে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্যদান (১:১৯-২৮)

১ [১৯] এ হল যোহনের সাক্ষ্য, যখন যেরুশালেম থেকে ইহুদীরা তাঁর কাছে
কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি

কে?' [২০] তিনি তখন স্বীকার করলেন, অস্বীকার করলেন না; বরং স্বীকার করলেন যে, 'আমি খ্রিষ্ট নই।' [২১] তাই তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে কী? আপনি কি এলিয়? তিনি বললেন, 'না, আমি নই।' 'আপনি কি সেই নবী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'না।' [২২] তাই তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আপনি কে? যাঁরা আমাদের পাঠিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমাদের একটা উত্তর দিতে হবে। নিজের বিষয়ে আপনি কী বলেন?' [২৩] তিনি বললেন, 'নবী ইশাইয়া যেমন বলেছিলেন,

আমি এমন একজনের কণ্ঠস্বর
যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে,
প্রভুর জন্য পথ সরল কর।'

[২৪] যাঁদের পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা ফরিশী ছিলেন। [২৫] তাঁরা আরও প্রশ্ন করে তাঁকে বললেন, 'আপনি যদি খ্রিষ্ট নন, এলিয় বা সেই নবীও নন, তবে কেন বাপ্তিস্ম দেন?' [২৬] উত্তরে যোহন তাঁদের বললেন, 'আমি জলে বাপ্তিস্ম দিই, কিন্তু আপনাদের মধ্যে এমন একজন আছেন যাঁকে আপনারা জানেন না, [২৭] যিনি আমার পরেই আসছেন। আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই।' [২৮] এই সমস্ত ঘটেছিল যর্দন নদীর ওপারে, বেথানিয়াতে; সেইখানে যোহন বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন।

সুসমাচারের লেখক যোহন ইতিপূর্বে বাণী-বন্দনায়ও বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে যিশুর সাক্ষ্যদাতারূপে উপস্থাপন করেছিলেন। এখন এই উদ্ধৃতাংশে, তিনি সেই সাক্ষ্যদান বিস্তারিত করে আরও স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন যে, বাপ্তিস্মদাতার সাক্ষ্যদান সম্পূর্ণরূপে যিশুতে কেন্দ্রীভূত, যিশুর দিকেই লক্ষ করে। স্মরণীয় যে, যোহনের ধারণায় যিশুতে বিশ্বাস সাক্ষ্যদান থেকে উদ্গত: মাংসে আগত বাণীর স্বগৌরব বা ঐশস্বরূপ প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত হয় না, বরং সাক্ষ্যদাতাদের দ্বারা নির্দেশিত হয়, সুতরাং বাপ্তিস্মদাতা যোহন সাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়েই নিজের শিষ্যদের বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিলেন এবং আজও আমাদের বিশ্বাস সৃষ্টি করেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহন নিজের সাক্ষ্যদানে আমাদের মাঝে উপস্থিত অথচ অচেনা যিশুকে নির্দেশ করেন যাতে আমরা তাঁকে চিনতে পারি। তা না হলে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পরিকল্পিত কাজ নিষ্ফল হয়।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাছে ইহুদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কয়েকজন যাওয়াতে অনুমান করা যায় যে, তাঁদের এই সাক্ষাৎকার আনুষ্ঠানিক বা সরকারী এক সাক্ষাৎকার। এজন্যই বাপ্তিস্মদাতা যোহনও অপূর্ণাঙ্গ বা অস্পষ্ট উত্তর না দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নিজের পরিচয় ও বিশেষ ভূমিকা ঘোষণা করেন।

'ইহুদী', এবিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা করা বাঞ্ছনীয়। যোহন অনুসারে 'ইহুদীরা' ও 'ইস্রায়েল জনগণ' এক কথা নয়। ইস্রায়েল জনগণ বলতে ঈশ্বরের মনোনীত জনগণ বোঝায়, অর্থাৎ শব্দটা সম্মানসূচক। অপর দিকে, যে ইস্রায়েলীয়েরা যিশুকে অস্বীকার করে ক্রুশে দিয়েছিল, তারাই (যোহনের ভাষায়) ইহুদী। সুতরাং আমরা বাপ্তিস্মদাতা ও ইহুদীদের মধ্যকার সাক্ষাৎকারের ফলাফলের পূর্বাভাস অনুমান করতে পারি: ইহুদীদের অবিশ্বাস ও নির্বুদ্ধিতার দরুনই সাক্ষাৎকার নিষ্ফল হবে। তিন তিন বার করে তাঁরা বাপ্তিস্মদাতার পরিচয় অবগত হতে চান, অথচ তিনবার করে বাপ্তিস্মদাতার কথা উপলব্ধি করতে অক্ষম হন।

১:২০ (…)—খ্রিষ্ট, এলিয় এবং সেই নবী: বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সঙ্গে ইহুদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব সঠিকভাবে বুঝতে হলে উল্লিখিত ব্যক্তিত্ব তিনটির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

- 'খ্রিষ্ট' (বা মশীহ বা সেই তৈলাভিষিক্তজন) ছিল ইস্রায়েল রাজাদের একটা নাম-বিশেষ। ইস্রায়েলীয় রাজতন্ত্রকালের শেষ থেকে ইস্রায়েলীয়রা কতিপয় ভাববাণীর উপর নির্ভর করে নব 'খ্রিষ্ট'-এর জন্য অপেক্ষা করত (ইশা ৭:১৩-১৫; ৯:৫-৬; ১১:১-৭; মিখা ৫:১-৩)। তেমন ভাববাণী অনুসারে নব 'খ্রিষ্ট' হবেন আদর্শরাজ, প্রভুভীরু রাজর্ষি ও ঈশ্বরের সঙ্গে ইস্রায়েল জনগণের পুনর্মিলনের স্রষ্টা। দ্বিতীয় ইশাইয়া বলে পরিচিত নবীর 'প্রভুর দাসের গীতিকা' চতুষ্টয়ের মধ্য দিয়ে নব খ্রিষ্টের সংজ্ঞা অধিক গভীরতর হয়ে উঠেছিল: নব খ্রিষ্টরাজ কষ্টভোগী দাসেই রূপান্তরিত হন। জাখারিয়া নবীও (৯:৯-১০) এক শান্তিরাজের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন। যিশুর সময়ে লোকে রাজনৈতিক নেতারূপেই নব খ্রিষ্টের অপেক্ষা করত; আসন্ন খ্রিষ্ট রোমীয় রাজদণ্ড থেকে

তাদের মুক্ত করবেন। কিন্তু যিশু সেই ‘খ্রিষ্ট’ নাম সবসময় অগ্রাহ্য করলেন, এমনকি যাতে লোকে ভুলভ্রান্তিবষত তাঁকে রাজনৈতিক নেতা না মনে করে সেজন্য ‘খ্রিষ্ট’-এর জায়গায় ‘মানবপুত্র’ রহস্যাবৃত নাম ধারণ করলেন। নামটি দানিয়েল নবী দ্বারাই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল, এবং দ্বিতীয় ইশাইয়ার কষ্টভোগী দাসেরও কথা নির্দেশ করত।

• ‘এলিয়’-ই পুরাতন নিয়মের প্রধান নবী, এটিই ছিল ইস্রায়েলীয়দের ধারণা। তিনি আহাব রাজা ও যেসাবেল রানীর বিরুদ্ধে প্রভুর সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এবং মোশির মত তাঁকেও ইস্রায়েল জনগণের রক্ষাকর্তা বলে গণ্য করা হত। এলিয় অলৌকিকভাবে ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন বিধায় ইস্রায়েলীয়েরা খ্রিষ্টের আবির্ভাবের লক্ষণ বলে তাঁর পুনরাগমন প্রতীক্ষা করত। তাছাড়া মালাখি নবী স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে বলেছিলেন যে, খ্রিষ্টের আসন্ন আগমন উপলক্ষে ইস্রায়েলীয়দের কাছে মনপরিবর্তনের কথা প্রচার করতে এলিয়ই আসবেন (মালাখি ৩:১-২৯)। যিশুর সময়ে এ জনশ্রুতিও প্রচলিত ছিল: এলিয় এসে ঈশ্বরের সেই মনোনীতজনকে তৈলাভিষিক্ত করে জনগণের কাছে ‘খ্রিষ্ট’ বলে নির্দেশ করবেন।

• ‘সেই নবী’ সাধারণ একজন নবী নন। পুরাতন নিয়মে প্রভু মানুষের সঙ্গে নিজের সহায়তার প্রমাণস্বরূপ নবীদের প্রেরণ করবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫)। কিন্তু যিশুর সময়ে, এমনকি যিশুর সময়ের পূর্ববর্তী দুই শতক থেকেই ইস্রায়েল জাতির মধ্যে নবীদের লেশমাত্র নেই। তবুও সকলের বিশ্বাস যে, যাঁর আসবার কথা সেই নবী মোশির চেয়েও মহান হবেন এবং ইস্রায়েল জাতির সকল সমস্যা সমাধান করে চিরন্তন মুক্তি আনবেন।

বাপ্তিস্মদাতা যোহন ‘খ্রিষ্ট’, এলিয় ও সেই নবী এই সকল নাম ও ভূমিকা নিজের জন্য অস্বীকার করলেন। নিজের পরিচয় দেওয়া নয়, যিশুকে নির্দেশ করাই ও তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দান করাই তাঁর একমাত্র ভূমিকা, কেননা তিনি মরুপ্রান্তরে কণ্ঠস্বর মাত্র, অর্থাৎ তিনি আসন্ন খ্রিষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্যদাতা।

মরুপ্রান্তরেই তিনি ঐশবাণী ঘোষণা করেন, কারণ পুরাতন নিয়মে মরুপ্রান্তরেই প্রভু ইস্রায়েল জনগণের মুক্তিদাতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন; সুতরাং বাপ্তিস্মদাতার

‘কণ্ঠস্বরে’ ইস্রায়েলের বর্তমান মুক্তি পূর্বপ্রকাশিত হয়। তথাপি, অবিশ্বাসী ইহুদীদের মত ফরিশীদেরও চোখ থাকলেও তাঁরা দেখতে পান না, ফলে অন্য প্রশ্নগুলো করতে থাকেন। এবারও বাপ্তিস্মদাতার উত্তর যিশুকে নির্দেশ করে: মানুষের বাপ্তিস্মদাতা নন, প্রকৃতপক্ষে যিশুর সাক্ষ্যদাতাই তিনি, তবুও ফরিশীরা তাঁর সাক্ষ্য না মেনে যিশুকে জানেন না, এমনকি বিশ্বাসের অভাবে তাঁকে কখনও জানতে পারবেন না। যিশুকে চোখে দেখা সত্ত্বেও বিশ্বাস না থাকায় তাঁকে ঐশপ্রকাশকর্তা ও শেষ ও চরম ত্রাণকর্তারূপে স্বীকার করা সম্ভব নয়।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সঙ্গে ইহুদী কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার ঐতিহাসিক একটা ঘটনা; ঘটেছিল যর্দন নদীর ওপারে, বেথানিয়াতে। এ জায়গার প্রেক্ষিতে মনে রাখতে হয় যে, যেরুশালেমের নিকটবর্তী আর একটা বেথানিয়া নামক গ্রাম ছিল (সেখানে যিশু লাজারকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, ১১ অধ্যায়)।

নিজের শিষ্যদের সম্মুখে বাপ্তিস্মদাতার সাক্ষ্যদান (১:২৯-৩৪)

১ [২৯] পরদিন তিনি যিশুকে নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, ‘ওই দেখ,
ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন! [৩০] তাঁরই সম্বন্ধে
বলেছিলাম: আমার পরে এমন একজন আসছেন, যিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ
আমার আগেও ছিলেন। [৩১] আমিও তাঁকে জানতাম না, কিন্তু ইস্রায়েলের কাছে
তিনি যেন প্রকাশিত হন, এজন্যই আমি এসে জলে বাপ্তিস্ম দিই।’ [৩২] আর
যোহন এই বলে সাক্ষ্য দিলেন, ‘আমি দেখেছি, আত্মা কপোতের মত স্বর্গ থেকে
নেমে এসে তাঁর উপর থাকলেন। [৩৩] আমিও তাঁকে জানতাম না, কিন্তু যিনি
আমাকে জলে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে বললেন, “যাঁর উপরে
আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেবেন।”
[৩৪] আর আমি দেখেছি, এবং এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে, ইনিই ঈশ্বরের সেই
মনোনীতজন।’

এই উদ্ধৃতাংশের আলোচ্য বিষয় যিশুর বাপ্তিস্মের বর্ণনা নয়, বরং নিজের শিষ্যদের কাছে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্যদান। অর্থাৎ বিশ্বস্ত ইস্রায়েলীয়দের কাছে 'ঈশ্বরের সেই মনোনীতজন', 'ঈশ্বরের মেষশাবক' খ্রিস্টের পরিচয় দান করা।

১:২৯—ঈশ্বরের মেষশাবক : এই নাম বহুবিধ তাৎপর্যপূর্ণ নাম হওয়ায় তার প্রধান প্রধান তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার পর শেষে সাংশ্লেষিক কথা উপস্থাপন করা হবে। সূচনাস্বরূপ একথা উল্লেখযোগ্য যে, আরামীয় ভাষায় 'মেষশাবক' ও 'দাস' কথা দু'টো একই শব্দ (তালিয়া)।

ক। পুরাতন নিয়মে মেষশাবকের সঙ্গে 'ঈশ্বরের কষ্টভোগী দাসের' যে তুলনা করা হয়, তাতে 'দাসের' নিরপরাধিতা প্রকাশিত হয় :

> তিনি [ঈশ্বরের দাস] মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন,
> ও লোমকাটিয়ের সামনে মেষশাবক যেমন নীরব থাকে,
> তিনি তেমনি মুখ খোলেন না। [ইশা ৫৩:৭]

এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হয় যে, ইশাইয়া নবীর বর্ণিত 'ঈশ্বরের কষ্টভোগী দাসের' মুখ্য আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি পাপীদের সহভাগী :

> তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন ;
> বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট (…) ;
> তিনি আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য অপমানের পাত্র হয়েছেন ;
> আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন। [ইশা ৫৩:৪]

খ। হিব্রু ধর্মোপাসনায় ও আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর ধারণা অনুযায়ী 'পাস্কাপর্বের মেষশাবকের' উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। মিশরদেশ থেকে ঐশমুক্তিলাভ স্মরণার্থে ইস্রায়েলীয়রা পাস্কাপর্বের রাতে যেরুশালেমের মন্দিরে একটা মেষশাবক বলিদান করত। তারা মনে করত, মিশরদেশে পালিত প্রথম পাস্কা-ভোজের মত (যাত্রা ১২) অন্তিমকালেও এই বলিদান গুণে প্রভু মানুষের পাপকর্ম মোচন করবেন।

উল্লেখযোগ্য যে, যে দিনে ও যে সময়ে পাস্কাপর্বের মেষশাবক বলিদান করা হত, ঠিক সেই দিনে ও সেই সময়ে ইহুদীরা যিশুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। সুতরাং, সত্যিই যিশুই পাস্কাপর্বের প্রকৃত মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেছেন।

গ। যোহনের প্রথম পত্রে লেখা আছে: 'আর তোমরা তো জান যে, পাপ হরণ করতেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, আর তাঁর মধ্যে কোন পাপ নেই (১ যোহন ৩:৫)।' অর্থাৎ যিশু মানবজাতির পাপকর্ম হরণ করে নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে ত্রাণ করেছেন।

এই তাৎপর্য তিনটি সংশ্লেষণ করে আমরা এখন সুসমাচারের লেখকের উদ্দেশ্য বা ধারণা উপলব্ধি করতে পারি: ঈশ্বরের সেই তৈলাভিষিক্তজন বা খ্রিষ্ট যিশুই হলেন ঈশ্বরের সেই কষ্টভোগী দাস এবং নব ও চরম পাস্কাপর্বের মেষশাবক যিনি পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছায় বাধ্য হয়ে মানবপ্রেমের জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি নিরপরাধী ছিলেন অথচ বিশ্বপাপ বহন করে নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পুণ্য প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, সেই বিশ্বপাপ বিনষ্ট করে ফেলেছেন এবং তা-ই করে হয়ে উঠলেন অন্তিমকালের 'পরম বিজয়ী মেষশাবক' (এবিষয়ে ঐশপ্রকাশ পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বিবিধ উদ্ধৃতাংশ দ্রষ্টব্য)। এ সকল কথা থেকে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয় যোহনের খ্রিষ্টসম্বন্ধীয় ধারণা, যে-ধারণা তিনি মেষশাবকের তুলনায় ব্যক্ত করেছিলেন, তথা: ক্রুশ-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যিশু হলেন সমগ্র মানবজাতির একমাত্র ও চরম ত্রাণকর্তা।

১:৩০—তিনি আমার আগেও ছিলেন: এই উক্তি ১৫ পদের কথা পুনরাবৃত্তি করে: আদিকাল থেকে বিদ্যমান বলেই যিশু বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে মহান। উপরন্তু, এখানে এ সত্যও অনুধাবিত হয় যে, বাপ্তিস্মদাতার সাক্ষ্যদান মানবীয় নয় বরং ঈশ্বরের নির্ধারিত কাজ; ঈশ্বরের আদেশেই বাপ্তিস্মদাতা যিশুর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করলেন।

১:৩২—আমি দেখেছি… : বাপ্তিস্মদাতা যিশুর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন, তবুও এ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে খ্রিষ্ট অর্থাৎ মশীহ্ বলে জানতে পারলেন না। দিব্য একটা চিহ্ন পেলেন বিধায়, অর্থাৎ ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেন বিধায়ই তিনি যিশুকে খ্রিষ্ট বলে জানতে পারলেন। দিব্য চিহ্নটি হল যিশুর উপর পবিত্র আত্মার প্রকাশ্য অবতরণ। এবিষয়ে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, পুরাতন নিয়মে ঐশআত্মাকে বাতাসের সঙ্গে তুলনা করা হত এবং কবিগণ দুই পাখা-বিশিষ্ট বলেই এই বাতাস কল্পনা করতেন। সুতরাং সেইকালে পবিত্র আত্মাকে সাধারণত একটা পাখি বলে বর্ণনা করা হত।

বাপ্তিস্মদাতার সাক্ষ্যদানে আমরা অবগত আছি যে, ঐশআত্মা যিশুর উপর নেমে এলেন শুধু নয়, বরং সেই আত্মা স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর উপর থাকলেন। সুতরাং, খ্রিষ্ট হয়ে যিশুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সর্বকালে ঐশআত্মায় পরিপূর্ণ, এবং পরিপূর্ণ বলেই সেই আত্মাকে দান করতে বা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দিতে সক্ষম।

১:৩৩—তিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন : এই বাক্যের মাধ্যমে বাপ্তিস্মদাতা কী বলতে চাইলেন, সুসমাচার এবিষয়ে কিছুই বলে না। বস্তুত, যিশুর কাজ নয়, বরং ব্যক্তি হিসাবে যিশুকে স্বীকার করাই তার লক্ষ্য। সম্ভবত এই উক্তি দ্বারা আদিখ্রিষ্টমণ্ডলী অনুভব করল যে, যিশু 'জল ও আত্মা থেকে জন্ম' (৩:৫), অর্থাৎ বাপ্তিস্ম-সাক্রামেন্ত আনয়ন করেন, যে-সাক্রামেন্তের মাধ্যমে ঐশআত্মা মানুষকে ঈশ্বরসন্তানরূপে রূপান্তরিত করেন (১:১২…)। যিশুই মাত্র সেই ব্যক্তি যিনি 'ঊর্ধ্বলোক' থেকে নেমে এসে মানুষকে 'ঊর্ধ্বলোক থেকে জন্ম' লাভ করতে বা আত্মা থেকে জনিত হতে দেন (৩:৩, ৬-৮, ৩১)। এইভাবে আমরা দেখি যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্যদানে আর একটা ধারণা সূচিত আছে, তথা: সেই খ্রিষ্ট যিশু, যিনি আদি থেকে বিদ্যমান ও ঊর্ধ্বলোক থেকে আগত হয়ে নিজের মৃত্যু দ্বারা জগতের পাপকর্ম মুছিয়ে দিলেন, শুধু তিনিই মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ ও পরিত্রাণদায়ী অনুগ্রহ অর্থাৎ কিনা পবিত্র আত্মাকে ও অনন্ত জীবন দান করতে পারেন (৩:৩৪; ৬:৬৩; ৭:৩…)।

১:৩৪—ইনিই ঈশ্বরের সেই মনোনীতজন: এই বাক্যও 'প্রভুর দাস' গীতিকায় প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল (ইশা ৪২:১)। এতে পুনরায় পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে যিশুর আন্তরিক ঐক্য-সম্পর্ক প্রকাশিত হয়।

সম্ভবত কয়েকজন পাঠকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হল: যখন বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিশুর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করলেন, তখন কি তিনি সত্যিই সচেতন ছিলেন যে নিজের কথায় এত গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর ঐশতাত্ত্বিক ধারণা নিহিত ছিল? উত্তরে বলতে পারি যে, সম্ভবত তিনি কেবল এ সত্যই ঘোষণা করতে চাইলেন যে, যিশু মশীহ অর্থাৎ যিশুই পুরাতন নিয়মের প্রতিশ্রুত ঈশ্বরের সেই তৈলাভিষিক্তজন যিনি মানবজাতির ত্রাণকর্তা। সুসমাচারের লেখক যোহনই বাপ্তিস্মদাতার কথায় যে সত্যগুলি সূচিত ছিল যিশুর পুনরুত্থান দ্বারা অর্জিত বিশ্বাসের আলোতে সেগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তিনিই প্রকাশ করলেন যে, 'মশীহ' বলতে রাজনৈতিক নেতা নয় বরং 'কষ্টভোগী' ত্রাণকর্তা বোঝায়; আর ঠিক এইভাবে ব্যাখ্যা করে বাপ্তিস্মদাতার অন্যান্য কথাও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুললেন। এবিষয়ে এই পুস্তকের ভূমিকায়ও বলা হয়েছিল যে, সুসমাচার-লেখকদের ঐতিহাসিক ধারাবিবরণী লেখবার কোন উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁরা খ্রিষ্টের অনুগামীদের বিশ্বাস জাগাবার জন্যই সুসমাচার পুস্তক রচনা করলেন: যিশুর জীবনের ঘটনাবলিতে যে সত্যগুলি প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ছিল, তাঁরা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় সেই সকল সত্য পূর্ণার্থমণ্ডিত করে লিপিবদ্ধ করলেন।

যিশুর প্রথম শিষ্যেরা (১:৩৫-৫১)

১ [৩৫] পরদিন যোহন ও তাঁর দু'জন শিষ্য আবার সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
[৩৬] যিশু সেখান দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন; তাঁর দিকে তাকিয়ে যোহন বললেন,
'ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক!' [৩৭] তিনি এই যে কথা বললেন, সেই দু'জন
শিষ্য তা শুনে তাঁর অনুসরণ করলেন। [৩৮] যিশু ফিরে দাঁড়ালেন, এবং সেই
দু'জনকে তাঁর অনুসরণ করতে দেখে বললেন, 'তোমরা কী অনুসন্ধান করছ?' তাঁরা
তাঁকে বললেন, 'রাব্বি (অর্থাৎ, গুরু), আপনি কোথায় বাস করেন?' [৩৯] তিনি
তাঁদের বললেন, 'এসো, দেখে যাবে।' তাই তাঁরা গেলেন, ও দেখলেন, তিনি

কোথায় বাস করেন, এবং সেই দিন তাঁর সঙ্গে থাকলেন। তখন প্রায় বিকাল চারটে। [৪০] যে দু'জন শিষ্য যোহনের সেই কথা শুনে যিশুর অনুসরণ করেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়। [৪১] তিনি প্রথমে তাঁর ভাই শিমোনকে খুঁজে পেলেন; তাঁকে বললেন, 'আমরা মশীহের সন্ধান পেয়েছি!' মশীহ কথাটার অর্থ হল খ্রিষ্ট। [৪২] তিনি তাঁকে যিশুর কাছে নিয়ে গেলেন। যিশু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি তো যোহনের ছেলে শিমোন; তুমি কেফাস নামে অভিহিত হবে।' কেফাস কথাটার অর্থ শৈল।

[৪৩] পরদিন তিনি গালিলেয়ায় যাবেন বলে স্থির করলেন; ফিলিপের দেখা পেয়ে যিশু তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।' [৪৪] ফিলিপ ছিলেন আন্দ্রিয় ও পিতরের একই শহর সেই বেথ্‌সাইদার মানুষ। [৪৫] ফিলিপ নাথানায়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন; তাঁকে বললেন, 'মোশি বিধান-পুস্তকে যাঁর কথা লিখেছিলেন, নবীরাও যাঁর কথা লিখেছিলেন, আমরা তাঁর সন্ধান পেয়েছি: তিনি যোসেফের ছেলে নাজারেথের সেই যিশু।' [৪৬] নাথানায়েল তাঁকে বললেন, 'নাজারেথ থেকে! সেখান থেকে ভাল কিছু কি আসতে পারে?' ফিলিপ তাঁকে বললেন, 'এসো, দেখে যাও।' [৪৭] নাথানায়েলকে তাঁর দিকে আসতে দেখে যিশু তাঁর সম্বন্ধে বললেন, 'ওই দেখ, একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যার মধ্যে ছলনা নেই।' [৪৮] নাথানায়েল তাঁকে বললেন, 'আপনি কী করে আমাকে চেনেন?' উত্তরে যিশু তাঁকে বললেন, 'ফিলিপ তোমাকে ডাকবার আগে, তুমি যখন সেই ডুমুরগাছের তলায় ছিলে, আমি তোমাকে দেখলাম।' [৪৯] নাথানায়েল উত্তর দিলেন, 'রাব্বি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইস্রায়েলের রাজা।' [৫০] যিশু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'সেই ডুমুরগাছের তলায় তোমাকে দেখেছি, একথা বলেছি বিধায় তুমি কি বিশ্বাস কর? এর চেয়ে অনেক বড় কিছু দেখতে পাবে!' [৫১] তিনি বলে চললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা দেখতে পাবে, স্বর্গলোক উন্মুক্ত, এবং ঈশ্বরের দূতেরা মানবপুত্রের উপরে উঠে যাচ্ছেন ও নেমে আসছেন।'

বাপ্তিস্মদাতার সাক্ষ্যদানে যে প্রথম ব্যক্তিগণ যিশুর অনুগামী হন, তাঁরা হলেন প্রকৃত ও বিশ্বস্ত ইস্রায়েল জনগণের প্রতীক: তাঁরা ঈশ্বরের প্রেরিতজনের সাক্ষ্যদান হৃদয়ঙ্গম করে মশীহ যিশুর অনুসরণ করলেন (১:৩১, ৪৭-৪৯) এবং তাঁরাই হলেন সেই

খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রথম সদস্য, যে-মণ্ডলীকে স্বয়ং পিতা ঈশ্বর মশীহের হাতে ন্যস্ত করলেন। উল্লিখিত ধারণা যোহনের বিশিষ্টই একটা ধারণা, কেননা সদৃশ সুসমাচার-রচয়িতাদের অনুসারে যিশু নিজে নিজের শিষ্যদের আহ্বান করেছিলেন।

উদ্ধৃতাংশটি চারটে ভাগে ভাগ করা যায়:

– বাপ্তিস্মদাতা যোহনের দু'জন শিষ্য যিশুর অনুসরণ করেন (১:৩৫-৩৯)।
– পিতরের সঙ্গে যিশুর সাক্ষাৎ (১:৪০-৪২)।
– ফিলিপ ও নাথানায়েলের সঙ্গে যিশুর সাক্ষাৎ (১:৪৩-৫০)।
– শিষ্যদের কাছে যিশুর আত্মপ্রকাশ (১:৫১)।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের দু'জন শিষ্য যিশুর অনুসরণ করেন (১:৩৫-৩৯)

১:৩৬—ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক: পূর্ববর্তী উদ্ধৃতাংশের সঙ্গে এই উদ্ধৃতাংশের সংযোজক বিষয় হল বাপ্তিস্মদাতার এই উক্তি: 'ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক।' এই কথায় দু'জন শিষ্য যিশুকে অনুসরণ করলেন। এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে পরিলক্ষিত হয় যিশুর শিষ্য হতে হলে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত, তথা: যিশুকে অনুসরণ করা মানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর ঐক্যে অংশ নেওয়া, এমনকি অবিরতই তাঁর ঐক্যে স্থিতমূল থাকা; পরে তিনি নিজে প্রথমেই নিজের অনুগামীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে প্রবৃত্ত হন: 'তোমরা কী অনুসন্ধান করছ?' লক্ষণীয় যে, যোহনের সুসমাচারে এই প্রশ্ন হল যিশুর প্রথম উচ্চারিত বাক্য। প্রশ্নটি অতি গুরুত্বপূর্ণ; প্রশ্নটি নিজেদের কাছে তারাই রাখবে যারা যিশুর অনুগামী হবে বলে সঙ্কল্প নেয়: যিশুর অনুসরণ করায় মানুষ কিসের সন্ধান পেতে চাইবে? অনেকে মানবীয় ও বাহ্যিক প্রয়োজনের জন্যই মাত্র তাঁর অনুসরণ করেছিল, তবু তারা তাঁর শিষ্য হল না।

১:৩৮—রাব্বি, আপনি কোথায় বাস করেন? এটিই প্রকৃত ঈশ্বরান্বেষী শিষ্যের প্রশ্ন, কেননা যিশু নিজের বাসস্থান প্রকাশ করতে এলেন যাতে মানুষ সেখানে যেতে পারে (১৪:৩; ১৭:২৪)। অবশ্যই এ প্রশ্নের অর্থ এই নয় যে, আপনার বাসা কোথায়?

রচয়িতার ভাষায় এর সূক্ষ্ম অর্থ হল, আপনার জীবনযাত্রার উদ্দেশ্য কী? কিংবা, আপনি প্রকৃতপক্ষে কে?

১:৩৯ক—এসো, দেখে যাবে: যিশু মানুষকে তাঁকে নিজেকেই অনুসরণ করতে ও দেখতে আহ্বান করেন; তাঁর ইচ্ছা, মানুষ নিজে তাঁর জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হোক, তাঁর রহস্য আবিষ্কার করুক।

যোহনের এ সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত থেকে একথা স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, শিষ্যেরা যিশুকে অনুসরণ করতে সিদ্ধান্ত নিলেন এমন নয়, যিশুই বাপ্তিস্মদাতার মধ্যস্থতায় তাঁদের মন জয় করলেন।

১:৩৯খ—তাই তাঁরা গেলেন ও দেখলেন: সেইদিন যিশু দু'জন শিষ্যকে যে কি কি বললেন এবিষয়ে রচয়িতা কিছুই বলেন না। আসলে, এই সাক্ষাতে যিশু নিজের কথার মাধ্যমে নয়, আপন ব্যক্তিত্ব ও প্রতাপের প্রবাহেই কৃতকার্য হলেন এবং শিষ্য দু'জন তাঁর এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতাপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর অনুগামী হলেন। সুতরাং, একথা বলা চলে যে, যিশুকে জানা বলতে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু অবগত হওয়া নয়, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই বোঝায়।

১:৩৯গ—তখন প্রায় বিকাল চারটে: শিষ্য দু'জন যিশুর সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময় আজীবনই স্মরণে রাখলেন; ঠিক সেই শুভলগ্নে তাঁরা যিশুকে অনুসন্ধান করে তাঁর ঐক্যের অংশী হয়ে তাঁর কাছে চিরন্তন আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

পিতরের সঙ্গে যিশুর সাক্ষাৎ (১:৪০-৪২)

এই বর্ণনায় অনুধাবিত বিষয়বস্তু হল যিশুর আচরণ: তিনি কি কি বলেন ও কি করে মানুষের অন্তর তলিয়ে দেখে জয়ই করেন। যিশু তাঁর কাছে আনা শিমোনের গভীরতম

মর্মস্থল তলিয়ে দেখেন, তাঁকে অর্থপূর্ণ নব একটি নামে ডাকেন যে-নাম তাঁর ভাবী ভূমিকা নির্দেশ করে। এক কথায়, যিশু শিমোনকে জানেন ও মনোনীত করেন। যিশুর সাক্ষাতে পিতরের কী প্রতিক্রিয়া হল তা আমাদের বলা হয় না; কিন্তু লেখা আছে আন্দ্রিয়েরই কথা: আন্দ্রিয়ের আনন্দভরা স্বীকারোক্তিতে যিশুর সঙ্গে থাকার সাফল্য ব্যক্ত হয়। তা সত্ত্বেও, এই বর্ণনায়ও প্রাধান্য আরোপ করা হয় যিশুর প্রতাপপূর্ণ বাণীর উপর। অধিকন্তু যিশু ঐশজ্ঞান-মণ্ডিত, ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-সম্পন্ন ও ইহুদীদের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত অথচ অপূর্ব ও বিস্ময়কর মশীহ্ বলে আত্মপ্রকাশ করেন।

১:৪২—তুমি··· শিমোন। তুমি কেফাস নামে অভিহিত হবে: যিশু শিমোনের সঙ্গে আন্তরিক ও ব্যক্তিময় সম্পর্ক স্থাপন ক'রে এবং তাঁর নামান্তর করে তাঁকে জয় করেন। এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, হিব্রু ঐতিহ্য অনুসারে নামটাই মানুষের ভূমিকা নির্দেশ করে। সুতরাং, শিমোনের নব নামকরণে ঐশপ্রকাশকর্তা যিশু পিতরের ভাবী ভূমিকা পূর্বপ্রকাশ করেন: পিতর (কথাটির অর্থ শৈল) হবেন যিশুর মেষপালের পালক; এসময় থেকেও যিশু বিশ্বাসীমণ্ডলীর ভবিষ্যতের কথা ভাবেন।

এখন এই অধ্যায়ের মুখ্য একটা বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হোক।

যিশুর শিষ্য: সে-ই যিশুর শিষ্য, যে যিশু বিষয়ে সাক্ষ্য শুনে তাঁকে অনুসন্ধান ক'রে, প্রত্যক্ষ ক'রে ও অনুসরণ ক'রে তাঁর কাছে স্থায়ীভাবে আশ্রয়গ্রহণ করে। আবার, সে-ই যিশুর শিষ্য, যে যিশুকে সাক্ষাৎ ক'রে মুগ্ধ হয়ে গভীর উল্লাসে তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে যাতে অন্যেরাও তাঁর শিষ্য হতে পারে। সুতরাং আনন্দপূর্ণ সাক্ষ্যদান যদি না থাকে কেউই নিজেকে যিশুর সঙ্গে একাত্ম বলে বিবেচনা করতে পারে না, আবার কেউই একথা বলতে পারে না, আমি যিশুর শিষ্য। উপসংহারে, সে-ই যিশুর প্রকৃত শিষ্য, যে যিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এবং তাঁকে মশীহরূপে চিনে তাঁর দ্বারা নিজেকে মনপরিবর্তনের পথে চালিত হতে দেয়। একই ধারণা সূচিত হয় সুসমাচারে বারবার উল্লিখিত 'যিশুর অনুসরণ করা' উক্তি দ্বারা। যিশুর অনুসরণ করাই হল ঈশ্বরের অনুগ্রহ, যে অনুগ্রহ তিনি সাধারণত একজন সাক্ষ্যদাতার মধ্যস্থতায়ই দান করেন। যেভাবে বাপ্তিস্মদাতার অনুগামীরা নিজেদের গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করে যিশুর শিষ্য হলেন, সেইভাবে যিশুর শিষ্য হতে হলে

সর্বযুগের মানুষ পূর্বপূজিত দেব-দেবী বা পূর্ববিবেচিত সত্য প্রভৃতি অপূর্ণাঙ্গ ধারণাধারা ত্যাগ করবে। বলতে পারি যে, যিশুর শিষ্যত্ব বা যিশুর অনুসরণ এখানকার আলোচিত প্রসঙ্গটা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে:

ক। যিশুকে দেখা, অর্থাৎ তাঁকে মশীহ বলে স্বীকার করা।

খ। যিশুর সঙ্গে থাকা, অর্থাৎ তাঁর জীবন ও নিয়তির সহভাগী হওয়া।

গ। যিশু বিষয়ে সাক্ষ্যদান করা: তাঁর ঐক্য-সম্পর্কে মুগ্ধ হয়ে অন্যদের কাছে তাঁর কথা প্রচার করা।

ফিলিপ ও নাথানায়েলের সঙ্গে যিশুর সাক্ষাৎ (১:৪৩-৫০)

ফিলিপ যিশুকে চিনে ও অনুসরণ করে প্রকৃত শিষ্য বলে নাথানায়েলের কাছে তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন।

১:৪৬—নাজারেথ থেকে! … : বিশ্বাস না থাকলে যিশুর মানবীয় দীনতা মানুষের পক্ষে লজ্জাকর ব্যাপার। বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায়ই মানুষ সেই দীনহীন যিশুকে ঈশ্বরপুত্র বলে চিনতে পারে। কিন্তু যিশুর প্রতি বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে অধ্যয়ন থেকে এমনকি অন্য শিষ্যদের সাক্ষ্যদান থেকেও উদ্গত নয়।

ফিলিপ জানেন তিনি নাথানায়েলের বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারেন না, এজন্যই যে কোন তাত্ত্বিক আলোচনা এড়িয়ে যা একমাত্র প্রয়োজন তা-ই অবলম্বন করেন: যিশুকে না দেখলে ও তাঁর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন না করলে নাথানায়েল যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারবেন না।

১:৪৭—ওই দেখ, একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়: যিশু দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বলে আত্মপরিচয় দেন; তিনি মানুষের হৃদয়-মন তলিয়ে দেখতে পারেন কেননা সর্বদাই পিতামুখী। যিশুর সম্ভাষণে সম্মানসূচক একটা ভাব প্রকাশ পায়। তিনি নাথানায়েলকে 'ইহুদী' (অর্থাৎ বিশ্বাসের অনুপযুক্ত মানুষ) নয়, 'ইস্রায়েলীয়' অর্থাৎ ঈশ্বরের মনোনীত জনগণের প্রকৃত সদস্য বলে সম্বোধন করেন। অন্যান্য শিষ্যের মত নাথানায়েলও যিশুর

সংস্পর্শে এসেই বিশ্বাস ও মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ লাভ করেন, এমনকি তিনি যিশু বিষয়ে এত মুগ্ধ হন যে উৎসাহ-ভরা মনে ঘোষণা করেন, 'আপনি ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইস্রায়েলের রাজা।' সম্ভবত উক্ত নামগুলো ঘোষণায় নাথানায়েল যিশুকে মশীহ বলেই মাত্র স্বীকার করতে বিবেচনা করলেন, কিন্তু সুসমাচারের রচয়িতা এবং আদিখ্রিষ্টমণ্ডলী সেই ঘোষণাকে গভীরতর ও অর্থপূর্ণ একটা স্বীকারোক্তিতে পরিণত করলেন: মাংসে আগত ঐশবাণী-যিশুই সেই ব্যক্তি যিনি আদি থেকেও ঈশ্বরমুখী, ঈশ্বর হতে উদ্গত ও সকল বিশ্বাসীর ত্রাণকর্তারূপে ঈশ্বর দ্বারা তৈলাভিষিক্ত হলেন।

শিষ্যদের কাছে যিশুর আত্মপ্রকাশ (১:৫১)

'আমি সত্যি সত্যি তোমাদের বলছি...' বাক্যটা অতি গুরুত্বপূর্ণ। নিঃসন্দেহে বলতে পারি বাক্যটি এই অধ্যায়ের (১:১৯-৫১) মহাবাক্য, কেননা সেই অধ্যায়ের সকল ঘটনায় সূচিত শিক্ষা ঠিক এই বাক্যেই সিদ্ধি লাভ করে। পদটি পড়লে পর সম্ভবত সুধী পাঠকের আদিপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত যাকোবের স্বপ্ন ও স্বর্গস্পর্শী সেই সিঁড়ির দর্শনের কথা (আদি ২৮:১০-২২) স্মরণ হয়। সুতরাং যিশুর এ উক্তির শিক্ষা কি? পৃথিবীনিবাসী মানবপুত্র স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের সঙ্গে ঐক্যসম্পন্ন, অর্থাৎ অদৃশ্যমান ঈশ্বর যিশুতেই সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, বিশ্বাসীর কাছে ঈশ্বর যিশুতেই নিজের গৌরব অর্থাৎ ইতিহাসের ও সৃষ্টিকর্মের উপর নিজের পরিত্রাণদায়ী প্রভুত্ব প্রদর্শন করেন। পৃথিবীনিবাসী মানবপুত্রের উপরে স্বর্গদূতগণ উঠে গিয়ে স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রার্থনা নিবেদন ক'রে মানবপুত্রকে সেবা করার জন্য আবার পৃথিবীতে নেমে আসেন। অবশ্যই, এই ব্যাখ্যা সুসমাচারে ব্যবহৃত তুলনামূলক কথা অনুসারে বর্ণিত; তবুও তুলনায় অন্তর্নিহিত সত্য সম্পূর্ণ বাস্তব (১১ অধ্যায়ে লাজারের পুনরুত্থান দ্রষ্টব্য): যিশু পিতার কাছে প্রার্থনা রাখলেন এবং পিতা পুত্রের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে বিস্ময়কর কাজ করায় যিশুতে নিজের গৌরব প্রকাশ করলেন।

সুতরাং, শিষ্যেরা যিশুর প্রতিটি কাজে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর অনন্য সম্পর্ক ও তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করবেন, এজন্যই শিষ্য হিসাবে তাঁরা আহূত হয়েছিলেন।

মানবপুত্রের মাধ্যমে স্বর্গদ্বার (আদি ২৮:১৭) উন্মুক্ত হল, ঈশ্বর এ পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন, আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন। অর্থাৎ, শিষ্যেরা যিশুতে পিতাকে দেখতে ও চিনতে পারলেন; আজকালের শিষ্য আমরাও সেই একই অভিজ্ঞতা করতে আহূত।

* * *

পূর্বে, যিশুর শিষ্য ও যিশুর অনুসরণ করা বিষয় দু'টোতে আলোচনা করা হয়েছে। এখন নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করা হোক: এই অধ্যায় অনুসারে (১:৩৫-৫১) যিশু কে? কেননা রচয়িতার প্রধান উদ্দেশ্য ঠিক এটিই: যিশু বিষয়ে সাক্ষ্যদান করা। সর্বপ্রথমে, প্রথম অধ্যায়ে প্রচারিত যিশুর নামসমূহের একটা তালিকা দেওয়া হবে, পরে প্রধান প্রধান নামের ঐশতাত্ত্বিক অর্থ ব্যাখ্যা করা হবে।

প্রথম অধ্যায়ে প্রচারিত যিশুর নামসমূহ

প্রথম অধ্যায়ে প্রচারিত যিশুর নামসমূহ এ এ:

বাণী, ঈশ্বর, জীবন, আলো, অদ্বিতীয় পুত্র, ঈশ্বরের মেষশাবক, ঈশ্বরের সেই মনোনীতজন, খ্রিষ্ট (মশীহ), ঈশ্বরের পুত্র, ইস্রায়েলের রাজা, মানবপুত্র।

উল্লিখিত নামসমূহ ছাড়া যিশু বিষয়ে অন্যান্য সংজ্ঞাও রয়েছে। সেগুলির মাধ্যমে যিশু-রহস্য ও তাঁর মশীহ-ভূমিকা আরও প্রকটভাবে উদ্ভাসিত হয়:

– সেই মহান, যিনি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পরে আসবেন (১:১৫, ২৭, ৩০)।

– সেই ব্যক্তি যিনি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের আগেও ছিলেন (১:১৫, ৩০)।

– সেই ব্যক্তি যিনি পিতার বুকে বিরাজমান (১:১৮)।

– সেই ব্যক্তি যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেবেন (১:৩৩)।

উপরন্তু, ইহুদী কর্তৃপক্ষের সম্মুখে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্যদানে যিশুকে পরোক্ষভাবে 'মশীহ' ও 'নবী' বলে অভিহিত করা হয় (১:২০, ২১, ২৫)। এলিয় নামটি তালিকাভুক্ত করা হবে না, যেহেতু পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তেমন নাম আর উল্লিখিত হবে না।

অবশেষে যিশু ‘রাব্বি’ (গুরু) বলে আখ্যাত হন (১:৩৮, ৪৯)।

যোহনের সুসমাচারের অবশিষ্টাংশে দু’টো নাম মাত্র পাওয়া যায় প্রথম অধ্যায়ে যেগুলোর উল্লেখ নেই। প্রথমটা হল জগতের ত্রাণকর্তা (৪:৪২) এবং দ্বিতীয়টা হল ঈশ্বরের সেই প্রেরিতজন (৬:৬৯)।

এই সকল কথার উপর ভিত্তি করে এ মত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করতে পারি যে, প্রথম অধ্যায় হল সমগ্র সুসমাচারের সূচনা, কেননা সমগ্র সুসমাচারের শিক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে এই প্রথম অধ্যায়েই সূচিত।

মুখ্য নামসমূহের ঐশতাত্ত্বিক তাৎপর্য

(এখানে, বাণী-বন্দনায় উল্লিখিত নামসমূহের অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করা হবে না, কেননা সেগুলো সম্বন্ধে উপযুক্ত মন্তব্য পূর্বেই করা হয়েছে)।

খ্রিষ্ট (মশীহ) : নিজের বেলায় সেই নাম অগ্রাহ্য করাতে বাপ্তিস্মদাতা যোহন সাক্ষ্য দেন যে, যিশুই মশীহ; সুতরাং তিনি নিজের শিষ্যদের সম্মুখে (অর্থাৎ বিশ্বস্ত ইস্রায়েল জনগণের সম্মুখে) মশীহ-ই বলে যিশুর পরিচয় দেন (১:৩০)। বাপ্তিস্মদাতার ধারণায় যিশুই মশীহ, কেননা তিনি পবিত্র আত্মাকে বহনকারী ও প্রদানকারী; বস্তুত যিশু সতত পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ। তাছাড়া বাপ্তিস্মদাতার সাক্ষ্যদানে আমরা আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীরও সাক্ষ্যদানের ধ্বনি কেমন যেন শুনতে পাই: মশীহ যিশুর পূর্বাস্তিত্ব প্রচারিত হয় এবং তাঁর মৃত্যু জগতের পরিত্রাণের জন্য মহাপ্রায়শ্চিত্ত বা মুক্তিপণ বলে স্বীকৃত হয় (ঈশ্বরের মেষশাবক-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ‘ইস্রায়েলের রাজা’, এই নামও আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর ব্যাখ্যায় পূর্ণ অর্থ লাভ করে; যথার্থই এই নামের পর পরেই ‘ঈশ্বরের পুত্র’ একথাও উদিত হয়। এইভাবে আদিখ্রিষ্টমণ্ডলী ও সুসমাচারের রচয়িতা এই মহা সত্য নির্দেশ করতে পারেন যে, যিশুই সেই প্রতিশ্রুত আকাংক্ষিত মশীহ, ইস্রায়েল জাতির বংশধর ও অন্তিমকালের সার্বজনীন ত্রাণকর্তা।

মানবপুত্র : এই নাম অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ স্বয়ং যিশু নিজের জন্য এটাই ব্যবহার করলেন। এতে এধারণা প্রকাশ পায় : ত্রাণকর্তা জগতে নেমে আসেন এবং তাঁর

আপনজনদের সঙ্গে স্বর্গারোহণ করেন (এপ্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়গুলির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। উপরন্তু ত্রাণকর্তা যিশু পৃথিবীতে থাকলেও স্বর্গস্থ পিতার সঙ্গে সতত একতাবদ্ধ। আবার, এই বাক্য দ্বারা যোহন আমাদের মনোযোগ পরিত্রাণের আসন্ন প্রকাশের দিকে আকর্ষণ করতে চান, যে-প্রকাশ যিশুর নানা উপদেশে ও চিহ্নকর্মগুলিতে বাস্তবায়িত হবে (অর্থাৎ সুসমাচারের পরবর্তী অংশ)। এর মানে হল এই যে, সকল বিশ্বাসী প্রত্যক্ষ করতে পারবে যে, পৃথিবীস্থ যিশু পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগপ্রাপ্ত এবং তিনিই ইস্রায়েলের অপেক্ষিত চরম পরিত্রাণের অপূর্ব সিদ্ধিসাধক। এখন থেকেও মাংসে আগত যিশুতে ঈশ্বরের গৌরব প্রত্যক্ষ করা যায়: এটিই হল যোহনের ঐশতত্ত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং, রচয়িতার উদ্দেশ্য এই, যাতে পাঠকগণ বিশ্বাস সহকারে সুসমাচারের অবশিষ্টাংশ পড়ে যিশুর গৌরবের পূর্ণ প্রকাশের দিকে মনোযোগ দেন।

এ বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য যে, যে যে নাম যোহন ব্যবহার করেছেন, সেই সকল নাম যিশুর গুণকীর্তন করার জন্য শুধু নয়, বরং প্রতিটি নাম যোহনের যিশু-সম্বন্ধীয় ধারণা ও গবেষণার এক একটা দিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এমনকি প্রতিটি নাম দ্বারা সেই দিকটা সম্পূর্ণ নির্ধারিত ও আলোকিত হয়।

পরিশিষ্ট

যোহনের সুসমাচারের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য

বার বার বলা হয়েছে যে সদৃশ সুসমাচারত্রয় অপেক্ষা যোহনের সুসমাচার অনন্য বা স্বকীয়। স্বকীয়তা বিভিন্ন রূপে বা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত, যে-বৈশিষ্ট্যগুলি সাংস্কৃতিক শুধু নয়, প্রকৃতপক্ষে ঐশতাত্ত্বিক। সুসমাচারের কথা অধিক বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এগুলি বিষয়ে অবগত হওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

ভাষা: লেখক হিসাবে যোহন কথাশিল্পী নন, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর ভাষা যথার্থই বৈচিত্র্যহীন; প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই শব্দসমূহ দ্বারা সীমিত। কোন

শাস্ত্রবিদ নাকি বলেছিলেন, যোহনের মাতৃভাষা আরামীয় ভাষা বিধায়ই সেই বিদেশী গ্রীক ভাষার উপর তাঁর যথেষ্ট অধিকার নেই (স্মরণযোগ্য যে চতুর্থ সুসমাচার গ্রীক ভাষায় লেখা)। কিন্তু তবুও সমস্যা অন্যরূপ: যোহন একই শব্দ প্রয়োগ করেন কারণ তাঁর লেখায় তিনি সেই একই বাস্তবতা বা বিষয়বস্তু, অর্থাৎ যিশুকেই অভিব্যক্ত করার মহাপ্রচেষ্টা চালান, যে-বিষয়বস্তু কঠিন, দুর্জ্ঞেয়, প্রমাণের অতীত, ইন্দ্রিয়গোচর নয়। এই কারণে সুসমাচারের প্রসঙ্গ-বিশেষে ব্যবহৃত একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে।

দ্বন্দ্বসূচক ধারণা: চতুর্থ সুসমাচারে দ্বন্দ্বসূচক শব্দ বহুবিধ: আলো-অন্ধকার, জীবন-মৃত্যু, ঊর্ধ্বলোক-নিম্নলোক, স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতি শব্দ। এক্ষেত্রে প্রশ্ন এরূপ: এই দ্বন্দ্বসূচক দৃষ্টিভঙ্গি কোথা থেকে আসে, এবং কেন ব্যবহৃত হয়? আমরা সবাই আমাদের নিজেদের জীবনে একই সমস্যার সম্মুখীন হই, সমস্যাটা হল ভাল-মন্দের সমস্যা। এবিষয়ে পবিত্র বাইবেলও, এমনকি অন্যান্য দর্শন ও ধর্মও সচেতন হয় এবং কালস্রোতে এই সমস্যার প্রয়াসে প্রতিটি ধর্ম ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ উপস্থাপন করে আসছে। যোহনের সময় গ্রীক জ্ঞান-মার্গপন্থীরা একথা সমর্থন করত যে, এই দ্বন্দ্ব একটা ধারণা মাত্র নয়, বরং জগতের প্রকৃত দ্বৈত বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ: পরস্পর-সংগ্রামী দুই বাস্তবতা। কুম্রান সম্প্রদায়ের মত ছিল এই যে, ঈশ্বর মঙ্গল ও অমঙ্গল দু'টোই সৃষ্টি করলেন; যে মানুষ অমঙ্গলের বশে জন্মেছে, সে মঙ্গলের দিকে কখনও এগোতে পারবে না, অপর দিকে যারা মঙ্গললগ্নে জন্মেছে তারা আজীবন সদাচরণ করবে। যোহনের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। তাঁর কাছে দ্বন্দ্ব হল ঈশ্বর ও দিয়াবলের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। নিজের জীবনযাত্রায় প্রতিটি ক্ষণে মানুষ বিবেকের সাহায্যে মঙ্গল বা অমঙ্গল এ দু'টোর মধ্যে একটা বেছে নিতে স্বাধীন। সুতরাং মানুষ কোন শুভ বা অশুভ লগ্ন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত নয়। অধিকন্তু, ঈশ্বর ও দিয়াবলের মধ্যকার দ্বন্দ্বের পরিণতি যোহনের কাছে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত, তথা: অন্ধকার আলোকে বিনাশ করতে পারবে না, অর্থাৎ ঈশ্বরই জয়ী হবেন।

প্রতীকসমূহ: যোহনের লেখায় প্রতীকমূলক শব্দ বহুসংখ্যক। এখানেও আমাদের জিজ্ঞাসা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত: কেন তিনি এ সকল প্রতীক প্রয়োগ করেছেন?

ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করা কঠিন ব্যাপার। তিনি ত অদৃশ্যমান, এজন্যই তাঁর বিষয়ে কথা বলতে গেলে মানুষ বিশেষ বিশেষ কথা বা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ প্রতীক অবলম্বন করে। সুতরাং, প্রতীকের সামনে মানুষ সেটাকে অতিক্রম করবে, তার গুপ্ত অন্তর্নিবিষ্ট সত্য উদ্ঘাটন করবে। বাস্তবিকই যদিও মানবীয় জ্ঞান ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে ধরতে না পারে, তবুও একথাও সত্য যে, যেহেতু তিনি জগতের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কে যুক্ত, সেহেতুই মানুষ তাঁকে কোন রকমে অনুভব করতে পারে। প্রতীক-ই ঈশ্বরোপলব্ধিকে লব্ধ করে দেয়, কিন্তু একাধারে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তার মধ্য দিয়ে (প্রতীকেরই মধ্য দিয়ে) ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত নন। একারণে সকলের মত যে, প্রতীক এক দিকে ঈশ্বর-রহস্য উদ্ঘাটন করে, অন্য দিকে তাঁকে আবৃত করে। কেবল বিশ্বাসের সাহায্যে প্রতীক অর্থপূর্ণ হয়।

যোহনের ব্যবহৃত যে প্রতীকসমূহ, সেগুলি যিশুতে কেন্দ্রীভূত। অর্থাৎ সুসমাচারের যে কোন বর্ণনা বা যে কোন ঘটনা যিশুর কথা নির্দেশ করে এবং যিশুতেই পূর্ণ অর্থ লাভ করে। অধিকন্তু, প্রতীকের মধ্য দিয়ে যোহন যিশু-রহস্যের গুপ্ত, আত্মিক ও যথার্থ তাৎপর্য প্রকটভাবে ফুটিয়ে তুলতে চান, যাতে পাঠকগণ যিশুর কার্যাবলির প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেন। এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, যিশু-বিষয়ক প্রধান প্রতীক হল তাঁর ‘মাংস’: তেমন মাংসের মধ্যেই বিশ্বাসীরা যিশুর আসল সত্তা অর্থাৎ তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করবে। অবশেষে, সকল প্রতীক ঘোষণা করে যিশুর বহুবিধ পরিচয়: আমিই জগতের আলো, আমিই জীবনের রুটি, আমিই প্রকৃত মেষপালক, আমিই আঙুরলতা প্রভৃতি বচন। এক্ষেত্রে, সর্বপ্রথমে বলতে হয়, এ বচনাদির মুখ্য অংশ হল সেই ‘আমিই’। এর মানে হল যে, আমরা ‘আলো, রুটি, মেষপালক, আঙুরলতা’ ইত্যাদি প্রতীকের দিকে শুধু নয়, বরং ব্যক্তি হিসাবে যিশুরই দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করব। প্রতীকগুলি যিশুর কয়েকটা দিক ব্যক্ত করে এবং বোঝায় যে, সেই ‘আমিই’ ছাড়া এই জগতে আর নির্ভরযোগ্য আলো বা খাদ্য নেই, অর্থাৎ কেবল যিশুই জগতের পরমার্থ বা পরিত্রাণ।

উপসংহার: এই জগতে যা যা আছে, সেই সবকিছু যিশুতেই শুধু অর্থ লাভ করে, সচেতন-অসচেতন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকল মানুষ একটিমাত্র রত্নের অন্বেষী: রত্নটি স্বয়ং যিশু।

যিশুর আত্মপ্রকাশকর্মের সূচনা

(২–৪ অধ্যায়)

শাস্ত্রজ্ঞদের গবেষণা থেকে অনুমান করা যায় যে, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায় যোহনের বিবেচনায় একটামাত্র ধারাবাহিক বর্ণনা (স্মরণযোগ্য বিষয় যে, প্রকৃত বাইবেল অধ্যায়ে কি পদে বিভক্ত নয়; শুধু ১৩শ শতাব্দে অধ্যায় অনুসারে, এবং ১৬শ শতাব্দে পদ অনুসারে ভাগ ভাগ করা হয়েছে)। বস্তুত, এ খণ্ডে বিবৃত প্রথম ও শেষ পরাক্রম-কর্ম একই জায়গায়—সেই কানা গ্রামে—সাধিত হল। উপরন্তু, এ তিনটি অধ্যায়ব্যাপী একই বিষয়বস্তু আলোচিত হয়, বিষয়টি হল বিশ্বাস ও যিশুর আত্মপ্রকাশ: যিশু চিহ্নকর্ম ও উপদেশের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন, তিনি পুরাতন নিয়মে পূর্বঘোষিত পরিত্রাণের পরম সিদ্ধিস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেন। পরম সিদ্ধিস্বরূপ-যিশুর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, যিশুতেই নব সন্ধির নবীনতা পূর্ণপ্রকাশিত হয়: শুচীকরণের জল আর নয় বরং নব আঙুররস (২:১-১১), যেরুশালেম-মন্দির আর নয় বরং ক্রুশে উত্তোলিত স্বয়ং যিশু (২:১৩-২২), যাকোবের কুয়োর জল আর নয় বরং অনন্ত জীবনের জল (৪:১-১৪), যেরুশালেমে বা গারিজিম পর্বতে উপাসনা আর নয় বরং আত্মা ও সত্যের শরণেই উপাসনায় (৪:২০-২৪) যিশুর নবীনতা প্রকাশ পায়।

যিশুর আত্মপ্রকাশের সংস্পর্শে এসে মানুষের প্রতিক্রিয়া কি রূপ, একথাও লক্ষণীয়: শিষ্যেরা, ভিড় ও সর্বাপেক্ষা তিনজন ব্যক্তি-বিশেষের (নিকোদেম, সামারীয় নারী ও বিধর্মী রাজকর্মচারী) প্রতিক্রিয়া হল যিশুর সংস্পর্শে আসা সর্বকালের মানুষের প্রতিক্রিয়া।

প্রথম চিহ্নকর্ম (২:১-১২)

২ [১] তিন দিন পর গালিলেয়ার কানা গ্রামে এক বিবাহোৎসব হল। যিশুর মা
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। [২] যিশু ও তাঁর শিষ্যেরাও উৎসবে নিমন্ত্রিত
হয়েছিলেন। [৩] আঙুররস ফুরিয়ে যাওয়ায় যিশুর মা তাঁকে বললেন, 'ওদের

আঙুররস নেই।' [৪] যিশু তাঁকে বললেন, 'নারী, তুমি আমার কাছে কী চাও? আমার ক্ষণ এখনও আসেনি।' [৫] তাঁর মা চাকরদের বললেন, 'উনি তোমাদের যা কিছু বলেন, তোমরা তা-ই কর।' [৬] ইহুদীদের প্রথা অনুসারে শুচীকরণের জন্য সেখানে পাথরের ছ'টা জালা রাখা ছিল, প্রত্যেকটিতে দু' তিন মণ জল ধরত। [৭] যিশু চাকরদের বললেন, 'জালাগুলো জলে ভর্তি কর।' তারা সেগুলোকে কানায় কানায় ভর্তি করে দিল। [৮] পরে তিনি তাদের বললেন, 'এখন তোমরা কিছুটা তুলে ভোজকর্তার কাছে নিয়ে যাও।' তারা তাই করল। [৯] কিন্তু যখন ভোজকর্তা আঙুররস হওয়া সেই জল আস্বাদ করল—সে তো জানত না, তা কোথা থেকে এসেছে, কিন্তু যে চাকরেরা জল তুলেছিল তারাই জানত—তখন বরকে ডেকে [১০] বলল, 'সবাই প্রথমে ভাল আঙুররস পরিবেশন করে, আর অতিথিরা বেশ কিছু খাওয়ার পরে কম ভালটা দেয়; আপনি কিন্তু ভাল আঙুররস এখন পর্যন্তই রেখেছেন।'

[১১] এ হল যিশুর চিহ্নকর্মগুলির প্রথম চিহ্নকর্ম: তা তিনি গালিলেয়ার কানা গ্রামে সাধন করলেন: এতে নিজের গৌরব প্রকাশ করলেন, ও তাঁর শিষ্যেরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলেন। [১২] তারপর তিনি, তাঁর মা, তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর শিষ্যেরা কাফার্নাউমে নেমে গেলেন; কিন্তু সেখানে শুধু কিছু দিন থাকলেন।

কানা গ্রামে তাঁর সাধিত প্রথম চিহ্নকর্মে যিশু নিজের গৌরব প্রকাশ করলেন (২:১১)। যোহনের এই মন্তব্যের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রথম অধ্যায়ে (১:৫০-৫১) পূর্বঘোষিত মশীহ-যিশুর আত্মপ্রকাশ এইখানে বাস্তব রূপ লাভ করে এবং এই চিহ্নকর্মের মাধ্যমে শিষ্যদের অপূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু, এই অলৌকিক কাজ হল চিহ্নকর্মেরই মধ্য দিয়ে যিশুর আত্মপ্রকাশের সূচনা (১২:৩৭; ২০:৩০); অর্থাৎ, সুসমাচারের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতেও যিশু এই পদ্ধতি-বিশেষ অনুসারে আত্মপ্রকাশ করেন। সুতরাং কানা গ্রামে সাধিত চিহ্নকর্ম শুধু প্রথম নয় বরং সকল চিহ্নকর্মের নমুনা স্বরূপ।

সাহিত্যিক দিক দিয়ে চিহ্নকর্মের বর্ণনা খুবই সাধারণ; কিন্তু এই সাধারণ বর্ণনা অতিক্রম করলে তবেই চিহ্নকর্মের গভীর তাৎপর্য ধরা যায়: যিশুর গৌরব-প্রকাশে

শিষ্যদের বিশ্বাস বৃদ্ধিলাভ করেছে। যেহেতু যিশু এই চিহ্নকর্মের কোন ব্যাখ্যা করলেন না সেজন্য রচয়িতার পক্ষে যা যা লক্ষণীয়, সেই সমস্ত ইঙ্গিতের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার।

ভূমিকাস্বরূপ বলা হয় যে, নাজারেথের আনুমানিক এগারো কিলোমিটার দূরস্থ কানা গ্রামে বিবাহ-উৎসব হচ্ছিল। যিশুর সময়ে সাধারণত বিবাহ-উৎসব এক সপ্তাহব্যাপী চলত। যিশুর সঙ্গে তাঁর মা এবং শিষ্যেরাও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

২:১০—সবাই প্রথমে ভাল আঙুররস পরিবেশন করে: ঠিক এই ভোজে যিশু জলকে আঙুররস করে প্রথম চিহ্নকর্ম সাধন করলেন। কিন্তু, কিভাবে চিহ্নকর্মটা সাধিত হল এবিষয়ে যোহনের লেখায় একটামাত্র কথা নেই। বরং যোহন কেমন যেন ইচ্ছা করেই ভোজকর্তার মন্তব্যের পর পরেই বর্ণনা আকস্মিকভাবে বন্ধ করেন। এসম্বন্ধে একথা বলা চলে যে, যোহনের উদ্দেশ্যই যাতে আমরা উল্লিখিত বাক্যেই যিশুর চিহ্নকর্মের তাৎপর্যের সন্ধান পাই: ভাল ও অপর্যাপ্ত পরিমাণ আঙুররস হল মশীহ-যিশুর মঙ্গলদান। চিহ্নকর্মের এই অর্থপূর্ণ খ্রিষ্টসম্বন্ধীয় তাৎপর্য সঠিকভাবে অনুভব করতে হলে পুরাতন নিয়ম অনুসারে আঙুররসের প্রতীকমূলক ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা দান করা বাঞ্ছনীয়। নবী ইশাইয়ার পুস্তকে (ইশা ৫৪:৪-৮; ৬২:৪-৫) বিবাহ-উৎসব ও বিবাহভোজই ছিল ভাবী মশীহের আনা চরম মুক্তির প্রতীক; অন্যান্য নবীদের লেখায় মশীহের দেওয়া বিশিষ্ট দানগুলির মধ্যে ভাল ও অপর্যাপ্ত পরিমাণ আঙুররস অন্যতম ছিল।

> পর্বত বেয়ে নতুন আঙুররস ঝড়ে পড়বে,
> উপপর্বত বেয়ে তা গড়িয়ে পড়বে। [যোয়েল ৪:১৮]

> সেইদিন এমনটি ঘটবে যে,
> পাহাড়পর্বত বেয়ে নতুন আঙুররস ঝরে পড়বে,
> উপপর্বত বেয়ে দুধ প্রবাহিত হবে। [আমোস ৯:১৩]

> তারা এসে সিয়োনের উঁচুস্থানে সানন্দে চিৎকার করবে,

প্রভুর মঙ্গলময়তার জন্য তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—
তারা গম, নতুন আঙুররস, তেল,
মেষ ও পশুপালের উপর উল্লাস করবে;
তারা জলসিক্ত বাগানেরই মত হবে। [যেরে ৩১:১২]

সদৃশ সুসমাচারত্রয়ও নতুন আঙুররসের কথা উল্লেখ করে: নতুন আঙুররস পুরাতন চামড়ার ভিস্তিতে রাখতে নেই (মার্ক ২:২২)। এইভাবে এই প্রধান সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, কানা গ্রামে সাধিত চিহ্নকর্ম পুরাতন নিয়মের পূর্বকথিত চরম ত্রাণকর্তারূপে যিশুর দিকে লক্ষ করে। তাছাড়া আমরা যদি স্মরণ করি যে, ইহুদীদের শুচীকরণের জলই যে সেই ভাল আঙুররসে পরিণত হল, তাহলে চিহ্নকর্মটি অধিক অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে: মশীহ-যিশুর স্থাপিত নব সন্ধিতে প্রাক্তন সন্ধি সিদ্ধিলাভ করে; নব সন্ধিই আসল উত্তম ও চরম মুক্তিদায়ী সন্ধি।

ভোজকর্তার কথায় যোহনের আর একটা উদ্দেশ্য সূচিত আছে: যিশুর আঙুররস যে কোথা থেকে আসে ভোজকর্তা তা জানে না। এই 'কোথা থেকে' কথাটা যোহনের সুসমাচারের গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা। যিশু কোথা থেকে আসেন? এবং তাঁর দানগুলিও কোথা থেকে আসে? মানুষ জানে না এই দানগুলি কোথা থেকে আসে, কেননা সেগুলি ঈশ্বর থেকেই আসে। নিকোদেমও জানতে পারেননি 'আত্মা' কোথা থেকে আসেন (৩:৮) এবং সামারীয় নারীও জানত না যিশু কোথা থেকে জীবনের জল পাবেন (৪:১১)। আরও, ইহুদীরা বারবার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত কোথা থেকেই বা যিশু আসেন (৭:২৭; ৯:২৯)। পিলাতও যিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথাকার মানুষ? (১৯:৯), কিন্তু যিশু কোন উত্তর দিলেন না, কারণ জগতের পক্ষবাদীরা অর্থাৎ অবিশ্বাসী যারা তারা তাঁর কথা অনুভব করতে অক্ষম। 'আমি পিতার কাছ থেকে এসেছি' (১৬:২৮), বিশ্বাসী যারা এটিই তাদের কাছে যিশুর আত্মপ্রকাশ এবং যোহনের সুসমাচারের মর্মোপলব্ধি লাভের জন্য উপযুক্ত চাবিকাঠি। যিশু ও তাঁর দানগুলি ঊর্ধ্বলোক থেকেই আগত। অবশেষে একথাও স্মরণযোগ্য যে, যোহনের ধারণায় যিশু হলেন সত্যকার আঙুরলতা (১৫:১)।

আঙুররস-প্রসঙ্গটা ছাড়া যিশুর একটি বাক্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশেষত লক্ষণীয়: 'আমার ক্ষণ এখনও আসেনি'। যিশুর ত্রাণকর্মের সর্বোত্তম ক্ষণ হল ক্রুশ-পুনরুত্থানের ক্ষণ। যে ক্ষণে তিনি ক্রুশের উপর উত্তোলিত হন, সেই ক্ষণেই তাঁর ত্রাণকর্মের সিদ্ধিলাভ ঘটে এবং তাঁর গৌরবের প্রকৃত স্বরূপ পূর্ণ প্রকাশ পায়। যিশুর উল্লিখিত বাক্যের মধ্য দিয়ে যোহন দেখাতে চান যে, জীবনকালে যিশু সর্বদাই সেই ক্রুশ-ক্ষণের দিকে লক্ষ করতেন, এমনকি তাঁর সাধিত চিহ্নকর্মগুলি সেই ক্রুশ-ক্ষণের মহাকর্মেই পূর্ণতা লাভ করল। সুতরাং, কানা গ্রামে সাধিত চিহ্নকর্মের মধ্য দিয়ে যিশু যে তাঁর দয়া প্রকাশ করলেন, অর্থাৎ তিনি যে বিবাহভোজের বড় অসুবিধা সমাধান করতে সঙ্কল্পবদ্ধ হলেন তা শুধু নয়, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর নিজের 'মশীহ' (খ্রিষ্ট) ভূমিকার একটা চিহ্ন দেখাতে চাইলেন, যে মশীহ ভূমিকা কেবল ক্রুশ-ক্ষণেই পূর্ণ মাত্রা লাভ করবে।

তবুও যিশু আর একটা বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকারী: তিনি ঐশপ্রকাশকর্তা। একথা-ই রচয়িতা এই মন্তব্যে প্রকট করেন, 'এতে তিনি নিজের গৌরব প্রকাশ করলেন' (২:১১)। কেবল কথায় নয়, কাজেই যিশু নিজের গৌরব প্রকাশ করলেন, তাঁর সাধিত চিহ্নকর্ম ঐতিহাসিক একটা ঘটনা। যেমন ইতিহাস বাস্তব, তেমনি চিহ্নকর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তাঁর গৌরবও বাস্তব। এই ঐতিহাসিক চিহ্নকর্মের মধ্য দিয়েই যিশু শিষ্যদের গভীরতম বিশ্বাসে আনেন, এর অর্থ এই যে, সর্বযুগের মানুষ যিশুর সামনে এসে উপস্থিত হয়ে, হয় বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করবে অর্থাৎ যিশুকে ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করবে, না হয় তাঁকে অস্বীকার করবে। যেমন যিশুর উপদেশ আজও আমাদের কাছে বোধগম্য, ঠিক তেমনি সেইকালে সাধিত চিহ্নকর্মগুলি আমাদের পক্ষে আজও বিশ্বাসযোগ্য; এ হল যোহনের দৃঢ় ধারণা এবং এজন্যই তিনি সুসমাচার লিখেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারি যে, চিহ্নকর্ম হল স্বর্গনিবাসী পিতার সঙ্গে একতাবদ্ধ অথচ ইহলোকেও বিরাজমান মানবপুত্র (১:১৫) সেই 'মাংসে আগত' বাণীর (১:৪) গৌরবের অভিব্যক্তি, যে-অভিব্যক্তি বিশ্বাসেরই মাধ্যমে লাভ করে আমরা ঈশ্বরপুত্র সেই মশীহ (২০:৩১) যিশুর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারি (২:১১)।

যিশুর ঐশপ্রকাশকারী ও মশীহ-সংক্রান্ত ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা হল, তথাপি এই চিহ্নকর্মের পূর্ণ সংজ্ঞা লাভের জন্য সুসমাচারের আর একটা কথা বিবেচনাধীন। কথাটা হল 'যিশুর গৌরব'। যোহনের ধারণা অনুযায়ী গৌরবের অর্থ কি? গৌরব হল যিশুর নিজের পরিত্রাণদায়ী ঐশস্বরূপ। পুরাতন নিয়ম অনুসারে গৌরব ছিল সৃষ্টিকর্মে ও ইতিহাস-পরিচালনায় ঈশ্বরের অতুলনীয় গুরুত্ব বা প্রভাব এবং তাঁর জ্যোতির্ময় গরিমার প্রকাশ। বিশ্বাসের চোখে খ্রিষ্টভক্তগণ এই জীবনকালেও যিশুতে ঈশ্বরের প্রভাব ও জ্যোতির্ময় গরিমা অর্থাৎ যিশুর প্রকৃত ঐশসত্তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। অবশ্যই এই দিব্য দর্শন তখনই পরিপূর্ণ হবে যখন স্বর্গধামে গিয়ে আমাদের প্রভু যিশুর সঙ্গে একাত্ম হব।

২:১১খ—তাঁর শিষ্যেরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলেন: শিষ্যেরা যে শুধু যিশুর কথায় মুগ্ধ হলেন বা তাঁর কথাসকল শ্রদ্ধা করলেন তা নয়; প্রকৃতপক্ষে তাঁরা যিশুর প্রতিই বিশ্বাস রাখলেন। এর মানে হল, যিশুর প্রতি বিশ্বাস রেখে আমরা কেবল একটা ঐশসত্য শ্রদ্ধা করি এমন নয়, বরং একজন ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে বিশ্বাস-সম্পর্ক স্থাপন করি। প্রকৃত শিষ্য গুরুর উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এবং তাঁর দ্বারা নিজেকে পরিচালিত হতে দেয়। এবিষয়ে পূর্ণ সচেতনতা লাভের জন্য 'বিশ্বাস' বাংলা শব্দের ব্যাখ্যা নিতান্ত উপযোগী: বিশ্বাসের ধাতু হল শ্বস, ফলে আমরা যিশুতে বিশ্বাস রাখা বলতে বুঝি যিশুতে নিঃশ্বাস নেওয়া; যিশু আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস, তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ। এ সকল কথা বলার পর, উপসংহারস্বরূপ বলতে পারি যে, সে-ই খ্রিষ্টবিশ্বাসী যে চিহ্নকর্মগুলিতে যিশুর রহস্য অর্থাৎ পিতা থেকে তাঁর উদ্ভব, পিতার প্রতি তাঁর বাধ্যতা এবং ক্রুশ-ক্ষণের দিকে তাঁর যাত্রা অনুভব করতে পারে।

যোহনের বর্ণনার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পর, আর একটা দৃশ্যের দিকে, অর্থাৎ যিশু ও তাঁর মায়ের মধ্যকার সংলাপের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার।

২:৪—নারী, তুমি আমার কাছে কী চাও? যিশু তাঁর নিজের মাকে 'মা' বলে নয়, 'নারী' বলে সম্বোধন করেন, এবং পুনরায় তাঁকে 'নারী' বলে ডাকবেন ক্রুশের উপর থেকে (১৯:২৬)। যিশুর জীবনে এই ক্ষণ দু'টো গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ক্ষণে (২:১-১১) যিশু

আত্মপ্রকাশকর্ম শুরু করে নিজের ঐশগৌরব প্রকাশ করেন এবং শিষ্যদের বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন। দ্বিতীয় ক্ষণে (১৯:২৫) ক্রুশবিদ্ধ যিশু সম্পূর্ণরূপে গৌরবান্বিত, এবং তাঁর ত্রাণকর্ম সিদ্ধি লাভ করে। উভয় ক্ষণে তাঁর নিজের ক্রিয়াশীল উপস্থিতির মাধ্যমে মা মারীয়া খ্রিষ্টমণ্ডলীর অর্থাৎ যিশুর প্রকৃত দাসী ও শিষ্যের আদর্শস্বরূপ হয়ে ওঠেন। উপরন্তু, 'নারী' সম্বোধনে স্পষ্ট হয় যে, ত্রাণকর্ম সাধনে যিশু নিজের আত্মীয়স্বজনদের যথার্থই বিসর্জন দিয়েছিলেন; তাঁর আত্মীয়স্বজন হয়ে উঠেছিল তারাই যারা তাঁর মত ঈশ্বরের ইচ্ছার আকাঙ্ক্ষী। কানা গ্রামে মা মারীয়া অনুভব করলেন যে এমন সময় এসে উপস্থিত হয়েছে যখন নিজের মাতৃত্ব বা মাতৃ-অধিকার বিসর্জন দিয়ে যিশুকে নিজের প্রভু ও গুরু বলেই গ্রহণ করা দরকার: দ্বিধা না করে দাসী ও শিষ্যা ভূমিকা গ্রহণ করে প্রকৃত দাসী ও শিষ্যা হিসাবে তাঁর যে একমাত্র কর্তব্য সেই কর্তব্য পালন করলেন, তথা: চাকরদের সামনে প্রভু ও গুরুর প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস এই বলে প্রকাশ করলেন, 'উনি তোমাদের যা কিছু বলেন, তোমরা তা-ই কর।' মণ্ডলীর আদর্শ মা মারীয়ার মত আমরাও মানুষকে প্রভু ও সদ্‌গুরু যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখতে অনুপ্রেরণা দান করতে আহূত।

উপরন্তু মারীয়া সেই সকলেরই প্রতীক হয়ে দাঁড়ান যারা ভরসাভরে যিশু থেকে পরিত্রাণ প্রত্যাশা করে। প্রকৃতপক্ষে সেই উৎকৃষ্ট আঙুররস হল মশীহের সাধিত পরিত্রাণের একটা প্রতীক বা আভাস মাত্র, যে পরিত্রাণ চিরন্তন সিদ্ধি লাভ করবে মশীহ যিশুর 'ক্ষণে' (১৯:২৪গ-২৭ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

২:১২—তারপর তিনি··· কাফার্নাউমে **নেমে গেলেন:** শিষ্যেরা যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখায় চিহ্নকর্মের উদ্দেশ্য পূর্ণ হল। যারা যিশুর পরাক্রম-কর্ম দেখল, তাদের উৎসাহ যাতে বৃদ্ধি না পায় এজন্য যিশু সঙ্গে সঙ্গে কানা গ্রাম ছেড়ে চলে যান। যিশু জনতার উত্তেজনার আকাঙ্ক্ষী নন, তিনি সর্বদা পিতার ইচ্ছা অনুসারে ঐশপ্রকাশ বহন করতে প্রবৃত্ত। উপসংহারস্বরূপ এই চিহ্নকর্মের প্রতীকমূলক ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করা হোক: ইহুদী ঐতিহ্য অনুসারে মশীহ-কাল বিবাহ-উৎসবের কাল হওয়ার কথা। শিষ্যদের (অর্থাৎ মশীহ-কালের নব সমাজ) নিজেকে অনুসরণ করতে আহ্বান করার পর

(১:৩৫-৫১) যিশু এই নব-সমাজরূপে মণ্ডলীর সঙ্গে নিজের বিবাহ-উৎসব উদ্‌যাপন করলেন।

পরিশিষ্ট

যোহনের সুসমাচারে চিহ্নকর্ম

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ পদেই প্রথম বার আমরা ‘চিহ্নকর্ম’ শব্দের সম্মুখীন হলাম। যেহেতু শব্দটি যোহনের ঐশতাত্ত্বিক ধারণায় গভীর অর্থবহ শব্দ, সেজন্য সেই সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করা বাঞ্ছনীয়।

‘চিহ্নকর্ম’ শব্দের ত্রিবিধ অর্থ: এই শব্দ চতুর্থ সুসমাচারে সতের বার উল্লিখিত। এর সরলার্থ ২০ অধ্যায়ের ৩০ ও ৩১ পদে স্পষ্টভাবে নিরূপিত: ‘যিশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও বহু চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন এই পুস্তকে যেগুলোর উল্লেখ নেই। তবে এগুলো লেখা হয়েছে যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে, যিশুই খ্রিষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, এবং বিশ্বাস করে যেন তোমরা তাঁর নামে জীবন পেতে পার।’ এতে আমরা বুঝি যে ‘চিহ্নকর্ম’ হল শিষ্যদের সাক্ষাতে সাধিত একটা আশ্চর্য কাজ যার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল যাতে শিষ্যেরা ঈশ্বরপুত্র ও মশীহ সেই যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারেন। এখানে ‘শিষ্যদের সাক্ষাতে’ বলতে সেই বারোজন প্রেরিতদূতই মাত্র নয়, কিন্তু ‘জনগণ’ বোঝায় এবং এর মাধ্যমে একথাও ইঙ্গিত করা হয় যে, চিহ্নকর্মের উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হয় যখন শিষ্যেরা বিশ্বাসের চোখে সেগুলি দেখে যিশুর গৌরবই দেখেন। তিন প্রকার চিহ্নকর্ম আছে, তথা:

১। **মহাচিহ্নকর্ম:** যে যে চিহ্নকর্ম বিস্তারিতভাবে বর্ণিত সেগুলিই যোহনের মতে প্রধান, সুতরাং সেগুলিকে মহাচিহ্নকর্ম বলা হয়। এগুলি সংখ্যায় ছয়টা: আঙুররসে পরিণত জল (২:১১), রাজকর্মচারীর ছেলেকে আরোগ্যদান (৪:৪৩-৫৪), বেথসাথা জলকুণ্ডে রোগীর আরোগ্যলাভ (৫:১-১৮), পাঁচ হাজার মানুষকে অলৌকিক আহার্যদান

(৬ অধ্যায়), জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান (৯:১-৪১) এবং লাজারকে পুনর্জীবনদান (১১ অধ্যায়)।

২। সাধারণ চিহ্নকর্ম : এগুলি বিস্তারিতভাবে বিবৃত নয় (২:২৩; ৩:২; ৬:২, ১৪, ২৬; ৭:৩১; ৯:১৬; ১০:৪১; ১১:৪৭; ১২:৩৭)। এগুলিও জনগণের বিশ্বাস জাগাবার জন্য যিশু দ্বারা সাধিত হয়েছিল; কিন্তু জনগণ সবসময় এগুলির অর্থ উপলব্ধি করতে পারল না।

৩। দাবি করা চিহ্নকর্ম : দুই বার করে (২:১৮; ৬:৩০) অবিশ্বাসী মানুষ যিশুর কাছে চিহ্নকর্ম অর্থাৎ বিস্ময়কর কাজ দেখতে দাবি করল, কিন্তু তাদের বিশ্বাসের অভাবে যিশু আত্মপ্রকাশ করলেন না।

এই বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার চিহ্নকর্মের সঙ্গে তৃতীয় প্রকার চিহ্নকর্মের কোন মিল নেই, তৃতীয় প্রকার চিহ্নকর্ম অর্থহীন আশ্চর্য কাজের পর্যায়েই মাত্র দাঁড়ায়। অপর দিকে যোহনের ধারণায় সাধারণ ও মহাচিহ্নকর্ম সম্পূর্ণরূপে যিশুরই পরিকল্পিত, তাঁর ঐশপ্রকাশকর্তা ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমেই বোধগম্য।

‘চিহ্নকর্ম’ ও ‘কাজ’ : যোহন যিশুর অলৌকিক কাজ ‘চিহ্নকর্ম’ ও ‘কাজ’ বলে বর্ণনা করেন। যোহনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শব্দ দু’টোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, ‘চিহ্নকর্ম’ শব্দটি ২০:৩০-এ ছাড়া প্রথম থেকে ১২ অধ্যায় পর্যন্তই মাত্র এবং ‘কাজ’ শব্দটি ৫ অধ্যায় থেকে ১৫ অধ্যায় পর্যন্ত উল্লিখিত। যোহনের ভাষায় ‘কাজগুলোর’ ভূমিকা হল সাক্ষ্যদানই ভূমিকা। ‘কাজগুলো’ সাক্ষ্যদান করে যে, যিশু ঈশ্বরের প্রেরিতজন, এবং প্রমাণস্বরূপ দেখায় যে, পিতা যিশুতে বিরাজমান (৫:৩৬; ৯:৪ ইত্যাদি)। যিশু ‘পিতার নামে’ কাজ করেন, অর্থাৎ, যেমন স্বয়ং যিশু বলেছিলেন, ‘যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন’ (১৪:১০)। সুতরাং, ‘কাজগুলোর’ উদ্দেশ্যই যাতে আমরা বিশ্বাস করি যে, যিশু পিতার সেই প্রেরিতজন।

‘চিহ্নকর্ম’ও অলৌকিক কাজ, তথাপি এগুলোর ভূমিকা হল যিশু-রহস্যের গভীরতম অর্থ বিশ্বাসের চোখে উন্মোচন করা। চিহ্নকর্মগুলো যিশুকে পিতার প্রেরিতজনই বলে প্রকৃতপক্ষে সাক্ষ্যদান করে না, বরং বিশ্বাসীদের কাছে মাংসে আগত ঐশবাণী সেই পৃথিবীস্থ যিশুর গৌরবকেই প্রকাশ করতে চায়। একথা বলা যেতে পারে যে, ‘কাজগুলো’ মশীহেরই ভূমিকামণ্ডিত যিশুর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে, এবং ‘চিহ্নকর্মগুলো’ মাংসে আগত যিশু-রহস্যের বিবিধ দিক ব্যাখ্যা করে। বাস্তবিকই, আগে লক্ষ করেছিলাম যে, চিহ্নকর্মগুলোর বর্ণনা ১২ অধ্যায়ে শেষ হয়, অপর দিকে কাজগুলো যিশুর মহাকর্মে অর্থাৎ ক্রুশে তাঁর মৃত্যুতে সিদ্ধিলাভ করে। উপরন্তু, যিশু শিষ্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, তাঁরাও তাঁর মত কতগুলো ‘কাজ’ সাধন করতে পারবেন, কিন্তু একথা কখনও বলেননি যে তাঁরা তাঁর মত চিহ্নকর্মও সাধন করতে পারবেন। এর কারণ, চিহ্নকর্মগুলো মাংসে আগত সেই ঐশপ্রকাশকারী পৃথিবীস্থ বাণীর সঙ্গেই মাত্র সম্পর্কিত।

চিহ্নকর্মের ঐশতাত্ত্বিক গুরুত্ব: কানা গ্রামে সাধিত চিহ্নকর্মের বিষয়ে যোহনের মন্তব্য থেকে (২:১১) আমরা অনুমান করি যে, একটি অলৌকিক কাজ তখনই চিহ্নকর্ম হয়ে ওঠে যখন সেটির মাধ্যমে যিশু নিজের গৌরব প্রকাশ করেন। চিহ্নকর্মের এই সংজ্ঞা প্রমাণিত হয় লাজারকে পুনর্জীবনদান বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত উক্তি দু’টোর মাধ্যমে: ‘এই অসুস্থতা মৃত্যুর উদ্দেশে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরবার্থে, তা দ্বারা যেন ঈশ্বরপুত্র গৌরবান্বিত হন’ (১১:৪), এবং ‘আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি বিশ্বাস করলে তবে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পাবে?’ (১১:৪০)। বিশ্বাসের সঙ্গে আমরা যিশুর কাজে ঈশ্বরের ও স্বয়ং যিশুর গৌরব প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। সকল চিহ্নকর্ম যিশুকে প্রকাশ করে।

তবু এবিষয়ে লক্ষ রাখতে হয় যাতে চিহ্নকর্মকে প্রতীক বলে মনে না করি। যেমন আগেকার পরিশিষ্টে বলেছি, প্রতীকের মধ্য দিয়ে আমরা একটা আত্মিক বাস্তবতা বোধগম্য বর্ণনায় ব্যক্ত করি, কিন্তু চিহ্নকর্ম একটা বর্ণনা নয়, প্রকৃতপক্ষে আত্মিক একটা বাস্তবতাকেই দৃশ্যমান করে তোলে। বিশ্বাস দ্বারা আমরা চিহ্নকর্মের মধ্য দিয়ে এর মধ্যেও সেই বাস্তবতা পূর্বপ্রত্যক্ষ করি যে-বাস্তবতা চরম পরিত্রাণকালের পূর্ণতায় অর্থাৎ শরীরের পুনরুত্থানকালে সম্পূর্ণরূপে ও খোলাখুলিভাবে প্রত্যক্ষ করব।

যিশু ঈশ্বরের উপস্থিতি ও গৌরব শুধু প্রকাশ করেন না, তিনি নিজেই ঈশ্বরের দেওয়া প্রকৃত চিহ্নস্বরূপ; অর্থাৎ, আমরা যিশুতে ঈশ্বরের পরিত্রাণ-সিদ্ধি কেবল নয়, স্বয়ং পিতাকেও প্রত্যক্ষ করি; সুতরাং, চিহ্নকর্মগুলো একথা ঘোষণা করে যে, পৃথিবীস্থ যিশু পিতার সঙ্গে সংযুক্ত এবং পিতাকে প্রকাশ করেন। সেগুলির উদ্দেশ্যই আমাদের বিশ্বাস-জাগরণ, যেন আমরা বিশ্বাস করি যে যিশুই ঈশ্বরপুত্র, মশীহ ও বিশ্বত্রাতা। চিহ্নকর্মগুলো যে পৃথিবীস্থ যিশুর কাজেই মাত্র সম্পর্কযুক্ত একথা এই সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, মাংসে আগত যিশুর আত্মপ্রকাশ ও ত্রাণকর্ম পুনর্ঘটমান হতে পারবে না এবং চরমকালেই সিদ্ধিলাভ করবে, এজন্যই ভাবী বাণীপ্রচারকবৃন্দ মাংসে আগত যিশুকে স্বচক্ষে না দেখলেও তবুও চিহ্নকর্মের মধ্য দিয়ে যিশুর সাধিত আত্মপ্রকাশ প্রচার করতে ও সেই বিষয়ে সাক্ষ্যদান করতে, এমনকি তা বর্তমান বা বাস্তব করে তুলতে পারবে। যিশু এখন 'স্বর্গে' গৌরবান্বিত এবং এখনও বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করতে নিরত, কিন্তু তাঁর ঐশপ্রকাশকর্ম ঐতিহাসিক দিক দিয়ে শেষ হয়েছে, তাঁর মৃত্যুকালেই সিদ্ধিলাভ করেছে। বর্তমানকালে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায়ই আমরা সেই সময়ের পূর্ণরূপে প্রকাশিত যিশুর কথাসকল ধ্যান ও বাস্তবায়িত করব।

যোহন অনুসারে মাংসে ঐশবাণীর আগমন ও চিহ্নকর্মের মধ্যে গভীর একটা সম্বন্ধ রয়েছে: যেমন যিশু এই জগতে একবার মাংসে আগমন করে পুনরায় এই জগতে মাংসে আগমন না করলেও তবু মাংসে তাঁর সেই আগমন সর্বকালব্যাপী আমাদের বিশ্বাস ও পরিত্রাণের কারণস্বরূপ, তেমনিভাবে চিহ্নকর্মগুলোর ক্ষেত্রেও ঘটে: একবার ঐতিহাসিকভাবে ঘটেছিল, কিন্তু পুনরায় না ঘটলেও তবুও সর্বযুগের বিশ্বাসীদের কাছে সেগুলো বিশ্বাস ও পরিত্রাণের ভিত্তিস্বরূপ হয়ে থাকবে।

* * *

প্রথম পাস্কাপর্ব (২:১৩-২২)

যোহনের কাছে ইহুদীদের ধর্মীয় পর্বগুলি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। এর মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চান যে খ্রিষ্টমণ্ডলীর পক্ষে সেই পর্বগুলো পৃথক একটা তাৎপর্য অর্জন করেছে: ইহুদীরা সেই পর্বগুলো উদ্‌যাপন করায় পুরাতন নিয়মকালে ঈশ্বরের সাধিত বিস্ময়কর ও ত্রাণদায়ী কাজ স্মরণ করত; কিন্তু এখন, যিশুর আগমনের পর, সেই সকল পর্বে নিহিত তাৎপর্য যিশুতেই সিদ্ধিলাভ করেছে। পুরাতন নিয়মের বিস্ময়কর ও ত্রাণদায়ী কাজগুলো যিশুকেই লক্ষ করত, এখন যিশু উপস্থিত বিধায় সেই পর্বগুলো খ্রিষ্টসম্বন্ধীয় পর্ব হয়ে ওঠে।

২ [১৩] ইহুদীদের পাস্কা সন্নিকট ছিল, তাই যিশু যেরুশালেমে গেলেন।
[১৪] মন্দিরের মধ্যে তিনি দেখলেন, লোকে বলদ, মেষ ও পায়রা বিক্রি করছে,
পোদ্দারেরাও সেখানে বসে আছে। [১৫] দড়ি দিয়ে একগাছা চাবুক বানিয়ে তিনি
তাদের সকলকে মন্দির থেকে বের করে দিলেন: বলদ ও মেষ তাড়ালেন,
পোদ্দারদের টাকা-কড়ি ছড়িয়ে তাদের টেবিল উল্টিয়ে দিলেন, [১৬] এবং যারা
পায়রা বিক্রি করছিল তাদের বললেন, 'এখান থেকে ওই সমস্ত সরিয়ে নিয়ে যাও;
আমার পিতার গৃহকে একটা ব্যবসার ঘর করো না।' [১৭] তাঁর শিষ্যদের শাস্ত্রের
এই বচন মনে পড়ল, 'তোমার গৃহের প্রতি আগ্রহের আগুন আমাকে গ্রাস
করবে।' [১৮] ইহুদীরা তখন তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এই যা আপনি করছেন,
তার জন্য আমাদের কী চিহ্ন দেখাতে পারেন?' [১৯] যিশু এই বলে তাঁদের উত্তর
দিলেন, 'এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেলুন, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন
করব।' [২০] তখন ইহুদীরা বলে উঠলেন, 'এই পবিত্রধাম নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ
বছর লেগেছিল, আর আপনি নাকি তিন দিনের মধ্যে তা উত্তোলন
করবেন?' [২১] তিনি কিন্তু তাঁর নিজের দেহ-পবিত্রধামের কথাই বলছিলেন।
[২২] তাই যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, তখন তাঁর
শিষ্যদের মনে পড়ল যে, তিনি এই কথা বলেছিলেন; এবং তাঁরা শাস্ত্রে ও যিশু যা
বলেছিলেন, সেই কথায় বিশ্বাস করলেন।

এই উদ্ধৃতাংশে বিবৃত যেরুশালেমের ঘটনা কানা গ্রামে সাধিত চিহ্নকর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কেননা যেরুশালেমেও যিশু মশীহরূপে আত্মপ্রকাশ বহন করে চলেন, নিজের আগমনে চরম পরিত্রাণকাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং আর একটা নবীনতা আনেন, তথা: যেরুশালেমের মন্দির এবং যজ্ঞের বলিগুলো অর্থশূন্য হয়ে গেছে। তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত পবিত্রধাম, তিনিই উপযুক্ত পাস্কাপর্বের বলি। তবুও লক্ষ করার বিষয় কানা গ্রামের সঙ্গে যেরুশালেমের এই পার্থক্য: কানা গ্রামে শিষ্যেরা চিহ্নকর্ম দেখে বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু যেরুশালেমে যিশু ইহুদীদের অবিশ্বাসের সম্মুখীন হলেন।

২:১৩ক—ইহুদীদের পাস্কা সন্নিকট ছিল: যোহনের এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর আলোতে পরবর্তী ঘটনার মর্মকথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পাস্কাপর্ব ইহুদীদের কাছে প্রধান পর্ব ছিল: মিশরদেশ থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের পক্ষে যে সকল চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন, সেগুলি স্মরণ করাই পাস্কাপর্বের উদ্দেশ্য। যেরুশালেম-মন্দিরে সমবেত হয়ে ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের কাছে বলি উৎসর্গ করে পর্বটি পালন করত।

২:১৩খ—যিশু যেরুশালেমে গেলেন: যেরুশালেমে গিয়ে পৌঁছে যিশু সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং বিক্রেতাদের ও পোদ্দারদের মন্দির থেকে বের করে দিলেন, তাতে পুরাতন নিয়মকালে ঘোষিত মশীহ বলে আত্মপরিচয় দিলেন। যথার্থই, নবীগণ মন্দির বিষয়ে ইহুদীদের সঙ্গে বিতর্ক করেছিলেন এবং ভাববাণী দিয়েছিলেন যে, মশীহ এসে মন্দির শুদ্ধ করবেন। ঈশ্বরপ্রেরিত দূতরূপে যিশু বিষয়ক নবী মালাখির এই বাণী এসম্বন্ধে আলোকপাত করে:

> দেখ! আমি আমার দূত প্রেরণ করব,
> তিনি আমার সম্মুখে পথ প্রস্তুত করবেন।
> তখন সেই যে প্রভুকে তোমরা অন্বেষণ করছ,
> তিনি হঠাৎ আপন মন্দিরে আসবেন;
> সেই যে সন্ধির দূতকে তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছ,

দেখ! তিনি আসছেন—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।
তিনি ধাতুশোধকের আগুনের মত, রজকের ক্ষারের মত।
তিনি নিখাদ করতে ও শোধন করতে আসন নেবেন:
তিনি লেবি-সন্তানদের পরিশুদ্ধ করবেন। [মালাখি ৩:১-৩]

২:১৬—আমার পিতার গৃহকে একটা ব্যবসার ঘর করো না: নিঃসন্দেহেই এখানে যিশু ঈশ্বরপুত্র হওয়ার পূর্ণ সচেতনতায় ও অধিকারে কথা বললেন। একাধারে কিন্তু, যেহেতু তিনি একজন নবীর বাণীর উল্লেখ করলেন, সেজন্য তাঁর মশীহ-ভূমিকা অধিক স্পষ্টতর হয়ে ওঠে: নবী জাখারিয়ার ভাববাণী অনুসারে মশীহের আগমনে মন্দির সকল জাতির জন্য উন্মুক্ত হবে এবং বলিদানের জন্য ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন হবে না:

সেইদিন সেনাবাহিনীর প্রভুর মন্দিরে
কোন ব্যবসায়ী আর থাকবে না। [জাখা ১৪:২১]

নবী জাখারিয়ার উল্লিখিত বাণী অধিক প্রকটতর হয় যখন যিশুর আচরণের আলোতেই তা পড়ি: যিশু শুধু বিক্রেতাদের ও পোদ্দারদের নয়, সমস্ত জন্তুও মন্দির থেকে বের করে দিলেন, যে-জন্তুগুলো পাস্কাপর্বের যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে বলিরূপে বিক্রি করা হত। প্রকৃতপক্ষে যিশু ঘোষণা করতে চান যে, মশীহ-কাল এসে গেছে, যজ্ঞ-বলিদানের আর কোন প্রয়োজন নেই। তিনিই প্রকৃত পাস্কাপর্বের বলি বিধায় অন্যান্য জন্তু বলিদান করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। বাস্তবিকই, ঈশ্বরের মেষশাবক যিশু সেই ক্ষণেই উৎসর্গীকৃত হলেন যে-ক্ষণে পাস্কাপর্বের জন্তুগুলো বলি দেওয়া হচ্ছিল।

২:১৭—তাঁর শিষ্যদের শাস্ত্রের এই বচন মনে পড়ল: শিষ্যদের যে কী মনে পড়ল তা ২২ পদে ব্যাখ্যা করা হবে। এখানে আমরা শুধু যিশুর উচ্চারিত শাস্ত্রবাণীর উপর কিছু আলোকপাত করব: ‘তোমার গৃহের প্রতি আগ্রহের আগুন আমাকে গ্রাস করবে।’ আদিখ্রিষ্টমণ্ডলী এই বাক্যের উপর মশীহসূচক অর্থ আরোপ করেছিল: সেই আগ্রহের আগুনের কারণে যিশু অবিশ্বাসীদের দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন, এমনকি সেই অপমান

পূর্ণ হয়েছিল তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর সময়। বাক্যটি ৬৯ নং সামসঙ্গীতে অন্তর্ভুক্ত ঠিকই, কিন্তু সামসঙ্গীত প্রকৃতপক্ষে বলে: 'তোমার গৃহের প্রতি আগ্রহের আগুন আমাকে গ্রাস করে'; অর্থাৎ কিনা যোহন সামসঙ্গীতের সেই পদ উল্লেখ করে তার ক্রিয়ার বর্তমানকালকে ভবিষ্যৎকালে পরিণত করায় যিশুর অপমানের দিকে নয়, তাঁর মৃত্যুরই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন; বাস্তবিকই যিশু আপন মশীহ-ভূমিকা আগ্রহের সঙ্গে পালন করতে করতে একদিন সেই আগ্রহের আগুন তাঁর মৃত্যুই ঘটাবে।

২:১৮—আমাদের কী চিহ্ন দেখাতে পারেন: লক্ষ করেছি যে, যিশুর কাজ ও কথা দু'টোই মশীহ-ভূমিকাসূচক। যিশুর শাস্ত্রজ্ঞ শ্রোতারা বাক্যটির অন্তর্নিহিত মশীহসূচক তাৎপর্য স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন, সেইজন্য মশীহ বলে তাঁর আত্মপ্রকাশের দিব্য প্রমাণস্বরূপ তাঁর কাছে একটা চিহ্ন দেখার দাবি করলেন। যিশু কিন্তু কোন চিহ্ন দেখালেন না, কারণ অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস জাগাবার জন্য অলৌকিক কাজও অকৃতকার্য! বস্তুত সুসমাচারের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখব যে, যিশু চিহ্নকর্ম সাধন করতেন বিধায় ইহুদীরা তাঁকে অগ্রাহ্য করল (১১:৪৭)।

২:১৯—এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেলুন: যিশুর উত্তর দুরূহ বটে, অথচ এধরনের বাক্যের সম্মুখীন হয়ে শ্রোতারা যিশুর বাণীর গুপ্ত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে আহূত। বার বার যিশু ইহুদীদের সঙ্গে বিতর্ক করতে গিয়ে এ পদ্ধতি পালন করলেন। ইহুদীদের কাছে বাক্যটি মশীহ-কালে যেরুশালেম-মন্দির পুনর্নির্মাণের দিকে নির্দেশ করত; কিন্তু বিশ্বাসের অভাবে যিশুর বাণীর অর্থ তাঁরা ধরতে পারলেন না। তাঁরা যে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না, একথা তাঁদের প্রতিবাদে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়: 'এই পবিত্রধাম নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল, আর আপনি নাকি তিন দিনের মধ্যে তা উত্তোলন করবেন?'

যিশুর বাণী ব্যাখ্যা প্রারম্ভে মন্দির বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হোক। প্রথম, একথা বলতে হয় যে, পুরাতন নিয়মে যেরুশালেম-মন্দিরকে মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের

উপস্থিতির বিশেষ স্থান এবং ইস্রায়েল জাতির গোষ্ঠীসকলের মিলন-কেন্দ্র বলে বিবেচনা করা হত। দ্বিতীয়, যোহনের সময় কুম্রান সম্প্রদায়ের সদস্যরা সমর্থন করত যে, যেরুশালেমস্থ মন্দির অপবিত্রিত হয়েছিল বিধায় এখন অর্থহীন, সুতরাং তারা সেই মন্দির নির্ভরশীল উপাসনার স্থান বলে অস্বীকার করত এবং লেবি-গোষ্ঠীর পৌরোহিত্যও অস্বীকার করত। তাদের ধারণায়, তারা নিজেরাই সম্প্রদায় হিসাবে নব-মন্দির, যতদিন না ঈশ্বর যেরুশালেমস্থ মন্দির পুনরায় পরিশুদ্ধ করবেন। তৃতীয়, আদিখ্রিষ্টমণ্ডলী, বিশেষভাবে প্রেরিতদূত পলের পত্রাবলি, প্রচার করত অপবিত্রীকরণের কারণে নয়, প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং মশীহ উপস্থিত বলেই যেরুশালেমের মন্দির অর্থশূন্য হয়ে গেছে; মশীহই নব সন্ধি প্রতিষ্ঠা করে নিজের মণ্ডলীকে এবং প্রতিটি মণ্ডলীভুক্তকে আত্মিক মন্দিররূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশ্যই যোহন এই সকল ধারণা অবগত ছিলেন, তথাপি তাঁর নিজের লেখায় সেগুলি অধিক সূক্ষ্মভাবে ও নবীন একটা ভঙ্গি অনুসারে উপস্থাপন করলেন, তথা: অপবিত্রীকরণের কারণে শুধু নয় এবং স্বয়ং মশীহ উপস্থিত বলেও শুধু নয়, কিন্তু স্বয়ং যিশুই মন্দির বলেই যেরুশালেমের মন্দির নিরর্থক হয়ে গেছে, এটাই হল যিশুর বাক্যের যথার্থ অর্থ। তাছাড়া একথা নিম্নলিখিত শব্দ দু'টোর মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়: 'তিন দিন' এর অর্থ শাস্ত্রীয় ভাষায় বোঝাত 'অল্প দিনের মধ্যে', কিন্তু আদিখ্রিষ্টমণ্ডলী এতে স্বীকার করত যে, যিশু 'তৃতীয় দিনে' মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন। উপরন্তু, 'পুনরুত্তোলন' শব্দটাও বিশদভাবে যিশুর পুনরুত্থানের দিকে ছুটে চলে, যেহেতু সেইকালের ভাষায় 'পুনরুত্তোলন' ও 'পুনরুত্থান' একই শব্দ ছিল।

২:২১—তিনি কিন্তু তাঁর নিজের দেহ-পবিত্রধামের কথাই বলছিলেন: যোহনের এই মন্তব্যে যিশুর বাক্যের অর্থ-বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র আর থাকে না, কেননা যোহনের ঐশতাত্ত্বিক ভাষায় 'দেহ' শব্দ-বিশেষ যিশুর মৃতদেহই মাত্র বোঝায় (১৯:৩৮)। এখন আমরা যদি স্মরণ করি যে, যোহনের ধারণায় মৃত্যু পুনরুত্থান ও গৌরবায়ন সেই একই 'ক্ষণে' ঘটেছে যে-ক্ষণে যিশু ক্রুশের উপর উত্তোলিত হয়েছিলেন, তবে যিশুর বাক্য-সম্পর্কিত এই সিদ্ধান্ত তিনটি স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারব:

ক। যিশুর বাক্যটি তাঁর 'মৃত্যু-ক্ষণে' সিদ্ধিলাভ করল। বাস্তবিকই, যখন যিশু প্রাণত্যাগ করলেন তখনই মন্দিরের পরদার মাঝামাঝি উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছিল, অর্থাৎ মন্দির মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতির স্থান-ভূমিকা হারিয়ে ফেলল (মার্ক ১৫:৩৮)।

খ। ইস্রায়েলীয়দের প্রত্যাশার বৈপরীত্যে মশীহ-যিশু আর একটি মন্দির নির্মাণ করলেন না এবং আদিমণ্ডলীর সাধারণ ধারণার বৈষম্যে মণ্ডলীকে ও মণ্ডলীভুক্তদের নব মন্দিররূপে প্রতিষ্ঠা করলেন না, কারণ মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে তিনি নিজেকেই নব মন্দিররূপে প্রতিষ্ঠা করলেন।

গ। নব মন্দিররূপে তিনিই হয়ে উঠলেন ঈশ্বরের উপাসনার একমাত্র উপযুক্ত 'স্থান' এবং মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতির 'স্থান-বিশেষ' (১:৫১); ক্রুশের উপর উত্তোলিত যিশুই সকল মানুষের মিলন-স্থান (১২:৩২); আত্মা ও সত্যের শরণে ঈশ্বরের উপাসনাকাল যিশুতেই প্রবর্তিত (৪:২৩); তাঁর দেহ-ই জীবনময় জলের উৎস (৭:৩৮), তিনিই সেই আঙুরলতা যার জীবন্ত শক্তিলাভে শিষ্যেরা ফলশালী (১৫:৪-৮)। সুতরাং, মন্দিরের বিদীর্ণ পরদা ও মুমূর্ষাবস্থায় যিশুর পীড়াগ্রস্ত দেহের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বাস্তব, মানবীয় অথচ দিব্য গৌরবভূষিত দেহে আত্মপ্রকাশ করেন। পুরাতন নিয়মের প্রত্যাশা এখন সিদ্ধিলাভ করল: পুনরুত্থিত যিশুতে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

১:২২—যখন তিনি… পুনরুত্থান করলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে… : এই পদে এই ধারণাই শুধু ইঙ্গিত করা হয় না যে, শিষ্যেরা যিশুর ব্যবহার ও বাণীর তাৎপর্য পুনরুত্থানের পরে উপলব্ধি করলেন, বরং যিশুর পুনরুত্থানের আলোতেই এবং পবিত্র আত্মার উদ্দীপনায়ই তাঁরা ঘটনাটির যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলেন, এমনকি তাঁদের এই হৃদয়ঙ্গম শাস্ত্রের কথা অনুযায়ী।

মন্দির-বিষয়ে যোহনের ঐশতাত্ত্বিক ধারণার সংক্ষিপ্ত একটা সংশ্লেষণ দান করা উপকারী হতে পারে। ভূমিকাস্বরূপ একথা স্মরণযোগ্য যে, ঈশ্বর নিজে 'মন্দির' হয়ে উঠবেন এমন ধারণা পুরাতন নিয়মেও বর্তমান ছিল (এজে ১০:১৮; ১১:১৫-১৬; যেরে

১৭:১২-১৩; ইশা ৮:১৪)। একথা বলা চলে যে, যোহন অনুসারে ঈশ্বর তিনটি ক্রমবর্ধমান পর্যায় অনুসারে যিশুতে আত্মপ্রকাশ করেন :

১। **আবৃত প্রকাশ :** পৃথিবীস্থ যিশু ঈশ্বরের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ বটে, অথচ বিশ্বাসীদের কাছে তিনি তা আবৃতভাবে, গুপ্তভাবেই প্রকাশ করেন।

২। **পূর্ণ প্রকাশ :** 'মৃত্যু-পুনরুত্থান-গৌরবায়ন' এই অনন্য ক্ষণে যিশুর উত্তোলিত দেহেই তাঁর ঐশগৌরব সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমান, এবং তিনি নিজে সেই নব ও প্রকৃত মন্দির হয়ে ওঠেন যেখানে ঈশ্বর সকল মানুষের মাঝে বিরাজমান।

৩। **চরমকালের পরম সিদ্ধি :** ঐশপ্রকাশ পুস্তকে যেরুশালেমে আর কোন মন্দির থাকে না, কেননা 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রভু ও সেই মেষশাবক, তাঁরাই তার মন্দির' (প্রকাশ ২১:২২) এবং ঈশ্বরকে যিশু-মেষশাবকেই প্রত্যক্ষ করা হয়। দিব্য মন্দির পৃথিবীতে নেমে এসে অন্তর্হিত হবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের উপস্থিতির জন্য আর কোন মধ্যস্থতার প্রয়োজন হবে না, বিশ্বাসের মধ্যস্থতারও পর্যন্ত প্রয়োজন হবে না, কেননা মেষশাবক-যিশুতে ঈশ্বরের উপস্থিতি হবে শ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষমান।

উপসংহারস্বরূপ এবিষয় লক্ষণীয় যে, সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের রচয়িতাগণও এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। কিন্তু, যোহনের সঙ্গে তাঁদের বৈসাদৃশ্য দু'টো রয়েছে :

ক। তিনজন রচয়িতা যিশুর প্রকাশ্য জীবনের শেষে, অপর দিকে যোহন প্রারম্ভেই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। **খ**। যোহনের কাছে যা একটিমাত্র ঘটনা, তিনজন রচয়িতা তা তিনটি পৃথক পৃথক ঘটনা বলে বর্ণনা করেন : বিক্রেতাদের তাড়না এবং ইহুদীদের সঙ্গে বিতর্ক পৃথক বর্ণনা দু'টোতে বর্ণিত হয় (মার্ক ১১:১৫-১৯, মথি ২১:১২-১৭, লুক ১৯:৪৫-৪৮ এবং মার্ক ১১:২৭-৩৩, মথি ২১:২৩-২৭, লুক ২০:১-৮); মন্দির বিষয়ক বচনটি যিশুর বিচারের সময় মিথ্যা সাক্ষীদের দ্বারা (মার্ক ১৪:৫৫-৫৮, মথি ২৬:৬১), ক্রুশের ধারে বিদ্রূপকারীদের দ্বারা (মার্ক ১৫:২৯, মথি ২৭:৪০) এবং স্তেফানের অভিযোগে (শিষ্য ৬:১৪) উচ্চারিত হয়। এই পার্থক্য লক্ষ করে সম্ভবত

পাঠকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হল: চারিটি বর্ণনার মধ্যে কোন্‌টাই বা সত্যাশ্রয়ী? উত্তর সহজ হবে যদি আমরা স্মরণে রাখি এই পুস্তকের ভূমিকার কথা, তথা: সুসমাচারের রচয়িতাগণ ইতিহাসের মত কিছুই লিখতে চাচ্ছিলেন না; তাঁদের উদ্দেশ্যই যে তাঁরা কোন্‌ তারিখে বা কোন্‌ বিশিষ্ট মুহূর্তে যিশু এ-বাক্য ও-বাক্য উচ্চারণ করলেন বলে বর্ণনা করবেন এমন কথা অস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বিশ্বাস জাগরণের জন্য যিশুর জীবনী রচনা করেছিলেন: যিশুর পুনরুত্থানের পর যিশু-বিষয়ে যে নতুন চেতনা লাভ করেছিলেন, সেই চেতনার আলোতেই এবং পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায়ই তাঁরা যাতে বর্তমান ও ভাবী পাঠকগণ তাঁদের নিজেদের মধ্যে যিশুকে বিরাজমান ও জীবন্ত বলে উপলব্ধি করেন সেজন্যই যিশুর জীবনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সুতরাং, প্রশ্নের উত্তর এ: চারজন রচয়িতার চারটি বর্ণনাই সত্যাশ্রয়ী, কেননা তাঁরা পৃথিবীস্থ যিশুর ক্রিয়াকলাপ ও বাক্যের অন্তর্নিহিত মর্মসত্য নিজ নিজ রচনায় প্রকাশ করে অক্ষুণ্ন রাখলেন।

চিহ্নকর্ম এবং বিশ্বাস (২:২৩-২৫)

২ [২৩] পাস্কাপর্ব উপলক্ষে তিনি যখন যেরুশালেমে ছিলেন, তখন যে সকল চিহ্নকর্ম সাধন করছিলেন, তা দেখে অনেকে তাঁর নামে বিশ্বাস রাখল; [২৪] কিন্তু যিশু নিজে তাদের উপর আস্থা রাখতেন না, কারণ তিনি সকলকে জানতেন; [২৫] তাছাড়া মানুষের বিষয়ে কারও সাক্ষ্যের প্রয়োজন তাঁর ছিল না: মানুষের অন্তরে কী আছে, তা নিজেই জানতেন।

যিশু যেরুশালেমে থাকাকালীন তাঁর সাধিত চিহ্নকর্মগুলি দেখেই অনেকে তাঁর নামের প্রতি বিশ্বাস রাখল। এবিষয়ে লক্ষণীয় যোহনের ভাষা। সেই অনেকে যিশুর প্রতি নয়, তাঁর নামেরই প্রতি মাত্র বিশ্বাস রেখেছিল, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে যিশুকে নয়, তাঁর আশ্চর্য কাজগুলোই মাত্র চেয়েছিল। সুতরাং তাদের বিশ্বাস অপূর্ণাঙ্গ, ভাসা-ভাসা বিশ্বাস। যিশুর কাছে কিন্তু মানুষের অন্তর জ্ঞাত; তিনি যথার্থই জানেন কোন্‌ কোন্‌

মানুষের অন্তর নির্মল, কোন্ কোন্ মানুষের বিশ্বাস সরল। তিনি নিজেই বিকৃত বিশ্বাসের মানুষের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন না।

এই উদ্ধৃতাংশ ঐতিহাসিক একটা বৃত্তান্ত শুধু নয়, যোহনের উদ্দেশ্যের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত; এর মধ্য দিয়ে বিশ্বাস-সমস্যা উপস্থাপিত হয়, যে-সমস্যা যোহন পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিশ্লেষণ ও সমাধান করার প্রয়াস করবেন। সুতরাং বলতে পারি যে, পরবর্তী অধ্যায়গুলির মর্মকথা যোহনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেই উপলব্ধি করতে হলে এই উদ্ধৃতাংশ সেগুলির অপরিহার্য পূর্বপ্রস্তুতি বা পটভূমিকাস্বরূপ।

তৃতীয় অধ্যায় বিষয়ে দু'টি কথা

দ্বিতীয় অধ্যায় শেষে আমরা দেখেছি যে, যেরুশালেমে যারা যিশুর বিস্ময়কর কাজগুলো দেখে তাঁর নামে বিশ্বাসী হয়েছিল, তাদের উপর তিনি বিশ্বাস রাখতেন না। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল, যোহন সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে বিশ্বাস-বিষয়ে একটা আলোচনা শুরু করবেন। আলোচনাটিকে নিকোদেম, সামারীয় নারী ও বিধর্মী রাজকর্মচারীর সঙ্গে যিশুর সংলাপের মধ্য দিয়ে অবতারণা করা হয়। এখানে বিবৃত নিকোদেম ও যিশুর মধ্যকার সংলাপ-ই বিশ্বাস-বিষয়ক আলোচনাটির প্রথম অংশ।

নিকোদেমের সঙ্গে যিশুর সংলাপ (৩:১-১২)

৩ [১] ফরিশীদের মধ্যে নিকোদেম নামে একজন ছিলেন; তিনি ছিলেন ইহুদীদের প্রধানদের একজন। [২] যিশুর কাছে রাতের বেলায় এসে তিনি তাঁকে বললেন, 'রাব্বি, আমরা জানি, আপনি ঈশ্বর থেকে আগত একজন ধর্মগুরু; কারণ আপনি যে সমস্ত চিহ্নকর্ম সাধন করেন, তা কেউই করতে পারে না, যদি না ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে থাকেন।' [৩] যিশু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আমি আপনাকে সত্যি সত্যি বলছি, ঊর্ধ্বলোক থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পারে না।' [৪] নিকোদেম তাঁকে বললেন, 'মানুষ বৃদ্ধ হলে কেমন করে জন্ম নিতে পারে? দ্বিতীয়বার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে জন্ম নেওয়া তার পক্ষে কি সম্ভব?' [৫] যিশু

উত্তর দিলেন, 'আমি আপনাকে সত্যি সত্যি বলছি, জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। [৬] মাংস থেকে যা জন্মায়, তা মাংসই, আর আত্মা থেকে যা জন্মায় তা আত্মাই। [৭] আমি যে আপনাকে বললাম, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাদের জন্ম নিতে হবে, তাতে আপনি আশ্চর্য হবেন না। [৮] বাতাস যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই বয়ে যায়; আপনি তার শব্দ শুনতে পান, কিন্তু কোথা থেকে আসছে আর কোথায়ই বা যায়, তা আপনি জানেন না। তেমনি প্রত্যেকে যে আত্মা থেকে জনিত, তার ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই।' [৯] নিকোদেম প্রতিবাদ করে তাঁকে বললেন, 'এই সমস্ত কেমন করে সম্ভব?' [১০] যিশু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আপনি ইস্রায়েলের ধর্মগুরু, অথচ এই সমস্ত বোঝেন না? [১১] আমি আপনাকে সত্যি সত্যি বলছি, আমরা যা জানি, তা-ই বলি; যা দেখেছি, তারই বিষয়ে সাক্ষ্য দিই, কিন্তু আপনারা আমাদের সাক্ষ্য মেনে নেন না। [১২] আমি আপনাদের কাছে পার্থিব বিষয়ে কথা বললে আপনারা যখন বিশ্বাস করেন না, আমি স্বর্গীয় বিষয়ে কথা বললে আপনারা তখন কেমন করে বিশ্বাস করবেন?'

নিকোদেম একজন ফরিশী, অর্থাৎ ইহুদী সমাজের অভিজাত শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তি। তিনি সমাজনেতাও, এর মানে তিনি ইহুদী সিনেদ্রিন বা ধর্মসভার একজন সদস্য। সুতরাং, নিকোদেমকে ইহুদী শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধিরূপে গণ্য করা যায়। তিনি যিশুর কথা শুনে তাঁকে নির্ভরযোগ্য ধর্মগুরু মনে করেন এবং তাঁর সাধিত চিহ্নকর্মগুলো তাঁর শিক্ষা-সমর্থনে দিব্য প্রমাণস্বরূপ বিবেচনা করেন। এজন্য যিশুর সঙ্গে ধর্ম-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা করবেন বলে স্থিরসংকল্প করেন। কিন্তু তাঁর এই মনোভাব যথাযথ মনোভাব নয়; তিনি ত শুধু বিস্ময়কর চিহ্নকর্ম দেখবার জন্য যিশুর কাছে যান না বটে, অথচ চিহ্নকর্মের মধ্য দিয়ে যিশুর গৌরব প্রত্যক্ষ করতে পারলেন না বিধায় তাঁর বিশ্বাস নগণ্য: যিশুকে মশীহ ও ঐশপ্রকাশকর্তা বলে চিনতে পারেন না, তাঁর ধারণায় যিশু একজন ধর্মগুরু মাত্র যাঁর সঙ্গে ধর্মচর্চা করা যেতে পারে। কিন্তু তবুও, দৃঢ় বিশ্বাস না থাকায় যিশুর উপদেশ বোধগম্য নয়, এমনকি অদ্ভুতও লাগতে পারে; বস্তুত নিকোদেম যিশুর উপদেশের লেশমাত্র উপলব্ধি করতে পারলেন না।

৩:৩—ঊর্ধ্বলোক থেকে জন্ম না নিলে… : নিকোদেমের উচ্চারিত প্রশংসার উত্তরে যিশু সরাসরি ও মুক্তকণ্ঠেই কথা বলেন; তিনি ধর্মচর্চা বা ঐশতাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্কের জন্য নয়, অপূর্ব একটা সত্য বহন করতেই পৃথিবীতে এলেন। শাস্ত্রাধ্যয়ন বা ধ্যানের মাধ্যমে নয়, কেবল ঊর্ধ্বলোক থেকে জন্ম নিলেই মানুষ ঐশরাজ্যে অংশ নিতে পারে ('ঊর্ধ্বলোক', গ্রীক ভাষায় এ শব্দের অন্য অর্থও আছে: 'পুনরায়' কিংবা নতুন ক'রে)। উল্লিখিত বাক্যের মাধ্যমে যিশু বলতে চান, শুধুমাত্র ঈশ্বরই মানুষকে এমন নবমানুষে রূপান্তরিত করতে পারেন যাতে সে ঐশরাজ্যে প্রবেশাধিকার পেতে পারে। নিকোদেম কিন্তু যিশুর বাণীর যথার্থ তাৎপর্য অনুভব করেন না; যিশুর সকল চিহ্ন দেখে তাঁর বোঝা উচিত ছিল যে, যিশুই পুরাতন নিয়মের পূর্বঘোষিত মশীহ এবং নবীদের পূর্বকথিত পবিত্র আত্মার বহনকারী। তিনি 'জন্ম' কথাটির সাধারণ অর্থের দিকেই মাত্র মন দেন, এজন্যই যিশুর বাক্যে বিস্মিত না হয়ে পারেন না, এমনকি তাঁর আসল ভুল এই যে, তিনি যিশুর দিব্য প্রকাশকে মানবীয় চিন্তাধারা অনুসারে বিচার করতে চান, তথা: মানুষের পক্ষে দু' বার জন্ম নেওয়া অসাধ্য।

৩:৫—জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে… : যিশু 'ঊর্ধ্বলোক' কথাটি ব্যাখ্যা করে নিকোদেমকে নিজের বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতে চান: কেবলমাত্র ঈশ্বর মানুষকে নতুন করে জন্ম দান করতে পারেন। 'জল' উল্লেখে যোহনকালীন খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ বাপ্তিস্ম-সাক্রামেন্তের কথা অনায়াসে উপলব্ধি করতেন; ঊর্ধ্বলোক থেকে জন্মটা বাপ্তিস্ম গ্রহণেই লাভ করা যায়। অবশ্যই যোহন বাপ্তিস্ম-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত জলকে লক্ষ করেন না, প্রকৃতপক্ষে বাপ্তিস্ম-সাক্রামেন্তযুক্ত গভীর বাস্তবতার দিকে, অর্থাৎ বাপ্তিস্মের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা থেকে জন্মলাভের দিকেই নির্দেশ করেন: যিশুর শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে বাপ্তিস্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে নয়, পবিত্র আত্মা থেকে জন্মলাভের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গেই সম্পর্কিত।

তখনকার ইহুদীরাও পবিত্র আত্মা ও তাঁর পরিত্রাণদায়ী ভূমিকা অবগত ছিল। শাস্ত্রে লেখা ছিল যে, যখন ঐশআত্মা আসবেন তখন মানুষের হৃদয়-মন নবীভূত করবেন যেন মানুষ সহজে ও পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করে (এজে ১১:১৯;

৩৬:২ ··· ; ইশা ৪৪:৩; যেরে ৩১:৩৩)। কুম্রান-সম্প্রদায়ের সদস্যরাও সমর্থন করত যে, তাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিলে মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ হবে, এমনকি ঐশআত্মা দ্বারা মানুষ নব স্বরূপ লাভ করবে। আবার, নিকোদেমের মত ইহুদী ধর্মাচার্যগণ শিক্ষা দিতেন যে, 'প্রায়শ্চিত্ত দিবসে' পাওয়া ঐশক্ষমা ছাড়া এর মধ্যে ঐশআত্মার অনুপ্রেরণাও পাওয়া যায়। সুতরাং নিকোদেম স্পষ্টরূপে অনুভব করতে পারতেন যে, ঐশরাজ্যে প্রবেশের জন্য যিশুর কথা অনুসারে ঈশ্বরের সাধিত শুচীকরণ এবং ঐশআত্মার সম্পাদিত নবীকরণের প্রয়োজন; এজন্যই যিশুর কাছে অন্য প্রশ্ন করার আগে নিকোদেমের সঠিকভাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল; কিন্তু (যেমন দেখেছি) তিনি যিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণরূপেই অগ্রাহ্য করেন।

৩:৬—মাংস থেকে যা জন্মায়, তা মাংসই: কেবল নিজের উপর নির্ভর করলে মানুষ ঐশরাজ্যে গিয়ে পৌঁছতে অক্ষম, কারণ 'মাংস' ও 'আত্মা'র মধ্যে সত্তাগত পার্থক্য বর্তমান। যারা মাংস থেকে জনিত তাদের সত্তা মাংসময়, তাদের আচার-আচরণও মাংস দ্বারা প্রভাবান্বিত। যারা আত্মা থেকে জনিত, যারা সত্যিকারে আত্মিক, তারাই মাত্র আত্মার ঐশ উপাদানমণ্ডিত। সুতরাং, ঐশরাজ্যে প্রবেশের জন্য মাংস থেকে জনিত মানুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন সে যেন ঊর্ধ্বলোক অর্থাৎ আত্মা থেকে জন্মায়। এক্ষেত্রে যোহন বাণী-বন্দনা কালেও আমাদের প্রস্তুত করেছিলেন (১:১৩): 'তারা রক্ত থেকে নয়, মাংসের বাসনা থেকেও নয়, ··· ঈশ্বর থেকেই জনিত।' ৬:৬৩-এ যোহন আরও স্পষ্টভাবে বলেন যে, কেবল ঐশআত্মার সাহায্যেই মাংস থেকে জনিত মানুষ প্রকৃত ও অনন্ত জীবন পেতে পারে। এবিষয়ে এ কথাও লক্ষণীয় যে, গ্রীক জ্ঞান-মার্গপন্থীরা বিবেচনা করত, মানুষ মানুষ বলেই ঐশআত্মাভূষিত; কিন্তু তাদের সেই আত্মা আসলে সংসারের মায়ায় আচ্ছন্ন; তাদের মতে ধ্যান ও সদাচরণের মাধ্যমেই মানুষ অন্তঃস্থিত আত্মাকে চিনে ঐশজীবন পুনর্লাভ করে। যোহনের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত: বাপ্তিস্মের মাধ্যমেই মাংস থেকে সঞ্জাত মানুষ ঐশআত্মাকে লাভ করে।

৩:৭—উর্ধ্বলোক থেকে আপনাদের জন্ম নিতে হবে: ‘মাংস ও আত্মা’ বিষয়ক আলোচনার পরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কেবল জীবনময় ঐশআত্মার নবসৃষ্টি গুণেই মানুষ ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে। যিশুর এই অপূর্ব শিক্ষায় নিকোদেম যেন আশ্চর্য না হন, অর্থাৎ নিকোদেম যেন যিশুর শিক্ষা গ্রহণ করেন তেমন আহ্বানে যিশু নিজের বক্তব্যের প্রথম অংশ শেষ করেন।

৩:৮—বাতাস যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই বয়ে যায়: বাতাসের উপমায় যিশু বলতে চান যে, পবিত্র আত্মা থেকে নবজন্ম সম্বন্ধে তিনি যা বললেন তা সত্য বটে, অথচ মানুষের বুদ্ধির অতীত। হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় ‘আত্মা’ ও ‘বাতাস’ একই শব্দ। যেমন বাতাস বাস্তব, আর ইন্দ্রিয়গোচর হয়েও তবু তার উদয় ও উদ্দেশ সম্পর্কে রহস্যাবৃত এবং নিজে স্বশক্তিতে বয়, তেমনি ঐশআত্মার ক্ষেত্রেও ঘটে: ঈশ্বর থেকে পাওয়া শক্তির উদয় ও উদ্দেশ, এবং কিভাবে মানুষ তা লাভ করে, এ কথাসকল রহস্যাবৃত; তবুও সেই শক্তি আছেই, সেই শক্তিশালী ঐশআত্মা মানুষে ঘটমান এবং মানুষের ব্যবহারে দৃশ্যমান (এবিষয়ে যোহনের ১ম পত্র দ্রষ্টব্য)। উল্লিখিত বাক্য সম্বন্ধে কেউ এমন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে, যে-ব্যাখ্যা অনুসারে ঈশ্বর যাকে খুশি তাকেই মাত্র পরিত্রাণ করেন। কিন্তু তেমন ব্যাখ্যা এখানে প্রযোজ্য নয়; বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য বাপ্তিস্মে পবিত্র আত্মার গুপ্ত অথচ মুক্তিদায়ী ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কিত। পবিত্র আত্মার রহস্যাবৃত কাজ বিশ্বাসের সঙ্গেই গ্রহণ করতে হয়; অপর দিকে নিকোদেম এখনও নিজের মাংসময় চিন্তাধারা পালন করতে ব্যস্ত, এমনকি তিনি পুনরায় যিশুর কাছে জানতে চান ‘এই সমস্ত কেমন করে সম্ভব।’ এভাবে তিনি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও শক্তি যাচাই করতে চান ও নিজের নির্বুদ্ধিতার সঙ্কীর্ণ গন্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করেন। এজন্যই যিশু তাঁকে ভর্ৎসনা করেন: শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত ধর্মাচার্য বলে পরিচিত নিকোদেমের পক্ষে ঐশআত্মা থেকে জন্মলাভের বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত ছিল। পবিত্র শাস্ত্রে যে কথা পবিত্র আত্মা থেকে জন্মলাভের সঙ্গে জড়িত, সম্ভবত যিশু কেবল সেই সকল কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান, যেন নিকোদেম ঐশপ্রকাশকারী যিশুর বাণীর আলোতে সেই

কথার পূর্ণ তাৎপর্য অনুভব করেন। কিন্তু যিশুকে অস্বীকার করে নিকোদেম এবং অন্যান্য ইহুদী ধর্মগুরু পবিত্র শাস্ত্রের পূর্ণ সংজ্ঞা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেন।

৩:১১—আমরা যা জানি, তা-ই বলি… : যিশুর ঐশপ্রকাশ বিশ্বাসযোগ্য, কেননা ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ : পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে কোনও ব্যবধান নেই।

যিশু কেন এখানে 'আমি'র স্থানে 'আমরা' ব্যবহার করেন? সম্ভবত এই বাক্য হল আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর শিক্ষার একটা সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতাংশ। যিশু-ই একমাত্র ঐশপ্রকাশকর্তা বটে, তবু সেই প্রকাশের বস্তু তিনি শিষ্যদের কাছে ন্যস্ত করেছিলেন তাঁরা যেন তাঁর স্বর্গারোহণের পরে মানবজাতির কাছে তা প্রচার করে যান : একথা অনুসারেই বলা চলে যিশু ও শিষ্যদের কথা একই কথা। যথার্থই স্বয়ং যিশু ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর নিজের ও মণ্ডলীর কাজ ধারাবাহিক একটিমাত্র কাজ (১৩:২০)। যিশুর মন কাল অতিক্রম করে সেই কালের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে, যে-কাল প্রচারকর্মে রত শিষ্যগণ তাঁর বাণী আপন করে নেবেন।

সুতরাং, ইহুদীধর্মের প্রতিনিধি নিকোদেমের কাছে যিশু 'শেষ ও চরম ঐশপ্রকাশকর্তা' পদভূমিকাপ্রাপ্ত বলে আত্মপ্ররিচয় দেন : তাঁর যে-সাক্ষ্য, তাঁর শিষ্যেরাও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে সেই একই সাক্ষ্য দান করবেন। কিন্তু নিকোদেম এবং আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীকালীন ইহুদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ এই সাক্ষ্য অস্বীকার করেন : এইখানে যিশু ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে বিচ্ছেদের সূত্রপাত। যিশু নিকোদেমকে দোষী সাব্যস্ত করেন না, তবুও তাঁকে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সম্মুখীন করান; বিশ্বাসের সঙ্গে যিশুকে বেছে না নেওয়ার ফলে নিকোদেম যেন ঐশরাজ্যের পথ বন্ধ করে নিজের মানবীয় বুদ্ধির সীমিত গন্ডিতে নিজেকে বন্দি না করেন।

৩:১২—আমি আপনাদের কাছে পার্থিব বিষয়ে কথা বললে… : এ পর্যন্ত নিকোদেমের কাছে যিশু পার্থিব বিষয় মাত্র অর্থাৎ মুক্তিদায়ী প্রকাশের প্রথম পর্যায়ের কথা

শিখিয়েছিলেন, তথা: পরিত্রাণ পেতে হলে মানুষ বাপ্তিস্মের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা থেকে নবজন্ম লাভ করুক। তবু, যদি নিকোদেম এই সত্য অস্বীকার করেন, তাহলে ‘স্বর্গীয় বিষয়ের’ কথাও অস্বীকার করবেন। স্বর্গীয় বিষয়টা কি? যিশুর জীবনকালে তাঁর বিভিন্ন উপদেশ ছাড়া এখানে প্রকৃতপক্ষে তাঁর দ্বারা উন্মুক্ত সেই পথকে নির্দেশ করা হয় যে-পথ স্বর্গলোকে গিয়ে পৌঁছে। এপ্রসঙ্গে অধিক স্পষ্টভাবে বলতে পারি, যিশুই স্বর্গলোকের পথ (১৪:৬); জীবনদায়ী আলো পাবার জন্য তাঁকেই অনুসরণ করা প্রয়োজন (৮:১২), তিনিই মাত্র স্বর্গারোহণ ক’রে (৩:১৩) সেখানে তাঁর আপনজনদের জন্য স্থান প্রস্তুত করলেন (১৪:২…); স্বর্গারোহণের মাধ্যমে অর্থাৎ পিতার কাছে তাঁর চলে যাওয়ার মাধ্যমে (১৩:১), ক্রুশে উত্তোলন (৩:১৪) ও গৌরবায়নের মাধ্যমে (১২:২৩) তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাসী যারা তাদের পরিত্রাণ (১২:৩১), জীবন ও গৌরব দান করেন (৬:৬২…; ১৭:৪)। জীবনদায়ী রুটি (৬:৩২) ও আঙুরলতা (১৫:১০) বিষয়ক উপদেশে যিশুর সঙ্গে বিশ্বাসীদের সংযোগের অপরিহার্যতা আরও সূক্ষ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যোহনের ধারণায় ‘পবিত্র আত্মা থেকে নবজন্মলাভ’-এর বিষয় জীবনদায়ী আত্মিক দানগুলো (যেমন পবিত্র রুটি) এর বিষয়ে বিকশিত হয়, এমনকি কেবল এই ধারণা অনুসারেই ত্রাণকর্মের রহস্যাবৃত সত্য পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং, ঐশপ্রকাশের সূত্রপাত অগ্রাহ্য করে অবশ্যই নিকোদেম তার বিকাশের কথাও অগ্রাহ্য করবেন। এ সকল কথা যে বর্তমানকালে আমাদের কাছে প্রযোজ্য, তাতে কোনও সন্দেহ নেই: শুধু যিশুর ঐশপ্রকাশের প্রথম পর্যায় স্বীকার করলে পর আমরা ঐশপ্রকাশের পূর্ণতা স্বীকার করতে পারব, তা না হলে নিকোদেমের মত আমাদেরও কাছে সুসমাচারের পরবর্তী বর্ধমান ঐশপ্রকাশের কথা অবোধ্য হয়ে থাকবে।

ঐশপ্রকাশকারী যিশুই জীবনদাতা (৩:১৩-২১)

৩ [১৩] ‘আর স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন—তিনি মানবপুত্র। [১৪] এবং মোশি যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে, [১৫] যে কেউ

বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে। [১৬] কেননা ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে। [১৭] কেননা ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে। [১৮] তাঁর প্রতি যে বিশ্বাসী, তার বিচার হয় না; কিন্তু যে অবিশ্বাসী, তার বিচার হয়েই গেছে, যেহেতু ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্রের নামে বিশ্বাস করেনি। [১৯] আর এই তো সেই বিচার: জগতের মধ্যে আলো আসা সত্ত্বেও মানুষ সেই আলোর চেয়ে অন্ধকার ভালবেসেছে, কেননা তাদের কর্ম অসৎ ছিল। [২০] বাস্তবিক, যে অপকর্মের সাধক, সে আলোকে ঘৃণা করে, ও আলোর দিকে সে আসে-ই না, পাছে তার কর্ম ব্যক্ত হয়; [২১] কিন্তু যে সত্যের সাধক, সে আলোর দিকে এগিয়ে আসে, তার সমস্ত কর্ম যে ঈশ্বরে সাধিত তা যেন প্রকাশিত হয়।’

নিকোদেমের সঙ্গে যিশুর শেষ কথা (৩:১২) একটা প্রশ্ন শুধু নয়, সেই কথায় সূচিত আছে একাধিক মন্তব্য! মন্তব্যটা যিশুর ঐশপ্রকাশ সম্বন্ধীয় সমস্যা, ত্রাণকর্তা এবং শেষ ও চরম ঐশপ্রকাশকর্তা যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধীয় সমস্যা এবং সেইকালে যারা যিশুর মঙ্গলবার্তা ও আহ্বান শুনেছিল তাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধীয় সমস্যার উপর আলোকপাত করতে চায়। সুতরাং একথা বলা চলে যে, সম্ভবত রচয়িতা উল্লিখিত সমস্যা তিনটি সমাধানের জন্যই তাঁর নিজের এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন; আমরাও নিকোদেমের সঙ্গে যিশুর সংলাপ বিষয়ে একটা মন্তব্য বলে এই উদ্ধৃতাংশ বিবেচনা ও ব্যাখ্যা করব। নিকোদেমের সঙ্গে যিশুর সংলাপের চেয়ে এই উদ্ধৃতাংশই অধিকতর রূপে গভীর ও ঐশতাত্ত্বিক, এমনকি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, যোহন-রচিত সুসমাচার ও তাঁর ঐশতত্ত্বের মূল ধারণাগুলো ঠিক এই উদ্ধৃতাংশেই সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থিত, যেমন:

– চরম ঐশপ্রকাশকর্তার আগমনের মূল-ঘোষণা, বা জগতের পরিত্রাণের জন্য পিতা ঈশ্বর দ্বারা পুত্রকে প্রেরণ।
– ক্রুশের মধ্য দিয়েই ঐশগৌরবে ত্রাণকর্তার ফিরে যাওয়ার ‘পথ’।

– ত্রাণকর্তার আহ্বানই যেন মানুষ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁকে অনুসরণ করে এবং ফলত মানুষের পক্ষে যিশুকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা।

এ মূল ধারণা তিনটি ছাড়া (যা যোহনের খ্রিষ্টমণ্ডলীর বাণী-বন্দনার' সার বলে বিবেচনাযোগ্য) উদ্ধৃতাংশে ব্যক্ত হয় যিশুর সম্মুখীন হয়ে সেইকালের মানুষের বিচার; সেই বিচার অবগত হয়ে সর্বকালের মানুষ যেন যিশুকে অনুসরণ করবে বলে স্থিরসঙ্কল্প করে (১:১০-১৩; ১২:৩৭-৪৩)। এদিক দিয়ে, সুসমাচার লেখার জন্য যোহনের উদ্দেশ্য এই উদ্ধৃতাংশে নিহিত (২০:৩১), তথা: যিশুর জীবনের মহাঘটনাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করে বর্তমানকালের মানুষের কাছে তা প্রচার করা; অন্য কথায়, ইতিহাস ব্যাখ্যা করে বর্তমান মানুষকে আহ্বান করা।

৩:১৩—স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি: এখানে ঐশপ্রকাশের লক্ষ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়: যিশু স্বর্গীয় বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য পৃথিবীতে আসেননি, মানুষকে পরিত্রাণ করতে অর্থাৎ তাকে ঐশজীবনের সহভাগী করতেই তিনি এসেছেন। ঐশপ্রকাশকর্তারূপে যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন, তিনি পরিত্রাণ দান করতেই এসেছেন। এই ধারণা এখন নতুন এক দৃষ্টিকোণ অনুসারে ব্যক্ত হয়, দৃষ্টিকোণটা সূচিত হয় এই বাক্যেই: স্বর্গে গিয়ে ওঠা। যিশু বিশ্বাসীদের কাছে পরিত্রাণ দিয়েছেন স্বর্গে গিয়ে ওঠার মাধ্যমে, এবং স্বর্গে গিয়ে ওঠাই হল ক্রুশের উপরে যিশুর উত্তোলন-গৌরবায়ন। যিনি ঊর্ধ্বলোক থেকে আগত হয়ে মাংস হলেন, তিনিই মাত্র স্বর্গলোকে আবার প্রবেশ করে সেইখানে অবস্থান করেন। এখানে যিশুকে মানবপুত্র বলে অভিহিত করা হয়, কারণ এই নামেই যোহন স্বর্গারোহণ (৬:৬২), ক্রুশে উত্তোলন (৩:১৪) এবং গৌরবায়ন (১২:২৩) ধারণা তিনটে একত্রিত করেন। মানবপুত্র যিশুই সেই একমাত্র ব্যক্তি যিনি যেখানে আগেও ছিলেন সেখানে আরোহণ করেন (৬:৬২) এবং তাঁর এই আরোহণ বিশ্বাসীদের জন্য পরিত্রাণের পথ হয়ে ওঠে। এইভাবে 'মানবপুত্র' ধারণাটা অধিক গভীরতর একটা তাৎপর্য অর্জন করে। সদৃশ সুসমাচারত্রয় 'মানবপুত্র' ধারণায় চরমকালীন বিচারকর্তা, পৃথিবীতে আগত যিশু এবং ঈশ্বরের বাধ্য ও কষ্টভোগী দাসের ভূমিকা আরোপ

করেছিল। কিন্তু যোহন সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের চেয়ে আরও এগিয়ে যান; তিনি ‘গৌরবায়ন’ ধারণাকে উল্লিখিত পূর্বাস্তিত্বের ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেন, ফলে যিশু শুধু পৃথিবীতে আসবার পরে নয়, জগতের সৃষ্টির আগে থেকে গৌরবায়ন-ক্ষণ পর্যন্তই ‘মানবপুত্র’-ভূমিকার অধিকারী।

৩:১৪—মোশি যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন: মানবপুত্রের স্বর্গারোহণ অর্থাৎ পিতার কাছে তাঁর ফিরে যাওয়াটা ক্রুশের উপরে তাঁর উত্তোলন বা উন্নয়ন নিয়ে শুরু হয়, এমনকি তাঁর এই উত্তোলন-উন্নয়ন গুণেই যিশুর স্বর্গারোহণ বিশ্বাসীদের জন্য পরিত্রাণের তাৎপর্য বহন করে: ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে, ক্রুশের উপরে যিশুর উত্তোলন-ই মানুষের ত্রাণকর্ম সাধন করার জন্য একমাত্র উপায়। এজন্য যোহন পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত সেই সাপের কাহিনী (গণনা ২১:৮…) উপস্থাপন করেন: ঈশ্বরের আদেশে একটা পতাকাদণ্ডের মাথায় একটা সাপ উত্তোলিত হয়েছিল, আর যে যে ইস্রায়েলীয় সেই সাপের দিকে তাকাত, সাপে কামড়ালেও সে বাঁচত। এই বৃত্তান্তের প্রধান দিক তিনটি: ঈশ্বরের আদেশ, সাপকে উত্তোলন এবং সেই উত্তোলিত সাপের ত্রাণ-ক্ষমতা। এই তিনটি দিক প্রতীকরূপে অনুসরণ করে অনুমান করতে পারি যে, ক্রুশের উপরে যিশুকে উত্তোলন ঈশ্বরের আদেশ-মতই ঘটেছে: যিশুকে উত্তোলিত ‘হতে হবে’; সেই উত্তোলন হল ত্রাণকারীই উত্তোলন, এবং এতেই মানবপুত্রের গৌরবায়ন প্রকাশ পায় (৮:২৮; ১২:৩৪…)। যোহনের আগে আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর এই ধারণা ছিল যে, শুধু অপমানকর ক্রুশারোপণের পর থেকেই যিশু উন্নীত হয়ে ঈশ্বরের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন (শিষ্য ২:৩৩-৩৬; ফিলি ২:৮-১১)। কিন্তু এক্ষেত্রেও যোহন এগিয়ে যান; তাঁর ধারণায় ক্রুশই যিশুর উত্তোলন-উন্নয়নের স্থান; ক্রুশে উত্তোলিত অবস্থায়ই যিশু যথার্থ ত্রাণকারী অধিকার-লাভে উন্নীত হলেন। সুতরাং ‘ক্রুশ-ক্ষণ’ থেকেই যিশু নিজের ত্রাণকারী অধিকার অনুশীলন করতে লাগেন এবং একাধারে ঐশগৌরবে উন্নীত, যে-গৌরব আপনজনদের কাছে অনন্ত জীবন দান করার ঐশঅধিকার-প্রাপ্তিতে প্রকাশিত (১৭:১…)। পলের কথায় ক্রুশের অপমান পুনরুত্থান দ্বারা পরাজিত হল; সদৃশ সুসমাচারত্রয়ও অপমানিত যিশুকে বর্ণনা করে; যোহন গভীর ও নতুন একটা দিক

অনুভব করে ক্রুশেরই গৌরব আর সেটির পরিত্রাণদায়ী শক্তি ঘোষণা করেন: ক্রুশের অপমান একই ক্রুশের গৌরব দ্বারাই পরাজিত, কেননা ক্রুশে উত্তোলন যথার্থই ক্রুশে উন্নয়ন এবং উন্নয়ন হওয়াতে প্রকৃতপক্ষে গৌরবেই উন্নয়ন বা গৌরবায়ন। সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের সঙ্গে যোহন অনুসারেও যিশুর 'মৃত্যু-ক্ষণ' হল আতঙ্কের সময়, তবুও তাছাড়া যোহনের বিশেষ ধারণা অনুযায়ী 'মৃত্যু-ক্ষণ' আসলে হল সেই অনন্য সময় যখন যিশু এজগৎ ছেড়ে পিতার কাছে ফিরে গিয়ে গৌরবান্বিত হলেন (১২:২৩…)। এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, যোহনের সেই আরামীয় মাতৃভাষায় 'উত্তোলন', 'উন্নয়ন', 'মৃত্যু' ও 'ফিরে যাওয়া' শব্দ চারটি একই শব্দ দ্বারা প্রকাশিত।

৩:১৫—যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে: ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে ক্রুশের উপরে উত্তোলিত মানবপুত্রই একমাত্র ত্রাণকর্তা (৩:১৪)। যিশুর মধ্যস্থতায় মানুষ পরিত্রাণ পায়: যিশুর সঙ্গে এমনকি যিশুতেই অর্থাৎ যিশুর মাধ্যমে ও তাঁর সংযোগে বিশ্বাসীগণ অনন্ত জীবন পায়। পিতা ঈশ্বর যে ঐশজীবন আমাদের দান করতে চান, সেই জীবন যিশুতেই বিরাজ করে: কেবল তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলে অর্থাৎ ক্রুশে উত্তোলিত ও গৌরবান্বিত যিশুতে লীন হলে তবেই আমরা যিশুতে সঞ্চারিত ঐশজীবন পাই। উপরন্তু এখানে প্রকাশ পায় ক্রুশে উত্তোলিত যিশুর সেই অধিকার যা অনুসারে তিনি অনন্ত জীবন দিতে পারেন, অর্থাৎ যিশুর গৌরবায়ন ক্রুশে তাঁর উত্তোলনের উপর নির্ভর করে, ফলে আরও স্পষ্ট প্রকাশিত হয় যে ক্রুশে যিশুর উত্তোলন ও তাঁর গৌরবায়ন একই জিনিস।

৩:১৬—ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন… : যিশুর সাধিত পরিত্রাণের শুভসংবাদ এই বাক্যেই সূচিত। ঈশ্বরের পরিত্রাণ-অভিপ্রায়ের মূলে রয়েছে ঐশজীবনহীন জগতের প্রতি ঈশ্বরের অতুলনীয় ভালবাসা। এই পদের মুখ্য ব্যাখ্যা যোহনের প্রথম পত্রে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় (১ যোহন ৪:৯…): পৃথিবীতে যিশুকে প্রেরণটা হল পিতার ভালবাসার নানাবিধ অভিব্যক্তি, যেমন: পিতা তাঁর একমাত্র পুত্রকে

পৃথিবীতে প্রেরণ করেন আমরা যেন তাঁর দ্বারাই জীবনযাপন করি; পুত্র আমাদের পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে আবির্ভূত হন, তাঁর ক্রুশ-মৃত্যুর আদর্শদানে আমরা পারস্পরিক ভালবাসার আজ্ঞা পালন করতে শিখি; পিতা পুত্রকে জগতে ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করলেন। ঈশ্বর ভালবাসাস্বরূপ এবং আমাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর পুত্রের মৃত্যুই হল সেই ভালবাসার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপেই আত্মদান করে আমাদের ভালবাসেন। এবং আমরা যেন সেই অতুলনীয় ভালবাসা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করি, যোহন জোর দিয়ে ঘোষণা করেন যে, সেই পুত্র ছিলেন ঈশ্বরের একমাত্রই পুত্র। 'ঈশ্বর তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন', যোহনের ভাষায় 'দান করা' কথাটা জগতে যিশুকে প্রেরণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। যোহনের ঐশতত্ত্ব অনুসারে মাংসে ঐশবাণীর আগমন যে মর্মসত্য, সেই মর্মসত্যে ঈশ্বর ও জগতের মধ্যকার ব্যবধান অতিক্রম করা হয়। তারাই 'জগৎ', যারা পাপের কারণে ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গেছিল কিন্তু সর্বান্তঃকরণে পরিত্রাণ পাবার জন্য ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষী। পিতা ঈশ্বর যে জগৎকে ত্রাণ করেন, তা একটা ঐতিহাসিক ঘটনায়ই বাস্তবায়ন লাভ করেছে: জগতে যিশুর আগমন এবং ক্রুশের উপরে তাঁর মৃত্যু ইতিহাস থেকে কখনও নিশ্চিহ্ন করা যাবে না।

'অনন্ত জীবনের' অর্থও এইভাবে স্পষ্ট ফুটে ওঠে: সেই জীবন পেয়ে আমরা বিনাশ থেকে মুক্ত। অবিশ্বাসী যারা, তারা জীবন শেষেই যে দণ্ডিত হবে এমন নয়; বাস্তবিক, যিশুকে অস্বীকার করে তারা এর মধ্যেই নিজেদের দণ্ডিত করে এবং ঈশ্বরের বিচারেও দণ্ডিত। সুতরাং, এই হল আমাদের অবস্থা: হয় ঐশজীবন ও পরিত্রাণপ্রাপ্ত, না হয় বিনাশ ও ঈশ্বরের দণ্ডপ্রাপ্ত।

৩:১৭—ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি: অবিশ্বাসী যারা, তারা যে ইতিমধ্যে দণ্ডিত তাতে ঈশ্বর প্রীত নন; তাঁর ভালবাসায় তিনি সকলকেই মুক্ত করতে ইচ্ছা করেন, এবং যিশুও সকলেরই জন্য নিজের রক্ত দান করেছেন।

৩:১৮—তাঁর প্রতি যে বিশ্বাসী, তার বিচার হয় না : পরিত্রাণ ও বিচার যে বর্তমান একটা বাস্তবতা এবং সেই বাস্তবতা যে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, একথা এখানেও পুনরাবৃত্তি করা হয়। একটা বিষয় লক্ষণীয়, সেটা হল যোহনের মর্মবেদনা। তাঁর মর্মবেদনার কারণ হল এই যে, অবিশ্বাসী যারা তারা যদি এখন মন না ফিরিয়ে যিশুর প্রতি বিশ্বাস না রাখে, তবে ইতিমধ্যেই চিরন্তন বিচারে দণ্ডিত। অপর দিকে সান্ত্বনাদায়ী একটা বিষয় আছে, বিশ্বাসী যারা তারা ইতিমধ্যেই অনন্ত পরিত্রাণ লাভের বিষয়ে নিশ্চিত। মানুষের জীবন-শেষে ঈশ্বরের বিচার এরূপ : জীবনকালে মানুষ যে যে সিদ্ধান্ত করেছে, তিনি তাদের সেই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করবেন।

৩:১৯—এই তো সেই বিচার : বিভিন্ন প্রমাণ থেকে যোহন অনুমান করেন যে, মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকার ভালবেসেছে। যোহনের এই ভাষা বাহ্যিক ভাষা নয় ; তিনি যিশুর প্রতি ঐতিহাসিক মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন : শুধু ইহুদীরা নয়, বিভিন্ন জাতির মানুষ আলোস্বরূপ যিশুকে অস্বীকার করেছে ; অবিশ্বাস ও অন্ধকার একই কথা। যিশুর আগমনের পূর্বপুরুষেরা অসৎ কর্মের জন্য মার্জনীয় হতে পারে, কারণ তাদের মাঝে আলো ছিল না ; কিন্তু যিশুর আগমনে সবই উজ্জ্বল ও জাজ্বল্যমান হয়ে উঠল, তিনি নিজে ক্রুশের উপরে উত্তোলিত হয়ে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষী মানবজাতির জন্য জ্যোতির্ময় ধ্রুব-তারাস্বরূপ। যিশুর আগমনের পর থেকে মানুষ আর রেহাই পাবে না যদি যিশু দ্বারা নিজেকে আলোকিত ও অনুপ্রাণিত হতে না দিয়ে অন্ধকারের গণ্ডিতে আশ্রয় নেয়। অন্ধকারের কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বর যথাসাধ্য কাজ করেছেন এবং একই কারণে যিশু কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে ক্রুশ-মৃত্যুপণ পর্যন্ত আত্মনিবেদিত হয়েছেন ; তাই মানুষ যদি অন্ধকার ত্যাগ না করে তাহলে সে প্রচার করে সে অবিশ্বাসী ও ঈশ্বরের চেয়ে নিজের অসৎ কাজকর্মই বেশি ভালবাসে, এমনকি সেই অসৎ কর্মই তার জীবনের উদ্দেশ্য। সুধী পাঠক মনে করবেন না এবিষয়ে যোহন মানুষের দুর্বলতার কথা ভুলে গেছেন। অবশ্যই তিনিও জানেন যে মানুষ পাপী। এপ্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য এই যে, নিজের দুর্বলতাবশত মানুষ পাপ করে, কিন্তু সে যেন সেই

পাপ করার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প না করে। যে পাপ করার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করে, সে ঈশ্বরকে ঘৃণা করে, সে অবিশ্বাসী।

৩:২০—যে অপকর্মের সাধক… : অনেকে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েই মাত্র একথা ব্যাখ্যা করে, কেমন যেন পাপী-মানুষ চায় না সবাই তার অপকর্ম দেখবে। যোহনের ধারণা এর চেয়ে গভীর: যে ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে সে ঈশ্বরের আপনজন নয়; যিশুর আলো শুধু তার অপকর্ম উদ্ঘাটিত করে না, তার অন্তরের প্রকৃত স্বরূপও উদ্ঘাটিত করে।

৩:২১—কিন্তু যে সত্যের সাধক… : যা যা ঈশ্বরের, তা-ই সত্য; এর বিপরীত হল মিথ্যা, অমঙ্গল ইত্যাদি দিয়াবল থেকে উদ্গত দোষগুলো (৮:৪৪; ১ যোহন ২:২১; রো ১:২৫; ২ থে ২:৯…)। 'সত্য'-কে জ্ঞাতব্য বিষয়রূপে বিবেচনা করি বিধায় আমরা সাধারণত বলি 'সত্যকে জানা'। কিন্তু যোহনের বেলায় এরূপ নয়, তাঁর ধারণায় সত্য হল বাস্তবই কিছু, এমনকি (যেমন বলা হয়েছে) ঈশ্বরেরই স্বয়ং বাস্তবতা, ফলে ঈশ্বরেরই মত আচরণ করা উচিত। একথাও মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করতে নেই। 'সত্যের সাধনা করা' ও 'আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া' এই দু'টোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। যে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে সে স্বভাবতই ঈশ্বরের প্রেরিতজনের বাণী শুনবার জন্য ও গ্রাহ্য করার জন্য উপযুক্ত অবস্থায় বিরাজমান; সেই বাণী-ই পূর্ণ সত্য, কেননা তা ঈশ্বরেরই বাণী। যিশুতে আশ্রিত ঈশ্বরের বাণী প্রকাশিত হয় তারই কাছে মাত্র, যে সত্যের সাধক, যে 'সত্য-বাস্তবতা'র সাধন করে থাকে।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শেষ সাক্ষ্যদান (৩:২২-৩০)

৩ [২২] তারপর যিশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে যুদেয়া অঞ্চলে গেলেন। সেখানে তিনি
তাঁদের সঙ্গে থাকলেন ও বাপ্তিস্ম দিলেন। [২৩] যোহনও সালিমের কাছে অবস্থিত

আইনোনে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, কারণ সেখানে প্রচুর জল ছিল, এবং লোকে সেখানে যেত ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করত। [২৪] কেননা যোহন তখনও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হননি। [২৫] তখন এমনটি ঘটল যে, শুচীকরণ সম্বন্ধে একজন ইহুদীর সঙ্গে যোহনের কয়েকজন শিষ্যের তর্ক হল; [২৬] তাই যোহনকে গিয়ে তারা বলল, 'রাব্বি, যর্দনের ওপারে যিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন, আপনি যাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, দেখুন, তিনি বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন আর সকলে তাঁর কাছে যাচ্ছে।' [২৭] যোহন উত্তরে বললেন, 'মানুষ কিছুই পেতে পারে না, যদি না তা স্বর্গ থেকে দেওয়া হয়। [২৮] তোমরা নিজেরাই তো আমার সাক্ষী যে, আমি বলেছিলাম, আমি খ্রিষ্ট নই, কেবল তাঁর আগে আগে প্রেরিত। [২৯] কনেকে যে পায়, সে-ই বর; তবু বরের বন্ধু, যে সেখানে উপস্থিত ও তার কথা শোনে, সে বরের কণ্ঠস্বরে খুবই আনন্দ পায়। তাই আমার এই আনন্দ এখন পরিপূর্ণ। [৩০] তাঁকে উত্তরোত্তর বড় হতে হবে আর আমাকে উত্তরোত্তর ছোট হতে হবে।'

এ বৃত্তান্ত সদৃশ সুসমাচারত্রয়ে উল্লিখিত নয়। এতে যোহন 'সাক্ষ্যদান' প্রসঙ্গটা পুনরালোচনা করেন (১:৬-৮, ১৫ এবং ১:১৭-৩৭) এবং নিকোদেমের সঙ্গে তুলনা করে বিশ্বাসীর প্রকৃত আচরণ দেখাতে চান।

এখানে বলা হয় যে যিশু নিজে বাপ্তিস্ম দিতেন; একথা নিঃসন্দেহে আমাদের কেমন যেন অদ্ভুত লাগে; কিন্তু ৪:২-এ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয় যে আসলে যিশুর শিষ্যেরাই বাপ্তিস্ম দিতেন। তা সত্ত্বেও ঘটনা কিছু রহস্যময় হয়ে থাকে। এবিষয়ে বলা চলে যে, যিশুর শিষ্যদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রাক্তন কয়েকজন শিষ্য ছিলেন: তাঁরা সম্ভবত তাঁদের প্রাক্তন গুরুর কাজ করে চলতেন।

এবার উদ্ধৃতাংশের মুখ্য তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হোক। বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিশুর কাজের জন্য ঈর্ষা বোধ করেন এমন নয়, বরং 'মানুষ কিছুই পেতে পারে না, যদি না তা স্বর্গ থেকে দেওয়া হয়' কথাটায় নিশ্চিত হয়ে তিনি যিশুর কাজে পরম আনন্দিত। তাই এটিই হল বাপ্তিস্মদাতার শিক্ষা: প্রাক্তন ধারণাধারা, জাতিগত কৃষ্টি ও আশা-প্রত্যাশা সকল বিসর্জন দিয়ে আনন্দের সঙ্গে যিশুকেই গ্রহণ করা। সে-ই যিশুর যথার্থ অগ্রদূত বা

প্রচারক, যে তার নিজের কাজ দেখাবার জন্য চিন্তিত নয় বরং অন্তরালে থেকে জগতের মঞ্চে এখনও ক্রিয়াশীল যিশুকে আলোকিত করে।

ঐশপ্রকাশকারী যিশু-ই জীবনদাতা (২য় পর্যায়, ৩:৩১-৩৬)

৩ [৩১] 'ঊর্ধ্বলোক থেকে যিনি আসেন, তিনি সবার ঊর্ধ্বে; পৃথিবী থেকে যে
আসে, সে তো পার্থিব আর পার্থিব কথা বলে। স্বর্গ থেকে যিনি আসেন, তিনি সবার
ঊর্ধ্বে। [৩২] তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন, সেবিষয়েই সাক্ষ্য দেন, অথচ তাঁর
সাক্ষ্য কেউ মেনে নেয় না। [৩৩] কিন্তু যে কেউ তার সাক্ষ্য মেনে নেয়, সে সপ্রমাণ
করে যে, ঈশ্বর সত্যবাদী; [৩৪] কারণ ঈশ্বর যাঁকে প্রেরণ করেছেন, তিনি
ঈশ্বরেরই কথা বলেন, কেননা তিনি কোন সীমা না রেখেই আত্মাকে দান করে
থাকেন। [৩৫] পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, ও তাঁর হাতে সমস্তই তুলে দিয়েছেন।
[৩৬] পুত্রের প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে; অপর দিকে
পুত্রের প্রতি যে অবিশ্বাসী, সে জীবন দেখতে পাবে না। কিন্তু তার উপরে ঈশ্বরের
ক্রোধ থেকে যাচ্ছে।'

৩:৩১—**ঊর্ধ্বলোক থেকে যিনি আসেন, তিনি সবার ঊর্ধ্বে; পৃথিবী থেকে যে আসে, সে তো পার্থিব আর পার্থিব কথা বলে:** এখানে দু'জনের কথা বলা হচ্ছে: একজন ঊর্ধ্বলোক থেকে আসেন, আর একজন আসে পৃথিবী থেকে: এই দু'জনের মধ্যে যে বৈপরীত্য তা-ই নির্দেশিত হয়। ঊর্ধ্বলোক থেকে যিনি আসেন তিনি নিঃসন্দেহে হলেন সেই যিশু যিনি ঐশপ্রকাশকর্তা, পিতার প্রিয়তম পুত্র, স্বর্গ থেকে নেমে আসা মানবপুত্র। 'ঊর্ধ্বলোক থেকে আসা' ও 'পৃথিবী থেকে আসা': এই কথা দু'টোর অর্থ ভৌগলিক শুধু নয়, বরং কথা দু'টো সেই দুই ব্যক্তির সত্তারই উপর আলোকপাত করে: স্বর্গীয় ও পার্থিব, বা ঐশ ও মানবীয় হল বিপরীত দু'টো সত্তা, তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে নেমে আসা স্বর্গীয় প্রেরিতজনের দ্বারা সকল মানুষ 'ঈশ্বরসন্তান' (১:১২) হবার অধিকার পায়, অর্থাৎ ঊর্ধ্বলোক থেকে জন্মলাভের মধ্য দিয়ে (অর্থাৎ বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে) মানুষ

স্বর্গলোকে প্রবেশাধিকার পায় (৩:৩, ৫)। সুতরাং এই পৃথিবী একটা অভিশপ্ত স্থান নয়, দিয়াবলের রাজ্যও নয়। যারা যিশুর কথা অবিশ্বাস করে তারাই মাত্র দোষী বলে সাব্যস্ত হবে।

৩:৩২—তিনি যা দেখেছেন··· সেবিষয়েই সাক্ষ্য দেন: যা প্রত্যক্ষভাবে অবগত আছেন, সেবিষয়েই যিশু সাক্ষ্য দেন। ঈশ্বরপুত্র বলে তিনি যথার্থই বলতে পারেন যে, তাঁর শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজের নয়, 'যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই' (৭:১৬)। এজন্য যিশুর সাক্ষ্য সম্পূর্ণ সত্য, সেই সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে স্বয়ং পিতা আত্মপ্রকাশ করেন এবং মানুষ আলো, মুক্তিলাভের শক্তি ও জীবন অর্জন করে (১৪:৬)। দুঃখের বিষয়: কেউ না কেউ আছে যারা ঐশপ্রকাশকারী যিশুর সাক্ষ্য মেনে না নিয়ে যিশুকেই অগ্রাহ্য করে।

৩:৩৩—যে কেউ তার সাক্ষ্য মেনে নেয়··· : যে যিশুকে ও তাঁর সাক্ষ্য মেনে নেয়, সে হল খ্রিষ্টমণ্ডলী: জগতের কাছে খ্রিষ্টমণ্ডলী আত্মপরিচয় দিয়ে কেমন যেন অবিশ্বাসীদের কাছে ঘোষণা করে, আমরা ঈশ্বরের বাণী মেনে নিই, তাঁর কৃপায় তাঁর আপনজন হলাম। সেই সাক্ষ্য যে সত্যাশ্রয়ী এবং সেই মুক্তিদায়ী প্রতিশ্রুতি যে সুনিশ্চিত, সত্যবাদী ঈশ্বর নিজেই এই সবকিছু সমর্থন করেন। সুতরাং যে মানুষ ঐশপ্রকাশ গ্রহণ করে সে ঈশ্বরের প্রশংসা করে এবং নিজের জীবনে তাঁর বাণীকে কার্যকর হতে দেয়, অর্থাৎ সে অনন্ত জীবন পায়। যোহনের প্রথম পত্রেও (১ যোহন ৫:৯-১২) একই কথা প্রচার করা হয়, এমনকি সেই পত্রে যোহন একথাও বলেন যে, যারা যিশুর ঐশপ্রকাশ অগ্রাহ্য করে তারা ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে। সুতরাং ঈশ্বরের সাক্ষ্য গ্রহণ করে মানুষ তাঁর প্রশংসা করে এবং ঐশমুক্তি লাভ করে।

তাই উপদেশের এই বাক্যেই আরও স্পষ্ট প্রকাশ পায় যিশু ও পিতার সাক্ষ্যের অনন্যতা। পবিত্র শাস্ত্রে ও যিশুর কার্যকলাপেও সেই সাক্ষ্য প্রকাশিত, কিন্তু তবুও বিশেষত তাঁর বাণীতেই সেই সাক্ষ্যের অভিব্যক্তি ঘটে। ঐশপ্রকাশকারী হিসাবে যিশু

পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত; যারা তাঁকে অবজ্ঞা করে তারা পিতাকেও অবজ্ঞা করে; যারা তাঁকে গ্রহণ করে তারা পিতার সাক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ক'রে তা ফলপ্রদ করে।

৩:৩৪—কারণ ঈশ্বর যাঁকে প্রেরণ করেছেন… : যিশু সাক্ষ্যদান করেন যাতে ঈশ্বর থেকে দূরবর্তী জগৎ ঈশ্বরের জীবনদায়ী বাণী জানতে পারে। 'প্রেরণ' কথাটা সেই ইহুদী রীতিনীতির দিকে অঙুলি নির্দেশ করে যা অনুসারে প্রেরণকর্তার যে মূল্য প্রেরিতজনও একই মূল্যের অধিকারী। একথা সদৃশ সুসমাচারত্রয়েও সমর্থন পায় (মার্ক ৯:৩৭; লুক ৯:৪৮; মথি ১০:৪০)। কিন্তু, তাছাড়া যোহন আর একটা গভীরতর কারণ উল্লেখ করেন (১২:৪৪… ; ১৩:২০…): শুধু একটা রীতিনীতি গুণে নয়, প্রকৃতপক্ষে প্রেরণকর্তা-পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলেই প্রেরিতজন-যিশুর সাক্ষ্য মূল্যবান; পিতা যে শুধু যিশুকে জানিয়েছেন কি কি বলতে হয় তা নয়, যিশুর নিজের বাণী-সকলের মধ্য দিয়ে তিনিই আত্মপ্রকাশ করেন (১৪:১০)। সংক্ষেপে, প্রেরণকর্তা এবং প্রেরিতজন এক; যারা প্রথমজনকে দেখে তারা দ্বিতীয়জনকেও দেখে (১২:৪৫) এবং যারা যিশুকে শোনে তারা পিতাকেও শোনে।

পুরাতন নিয়মের নবীগণও ঈশ্বরের বাণী ঘোষণা করতেন, কিন্তু ঐশপ্রকাশকর্তা যিশুর সঙ্গে তাঁদের কোনও তুলনা করা যায় না, কারণ যিশু 'সীমা না রেখেই আত্মাকে দান করে থাকেন' (৩:৩৩); তিনি ত পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ, পবিত্র আত্মা তাঁর উপর থাকেন (১:৩৩) বলেই তিনি সেই আত্মায় বাপ্তিস্ম দিতে পারেন এবং তাঁর বাণীসকলই আত্মা ও জীবন (৬:৬৩)। অফুরন্ত ঝরনাস্বরূপ যিশু থেকেই বিশ্বাসীগণ ঐশআত্মাকে গ্রহণ করুক, তবে যিশুরই প্রতি বিশ্বাস রেখে পরিত্রাণ পাবে। এ ব্যাখ্যায় ঐশ ত্রিত্ব সম্বন্ধীয় যোহনের ধারণা গভীরভাবে পরিস্ফুট হয়: ঐশপ্রকাশকর্মে ও ত্রাণকর্মে রত পিতা ও পুত্র উভয়ে পবিত্র আত্মা দ্বারা একত্রিত। পিতা পবিত্র আত্মায় পুত্রকে পরিপূর্ণ করেন এবং ত্রাণকর্তা যিশু তাঁর নিজের বাণী ও বিশেষত ক্রুশের উপরে তাঁর উত্তোলন-গৌরবায়নের ফলে সেই আত্মাকে মানুষের কাছে প্রদান করেন।

৩:৩৫—পিতা পুত্রকে ভালবাসেন: পুত্রকে ভালবাসেন বিধায়ই পিতা তাঁকে ঐশআত্মায় পরিপূর্ণ করেন। উপরন্তু এই বাক্যে একথাও ব্যক্ত হয় যে, পিতার কাছে পুত্র পূর্ণ অধিকারপ্রাপ্ত: যিশুই একমাত্র শেষ ও চরম ঐশপ্রকাশকর্তা, তিনিই পরিত্রাণের পথ, একমাত্র দিশারী এবং একমাত্র ত্রাণকর্তা।

কি করে মানুষ পরিত্রাণ পেতে পারে তা ৩৬ পদে প্রকাশিত: 'পুত্রের প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে'। যিশুর প্রতিশ্রুত পরিত্রাণের অংশী হতে হলে বিশ্বাসেরই একান্ত প্রয়োজন, এমন বিশ্বাস যার মাধ্যমে মানুষ যিশুতে লীন হয়।

গ্রীক জ্ঞান-মার্গপন্থীরা মনে করত তারা তাদের অন্তরে গুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান পরিত্রাণ আবিষ্কার করত, অপর দিকে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস পৃথিবীতে নেমে আসা ঈশ্বরপুত্রের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তিনিই স্বর্গের উদ্দেশে পথ ও মাধ্যম-মধ্যস্থ। বিশেষ লক্ষ করার বিষয় এই যে, খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ ইতিমধ্যেই অনন্ত জীবন বা ঐশজীবন-প্রাপ্ত: যিশু কেবল একটা প্রতিশ্রুতি নয়, জীবন-ই দান করতে এসেছেন; যিশুতেই, যিশুরই মাধ্যমে এবং যিশুরই সঙ্গে ঐক্যলাভে বিশ্বাসীগণ সেই ঐশজীবন পায়। তাঁর উপর নির্ভর করা কিন্তু যথেষ্ট নয়, যিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ করেই (৩:৩৩) মানুষ তাঁর সঙ্গে ঐক্য লাভ করুক। তা-ই করে বিশ্বাসী মৃত্যু থেকে জীবনেই উপনীত হয়। একথার অর্থ এই নয় যে, বিশ্বাসী ইতিমধ্যে সম্পূর্ণরূপেই ঐশজীবন পেয়ে গেছে; ঐশজীবনের পূর্ণতা সে লাভ করবে তখনই যখনই যিশু তাঁর বিশ্বাসীসকলকে পুনরুত্থিত করবেন (৬:৩৯…)। সুতরাং বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য এরূপ: যিশুর প্রতি বিশ্বাস রেখে মানুষ ইতিমধ্যে ঐশজীবনের অংশী হতে শুরু করে এবং সেই জীবনের অংশী বলে জীবনযাপন করে যতদিন না নিজের পুনরুত্থানের সময়ে সেই জীবনের পূর্ণতা লাভ করবে। ইতিমধ্যেই ঐশজীবনের অংশী হবার একমাত্র শর্ত হল যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখা।

পদটির দ্বিতীয় অংশ এই ধারণা অন্য কথায় ব্যক্ত করে: যে পুত্রের প্রতি বিশ্বাস রাখে না সে এখন ও ভবিষ্যতেও ঐশজীবন পাবে না; সে ইতিমধ্যেই মৃত্যুর কবলে আবদ্ধ রয়েছে, এমনকি তার উপর ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে যাচ্ছে। 'ক্রোধ' কথায় আমরা বুঝি, অবিশ্বাসী যারা তারা ইতিমধ্যে ঈশ্বরের কাছে দোষী; ঈশ্বর মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করেন না, মানুষ নিজেই যিশুকে অগ্রাহ্য করে মুক্তিলাভ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে।

সুতরাং, মানুষ একটা সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হয়: যদি যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখে তাহলে ঐশপরিত্রাণ পায়; যদি যিশুকে অগ্রাহ্য করে তাহলে ঐশপরিত্রাণও অগ্রাহ্য করে।

পরিশিষ্ট

যোহনের সুসমাচারে 'মানবপুত্র' যিশু

চতুর্থ সুসমাচারে যিশুকে বার বার 'মানবপুত্র' বলে অভিহিত করা হয়। মানবপুত্র নামটির মধ্য দিয়ে যোহন যিশুর কোন্ অধিকার-বিশেষ লক্ষ করেন এবিষয়ে এখানে আলোচনা করা হবে। এই পরিশিষ্ট দু' ভাগে ভাগ করা হোক: যোহন অনুসারে 'মানবপুত্র' যিশু এবং যোহন ও সদৃশ সুসমাচারত্রয়ে 'মানবপুত্র' যিশু।

যোহন অনুসারে 'মানবপুত্র' যিশু: চতুর্থ সুসমাচারে তেরো বার করে যিশুকে মানবপুত্র বলে অভিহিত করা হয়; এপ্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে সংক্ষিপ্ত একটা তালিকা দেওয়া যাক:

১:৫১ - মানবপুত্রের উপর দিয়ে স্বর্গদূতদের ওঠা-নামা।

৩:১৩ - স্বর্গ থেকে নেমে আসা মানবপুত্রই মাত্র স্বর্গে গিয়ে উঠেছেন।

৩:১৪ - মরুপ্রান্তরে সেই সাপ-প্রতীকের মত মানবপুত্রকেও উত্তোলিত হতে হবে।

৫:৭ - মানবপুত্র বলেই পুত্র বিচার-অধিকারপ্রাপ্ত।

৬:২৭ - মানবপুত্র অনন্ত জীবনের জন্য খাদ্য দান করেন।

৬:৫৩ - ঐশজীবন পেতে হলে মানুষ মানবপুত্রের মাংস খাবে ও তাঁর রক্ত পান করবে।

৬:৬২ - মানবপুত্র স্বর্গে আরোহণ করবেন।

৮:২৮ - ইহুদীরা মানবপুত্রকে উত্তোলন করবে।

৯:৩৫ - জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়ে যিশু তাকে জিজ্ঞাসা করেন মানবপুত্রের উপর তার বিশ্বাস আছে কিনা।

১২:২৩ - সেই ‘ক্ষণ’ উপস্থিত হয়েছে যখন মানবপুত্রকে গৌরবান্বিত হতে হয়।

১২:৩৪গ - মানবপুত্রকে উত্তোলিত হতে হয়।

১২:৩৪ঘ - জনতার জিজ্ঞাসা : এই মানবপুত্র বা কে?

১২:৩১ - মানবপুত্রের গৌরবায়ন সংক্রান্ত একটা বচন।

এই তালিকা থেকে এখন আমরা সদৃশ ধারণা অনুযায়ী উদ্ধৃতাংশগুলি ভাগ করব :

– তিনিই মানবপুত্র যিনি ক্রুশের উপরে উত্তোলিত হলেন, গৌরবান্বিত হলেন এবং স্বর্গে আরোহণ করলেন (৩:১৩-১৪; ৬:৬২; ৮:২৮; ১২:২৩-৩৪গ; ১৩:৩১ …)। সুতরাং এই বিশেষ নামের মাধ্যমে যোহন ক্রুশের উপরে যিশুর ‘উত্তোলন-গৌরবায়ন-স্বর্গারোহণ’ ধারণা তিনটি একটিমাত্র ধারণা বলে অনুধাবন করেন।

– মানবপুত্ররূপে স্বয়ং যিশুই সেই রুটি যা তিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বা প্রভুর ভোজে যোগদানকারীদের দান করেন: জগৎকে জীবনদানকারী স্বর্গ থেকে নেমে আসা রুটি হলেন স্বয়ং মানবপুত্র যিনি আগে যেখানে ছিলেন সেখানে আবার আরোহণ করবেন; স্বয়ং মানবপুত্রই সেই খাদ্য দান করেন, যে-খাদ্য অনন্ত জীবন পাবার জন্য অদ্বিতীয় শক্তিস্বরূপ (৬:২৭, ৫৩, ৬২)। এখানেই উল্লিখিত এবং উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতাংশগুলির মধ্যকার সংযোজক সূত্র হল ‘নেমে আসা ও আরোহণ করা’ ধারণাটা: ক্রুশের উপরে ‘উত্তোলিত-গৌরবান্বিত’ এবং ‘স্বর্গ থেকে নেমে আসা আর পুনরায় স্বর্গে আরোহণকারী’ মানবপুত্রই তিনি, যিনি—ব্যক্তি হিসাবেই দিব্য রুটি এবং পবিত্র সাক্রামেন্ত হিসাবেই রুটি—অনন্ত ঐশজীবন দান করেন। এখানে উল্লিখিত উদ্ধৃতি তিনটি ৬ অধ্যায়ের কথার অর্থ অনুভব করার জন্য চাবিকাঠিস্বরূপ।

– মানবপুত্রই মশীহ: তা জনতার প্রশ্ন দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় (৯:৩৫; ১২:৩৪)।

– মানবপুত্রই অন্তিমকালের বিচারকর্তা (৫:২৭))। এবিষয়ে একথা উল্লেখযোগ্য যে, যখন ক্রুশের উপরে উত্তোলিত তখনই তিনি জগতের অধিপতি সেই দিয়াবলের বিচার করেন (১২:৩১ … ; ১৬:১১)।

– পৃথিবীস্থ মানবপুত্র স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের সঙ্গে অবিরতই সংযুক্ত (১:৫১)। উপরন্তু, এই পদে স্বর্গ থেকে নেমে আসা এবং স্বর্গে ফিরে যাওয়া মানবপুত্রের প্রসঙ্গও সূচিত। কারণটা ৩:১৩-এ ব্যক্ত: আদিতে মানবপুত্র স্বর্গে ছিলেন, সেখান থেকে এজগতে নেমে এসে বিশ্বাসীদের সঙ্গে আবার স্বর্গারোহণ করবেন।

বিশ্লেষণ শেষ করে মানবপুত্র বিষয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মানবপুত্র যিশুর স্বর্গ থেকে নেমে আসাটা ও তাঁর স্বর্গারোহণের মাধ্যমে তেরোটি পদ একটামাত্র প্রসঙ্গে একত্রিত: যিশুর উপরে মানবপুত্রের নাম-অধিকার আরোপ করায় যোহন তাঁকে মশীহ, জীবনদাতা ও বিচারকর্তা বলে ঘোষণা করেন।

যোহন ও সদৃশ সুসমাচারত্রয়ে 'মানবপুত্র' যিশু: অপরাপর সুসমাচারের সঙ্গে মানবপুত্র বিষয়ে চতুর্থ সুসমাচারের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। চারটি সুসমাচার অনুসারে মানবপুত্রই বিচারকর্তা এবং উত্তোলিত, ক্রুশবিদ্ধ ও গৌরবান্বিত যিশু। কিন্তু এবিষয় স্মরণযোগ্য যে, সদৃশ সুসমাচারত্রয় অনুযায়ী মানবপুত্র অন্তিমকালেরই বিচারকর্তা এবং মৃত্যুর পরেই গৌরবান্বিত হন। অপর দিকে (যেমন বলা হয়েছে) যোহনের ধারণায় মানবপুত্র ইতিমধ্যেই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের বিচারকর্তা এবং তাঁর মৃত্যুই তাঁর গৌরব, কেননা ক্রুশের উপরে তাঁর উত্তোলন যথার্থই গৌরবায়ন।

বৈসাদৃশ্য হিসাবে একথা উল্লেখ করা যায় যে, সুসমাচারত্রয় অনুযায়ী পৃথিবীস্থ মানবপুত্রের কয়েকটা দৃশ্য বা ধারণা যোহনের সুসমাচারে স্থান পায় না, যেমন: পাপক্ষমার অধিকার, সাব্বাৎ দিনের উপর প্রভুত্ব, এবং মাথা রাখবার জায়গার অভাব।

একথার উপসংহারে বলতে পারি, যোহন সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের ঐতিহ্য অবগত হলেও এবং মোটামুটি তা অনুসরণ করলেও তবু মানবপুত্র প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র একটা দৃষ্টিভঙ্গি গড়েছেন; এই দৃষ্টিভঙ্গি সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের বিপরীত নয়, বরং সেগুলোর গভীর একটা নবীকরণ।

সামারিয়ায় যিশুর আত্মপ্রকাশ (৪:১-৪২)

১। এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শুরু করার আগে, আসুন, সামারিয়ায় যিশুর আত্মপ্রকাশের বিবরণীর মুখ্য ও স্বতন্ত্র উপাদানগুলোর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করি।

– যেরুশালেমবাসীদের (২:২৩-২৫) ও নিকোদেমের মত ইহুদী ধর্মীয় নেতাদের নগণ্য বিশ্বাসের বৈপরীত্যে এবং ফরিশীদের প্রতিকূলতারও বৈপরীত্যে (৪:১-৩) এখানে সামারিয়া-অধিবাসীদের নির্মল বিশ্বাস ও মর্মস্পর্শী হৃদ্যতা প্রকাশ পায়: এরা 'আধা-বিধর্মী' হলেও যিশুকে গ্রহণ করার জন্য নিজেদের অন্তর ও গৃহ উন্মুক্তই করে। সুতরাং এদিকে রয়েছে ঈশ্বরের মনোনীত জনগণের অবিশ্বাস এবং অপর দিকে রয়েছে বিধর্মীদের বিশ্বাস।

– এখানে বিবৃত ঘটনার মধ্য দিয়ে সুসমাচারের সার্বজনীন উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে: কেবল ইহুদীদের নয়, সমগ্র জগতের ত্রাণকর্তারূপে যিশু আত্মপ্রকাশ করেন (৪:৪২)। যোহনের স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর অধিকাংশ প্রাক্তন বিজাতীয় সদস্যদর জন্য একথা অবশ্যই আনন্দদায়ী ছিল।

– এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে যোহন নিজের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কাছে উপাসনা বিষয়ে গভীর শিক্ষা দিতে অভিপ্রেত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সামারীয় নারীর কাছে যিশুর যথাযথ ও অনুপ্রেরণাদায়ী আত্মপ্রকাশ পরবর্তী যুগের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য, এমনকি আমাদেরও জন্য প্রযোজ্য।

২। যোহনের বর্ণনা সঠিকভাবে অনুভব করতে হলে যিশুর ব্যবহৃত মনস্তাত্ত্বিক বা পালকীয় পদ্ধতির উপর নয় বরং রচয়িতার পরিকল্পিত বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব দিতে হয়, বিষয়বস্তুটি হল যিশুর আত্মপ্রকাশ ও সামারীয় নারীর বিশ্বাসের ক্রমবর্ধমান বিকাশ; সংক্ষেপে, আত্মপ্রকাশ এবং বিশ্বাস। আত্মপ্রকাশ ও বিশ্বাসের ক্রমবর্ধমান বিকাশ নির্দেশিত হয় নারীর নিম্নলিখিত উক্তি দ্বারা:

– আপনি ত ইহুদী (৪:৯),
– আপনি প্রভু (৪:১১),
– আপনি যাকোবের চেয়েও মহান (৪:১২),

– আপনি নবী (৪:১৯),
– আপনি সেই মশীহ (খ্রিষ্ট) (৪:২৫, ২৯),
– আপনি জগতের ত্রাণকর্তা (৪:৪২)।

৩। স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হয় যে এই বর্ণনা কৌশলে গঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক একটা ঘটনা। যিশু ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তাঁর আত্মপ্রকাশ জগতের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত এবং তা-ই বলেই তাঁর বাণী ও কাজসকল আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিস্বরূপ।

৪। এই ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে যোহন আগেকার আলোচিত তিনটি প্রসঙ্গের দিকে আমাদের মন আকর্ষণ করেন: ক। সেই জীবনময় জল যা শুধু যিশু দিতে পারেন (কানা গ্রামে উত্তম আঙুররস দ্রষ্টব্য), খ। আত্মা ও সত্যের শরণে পিতাকে উপাসনা (মন্দিরের কথা দ্রষ্টব্য) এবং গ। 'বীজবুনিয়ের' কাজ ও ফসলের জন্য আনন্দ। এই প্রসঙ্গ তিনটির মধ্য দিয়ে যিশুর আত্মপ্রকাশ অধিকতর সূক্ষ্ম ও যথাযথ হয়ে ওঠে, এমনকি সেগুলির মাধ্যমে আমরা আবিষ্কার করতে শুরু করতে পারি সেই আত্মপ্রকাশের গভীরতম ভিত্তি, তথা: প্রেরণকর্তা পিতার সঙ্গে যিশুর ঐক্য (৪:৩৪)।

ভূমিকা (৪:১-৬)

৪ [১] যিশু যখন জানতে পারলেন, ফরিশীরা শুনতে পেয়েছিলেন যে তিনি
যোহনের চেয়ে বেশি শিষ্য করেন ও বাপ্তিস্ম দেন [২]—যদিও যিশু নিজে কাউকে
বাপ্তিস্ম দিতেন না, তাঁর শিষ্যেরাই দিতেন,—[৩] তখন তিনি যুদেয়া ছেড়ে আবার
গালিলেয়ার দিকে চলে গেলেন। [৪] তাঁকে সামারিয়ার ভিতর দিয়েই যেতে হল।
[৫] যেতে যেতে তিনি শিখার নামে সামারিয়ার একটা শহরে এলেন; যাকোব তাঁর
সন্তান যোসেফকে যে জমিটা দিয়েছিলেন, সেই শহর তারই কাছাকাছি।
[৬] যাকোবের কুয়োটা সেইখানে ছিল, আর যিশু যাত্রার জন্য ক্লান্ত হওয়ায় সেই
কুয়োর ধারে বসে পড়লেন। তখন প্রায় বেলা বারোটা।

ফরিশীরা তাঁর প্রতি বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেছে জেনে যিশু (অবশ্যই তাদের ভয়ে নয়, যেহেতু তিনি পিতার ইচ্ছা পালনে সর্বদা রত) তাদের সঙ্গে তর্ক করবেন না তেমন সিদ্ধান্ত নিয়ে সামারিয়ার মধ্য দিয়ে গালিলেয়ার দিকে রওনা হন। সামারিয়ার কথা বিষয়ে ঐতিহাসিক একটা ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা প্রয়োজনীয় হতে পারে; তাতে এই অধ্যায়ে বিবৃত ঘটনা আরও বোধগম্য হয়ে উঠবে।

শলোমন রাজার মৃত্যুর পর (৯২৬ খ্রিঃ পূঃ) এফ্রাইম ও যুদা দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধিতা উৎপন্ন হওয়ার ফলে রাজ্যের বিচ্ছেদ ঘটে: ইস্রায়েল বা উত্তর রাজ্য এবং যুদা বা দক্ষিণ রাজ্য; সামারিয়া অঞ্চলটা ছিল উত্তর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর রাজ্য দুই শতকব্যাপী স্বতন্ত্রভাবে চলার পর সামারিয়া অঞ্চলের পতনে (৭২১ খ্রিঃ পূঃ) তার অভিজাত শ্রেণি দেশছাড়া হয়ে বিদেশে চলে যায় এবং তাদের জায়গায় বিজাতীয়দের আনা হয়: এই সময় থেকে সামারিয়া অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি বসতি করে, আর তারা ইস্রায়েলের একমাত্র ঈশ্বরকে ছাড়া কতিপয় দেব-দেবীকেও পূজা করে। অজানা কারণে, পরবর্তীকালে ইহুদী ও সামারীয়দের মধ্যে ধর্মীয় বিচ্ছেদের সৃষ্টি হওয়ার ফলে সামারীয়রা শিখার শহরের কাছে অবস্থিত গারিজিম পর্বতে একটা মন্দির নির্মাণ করে। উপরন্তু তারা বাইবেলের কেবল পঞ্চপুস্তকই পবিত্র শাস্ত্র বলে মানত। পবিত্র শাস্ত্রের একটা ভাববাণী অনুসারে তারা 'তা এব্' নামক একজন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মশীহের অপেক্ষা করত। এই সকল কারণের জন্য সামারীয়রা ইহুদীদের ঘৃণা করত, এমনকি যিশুর সময়ে একজন ইহুদী পথিক তাদের অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাত্রা করলে তারা তাকে অত্যাচার করত। অপর দিকে ইহুদীরাও সামারীয়দের ঘৃণা করত এবং তাদের বিধর্মী ও অশুচি মনে করত।

সামারীয় নারীর সঙ্গে যিশুর সংলাপ (৪:৭-২৬)

৪ [৭] সামারীয় একজন স্ত্রীলোক জল তুলতে এল; যিশু তাকে বললেন, 'আমাকে একটু জল খেতে দাও।' [৮] তাঁর শিষ্যেরা তখন খাবার কিনতে শহরে গিয়েছিলেন। [৯] সামারীয় স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'ইহুদী হয়ে আপনি কেমন করে

সামারীয় স্ত্রীলোক এই আমারই কাছে জল চাইতে পারেন?' বাস্তবিকই সামারীয়দের সঙ্গে ইহুদীরা কোন মেলামেশাই করে না। [১০] উত্তরে যিশু তাকে বললেন, 'তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান আর কেইবা তোমাকে বলছেন, আমাকে একটু জল খেতে দাও, তাহলে তুমিই তাঁর কাছে চাইতে, আর তিনি তোমাকে জীবনময় জল দিতেন!' [১১] স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'প্রভু, জল তোলার মত আপনার কিছু নেই, আর কুয়োটা গভীর; আপনি কোথা থেকে সেই জীবনময় জল পাবেন? [১২] যিনি এই কুয়োটা আমাদের দিয়ে গেছিলেন, এর জল নিজেও খেয়েছিলেন আর যাঁর সন্তানেরা ও পশুপালও খেয়েছিল, আপনি কি আমাদের পিতৃপুরুষ সেই যাকোবের চেয়েও মহান?' [১৩] যিশু তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'যে কেউ এই জল খায়, তার আবার তেষ্টা পাবে; [১৪] কিন্তু আমি যে জল দেব, সেই জল যে খাবে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না; আমি তাকে যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।' [১৫] স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'প্রভু, তেমন জল আমাকে দিন, আমার যেন আর তেষ্টা না পায়, এখানে জল তুলতেও যেন আর আসতে না হয়।' [১৬] যিশু তাঁকে বললেন, 'যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এখানে ফিরে এসো।' [১৭] স্ত্রীলোকটি উত্তরে তাঁকে বলল, 'আমার স্বামী নেই।' যিশু তাঁকে বললেন, 'ঠিকই বলেছ, আমার স্বামী নেই; [১৮] কেননা তোমার পাঁচটা স্বামী হয়েছিল আর এখন যার সঙ্গে আছ, সে তোমার স্বামী নয়। হ্যাঁ, তুমি সত্যকথা বলেছ।' [১৯] স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'প্রভু, দেখতে পাচ্ছি, আপনি একজন নবী। [২০] আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পর্বতে উপাসনা করতেন, আর আপনারা কিনা বলে থাকেন, উপাসনা করার স্থান যেরুশালেমেই আছে।' [২১] যিশু তাঁকে বললেন, 'নারী, আমাকে বিশ্বাস কর, সেই ক্ষণ আসছে, যখন তোমরা পিতার উপাসনা করবে এই পর্বতেও নয়, যেরুশালেমেও নয়। [২২] তোমরা যা জান না, তার উপাসনা করে থাক; আমরা যা জানি, তারই উপাসনা করি, কেননা পরিত্রাণ ইহুদীদের মধ্য থেকেই আসে। [২৩] কিন্তু সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতার উপাসনা করবে, কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন। [২৪] ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়।' [২৫] স্ত্রীলোকটি বলল, 'আমি জানি যে, খ্রিষ্ট বলে অভিহিত মশীহ

আসছেন; তিনি যখন আসবেন, তখন সমস্তই আমাদের জানাবেন।' [২৬] যিশু তাকে বললেন, 'আমি-ই আছি, এই আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি।'

যিশুই সংলাপ আরম্ভ করেন: পথশ্রান্ত ও পিপাসিত হয়ে তিনি জল প্রার্থনা করেন; সামারীয় বলে নারী তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে চায়। সংলাপকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

১। যিশু জীবনময় জলদাতা (৪:১০-১৫)।
২। ঐশপ্রকাশকারী যিশু দ্বারা সামারীয় নারীর অবস্থা-প্রকাশ (৪:১৬-১৯)।
৩। আত্মা ও সত্যের শরণে পিতার উপাসনা (৪:২০-২৪)।
৪। মশীহরূপে (খ্রিষ্টরূপে) যিশুর পূর্ণ আত্মপ্রকাশ (৪:২৫-২৬)।

যিশু জীবনময় জলদাতা (৪:১০-১৫)

৪:১০—তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান: নিকোদেমের সঙ্গে সংলাপের মত এবারও যিশু সংলাপের স্বাভাবিক পর্যায় অতিক্রম করে সরাসরি রহস্যময় একটা কথা ঘোষণা করেন: তিনি এমন গুরু নন যিনি সমালোচনা-সাপেক্ষ কথা বলেন বরং তিনি সর্বদা ঐশপ্রকাশকারী ব্যক্তি যিনি জীবনময় ও অপূর্ব বাণী ঘোষণা করেন। 'ঈশ্বরের দান' হল সেই জীবনময় জল যা শুধু তিনিই দান করতে পারেন। সেইসময় 'ঈশ্বরের দান' কথাটায় ইহুদীরা বুঝত ঐশবিধান ও সেই সবকিছু যা মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর দান করেন। পরবর্তীকালে, আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর সময়, সেই কথা পবিত্র আত্মার দিকে ছুটে চলত (শিষ্য ২:৩৮; ৮:২০; ইত্যাদি) এবং একই কথায় প্রেরিতদূত পল ঈশ্বরের ন্যায্যতা ও অনুগ্রহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেন (রো ৫:১৭; ২ করি ৯:১৫; এফে ৩:৭; ইত্যাদি)। সুতরাং, মানব-পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর যা করতে প্রস্তুত, ঈশ্বরের দান সেই জীবনময় জল তারই প্রতীক হয়ে ওঠে।

জলশূন্য পালেস্তাইন দেশের অধিবাসীদের কাছে জল কতিপয় জিনিসের প্রতীক ছিল: জল দিয়ে ধোওয়া হয়, পিপাসা মেটানো হয়, জমি চাষ করা হয় প্রভৃতি। জল

বিষয়ে পুরাতন নিয়ম বলে স্বয়ং ঈশ্বরই জীবনময় জলের উৎস (যেরে ২:১৩) এবং তিনি তাঁর অমৃতধারায় তাঁর উপাসকদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দেন (সাম ৩৬:৯); পরবর্তীকালে জল ঐশপ্রজ্ঞা, ঐশবিধান ও পবিত্র আত্মার প্রতীক হয়ে উঠল। জ্ঞান-মার্গপন্থীরা ঐশবাণীর উপর জলের প্রতীক আরোপ করত। সুতরাং একথা বলা চলে যে, জলের বিবিধ প্রতীকে যোহন সর্বগুণমন্ডিত যিশুরই দিকে নির্দেশ করেন: কেবল যিশুই ঈশ্বরের যাবতীয় দান সম্পাদন করতে পারেন, এমনকি তিনি নিজেই ঈশ্বরের সত্যকার ও শ্রেষ্ঠ দান।

নিকোদেমের মত সামারীয় নারীও যিশুর কথার গভীর অর্থ উপলব্ধি করতে অক্ষম। সে জানতে চায় তিনি কলসি ছাড়া 'কোথা থেকে' জল তুলবেন। আগেও লক্ষ করেছি, যোহনের ধারণায় 'কোথা থেকে' কথা কত না গুরুত্বপূর্ণ: কানা গ্রামের ভোজকর্তাও জানতে চেয়েছিল নব আঙুররস কোথা থেকে এসেছিল এবং নিকোদেমের সঙ্গে সংলাপে রহস্যময় বাতাস যে কোথা থেকেই বা আসে কথাটা বার বার উঠেছিল। এই জিজ্ঞাসার উত্তর পূর্ণ প্রকাশ পাবে ৭:২৭; ৮:১৪ প্রভৃতিতে। তবুও ইতিমধ্যেই আমরা অনুমান করতে পারি, কানা গ্রামের নব আঙুররস ও এই অধ্যায়ের জীবনময় জল, অর্থাৎ যিশুর সকল দান ঊর্ধ্বলোক থেকেই আসে (৩:৩, ৭, ৩১)।

৪:১৩—যে কেউ এই জল খায়… : নিকোদেমের সঙ্গে সংলাপের মত এবারও যিশু স্পষ্টতরভাবে নিজের প্রচ্ছন্ন উক্তি ব্যাখ্যা করেন: তিনি কুয়োর জলের সঙ্গে ব্যস্ত নন, তিনি অন্য ধরনের জলের কথা বলছেন, যে-জল খেলে আর পিপাসা পাবে না। এই বাক্যের মাধ্যমে যিশু পুরাতন নিয়মের কতিপয় ভাববাণীর সিদ্ধি ঘটান (ইশা ৪৯:১০; ৫৮:১১; যেরে ৩১:২৫; আমোস ৮:১১ প্রভৃতি):

> ওহে, তৃষিত লোকসকল, জলের কাছে এসো…।
> আমার কথা কান পেতে শোন, …
> কান দাও, আমার কাছে এসো;
> শোন, তবেই তোমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত হবে। [ইশা ৫৫:১-৩]

যিশুই উপস্থিত সেই ত্রাণকর্তা যিনি তাঁর বিশ্বাসীদের ইতিমধ্যেই পরিত্রাণের জল দান করেন। উপরন্তু, যিশুর জল 'মানুষের অন্তরে··· জলের উৎস হবে': ঈশ্বরের দান মানুষকে পরিপূর্ণ করে এবং সৎকর্মের পথে তাকে চালনা করে। এই জলের উৎস 'অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী', অর্থাৎ যিশুর সম্পাদিত ঐশদান এখন থেকে চিরকাল পর্যন্ত জীবন্ত ও ফলপ্রসূ হয়ে থাকবে। এই বিশ্লেষণ থেকে অনুমান করা যায়, যিশুর দানের কথা পবিত্র আত্মা ও ঐশজীবনে প্রযোজ্য: পবিত্র আত্মাই প্রাণের সৃজনশীল মূলকারণ (৬:৬৩); যিশু পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ এবং যাতে তাঁর বিশ্বাসীরা সেই আত্মাকে গ্রহণ করে (৭:৩৯···) সেই ঐশআত্মায় তাদের বাপ্তিস্ম দেন (১:৩৩)। ঐশজীবনও প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের দান, কেননা যে জীবন্ত বাস্তবতাকে পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে সঞ্চার করেন, সেটাই ঐশজীবন।

সেই নারী কিন্তু যিশুর কাছে এমন জল চায় যা পেয়ে প্রতিদিন কুয়োর ধারে যাওয়া আর প্রয়োজন হবে না।

ঐশপ্রকাশকারী যিশু দ্বারা সামারীয় নারীর অবস্থা-প্রকাশ (৪:১৬-১৯)

৪:১৬—যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে···: যিশু নারীর কথায় কান না দিয়ে সংলাপের প্রকৃত বিষয়ে ফিরে আসেন। নারীর অবস্থা প্রকাশ করায় তিনি সেই ঐশপ্রকাশকারী ব্যক্তি বলে আত্মপরিচয় দেন যিনি মানুষের অন্তরের গভীরতম স্থল তলিয়ে দেখতে পান ও তা-ই করে বিশ্বাসের পথে চলছে যে নারী তাকে সাহায্য করেন: প্রাক্তন জীবনে কতগুলি পাপ মানুষ করেছে এ বড় কথা নয়, একমাত্র প্রয়োজন সে যেন যিশুর সাক্ষাতে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে।

৪:১৯—প্রভু, দেখতে পাচ্ছি, আপনি একজন নবী: বাস্তবিকই, নারী বিশ্বাসের পথে এগিয়ে যায়: 'নবী' বলায় সে এখন বুঝতে পাচ্ছে যিশু সাধারণ একজন ইহুদী নন, বরং অসাধারণ ব্যক্তি।

আত্মা ও সত্যের শরণে পিতার উপাসনা (৪:২০-২৪)

নারী এবার ধর্মীয় বিষয়েই যিশুর সঙ্গে তর্ক করতে চায়। কিন্তু যিশু তার কথার উপর ভিত্তি করে নিজের আত্মপ্রকাশ উন্মুক্ত করতে থাকেন: 'নারী, আমাকে বিশ্বাস কর, সেই ক্ষণ আসছে…': অর্থাৎ সেই ক্ষণ আসন্ন যখন উপাসনার জন্য আর কোনও মন্দিরের প্রয়োজন হবে না; এমনকি সেই সময়, সেই ক্ষণ এখনই উপস্থিত, যিশুর আগমনেই ক্ষণটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে: তিনি ঈশ্বরের নব ও অপূর্ব উপাসনার কথা ঘোষণা করেন, মানুষ ঈশ্বরকে প্রকৃতপক্ষে পিতা বলেই উপাসনা করবে এবং সামারীয়রাও সেই ক্ষণ থেকে পিতা বলে তাঁকে উপাসনা করতে আহূত।

৪:২২—তোমরা যা জান না… : নব-উপাসনার কথা ব্যাখ্যা করার আগে যিশু পরিত্রাণের ইতিহাসে ইহুদীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন: তারা হল ঈশ্বরের যথার্থ প্রাক্তন উপাসক এবং তাদের মধ্য থেকেই মশীহ আবির্ভূত হবেন। এতে একথা বলা হয় না যে কেবল ইহুদীরা ঈশ্বরের উপাসনা করবে, বরং ঈশ্বর তাদের উপর বিশেষ একটা ভূমিকা আরোপ করেছিলেন; এখন সেই ভূমিকাকে অতিক্রম করা হল, সকলেই পিতা ঈশ্বরের উপাসনা করতে সক্ষম। অধিকন্তু, যিশু আর একটা বিষয়ের দিকে নারীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন, তথা: প্রাচীন ঘৃণা ত্যাগ করে সামারীয়রা স্বীকার করুক যে, মশীহ একজন ইহুদী।

৪:২৩—কিন্তু সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এখনই উপস্থিত: ইতিমধ্যেই মানুষ জানে ঈশ্বর তার পিতা এবং 'আত্মা ও সত্যের শরণে' তাঁর উপাসনা করবে: যারা আত্মা থেকে জনিত, অর্থাৎ খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ, তারাই ঈশ্বরকে পিতা বলে চিনবার ও তেমন পিতার কাছে প্রার্থনা করার অধিকার পেয়েছে। যোহনের এধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এজন্য আসুন, বিস্তারিতভাবে এর ব্যাখ্যা করি:

– কেবল পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে অর্থাৎ বাপ্তিস্ম গ্রহণ ক'রে মানুষ পিতার উপাসনা করতে পারে: পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই মানুষ ঈশ্বরসন্তান হবার

অধিকার পেয়ে থাকে (১:১২), ঊর্ধ্বলোক থেকে জনিত (৩:৩…) এবং ভ্রাতৃপ্রেমে পবিত্র জীবন যাপন করতে সক্ষম (১ যোহন ২:২৯…)।

– যিশুর মাধ্যমে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে বিশ্বাসীগণ যিশুর সংযোগেই আত্মার শরণে পিতার উপাসনা করবে। শুধু যিশুই সেই মন্দির (২:২১) যেখানে নব উপাসনা অনুশীলন করা হয়।

– যিশুর কাছে বিশ্বাসীগণ শেখে যে, ঈশ্বরকে পিতা বলে উপাসনা করা হয়: পিতা ঈশ্বর নিজ সন্তানদের ভালবাসেন, সুতরাং তাঁর সন্তানেরা পিতার উপাসনা ও সেবা করুক, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চলুক।

– খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ সমবেতভাবেই অর্থাৎ মণ্ডলী হয়েই পিতার নব উপাসনা করে। সকলের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে কেউই নব উপাসনা করতে পারে না, প্রকৃত উপাসকেরা যিশু দ্বারা সংগৃহীত ঈশ্বরের মেষপাল হয়ে (৬:৩৭…) পিতার উপাসনা করে। খ্রিষ্টমণ্ডলী জাতি-ভেদাভেদ মানে না। খ্রিষ্টমণ্ডলীর কাছেই, খ্রিষ্টের আপনজনদের কাছেই ঐশআত্মাকে দান করা হয় এবং নব উপাসনার ভার ন্যস্ত করা হয়।

– নব উপাসনা শুধু কথা বা ধ্যান বা পশু-বলিদান অবলম্বন করে না, বরং পবিত্র সাক্রামেন্তের উপর নির্ভর করে। নব বলিরূপে রয়েছে রুটি ও আঙুররসের আকারে গৌরবান্বিত যিশুর মাংস ও রক্ত (৬:৫১…) এবং এই নব উপাসনা ফলপ্রদ হবে যিশুর আজ্ঞাপালনে: পরস্পরের ভালবাসা (১৩:৩৫) এবং সত্যের সাধন ক'রে (৩:২১; ১ যোহন ১:৬)।

এই শর্তেই মানুষ আত্মার শরণে পিতার উপাসনা করে; আর শুধু তাই নয়, এই ধরনের উপাসকদেরই পিতা ঈশ্বর প্রত্যাশা করেন(৪:২৩গ)।

৪:২৪—**ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ:** এই নব উপাসনা ভিত্তি করে যিশুর এই উক্তির উপর: ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ যার অর্থ হল, ঈশ্বর মানুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ, তিনি পবিত্র। কেবল তাঁর সহায়তা ও অনুগ্রহে মানুষ নব-মানুষ হয়ে তাঁর সাক্ষাৎ পেতে ও তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে পারে। ঐশআত্মার কথায় পুরাতন নিয়ম পরিপূর্ণ: আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর

সৃষ্টিকর্মে ও ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করেন (ইশা ৬৩:১৪; নেহে ৯:২০); আত্মার জীবনদায়ী, অনুপ্রেরণাদায়ী ও পরিত্রাণদায়ী শক্তিতে ঈশ্বর নব-সৃষ্টিকর্ম সাধন করবেন (এজে ৩৬:২৭…); ঐশআত্মা গুণে তিনি সমুদয় মাংসের চেয়ে মহান ও স্বতন্ত্র (ইশা ৩১:৩) এবং নিজের পরিচর্যায় আমাদের আহ্বান করেন (ইশা ৩৪:১৬)। এই আত্মা হবেন চরম ক্ষণে বিশ্বাসীদের কাছে যিশুর দান।

মশীহরূপে যিশুর পূর্ণ আত্মপ্রকাশ (৪:২৫-২৬)

৪:২৫—আমি জানি যে,… মশীহ আসছেন: নারী এখনও বুঝে উঠতে পারেনি যে যিশু উপস্থিত পরিত্রাণের কথা বলছেন, সে এখনও সামারীয়দের ও ইহুদীদের মত রাজনৈতিক নেতারূপে ভাবী মশীহকে প্রত্যাশা করে।

৪:২৬—আমি-ই আছি: যিশু গুরুত্ব সহ মশীহ বলে নিজেকে প্রকাশ করেন, যে-মশীহ জীবনময় জলদাতা এবং পিতার উপাসনার জন্য একমাত্র মন্দির। যিশু ‘আমিই আছি’ বলায় যে কোন ইহুদী ও সামারীয় বুঝতে পারত তিনি ঈশ্বরের নাম নিজের বেলায় আরোপ করেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে তিনি এই পদ্ধতি পালন করবেন যখন বলবেন আমিই পথ, আমিই জীবন প্রভৃতি। এইভাবে সামারীয় নারীর সঙ্গে যিশুর সংলাপ সমাপ্ত। এই সংলাপের কোনও ফল হয়েছে কিনা, একথা ৩৯-৪২ পদে ব্যক্ত হয়।

শিষ্যদের সঙ্গে যিশুর সংলাপ এবং সামারীয়দের বিশ্বাস (৪:২৭-৪২)

৪ [২৭] ঠিক এসময়ে তাঁর শিষ্যেরা ফিরে এলেন। তাঁকে একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে
কথা বলতে দেখে তাঁরা আশ্চর্য হলেন, তবু কেউ জিজ্ঞাসা করলেন না, ‘আপনি কী
চাচ্ছেন?’ বা ‘ওর সঙ্গে কেন কথা বলছেন?’ [২৮] স্ত্রীলোকটি কলসিটা ফেলে
রেখে শহরের দিকে চলে গেল আর লোকদের বলল, [২৯] ‘এসো, একজন
মানুষকে দেখে যাও, জীবনে আমি যা কিছু করেছি, যিনি তা সবই আমাকে বলে

দিয়েছেন। হয় তো কি উনিই সেই খ্রিষ্ট?' [৩০] তারা শহর থেকে বেরিয়ে তাঁর কাছে যাবার জন্য রওনা হল।
[৩১] এদিকে শিষ্যেরা তাঁকে অনুরোধ করে বলছিলেন, 'রাব্বি, কিছুটা খেয়ে নিন।' [৩২] কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'আমার এমন খাদ্য আছে, যার কথা তোমরা জান না।' [৩৩] তাই শিষ্যেরা এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, 'হয় তো কেউ কি তাঁকে খাবার এনে দিয়েছে?' [৩৪] যিশু তাঁদের বললেন, 'যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করা ও তাঁর কাজ সম্পন্ন করাই আমার খাদ্য।
[৩৫] তোমরা কি একথা বলে থাক না যে, আর চার মাস বাকি, তারপর ফসল হবে? দেখ, আমি তোমাদের একটা কথা বলি: চোখ তুলে মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, ফসল কেমন সোনালী হয়ে কাটার অপেক্ষায় আছে; [৩৬] এর মধ্যে ফসলকাটিয়ে মজুরি পাচ্ছে, ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ফসল সংগ্রহ করে যাচ্ছে, যেন ফসলকাটিয়ে ও বীজবুনিয়ে দু'জনে একসঙ্গেই আনন্দ পায়। [৩৭] কেননা এক্ষেত্রে প্রবাদটা যথার্থ হয়ে ওঠে, একজন বোনে, আর একজন কাটে। [৩৮] আমি তোমাদের এমন ফসল কাটতে প্রেরণ করলাম, যার জন্য তোমরা শ্রম করনি; অন্যেরা শ্রম করেছে, আর তোমরা তাদের শ্রমের ফল ভোগ করতে এসেছ।'
[৩৯] সেই শহরের অনেক সামারীয় যিশুর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল স্ত্রীলোকটির এই সাক্ষ্যদানের জন্য, 'জীবনে আমি যা কিছু করেছি, তিনি তা সবই আমাকে বলে দিয়েছেন।' [৪০] তাই সামারীয় লোকেরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে তাদের সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করল, আর তিনি সেখানে দু' দিন থাকলেন। [৪১] আরও অনেকে তাঁর বাণীগুণেই বিশ্বাসী হল; [৪২] তারা স্ত্রীলোকটিকে বলছিল, 'এখন তোমার সেই সমস্ত কথার জন্য আর বিশ্বাস করি না। আমরা নিজেরাই শুনেছি, আর আমরা জানি যে, তিনি সত্যিই জগতের ত্রাণকর্তা।'

যিশুর বাণী যে নারীটির হৃদয়ে নাড়া দিল তা নারীটির আচরণ থেকে প্রতীয়মান হয়, কেননা কুয়োর ধারে কলসি ফেলে রেখে সে যিশুর কথা রটনা করতে শহরে চলে যায়। এর মধ্যে যিশু শিষ্যদের কাছে ধর্ম-সম্প্রসারণ সংক্রান্ত একটা উপদেশ দেন: যেমন এখন যিশু পিতার প্রেরণকর্ম সম্পাদন করেন, তেমনি তাঁর শিষ্যদের অর্থাৎ মণ্ডলীকে তাঁর সেই কর্ম চালিয়ে যেতে প্রেরণ করেন।

৪:৩১—রাব্বি, কিছুটা খেয়ে নিন: শিষ্যদের একথার উপর ভিত্তি করে যিশু নতুনভাবে ও অধিক গভীরভাবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেন।

৪:৩২—আমার এমন খাদ্য আছে: যিশুর ত্রাণকর্মের অপরিহার্য উপাদান হল পিতার প্রতি তাঁর স্বেচ্ছাকৃত বাধ্যতা এবং এই বাধ্যতা ক্রুশের উপরে তাঁর আত্মোৎসর্গে সিদ্ধিলাভ করে। ত্রাণকর্মকে পিতারই দ্বারা শুরু করা হয়েছে; যিশু সেই কর্ম সম্পন্ন করার জন্যই রত। এ থেকেও পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ঐক্য পরিস্ফুট হয়: যিশু পিতার কাছ থেকে ত্রাণকর্মের ভার গ্রহণ করে পিতার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ চালিয়ে যান; এই দায়িত্বভার সম্বন্ধে তিনি এত সচেতন এবং পিতার সঙ্কল্প বাস্তবায়নের জন্য এত চিন্তান্বিত যে তাঁর কাছে জগতের যাবতীয় ব্যাপার নগণ্য। পিতার সঙ্গে যিশুর মিলন ঈশ্বরত্বে ছাড়া উভয়ের অভিপ্রেত উদ্দেশ্যের ঐক্যে প্রকাশ পায়; আবার, ঈশ্বরমুখী (১:১খ) হওয়ায়ই যিশু পিতার মন অনুসারে সর্বদাই কাজ করতে পারেন। তাই হোক খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরও অবস্থা: ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট বলে মানুষ তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত, তবু এছাড়া কার্যকলাপ ও উদ্দেশ্যসমূহের ঐক্যে তাঁর সঙ্গে তাদের সংযুক্ত হতে হবে।

৪:৩৫—চোখ তুলে মাঠের দিকে চেয়ে দেখ: সম্ভবত এবাক্য শস্যপূর্ণ মাঠের দৃশ্য ছাড়া আসন্ন সামারীয়দের দৃশ্যের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে: আসন্ন সামারীয়রা হল নারীর সঙ্গে যিশুর সংলাপের পরিণতি।

৪:৩৬—এর মধ্যে ফসলকাটিয়ে মজুরি পাচ্ছে: যিশুই সেই ফসলকাটিয়ে যিনি নিজের ত্রাণকর্মের সিদ্ধি দেখতে চান; সিদ্ধি দেখে তাঁর যে আনন্দ সেটাই তাঁর মজুরি। সদৃশ সুসমাচারত্রয়ে বলা হয়, শুধু অন্তিমকালে মণ্ডলীর কাজের সিদ্ধি হবে; অপর দিকে যোহনের ধারণায় ইতিমধ্যেই ফসল কাটা হচ্ছে অর্থাৎ ইতিমধ্যেই মণ্ডলীর কাজ সিদ্ধি লাভ করছে: বাস্তবিকই ইতিমধ্যেই মণ্ডলী বিশ্বাসীদের কাছে অনন্ত জীবন দান করে থাকে।

যদি ফসলকাটিয়েরা যিশু এবং মণ্ডলী, তবে স্পষ্ট হয় যে বীজবুনিয়ে হলেন পিতা। সুতরাং এখানেও পিতা ও পুত্র উভয়ের উদ্দেশ্যের ঐক্যের কথা পুনরাবৃত্ত হয়: বীজ বুনিয়ে পিতা কাজটা শুরু করেন এবং পুত্র ফসল কাটার কাজ অর্থাৎ ত্রাণকর্মই সম্পন্ন করেন। উভয়ে একই কাজে রত, উভয়ে ত্রাণকর্মের সিদ্ধির জন্য আনন্দিত।

৪:৩৮—আমি তোমাদের এমন ফসল কাটতে প্রেরণ করলাম: যিশুর এবাক্য সেই ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলে যখন খ্রিষ্টমণ্ডলী পুনরুত্থিত যিশু দ্বারা প্রেরিত হয়ে এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে যিশুর পরিত্রাণের কথা জগতের কাছে ঘোষণা করবে। 'অন্যেরা শ্রম করেছে': তারা হল যিশুর পুনরুত্থান থেকে যোহনের সময় পর্যন্ত সামারিয়ায় বাণীপ্রচারকগণ। একথা প্রমাণিত হয় প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তক দ্বারা যেখানে ফিলিপের প্রচারকর্মের ফলে সামারিয়ায় বাণীপ্রচারকর্ম বিবৃত (প্রেরিত ৮:৪)। তথাপি যিশুর এবাক্য সাধারণ একটা অর্থও বহন করে: বাণীপ্রচারকর্মে যারা 'ফসল কাটে' তারা, আগে যারা শ্রম করেছিল, তাদেরই কাজের ফল ভোগ করে।

৪:৩৯—অনেক সামারীয় যিশুর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল: যেমন বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শিষ্যদের বেলায় ঘটেছিল, তেমনিভাবে এখানেও প্রকাশিত হয় যে, উৎসাহিনী নারীর সাক্ষ্যদানেই সামারীয়রা বিশ্বাসের পথে প্রথম পদক্ষেপ নিতে পারে। তাদের বাসনা যিশু যেন তাদের মধ্যে থাকেন: এতে তিনটি ইঙ্গিত লক্ষণীয়: যেরুশালেম-অধিবাসীদের বৈসাদৃশ্যে সামারীয়দের যিশুর প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার ইচ্ছা, যিশুর জীবনে অংশ নেওয়ার জন্য প্রকৃত শিষ্যের আকাঙ্ক্ষা এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে জাতি-ধর্মের ভেদাভেদ অতিক্রম করার দৃঢ় সঙ্কল্প।

৪:৪১—আরও অনেকে তাঁর বাণীগুণেই বিশ্বাসী হল: এটিই বিশ্বাসের পরিণতি: একজনের সাক্ষ্যদানে উদ্দীপিত হয়ে যিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা: এই উদ্ধৃতাংশে যিশুর বাণীর উপর জোর দেওয়া হয়: সামারীয়দের পক্ষে আশ্চর্য

কাজ দেখবার প্রয়োজন নেই, তাদের জন্য যিশুর বাণী যথেষ্ট, যে-বাণী ঐশআত্মা ও ঐশজীবনে পূর্ণ এবং ত্রাণকর্ম সাধনের জন্য ও ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন লাভের জন্য মানুষের পক্ষে অনুপ্রেরণাদায়ী।

৪:৪২—তারা স্ত্রীলোকটিকে বলছিল··· : বিশ্বাস জাগরণের জন্য মানুষের সাক্ষ্যদান শুধু প্রথম উপাদান মাত্র। অপরিহার্য বস্তু হল যিশুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ, কেননা তখনই মানুষ তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে সক্ষম। সামারীয়দের এমন বিশ্বাস, যার ফলে তারা যিশুকে জগতের ত্রাণকর্তারূপে ঘোষণা করে। যোহন অনুসারে এই ঘোষণাটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেটির মধ্য দিয়ে যিশু এমন ত্রাণকর্তা বলে স্বীকৃত যিনি শুধু ইহুদীদের ও সামারীয়দের আকাঙ্ক্ষার অপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত সিদ্ধিস্বরূপ নন, বরং (যেমন ৩:১৭-এ ঘোষিত হয়েছিল) বিশ্বজগতেরও অনন্য ত্রাণকর্তা। ত্রাণকর্তা নামটি সেসময় রোম-সাম্রাজ্যের সম্রাটের বিশিষ্ট নাম-অধিকার ছিল : যিশুর উপর তেমন নাম-অধিকার আরোপ করায় গম্ভীরভাবে ঘোষণা করা হয় যে, যিশুই বিশ্বজগতের প্রকৃত রাজাধিরাজ ও ত্রাণকর্তা।

কানা গ্রামে যিশুর দ্বিতীয় চিহ্নকর্ম (৪:৪৩-৫৪)

৪ [৪৩] সেই দু' দিন পর তিনি সেখান থেকে গালিলেয়ার দিকে রওনা হলেন,
[৪৪] কারণ যিশু নিজে স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন যে, নবী নিজের দেশে সম্মান পান
না। [৪৫] তিনি যখন গালিলেয়ায় এসে পৌঁছলেন, তখন গালিলেয়ার লোকেরা
তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল, কেননা পর্বের সময়ে তিনি যেরুশালেমে যা কিছু সাধন
করেছিলেন, তারা তা দেখেছিল, যেহেতু তারাও সেই উৎসবে যোগ দিতে
গিয়েছিল।
[৪৬] তিনি গালিলেয়ার সেই কানা গ্রামে আবার গেলেন, যেখানে জলকে আঙুররস
করেছিলেন : সেখানে একজন রাজকর্মচারী ছিলেন, যাঁর ছেলে কাফার্নাউমে অসুস্থ
ছিল। [৪৭] যিশু যুদেয়া থেকে গালিলেয়ায় এসেছেন শুনে তিনি তাঁর কাছে এসে

তাঁকে মিনতি করলেন, তিনি যেন কাফার্নাউমে গিয়ে তাঁর ছেলেকে সুস্থ করেন, কারণ ছেলেটি মরণাপন্ন অবস্থায় ছিল। [৪৮] যিশু তাঁকে বললেন, ‘চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ না দেখে তোমরা বিশ্বাস করবে না!’ [৪৯] রাজকর্মচারী তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, আমার ছেলেটি মরবার আগেই ওখানে চলুন।’ [৫০] যিশু তাঁকে বললেন, ‘বাড়ি যান, আপনার ছেলে বেঁচে থাকবে।’ যিশু যা বললেন, লোকটি তা বিশ্বাস করে চলে গেলেন। [৫১] তিনি পথে আছেন, সেসময় তাঁর দাসেরা তাঁর দেখা পেয়ে খবর জানাল যে, তাঁর ছেলে বেঁচে গেছে। [৫২] তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোন সময়ে ছেলেটি সুস্থ হতে লাগল। তারা তাঁকে বলল, ‘কাল দুপুর একটায় তার জ্বর ছাড়ল।’ [৫৩] তখন পিতা বুঝতে পারলেন যে, ঠিক সেই সময়েই যিশু তাঁকে বলেছিলেন, ‘আপনার ছেলে বেঁচে থাকবে।’ আর তিনি নিজে ও তাঁর সমস্ত পরিবার-পরিজনেরা বিশ্বাসী হলেন। [৫৪] যুদেয়া থেকে গালিলেয়ায় ফিরে আসার পর, এটি হল যিশুর সাধিত দ্বিতীয় চিহ্নকর্ম।

এই বর্ণনা নিয়ে যিশুর আত্মপ্রকাশকর্মের সূচনা বিষয়ক অংশ (২–৪ অধ্যায়) শেষ হয়: কানা গ্রামে তিনি তাঁর প্রথম চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন, আর এখন যেরুশালেম থেকে ফিরে এসে আবার কানা গ্রামে দ্বিতীয় চিহ্নকর্ম সম্পাদন করেন। কিন্তু যোহন অপরাপর সাদৃশ্যও দেখাতে চান: যেরুশালেমবাসীদের মত গালিলেয়ার অধিবাসীরাও কেবল আশ্চর্য কাজ দেখলে তবে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস কৃত্রিম (৪:৪৫); কানা গ্রামে সাধিত প্রথম চিহ্নকর্মে যেমন শিষ্যেরা বিশ্বাসের আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন, তেমনিভাবে এখানেও রাজকর্মচারী নিজের পরিবার সহ বিশ্বাসী হন; জনতা আশ্চর্য কাজের উপর নির্ভর ক’রে নগণ্য ও ভাসা ভাসা বিশ্বাস দেখায় (৪:৪৮)।

এইভাবে যোহন পরবর্তী অধ্যায়গুলি বর্ণনার জন্য মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে নির্দেশ করেছেন। পরের বর্ণনায় এই প্রথম অংশে আলোচিত বিষয়বস্তুগুলো সমর্থন লাভ করে: গালিলেয়ার জনতা যিশুকে অস্বীকার করবে (৬:৬৬) এবং যেরুশালেমবাসীরা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করবে (৫:১৮; ৭:১৯…)।

উদ্ধৃতির যথাযথ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সর্বপ্রথমে রচয়িতার লক্ষ্য উল্লেখযোগ্য: যে-বিশ্বাস যিশুর ও তাঁর বাণীর উপর নির্ভর করে, সেই বিশ্বাস জীবনদায়ী; তাঁর নিজের

বাণীতে যিশু জীবন দান করতে পারেন, তবুও অপরিহার্য একটা শর্ত রয়েছে, তথা: মানুষের বিশ্বাস। বাস্তবিকই, এই বর্ণনায় তিনি তিন তিন বার করেই ঘোষণা করেন, মরণাপন্ন ছেলেটি বেঁচে গেছে (৪:৫০, ৫১, ৫৩); এতে খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করে যে, যিশু অনন্ত জীবনও দান করতে সক্ষম। যিশু 'অনন্ত জীবন-দাতা' প্রসঙ্গ (যা সুসমাচারের প্রধান একটা প্রসঙ্গ) বিশেষত লাজারকে পুনর্জীবনদানের বর্ণনায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও গভীরভাবে অনুধাবন করা হবে।

চিন্তার বিষয় যে, এ প্রথম অংশে যিশুর সাক্ষাতে যে তিনজন ব্যক্তি এল (ফরিশী নিকোদেম, সামারীয় নারী এবং বিধর্মী রাজকর্মচারী), তাদের মধ্যে শুধু সেই বিধর্মীই যিশুর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস রাখতে পারলেন। যেরুশালেমবাসীদের ও ধর্মগুরু নিকোদেমের মত যারা যিশুকে চিনবার জন্য প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, তারা যে তাঁকে গ্রহণ করল না শুধু তা নয়, তাঁকে হত্যা করার জন্যও ব্যতিব্যস্ত; সামারীয় নারীও যিশুকে বিশ্বাস করার আগে যথেষ্ট আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করে গেছিল। অপর দিকে, বিধর্মী বলে সংশয় করার মত যে-লোক, তিনি যথার্থই কিছু না দেখলেও যিশুর বাণী অবলম্বন করেন এবং শেষে প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। সুতরাং, যিশুকে গ্রহণ করতে হলে আত্মবিসর্জন প্রয়োজন, আর এই আত্মবিসর্জন হল বিশ্বাসের অগ্নি-পরীক্ষা, অর্থাৎ ধর্ম, বিশ্বাস, পরিত্রাণ, এমনকি ঈশ্বর বিষয়ে ব্যক্তিগত ধারণাধারার বিসর্জন দিলে পর এ সমুদয় বিষয়ে যিশুর প্রকাশিত শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। রাজকর্মচারী যিশু দ্বারা পরীক্ষিত হলেও তাঁর বাণীতে আপত্তি না করায় সকলের জন্য আদর্শ বিশ্বাসী হয়ে দাঁড়ান।

কিন্তু যোহনের আর একটা লক্ষ্য আছে: তিনি জোর দিয়ে চিহ্নকর্মের বাস্তবতার দিকে নির্দেশ করেন। আগেও বলা হয়েছিল যে যিশুর যাবতীয় চিহ্নকর্মে বিশ্বাসীগণ তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করবে; চিহ্নকর্মের প্রয়োজনীয়তাই যাতে যিশু বাস্তবরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। পরে সবকিছু মানুষের উপর নির্ভর করে: বিশ্বাস না থাকলে চিহ্নকর্মগুলো আশ্চর্য ঘটনা ছাড়া বেশি কিছু দেখাবে না, কিন্তু বিশ্বাস থাকলে তবে সেগুলোর মধ্য দিয়ে যিশুর গৌরব প্রত্যক্ষ করা যায়।

এইভাবে যোহনের সুসমাচারের বিশিষ্ট একটি অংশের সমাপ্তি হয়। এতে রচয়িতা আমাদের কাছে যিশুকে ঈশ্বরপ্রেরিত মশীহ (খ্রিষ্ট), ঐশপ্রকাশকর্তা ও জীবনদাতা বলে পরিচিত করতে শুরু করেছেন। উপরন্তু, সমস্ত ঘটনার মধ্যে বিশ্বাস ও বিশ্বাসের শক্তি প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। সুতরাং, এখন আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত কার্যকলাপ ও জগতের প্রতিক্রিয়ার বিকাশ সঠিকভাবে বুঝবার জন্য প্রস্তুত।

পরিশিষ্ট

যোহন অনুসারে 'বিশ্বাস করা'

যোহনের সুসমাচারের চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্বাস-বিষয়ে বিবিধ ও দৃঢ় একটা শিক্ষা নিহিত আছে: বিশ্বাস করা মানে যিশুর ঐশপ্রকাশে সাড়া দেওয়া। তবুও সমগ্র সুসমাচারব্যাপীও বিশ্বাস-বিষয়ের উপর একান্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের সঙ্গে তুলনা করা হোক: বিশ্বাস কথাটা মথি সুসমাচারে ১১ বার উল্লিখিত, মার্ক সুসমাচারে ১৪ বার এবং লুক সুসমাচারে ৯ বার। অপর দিকে যোহন ৯৮ বার একথার উল্লেখ করেন। বিশ্বাস-বিষয়ে যিনি যোহনের সঙ্গে অধিক চিন্তিত তিনি হলেন প্রেরিতদূত পল। তাঁর পত্রাবলিতে ১৯৬ বার বিশ্বাস শব্দের উল্লেখ ঘটে। কিন্তু ব্যাপারটা কেবল পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত নয়, বিশ্বাসের তাৎপর্য উদ্ঘাটনের দিক দিয়েও সদৃশ সুসমাচারত্রয় অপেক্ষা যোহনের গভীর গবেষণা, বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের প্রাধান্য রয়েছে। অপরাপর সুসমাচার অনুযায়ী বিশ্বাস অধিকতরভাবে কাল ও পরিস্থিতি-সাপেক্ষ (আশ্চর্য কাজজনিত বিশ্বাস) বা আত্মিক শক্তি বলে ব্যাখ্যা করা হয়। অপর দিকে যোহনের ধারণা অনুসারে বিশ্বাস হল মানুষের আমূল ও শর্তহীন একটা সিদ্ধান্ত, ঈশ্বরের প্রেরিত চরম ঐশপ্রকাশকারী যিশুর সম্মুখে ও তাঁর আনা মুক্তিদায়ী ঐশপ্রকাশের প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়া। প্রেরিতদূতগণ যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখলেন ও তাঁর গৌরবপ্রকাশে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন: এই কাঠামো অনুসরণ করে যোহন বিশ্বাসের উদয় ও

তার বিকাশের কথা, তার সমুদয় বাধাবিঘ্ন, ও পরিত্রাণ পাবার জন্য তার অনন্য ভূমিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করতে পারেন।

একথাও উল্লেখ্য যে, সদৃশ সুসমাচারের রচয়িতাগণ ‘মনপরিবর্তন’ প্রসঙ্গে যে বিশিষ্ট ও দৃঢ় আলোচনা করেন, যোহন ও পলের লেখায় সেই প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে আলোচিত নয়, বরং তা বিশ্বাস-প্রসঙ্গে নিহিত, এমনকি বিশ্বাস থেকে যে একটিমাত্র অপরিহার্যতা উদ্গত হয়, সেটা হল ভালবাসা: খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সকল অপরিহার্যতা বিশ্বাস ও ভালবাসায় স্থিতিবান।

এই স্বল্প কথা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় বিশ্বাস-বিষয়টা কত না গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তারময়; এই পরিশিষ্টে শুধু কয়েকটা দিক আলোচিত হবে: বিশ্বাস শব্দের ভাষাগত ব্যবহার, বিশ্বাস-বিষয়ে সদৃশ নানা ধারণা, বিশ্বাস ও পরিত্রাণ, বিশ্বাসের উদয় ও তার বিকাশ, এবং ঐশঅনুগ্রহ বলে বিশ্বাস।

ভাষাগত ব্যবহার

যখন যোহন বিশ্বাসের কথা বলেন, তখন তিনি এমন ধরনের ঐশতত্ত্ব বা মর্মসত্য ইঙ্গিত করেন না যা মানুষ মানসিকভাবে গ্রহণ করবে। এই ধারণাও তিনি সমর্থন করেন না যা অনুসারে বিশ্বাস হল ঈশ্বরের হাতে আত্মসমর্পণ, তিনি বরং ঐশপ্রকাশকর্তা ও জীবনদাতা যিশুর সঙ্গে মানুষের সেই সংযোগেরই দিকে নির্দেশ করেন, যে-সংযোগ ব্যক্তিময় ও জীবন্ত। সুতরাং, যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখা বলতে তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে জীবন্ত ও ব্যক্তিময় সংযোগে সংযুক্ত হওয়া বোঝায়। যিশুর প্রচারিত ঐশপ্রকাশও যে আমাদের গ্রহণ করা আবশ্যক একথা সন্দেহের অতীত, কিন্তু তবুও সেই ঐশপ্রকাশ তাত্ত্বিক ও অবাস্তব একটা ধারণা বলে বিবেচনাযোগ্য নয়: আমরা সেই ঐশপ্রকাশ গ্রহণ করেছি কিনা, তা আমাদের আচরণ, বাধ্যতা ও পারস্পরিক ভালবাসার আজ্ঞা পালনে দেখা দেবে।

বিশ্বাস বিষয়ে সদৃশ নানা ধারণা

ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তা যিশুর সঙ্গে খ্রিষ্টবিশ্বাসীর সংযোগ বিশ্বাস শব্দে ছাড়া যোহন দ্বারা অন্যান্য শব্দের মধ্য দিয়েও নির্দেশিত হয়, এমনকি এই অন্যান্য শব্দ অধিক সূক্ষ্মভাবেই যিশুর সঙ্গে বিশ্বাসীর সংযোগ আলোকিত করে:

গ্রহণ করা: ঐশবাণী তাঁর আপনজনদের মধ্যে আসা সত্ত্বেও জগৎ তাঁকে চিনল না (১:১১); তবু যারা তাঁকে গ্রহণ করল তাদের তিনি ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন (১:১২)। অতএব বিশ্বাস হল ঈশ্বরের শেষ ও চরম প্রেরিতজনকে এবং তাঁর প্রচারিত প্রকাশকে গ্রহণ করা: তিনি যা করতে বলেন, বিশ্বাসীগণ তা করবেই করবে। আমরা যদি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করি তাহলে কি করে তাঁর সাক্ষ্য ও তাঁর সকল বাণী গ্রহণ করব না? তাঁর সাক্ষ্য ও বাণীর সঙ্গে, অর্থাৎ তাঁর সমস্ত ঐশপ্রকাশের সঙ্গে প্রকাশকর্তাকেও গ্রহণ করা প্রয়োজন; এইভাবেই আমরা স্বীকার করব যে, ঈশ্বরই ঐশপ্রকাশকর্তারূপে যিশুকে প্রেরণ করেছেন (৩:১১, ১৩; ১২:৪৮; ১৭:৮)।

আসা: যেভাবে যিশু এই জগতে এলেন, সেইভাবে বিশ্বাসীর পক্ষে যিশুর কাছে আসা প্রয়োজন। ঐশবাণী আলোরূপেই এই জগতে এসেছেন এবং যে কেউ সত্যেরই সাধক সে আলোর দিকে এগোয় (৩:১৯··· ; ৫:৪০)। যে কেউ পুত্রের কাছে আসে যিশু তাকে কখনও ফিরিয়ে দেবেন না (৬:৩৭), কেননা স্বয়ং পিতাই পুত্রের কাছে বিশ্বাসীকে চালনা করেন; কেউই যিশুর কাছে আসতে পারে না পিতা নিজেই যদি না তাকে আকর্ষণ করেন। সদৃশ ধারণা 'পালক ও মেষপালের' বর্ণনায় সূচিত (১০ অধ্যায়): পিতাই মেষপালের প্রকৃত মনিব, তথাপি তিনি পুত্রের হাতে মেষগুলি ন্যস্ত করেন। যিশুর অনুসরণকারী মেষগুলি ও পালক যিশুর মধ্যে অন্তরঙ্গ সাহচর্য ও ভালবাসা বিরাজমান। এক্ষেত্রে একথাও স্মরণযোগ্য যে, যেমন যিশুর প্রচারিত ঐশপ্রকাশ সকলের জন্যই উন্মুক্ত অর্থাৎ সকলেই তা গ্রহণ করতে পারে, এমনকি কৃচ্ছ্র সাধনার মাধ্যমে নয় বরং সহজেই তা লভ্য, তেমনিভাবে ঐশপ্রকাশের প্রতি মানুষের সাড়া অর্থাৎ যিশুর সঙ্গে মানুষের বিশ্বাস-সংযোগ একজনেরই মাত্র নয় বরং মণ্ডলীগত ব্যাপার: যিশুর প্রকাশ গ্রহণ করে সকল বিশ্বাসীকেও গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

অনুসরণ করা: মেষপাল রূপকটির (১০ অধ্যায়) ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, বিশ্বাস হল মৃত্যু পর্যন্ত যিশুকে অনুসরণ (১২:২৬; ১৩:৩৬…)।

শোনা: যেহেতু ঈশ্বরের প্রেরিতজন ঈশ্বরেরই কথা বলেন (৩:৩৪) এবং নিজের মেষগুলোকে নাম ধরে ডাকেন (১০:৩), সেজন্য প্রকৃত বিশ্বাসী হতে হলে মানুষের তাঁর কথা ও কণ্ঠস্বর শোনা উচিত (৫:২৪; ১০:৩; ১৬:২৭; ১৮:৩৭), মানুষ তাঁর কথা পালন করবে (১২:৪৭) ও তাঁর বাণীতে স্থিতমূল থাকবে (৮:৩১)। এইভাবে তাঁর আজ্ঞাগুলিও পালন করায় (১৪:১৫… ; ১৫:১০) মানুষ যিশুর শিষ্য হয়ে উঠবে আর সত্যকে জানতে পারবে (৮:৩১…)। ফলত, বিশ্বাসের সম্পর্ক পিতা ও পুত্রের মধ্যকার সম্পর্ক অনুরূপে ভালবাসারই সম্পর্কে পরিণত হয় (১৫:১০) এবং পারস্পরিক ভালবাসার আজ্ঞা পালনে যথার্থ প্রমাণ লাভ করবে: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি (১৩:১৪; ১৫:১২)।

দেখা: যিশুর চিহ্নকর্মগুলো যে যথার্থভাবে দেখে (৬:২৬), সে যিশুর গৌরব প্রত্যক্ষ করে (১১:৪০), অর্থাৎ স্বর্গ থেকে নেমে আসা ঈশ্বরের প্রেরিতজন বলেই তাঁকে দেখে (৬:৩৬)। যে বিশ্বাসের চোখে যিশুকে পুত্র বলে দেখে, সে পিতাকেও দেখে, আর তাঁর পক্ষে অন্য দিব্য দর্শনলাভ দরকার হয় না (১৪:৯)। সুতরাং যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখা বলতে পুত্রতে আত্মপ্রকাশকারী পিতাকে দেখা-ও বোঝায়।

জানা: এবিষয়ে যেন ভুলে না যাই পুরাতন নিয়মের সেই ধারণা যা অনুসারে 'জানা' এমন গভীর ও অন্তরঙ্গ ঐক্যের কথা নির্দেশ করে, যে-ঐক্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সেই মিলনেরই সঙ্গে বার বার তুলনা করা হয় যা বিষয়ে আদিপুস্তক বলে, সেই দু'জন একদেহ হবে (আদি ২:২৪)। এতে যিশুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ও যিশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের গভীর ও প্রেমপূর্ণ দিক উত্তমরূপে উদ্ভাসিত হয়: যিশুর সাধিত ত্রাণকর্ম হল ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ সংযোগ বা ঐক্যের বাস্তব সহভাগিতা (১৭:২৬), বা অন্য কথায়, ঐশজীবনে আমাদের মানবীয় প্রাণের রূপান্তর; এজন্যই 'জানা' হল অনন্ত জীবন।

বিশ্বাস ও পরিত্রাণ

উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা থেকে অনুমান করা যায় যে, যোহনের ধারণায় বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে যিশুতে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু একথাও বলা প্রয়োজন যে, বিশ্বাসের প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্বাসীদের কাছে যিশুর পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণতা লাভ করে; একথা সাধারণত এ ধরনের বাক্যে ব্যক্ত হয়: যে যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখে সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে। অতএব বিশ্বাস ও পরিত্রাণের মধ্যকার সম্পর্ক এই যে, পরিত্রাণ পাবার জন্য আমাদের অপরিহার্য পদক্ষেপ হল বিশ্বাস করা। অপর দিকে, অপরাপর সুসমাচারের কথায় যিশু তাঁর জীবনকালে নিজের বিষয়ে 'মশীহ' বা 'ঈশ্বরপুত্র' লোকদের উচ্চারিত এই ধরনের স্বীকারোক্তি প্রকাশ্যে শুনতে চাইতেন না। বৈসাদৃশ্যের হেতু সুসমাচার-লেখবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ পায়: যোহন যিশুর মশীহত্বের অস্বীকারকারী ইহুদীদের বিপক্ষে এবং গ্রীক কৃষ্টির প্রভাবান্বিত ধর্মীয় ধারণার বিপক্ষেও সুসমাচার লেখার কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; তখনকার গ্রীক কৃষ্টি, বিশেষত জ্ঞান-মার্গপন্থীরা সমর্থন করত মানুষ জ্ঞান ও অনুধ্যানের মাধ্যমেই জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি ও আত্মবোধ লাভ করে আলোময় ও জীবনময় স্বর্গলোকে গিয়ে পৌঁছবে। ঠিক এই ভুলধারণার বৈপরীত্যে যোহন জ্ঞান ও অনুধ্যানের মধ্যস্থতা অস্বীকার করে জোর দিয়ে ঘোষণা করেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে এজগতে আগত যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখাতেই মানুষ পরিত্রাণ পেতে সক্ষম।

আবার গ্রীক পরিবেশের মানুষকে লক্ষ করে যোহন অনন্ত জীবন বা পরিত্রাণের বর্তমান প্রাপ্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইহুদী-ঐতিহ্যগত ধারণায় জগতের প্রলয়ের দিনে (চরম দিনে) মানুষ ঈশ্বরের বিচারের অধীন হয়ে পরিত্রাণ বা দণ্ড লাভ করবে: এধারণা সদৃশ সুসমাচারত্রয়েও উপস্থিত। কিন্তু গ্রীক দার্শনিকগণ এমন পরিত্রাণের অনুসন্ধান করতেন যে-পরিত্রাণ মানুষের বর্তমান অবস্থা নবীভূত করবে; তেমন আকাঙ্ক্ষা পূরণে যোহন ঘোষণা করেন যে, যে ঐশজীবন মৃত্যুর পরে সম্পূর্ণরূপে মানুষ পাবে, সেই জীবন যিশুর প্রতি বিশ্বাস রেখে ইতিমধ্যেই পাওয়া যায়: যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত থেকে অর্থাৎ বিশ্বাসের মাধ্যমেই খ্রিষ্টবিশ্বাসী ইতিমধ্যেই মৃত্যু, অন্ধকার ও অসৎ থেকে মুক্ত।

বিশ্বাসের উদয় ও তার বিকাশ

যেমন বর্তমান খ্রিষ্টমণ্ডলীতে, তেমনিভাবে সেকালের খ্রিষ্টমণ্ডলীতে এমন স্বল্প বিশ্বাসের মানুষ ছিল যারা যিশুকে ও তাঁর শুভসংবাদ ভ্রান্তিবশত বুঝে নিত; যোহনের লক্ষ্য যাতে সুসমাচারের পাঠকগণ প্রকৃত বিশ্বাস অবগত হয়।

কয়েকটি বর্ণনায় প্রমাণিত হয় যে অন্যের সাক্ষ্যদানে বিশ্বাসের উদয় হয়, তবুও কেবল যিশুর সঙ্গে সাক্ষাতেই বিশ্বাসের প্রকৃত জাগরণ ও বিকাশ ঘটে। সুসমাচারে বিবৃত সাক্ষাৎকারগুলো ঐতিহাসিক বটে, অথচ থোমাসের কাছে যিশুর কথায় (২০:২৯) স্পষ্ট ঘোষিত হয় যে যিশুর সঙ্গে এধরন বিশ্বাস-সাক্ষাৎ সর্বযুগের মানুষের পক্ষেও সুসমাচারের সাক্ষ্যদান-গ্রহণেই সম্ভবপর হবে: যে-যিশু ঐতিহাসিকভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁকে স্বচক্ষে না দেখলেও তবুও প্রৈরিতিক সাক্ষ্যদান গ্রহণ করাতেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায় (১৭:২০); একই শর্তে আজও তাঁকে অনুসরণ করা যায় এবং তাঁর সঙ্গে একতাবদ্ধ হওয়া যায় (৪:১২) যিনি গৌরবান্বিত হয়ে বর্তমানকালেও নিজের বিশ্বাসীদের সঙ্গে অর্থাৎ মণ্ডলীর সঙ্গে সংলাপ করে থাকেন।

বিশ্বাস-বিষয়ে যোহনের শিক্ষা প্রেরিতদূতদের বিশ্বাস-অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত: শুরুতে তাঁরা যিশুর কথা বুঝতে পারতেন না; তাঁর পুনরুত্থানের পরেই, পবিত্র আত্মার সহায়তায় তাঁর বাণীসকল উপলব্ধি ও স্মরণ করতে পারলেন (১৪:২৬; ১৬:১৩): পরবর্তীকালের বিশ্বাসীগণও প্রেরিতদূতগণের সাক্ষ্যদান ও পবিত্র আত্মার সাক্ষ্যদান একই সাক্ষ্যদান বলে বিবেচনা করবে (১৫:২৬)। সুতরাং বলা যেতে পারে, বিশ্বাস অচল নয় বরং উন্নতিশীল জিনিস: অপূর্ণাঙ্গ, সংশয়পূর্ণ, আশ্চর্য কাজ-সাপেক্ষ বিশ্বাস থেকে মানুষ এমন বিশ্বাসে পৌঁছতে পারে যা গভীর, কার্যকর এবং কেবল যিশুর কথা ও প্রেরিতদূতগণের সাক্ষ্যদানের উপর স্থাপিত: এখানেও বিশ্বাসের সেই মূল বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হয়, তথা: যিশুই অনন্য ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তা; তাঁর সঙ্গে একতাবদ্ধ হওয়াই অপরিহার্য।

বিশ্বাস ক্ষেত্রে বাধাবিঘ্নও রয়েছে: স্বয়ং যিশু নিজের শিষ্যদের পরীক্ষা করেছিলেন যাতে তাঁদের বিশ্বাস বিশুদ্ধ হয়: তোমরাও কি চলে যেতে চাও? তাঁরা পিতরের সাক্ষ্যদানেই উত্তর দিয়েছিলেন (৬:৬৮)। কিন্তু বিশ্বাসের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হল

যিশুর যন্ত্রণাভোগ: যিনি ক্রুশের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কেবল সেই প্রিয় শিষ্যই সকলের আগে পুনরুত্থানের ইঙ্গিত ধরতে পেরে 'দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন' (২০:৮)। এই শিষ্যই হলেন যে কোন বিশ্বাসীর আদর্শ যিনি প্রভুকে জানেন, কখনও তাঁকে ছেড়ে দেন না, যিশু আবৃত থাকলেও তাঁকে চিনতে পারেন এবং এজন্য তাঁর পুনরাগমন পর্যন্ত থাকতে পারবেন বলে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন (২১:২২)।

সুতরাং, যোহনের সুসমাচার বিশ্বাসযোগ্য শিক্ষা ছাড়া বিশ্বাস সম্পর্কিত শিক্ষাও দান করে।

ঐশঅনুগ্রহ বলে বিশ্বাস

বিশ্বাস হল ঈশ্বরের একটি অনুগ্রহদান: এধারণা-বিশেষ অবিশ্বাস-বিষয়ক উদ্ধৃতাংশগুলোতে নিহিত। এক্ষেত্রে যোহনের সমস্যা এরূপ: কি করে মানুষ যিশুর প্রতি বিশ্বাস না রেখে পারে? সমাধান এ: যাদের পিতা আকর্ষণ করেন তারাই মাত্র বিশ্বাস করতে সক্ষম (৬:৪৪, ৬৫; ৮:৪৩-৪৬; ১০:২৫-২৯)। অথচ সুসমাচারের অন্যত্র স্পষ্ট বলা হয় অবিশ্বাস মানুষেরই দোষ, অর্থাৎ অবিশ্বাসী যারা তারা আলোর চেয়ে অন্ধকার ভালবাসে (৩:১৯… ; ৫:৪৪; ৮:৪৪; ৯:৩৯… ; ১২:৩৯); যারা ঈশ্বরের পুত্রকে অগ্রাহ্য করল তাদের কোন ছুতা শোনা যাবে না, কেননা দোষ সম্পূর্ণরূপে তাদেরই।

যেমন যোহন মানুষের নিয়তির উপর ঈশ্বরের পূর্বস্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত ও মানুষের দোষের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেন না, তেমনিভাবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিশ্বাস যে এক দিকে মানুষের সিদ্ধান্ত এবং অপর দিকে ঈশ্বরের অনুগ্রহদান, এর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখেন না। বলা বাহুল্য যে এই সমস্যা একটি রহস্য, তবুও এ বিশেষ ধারণা অনুসরণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিশ্বাস করা ইহুদী-বিধানের পরিত্রাণদায়ী কর্মকাণ্ডের মত কেবল মানবীয় একটা কাজ নয়, বরং ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্য দিয়েই যিশুর আত্মপ্রকাশে সাড়া দেওয়া।

যিশুর আত্মপ্রকাশকর্ম

(৫–১২ অধ্যায়)

চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত যিশুর আত্মপ্রকাশকর্মের সূচনাই বর্ণনা করা হয়েছে। এখন (৫ থেকে ১২ অধ্যায় পর্যন্ত) গালিলেয়া ও যুদেয়ার জনতার সামনে যিশু খোলাখুলিভাবে আত্মপ্রকাশ করেন: তিনি বিশ্বাসের দিকে সকল মানুষকে আহ্বান করেন এবং ইহুদীদের অবিশ্বাস উদ্ঘাটন করেন।

৩ ও ৪ অধ্যায়ে তিনি নিকোদেম ও সামারীয় নারীর সঙ্গেই মাত্র আলাপ করেছিলেন, এখন কিন্তু প্রকাশ্যে ইহুদীদের সামনে কথা বলেন; অবিশ্বাসী যারা তারা নিজেদের অবিশ্বাসে আবদ্ধ থাকতে চায়। অপর দিকে বিশ্বাসী যারা তারা পূর্ণ বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে চলে। সুসমাচারের এই অংশের আর একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়: যিশু তাঁর সাধিত চিহ্নকর্মগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন, ফলে আগেও যা বলা হয়েছিল এখানে তা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে: চিহ্নকর্মের মধ্য দিয়ে যিশু বাস্তবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, যে-আত্মপ্রকাশ জন্মান্ধকে আরোগ্যদানে (৯ অধ্যায়) এবং লাজারকে পুনর্জীবনদানে (১১ অধ্যায়) সিদ্ধি লাভ করে: যথার্থই এখানে যিশু আলো ও জীবন স্বরূপ আত্মপরিচয় দেন: আলো ও জীবন প্রসঙ্গ দু'টোর অনুধাবন বাণী-বন্দনা থেকেও শুরু হয়েছিল (১:৪)।

উল্লিখিত ঐশতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া ইতিহাসের দিকে যোহনের গুরুত্ব আরোপণও লক্ষণীয়। কেননা সময় সম্পর্কিত উল্লেখগুলি সর্বদা সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত। অর্থাৎ, যোহন যিশুর আত্মপ্রকাশ ও মানুষের বিশ্বাসের প্রসঙ্গ দু'টো ছাড়া জগতের সঙ্গে যিশুর ঐতিহাসিক সাক্ষাতের দিকে নির্দেশ করেন এবং যাতে সর্বযুগের পাঠক বাস্তব শিক্ষা লাভ করেন সেজন্য সেই কালের ইহুদীদের ও প্রাক্তন বিধর্মীদের আচরণও বর্ণনা করেন (১০:১৬; ১১:৫২; ১২:২০)। এইভাবে একথা অধিক দৃঢ়ভাবে অনুধাবিত হয় যে, জীবনকালে যিশু যে সকল বাণী বলেছিলেন, সেগুলো বর্তমানকালের পাঠকের পক্ষে এখনও বাস্তব আহ্বানস্বরূপ।

ঐশতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য দু'টো মনের সামনে রেখে, আসুন, সুসমাচারের এই অংশের কাঠামো উপস্থাপন করি :

৫ অধ্যায় : পঞ্চাশত্তমী পর্ব উপলক্ষে যেরুশালেমে যিশুর আত্মপ্রকাশ : তিনি ত্রাণকর্তা। একজন রোগীর সুস্থতা-লাভ। বিচার করতে ও জীবন দিতে পুত্রের অধিকার-বিষয়ে উপদেশ। পুত্রের বিষয়ে পিতা ঈশ্বর নিজে সাক্ষ্যদান করেন।

৬ অধ্যায় : দ্বিতীয় পাস্কা পর্ব। গালিলেয়ায় যিশুর কাজের সমাপ্তি। যিশুই জীবনের রুটি। অল্প রুটি দিয়ে পাঁচ হাজার মানুষকে আহার্যদান। গালিলীয় শিষ্যদের অনেকে বিশ্বাসের অভাবে যিশুর সঙ্গ ত্যাগ করে।

৭–৯ অধ্যায় : পর্ণকুটির পর্ব; ইহুদীদের অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যিশুর সংগ্রাম। আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধীয় উপদেশসমূহ। জনতার মতামত এবং ইহুদী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধাচরণ। যিশুই জগতের আলো। জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তিদান। যিশুর বিপক্ষীদের অন্ধকরণ।

১০–১১ অধ্যায় : মন্দিরের উৎসর্গ-পর্ব। যিশুই মেষপালক এবং ইহুদী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ চোর ও দস্যু। যিশুর প্রতি বিরোধিতা তীব্রতর হয়ে ওঠে। যিশুই পুনরুত্থান ও জীবন : লাজারকে পুনর্জীবন দান। জনতার বিশ্বাসের পুনর্জাগরণ এবং ইহুদী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের পূর্ণ অবিশ্বাস।

১২ অধ্যায় : তৃতীয় পাস্কা পর্ব। যেরুশালেমে যিশুর শেষ কার্যকলাপ। ক্রুশের উপর যিশুর মৃত্যুর লক্ষণ। এদ্বারা জগৎ পরাজিত হবে এবং বিশ্বাসী যারা তাদের কাছে বিশ্বজনীন মণ্ডলী প্রতিশ্রুত হবে।

পঞ্চাশত্তমী পর্ব

(৫ অধ্যায়)

এই অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনা যে পঞ্চাশত্তমী পর্বেই ঘটেছিল, একথা যোহন প্রত্যক্ষভাবে বলেন না। তাঁর কথায় 'ইহুদীদের এক পর্বের সময় এল'। কিন্তু, তাঁর এই অতি সাধারণ উল্লেখ সত্ত্বেও অধিকাংশ শাস্ত্রজ্ঞ দ্বারা এই মত সমর্থন পায় যে, সম্ভবত পর্বটি ছিল পঞ্চাশত্তমী পর্ব। সুতরাং আমাদের ব্যাখ্যায় ইহুদী পর্ব এবং যোহনের বিবরণীর মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান সেটির দিকেই বিশেষভাবে লক্ষ করব।

ইহুদী বিধান অনুসারে, বছরে তিন বার করে (পর্ণকুটির, পাস্কা ও পঞ্চাশত্তমী পর্ব তিনটি উপলক্ষেই) ইহুদীদের পবিত্র নগরী যেরুশালেমে তীর্থযাত্রী হওয়ার কথা (দ্বিঃবিঃ ১৬:১৬)। যিশুর সময় পঞ্চাশত্তমী পর্ব ছিল সিনাই পর্বতে ঐশবিধান-গ্রহণ এবং ঈশ্বরের স্থাপিত সন্ধি স্মরণ করার জন্য উদ্‌যাপিত পর্ব। এই বিষয়গুলিও স্মরণযোগ্য যে: এই পর্বের নামান্তর ছিল 'সাক্ষ্যদান পর্ব'; মোশির কালে সন্ধি স্থাপন ছাড়া, নোয়া ও আব্রাহামের সঙ্গে স্থাপিত সন্ধিও উল্লেখ করা হত এবং ইহুদী ধারণা অনুসারে ঐশবিধান সাব্বাৎ দিনে দান করা হয়েছিল। সুতরাং, লক্ষ করে দেখতে পারি যে, পঞ্চাশত্তমী পর্ব উপলক্ষে নিম্নলিখিত বিষয় চারটিই বিশেষভাবে আলোচনার বস্তু ছিল, তথা: সন্ধি, সাক্ষ্যদান, সাব্বাৎ এবং মোশির ভূমিকা। এই অধ্যায়ে যোহনও ঠিক এই বিষয় চারটি সম্বন্ধে আলোচনা করেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য হল খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিকোণের দিক দিয়েই সেগুলোর যথাযথ ব্যাখ্যা করা।

একজন রোগীর সুস্থতা-লাভ (৫:১-১৫)

৫ [১] এরপর ইহুদীদের এক পর্বের সময় এল, আর যিশু যেরুশালেমে গেলেন।
[২] যেরুশালেমে মেষ-জলকুণ্ডের কাছাকাছি একটা জলকুণ্ড আছে, হিব্রু ভাষায়
যার নাম বেথ্‌সাথা; তার পাঁচটা চাতাল আছে। [৩] সেই সব চাতালে বহু রোগী,
অন্ধ, খোঁড়া আর পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষ ভিড় করে শুয়ে থাকত। [[৪] কারণ বিশেষ

বিশেষ সময়ে প্রভুর দূত জলকুণ্ডে নেমে এসে জলে কাঁপন জাগাতেন; জল কেঁপে ওঠার পর যে কেউ প্রথম জলে নামত, সে যে রোগে-ই ভুগত না কেন, তা থেকে মুক্তি পেত।] [৫] সেখানে একজন লোক ছিল যে আটত্রিশ বছর ধরে রোগে ভুগছিল। [৬] যখন যিশু তাকে সেখানে শুয়ে থাকতে দেখলেন ও তার সেই বহুদিনের অসুখের কথা জানতে পারলেন, তখন তাকে বললেন, 'তুমি কি সুস্থ হতে চাও?' [৭] রোগী উত্তরে তাঁকে বলল, 'প্রভু, আমার এমন কেউ নেই যে, জল কেঁপে উঠলেই আমাকে কুণ্ডে নামায়। আমি যেতে যেতেই অন্য কেউ আমার আগে নেমে পড়ে।' [৮] যিশু তাঁকে বললেন, 'উত্থিত হও, তোমার মাদুর তুলে নাও আর হেঁটে চল।' [৯] লোকটি তখনই সুস্থ হয়ে উঠল, ও মাদুর তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল।

দিনটি ছিল সাব্বাৎ; [১০] তাই যাকে নিরাময় করা হয়েছিল, তাকে ইহুদীরা বললেন, 'আজ সাব্বাৎ দিন, মাদুর তোলা তোমার পক্ষে বিধেয় নয়।' [১১] কিন্তু সে তাঁদের উত্তর দিল, 'যিনি আমাকে সুস্থ করেছেন, তিনিই আমাকে বলেছেন, তোমার মাদুর তুলে নাও আর হেঁটে চল।' [১২] তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যে তোমাকে বলেছে, মাদুর তুলে নাও আর হেঁটে চল, সেই লোকটা কে?' [১৩] কিন্তু যে সুস্থ হয়েছিল, সে জানত না, তিনি কে, কারণ সেই জায়গায় অনেক ভিড় থাকায় যিশু সরে গেছিলেন। [১৪] কিছুক্ষণ পরে যিশু মন্দিরে তার দেখা পেয়ে তাকে বললেন, 'দেখ, তুমি সুস্থ হয়েছ; আর পাপ করো না, পাছে তোমার আরও খারাপ কিছু ঘটে।' [১৫] লোকটি গিয়ে ইহুদীদের জানাল, যিশুই তাকে সুস্থ করেছেন।

৪র্থ অধ্যায় ব্যাখ্যা করার সময় আমরা দেখলাম যে, সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের বৈষম্যে যোহনের সুসমাচারে যিশু লোকদের বিশ্বাস বা কষ্ট দেখে যে আশ্চর্য কাজ সাধন করেন এমন নয়, বরং তিনি নিজে আশ্চর্য কাজ করার সম্পূর্ণ নেতৃত্ব ও দায়িত্ব নেন। আশ্চর্য কাজের বিষয়ে দ্বিতীয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, মানুষের মারাত্মক বা সাংঘাতিক অবস্থা জোর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়: কানা গ্রামে আঙুররসের অভাবে অতিথি-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত, রাজকর্মচারীর ছেলে মৃত্যুর অভিমুখে ছুটে চলত; এই অধ্যায়ে রোগীর আশ্বাসবিহীন অবস্থা নির্দেশ করা হয়: তার রোগ দীর্ঘস্থায়ীই ছিল এবং নিঃসন্দেহে সে

নিজে থেকে ত্রাণকারী জলে নেমে পড়তে কখনও পারত না; এতে যোহনের মর্মকথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, জলই নয়, কেবল যিশুই একমাত্র প্রকৃত ত্রাণকর্তা। একই শিক্ষা অনুধাবন করা হয়েছিল ২য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে: যিশুর আগমনে শুচীকরণের জল এবং সামারিয়াস্থিত যাকোবের কুয়োর জল অর্থশূন্য হয়ে গেছে; আবার, এই বর্ণনায় উল্লিখিত জায়গার নাম হল (আরামীয় ভাষায়) বেথ্‌সাথা, যার অর্থ (হিব্রু ভাষায়) হল কৃপার গৃহ বা দয়ার গৃহ। জায়গাটার এই সুন্দর নাম থাকা সত্ত্বেও এবং সেখানে আটত্রিশ বছর ধরে থাকা সত্ত্বেও সেই রোগী কৃপা বা দয়ার মত কিছুই কখনও পেতে পারেনি; সুতরাং এতেও স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ত্রাণকর্তা যিশুই একমাত্র কৃপা ও দয়া-বিতরণকারী।

৫:৬—তুমি কি সুস্থ হতে চাও? যিশু এই ধরনের প্রশ্ন রাখেন কেন? একটি রোগী যে সুস্থ হতে চায়, কথাটা ত স্বাভাবিক! আমরা কিন্তু প্রশ্নটার দুই দিক দেখতে পাই: প্রথম, যিশু চান রোগী নিজে নিজের মারাত্মক অবস্থা স্বীকার করুক; দ্বিতীয়, প্রশ্নে এই সত্যও নিহিত আছে যে, মানবীয় সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমরা নিজে থেকে অক্ষম: আমরা যা চাই তা পেতে অসমর্থ; শুধু যিশুই সুস্থতাদান অর্থাৎ পরিত্রাণ করতে সক্ষম।

৫:৭—প্রভু, আমার এমন কেউ নেই যে… : আটত্রিশ বছর ধরে রোগীটা মুক্তিলাভ করার প্রয়াস করে আসছিল, অথচ অকৃতকার্য হয়েছিল। আটত্রিশ বছর উল্লেখই বিশেষভাবে লক্ষণীয়: পুরাতন নিয়মের কথা অনুসারে ইস্রায়েল জাতির অবিশ্বাসের জন্য ঈশ্বর তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন: অবিশ্বাসীদের ও বিদ্রোহীদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ইস্রায়েল জনগণ প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করবে না, বরং মরুপ্রান্তরে উদ্দেশবিহীনভাবে চলতে থাকবে; আমরা জানি যে ইস্রায়েল আটত্রিশ বছর ধরেই সেই প্রান্তরে চলতে থাকল (দ্বিঃবিঃ ২:১৪; গণনা ১৪:৩২-৩৩)। সুতরাং, জলকুণ্ডের সেই রোগী হল ইস্রায়েল জনগণের প্রতীক যারা মরুপ্রান্তরে হেঁটে চলেছিল: কেবল যিশুর আগমনেই রোগীটা প্রকৃত প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করতে পারল, অর্থাৎ শুধু যিশুতেই সে চিরস্থায়ী পরিত্রাণ পেল।

৫:৮—উত্থিত হও: যিশুর উচ্চারিত বাণী অবিলম্বেই কৃতকার্য হয়। যিশুর আদেশে লোকটা রোগমুক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু, তাছাড়া, আমাদের মন অবশ্যই যিশুর বিশিষ্ট কথার দিকে ছুটে চলেছে: 'উত্থিত হও'। এটি হল সেই একই শব্দ যা মন্দির শুচীকরণের বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছিল (আমি তা পুনরুত্তোলন করব: ২:১৯, ২০, ২২) এবং এই ৫ম অধ্যায়েও ব্যবহৃত হবে: 'পিতা যেমন মৃতদের পুনরুত্থিত করে…' (৫:২১; উল্লেখযোগ্য যে, উত্থিত, পুনরুত্থিত, উত্থাপিত, উত্তোলিত বাংলা শব্দগুলো গ্রীক ও আরামীয় ভাষার একটিমাত্র শব্দের অনুবাদ)। সুতরাং, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এই উদ্ধৃতাংশে একটা সুস্থতাদানের কথা শুধু বর্ণনা করা হয় না, বরং যোহনের উদ্দেশ্যে সেই সুস্থতাদান যথার্থই একটা পুনরুত্থান, জীবন-নবীকরণ, তার প্রকৃত অবস্থায় মানুষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

৫:৯—দিনটি ছিল সাব্বাৎ: রোগীর সুস্থতালাভে একটা কাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ফরিশীরা যিশুর আশ্চর্য কাজ মানতে চান না, কেননা রোগমুক্ত লোক সাব্বাৎ দিনেই (অর্থাৎ বিশ্রামবারে) মাদুর তুলে হেঁটে বেড়ায়: বাস্তবিক, ইহুদী বিধান অনুসারে সাব্বাৎ দিনে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা ও নির্ধারিত দূরত্ব অতিক্রম করে হেঁটে বেড়ানো বিধেয় ছিল না, তবু রোগমুক্ত লোকটি নিরাময়কারীর আদেশ জানিয়ে আত্মপক্ষসমর্থন করে বলে, সে তাঁর নাম পর্যন্ত জানে না। সুস্থতালাভের আনন্দে সে যিশুর নাম জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছিল।

৫:১৪—আর পাপ করো না: সেইকালে লোকে মনে করত রোগ হল ঈশ্বরের দণ্ড; যিশু এখানে এই জনশ্রুতি সত্য বলে ঘোষণা করতে চান না বটে; তিনি এ-ই সত্য ঘোষণা করেন যে, অতিশয় সাংঘাতিক রোগের চেয়ে চিরকালীন শাস্তিই মারাত্মক: পাপজনিত ঐশ জীবন-হানি, এটিই মানুষের পক্ষে একমাত্র মারাত্মক রোগ। যিশুর দ্বারা সাধিত রোগীর সুস্থতালাভের ঘটনায় যিশুর যে মহাকর্মই সূচিত, সেটা হল মানুষকে

ঐশজীবন দান করা। যে ঐশজীবন অগ্রাহ্য করে, সে ঈশ্বরপুত্রের অভিযোগে বিচারাধীন হয়; একথা ইহুদীদের সঙ্গে যিশুর পরবর্তী তর্ক-বিতর্কে উন্মুক্তভাবে ব্যক্ত হবে।

যিশুই জীবনদাতা ও বিচারকর্তা (৫:১৬-৩০)

৫ [১৬] এজন্যই ইহুদীরা যিশুকে নিপীড়ন করতে লাগলেন, কেননা তিনি সাব্বাৎ দিনে এই সমস্ত করছিলেন। [১৭] যিশু প্রত্যুত্তরে তাঁদের বললেন, 'আমার পিতা এখনও কাজে রত আছেন, আর আমিও কাজে রত আছি।' [১৮] এজন্যই ইহুদীরা আরও প্রবল ভাবে তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন, কারণ তিনি যে সাব্বাৎ দিন লঙ্ঘন করতেন, তা শুধু নয়, কিন্তু ঈশ্বরকে নিজের পিতা বলতেন ও নিজেকেই ঈশ্বরের সমান করতেন। [১৯] যিশু এই বলে তাঁদের উত্তর দিলেন, 'আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না; তিনি পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই মাত্র করেন; কারণ তিনি যা কিছু করেন, পুত্রও তেমনি তা-ই করেন। [২০] কেননা পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, ও নিজে যা কিছু করেন, তা সমস্তই তাঁকে দেখান, এবং এর চেয়ে মহত্তর কাজও তাঁকে দেখাবেন, যেন আপনারা আশ্চর্য হন। [২১] পিতা যেমন মৃতদের পুনরুত্থিত করে তাদের জীবন দান করেন, তেমনি পুত্র যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই জীবন দান করেন। [২২] কারণ পিতা নিজে কারও বিচার না করে সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেছেন, [২৩] যেন সকলে যেমন পিতাকে সম্মান দিয়ে থাকে, তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে। পুত্রকে যে সম্মান করে না, যিনি পুত্রকে পাঠিয়েছেন, সে সেই পিতাকেও সম্মান করে না। [২৪] আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে আমার বাণী শোনে, ও যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, সে বিচারের সম্মুখীন হয় না, বরং সে মৃত্যু থেকে জীবনেই উত্তীর্ণ হয়েছে। [২৫] আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এখনই উপস্থিত, যখন মৃতেরা ঈশ্বরপুত্রের কণ্ঠস্বর শুনবে, এবং যারা তা শুনবে তারা জীবিত হবে। [২৬] কেননা পিতার যেমন নিজের মধ্যে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও নিজের মধ্যে জীবন রাখতে দিয়েছেন; [২৭] এবং তিনি তাঁকে বিচার করার অধিকার দিয়েছেন, কারণ তিনি মানবপুত্র! [২৮] এতে আপনারা

আশ্চর্য হবেন না, কারণ সেই ক্ষণ আসছে, যখন যারা সমাধিতে রয়েছে, তারা সকলে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে কবর থেকে বের হবে: [২৯] যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে জীবনের উদ্দেশে, কিন্তু যারা অসৎ কর্ম করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে বিচারের উদ্দেশে। [৩০] নিজে থেকে আমি কিছুই করতে পারি না: আমি যেমন শুনি তেমনি বিচারও করি, আর আমার বিচার ন্যায্য, কারণ আমি নিজের ইচ্ছা নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করি।'

যিশুর এই উপদেশ যোহনের সুসমাচারের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ উপদেশগুলোর অন্যতম; এতে যিশু পুত্র বলে আত্মপ্রকাশ করেন। যিশুই পুত্র, পিতার সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এ সত্য এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যেন আমরা যিশুর এই উপদেশও সঠিকভাবে বুঝতে পারি, আবার ঈশ্বর যে কিভাবে যিশুতে আত্মপ্রকাশ করেন তাও যেন উপলব্ধি করতে পারি। পুত্র সম্পূর্ণরূপে জীবন দান করেন, এ ঐশভূমিকা অনুশীলন করায় তিনি মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের উদ্বেগ ও চিন্তা প্রকাশ করেন। ঐশপ্রকাশকর্তা যিশু মানবজাতির মাঝে এসে মৃত্যু থেকে জীবনে পৌঁছানোর ক্ষমতা মানুষকে দান করেন মানুষ যেন নিজের প্রকৃত ও নিত্য অস্তিত্ব (যে অস্তিত্বের জন্য মানুষ সৃষ্ট হয়েছে) লাভ করে। তবুও মানুষকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়, তথা: সে যদি পুত্র ও তাঁর প্রেরণকর্তা পিতার প্রতি বিশ্বাস না রাখে তাহলে সে দণ্ডিত হয় এবং মৃত্যুতে থেকে যায়। এই সকল ধারণা ৩:১৬-১৮-এও উপস্থাপিত হয়েছিল, এখন কিন্তু বিশেষ একটা আলোতে—পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্কের আলোতেই আলোচিত হয়।

উপরন্তু, এই উপদেশে যোহন অধিক গভীরতরভাবে নিজ ধারণা ব্যক্ত করে বলেন যে, ইতিমধ্যেই চরমকালের সূচনা হয়েছে, চরমকাল ইতিমধ্যেই বর্তমান! পুত্র বলে যিশুও ঈশ্বরের সকল কাজ সাধন করতে সক্ষম; কিন্তু যেহেতু তিনি দেখতে সাধারণ মানুষের মত, সেজন্য তাঁর এই ঐশক্ষমতা কারও চোখে পড়ে না, অথচ তিনিই একমাত্র চরম ত্রাণকর্তা ও চরম বিচারকর্তা।

৫:১৬—এজন্যই ইহুদীরা যিশুকে নিপীড়ন করতে লাগলেন: পিতার ইচ্ছা পালনেই যিশু আশ্চর্য কাজ সাধন করায় ইহুদীরা বিস্মিত নয়, বরং আরও বেশি রাগান্বিত হয়। এই প্রতিক্রিয়া যিশুর বেলায় ঘটেছে, যোহনেরও সময়ে ঘটেছে এবং আজও ঘটে থাকে যখন বিশ্বাসহীন মানুষ নিজেকে ধর্মীয় নেতা বলে দাবি করে।

৫:১৭—আমার পিতা এখনও কাজে রত আছেন: সেইকালে ইহুদীরা ঈশ্বরের কাজ দুই শ্রেণিতে নির্ণয় করত: স্রষ্টারূপে তিনি সাব্বাৎ দিনে বিশ্রাম করেন, কিন্তু জগতের নিয়ন্তা, জীবনদাতা ও বিচারকর্তা বলে তিনি কখনও বিশ্রাম করেন না, এমনকি সাব্বাৎ দিনে (বিশ্রামবারে) তিনি সর্বোত্তম কাজ সৃষ্টি করেন: তিনি সাব্বাৎ অর্থাৎ ঈশ্বরের বিশ্রাম বলে সেই রাজ্য বা অবস্থা সৃষ্টি করেন, যে-রাজ্য ভোগ করতে মানুষ আদি থেকেই সৃষ্ট হয়েছিল। সুতরাং, সাব্বাৎ নগণ্য একটা দিন নয়, বরং সেই সৃষ্টিকর্মের মুকুটস্বরূপ, যে-সৃষ্টিকর্মের প্রভুরূপে মানুষই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাব্বাৎ হল ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম ও মহাশক্তির অভিব্যক্তির দিন, যে-দিনে মানুষ নিজের কাজ থেকে বিরত হয়ে সদা জীবনদানকারী ও সদা সৃষ্টিকর্মে রত ঈশ্বরকে উপাসনা করে: আমরা নয়, ঈশ্বরই জগতের নিয়ন্তা। এই কারণেই যিশু সাব্বাৎ দিনে রোগী লোকটিকে নিরাময় করে তোলেন: তিনি দেখাতে চান যে পিতা সৃষ্টিকর্ম ও মুক্তিকর্ম থেকে কখনও বিরত নন; এমনকি, পুত্র হয়ে তিনি পিতার সঙ্গে এত সংযুক্ত যে, বিশেষত ত্রাণকর্মের ক্ষেত্রে পিতার মত কাজ না করে পারেন না। যেহেতু পিতা সেই রোগীর প্রতি দয়া দেখিয়ে তার পাপ ক্ষমা করলেন, সেজন্য যিশুও তাকে রোগমুক্ত করে তোলেন অর্থাৎ তাকে জীবন দান করেন। বাহ্যিক দিক দিয়ে সাব্বাতের নিয়ম লঙ্ঘন করায় তিনি সাব্বাতের প্রকৃত তাৎপর্য অধিক স্পষ্টতরভাবে আলোকিত করেন এবং নিজের সম্বন্ধে একটি সত্য উদ্ঘাটন করেন: তিনি পিতার মত ঈশ্বর বলে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু ঠিক একথাই ইহুদীদের ও সর্বকালের অবিশ্বাসীদের রাগান্বিত করে: কি করে একজন মানুষ নিজেকে ঐশঅধিকারসম্পন্ন ও ঐশক্ষমতাপ্রাপ্ত বলে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে এত গভীর সম্পর্কযুক্ত বলে—এমনকি নিজেকে ঈশ্বর বলেই দাবি করতে পারে?

৫:১৯—নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না: এতে যিশু নিজের বিনম্রতা প্রকাশ করতে চান না, বরং প্রচার করেন যে, তিনি যদি ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য ও নিজের প্রতি বিশ্বস্ত হতে চান, তাহলে তাঁকে সর্বদাই ঈশ্বরের অধীনে থাকতে হয়। তিনি কথায় ও কাজে সবসময়ই পিতামুখী, নিজে থেকে কিছুই করতে পারেন না; তাঁর জীবনোৎসর্গও পিতার আদেশে ঘটেছে। একথাও লক্ষণীয়: পিতা ও পুত্র একসঙ্গেই একই কাজ সাধন করেন, অর্থাৎ পিতা পুত্রের মাধ্যমে কাজ করেন, জীবনদান করেন, বিচার করেন; পুত্রও পিতার কাজ সাধন করেন; কেননা ঐশবাণী এবং ঈশ্বর এক (১:১)। এখন কিন্তু পিতা পুত্রকে প্রেরণ করলেন; পুত্রের মধ্যে অদৃশ্যমান ঈশ্বর দৃশ্যমান, এবং পুত্রের বাণীতে মানুষ পিতার ইচ্ছা জানতে পারে; যিশুতেই ঈশ্বর ত্রাণকর্তারূপে মানুষের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করলেন।

৫:২০ক—পিতা পুত্রকে ভালবাসেন: ভালবাসার খাতিরেই পিতা ও পুত্র একসঙ্গে একই কাজ সাধন করেন। আবার ভালবাসার খাতিরেই পিতা সমস্তই পুত্রকে দেখান অর্থাৎ সমস্ত অধিকার পুত্রের উপর আরোপ করেন।

৫:২০খ—এর চেয়ে মহত্তর কাজও তাঁকে দেখাবেন: উল্লিখিত মহত্তর কাজ বাহ্যিক কাজ বটে, অথচ তেমন কাজের প্রকৃত মহত্ত্ব এই যে, সেটার মধ্য দিয়ে যিশুর জীবনদায়ী শক্তি ও বিচার করার অধিকার প্রকাশ পায়। পিতার বিশিষ্ট কাজ হল বিচার করা ও মৃতদের পুনরুত্থিত করা। লক্ষ করার বিষয় এই যে, পিতার হাত থেকে পুত্রের হাতে উল্লিখিত অধিকার দু'টোর (বিচার ও পুনরুত্থিত করা) হস্তান্তর ইতিমধ্যেও ঘটে: যে পুত্রের প্রতি বিশ্বাস রাখে, পুত্র তাকে নব জীবন দান করেন; যে বিশ্বাস রাখে না, সে ইতিমধ্যে পুত্র দ্বারা বিচারিত। উপরন্তু, সেই অধিকার-হস্তান্তর গুণে পুত্র পিতার একই শক্তিতে ও আধিপত্যে সেই কাজ সাধন করেন: তিনিই বিশ্বাসীদের পক্ষে প্রকৃত ঐশজীবনদাতা এবং অবিশ্বাসীদের পক্ষে প্রকৃত বিচারকর্তা; পুত্রের বাণীর মধ্য দিয়ে পিতা আমাদের জীবনদান ও বিচার করেন: পিতা ও পুত্র একই অধিকার ও মর্যাদায়

মণ্ডিত। এই কারণে আমরা পুত্রকে সম্মান করব, অর্থাৎ পুত্রের বাণী ও কাজসকল পিতার নিজের বাণী ও কাজসকল বলে গণ্য করব; আমরা এ কর্তব্য পালন করায় পিতা নিজেকে সম্মানিত মনে করেন। অধিকন্তু, পুত্রকে সম্মান করা উচিত, কেননা তিনি পিতার প্রেরিতজন। আজও পিতা তাদেরই কাছ থেকে সম্মান পান যারা পুত্রের কাজে ঈশ্বরের দেওয়া ঐশঅধিকার—জীবনদাতা ও বিচারকর্তা হওয়ার অধিকার স্বীকার করে।

৫:২৪—যে আমার বাণী শোনে: যে বিশ্বাসের সঙ্গে পুত্রের বাণী মেনে চলে, সে-ই অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে: যিশুতে তাঁর প্রেরণকর্তা পিতাকেই দেখা প্রয়োজন, এবং পিতা যাঁকে প্রেরণ করলেন সেই পুত্র যে পিতার একই বাণী বলেন ও একই কাজ সাধন করেন এই সত্যও আমাদের গ্রাহ্য করা উচিত। 'পুনরুত্থান' ও 'বিচার' বলতে দু' দিক দিয়ে একই জিনিস বোঝায়: যদি বিশ্বাস করি তাহলে পুনরুত্থান করি বিধায় বিচারিত নই; যদি বিশ্বাস না করি তাহলে যিশুকে অস্বীকার করে জীবনও অগ্রাহ্য করি বিধায় যিশুর বিচারের অধীনে নিজেদের বশীভূত করি। ঐশজীবন পাওয়া-ই পুনরুত্থান, কেননা এইভাবে আমরা চিরকালের মতই মৃত্যুলোক থেকে জীবনলোকেই স্থানান্তরিত হই। যোহন শারীরিক জীবন থেকে অনন্ত জীবন নির্ণয় করেন, যে-অনন্ত জীবন আমরা ঐশজীবনের সহভাগিতায় লাভ করি। যেহেতু যিশু পিতার জীবনের সহভাগী, সেজন্য তিনি এই অনন্ত জীবন আমাদের দান করতে সক্ষম। তেমন জীবন পাবার ফলে আমরা নিজেদের অস্তিত্বের গভীর মর্মসত্যও আবিষ্কার করি।

৫:২৫—সেই ক্ষণ আসছে… যখন মৃতেরা…: যিশুর প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যে সিদ্ধিলাভ করেছে: ক। ভাবী পুনরুত্থান ইতিমধ্যে বর্তমান একটি বাস্তবতা, কেননা ইতিমধ্যেই আমরা জীবনের উদ্দেশে আহ্বানকারী সেই ঈশ্বরপুত্রের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। খ। সকল মানুষই 'মৃত', কেননা আমরা সকলেই ঈশ্বরের বিচারাধীন এবং ইতিমধ্যেই ঐশজীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থান করতে পারি। গ। ঈশ্বরপুত্রের কণ্ঠস্বর শুনতে গিয়ে

আমরা বিশ্বাসের সঙ্গেই সেই কণ্ঠস্বর শুনব, নইলে জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থান করব না। এবিষয়ে জ্ঞান-মার্গপন্থীরা বলত, এক কণ্ঠস্বরই জগতের মায়াবেশে নিদ্রিত মানবাত্মাদের জাগায়; অপর দিকে যোহনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, যিশুর কণ্ঠস্বরে বিশ্বাসী নিদ্রা থেকে জাগরিত নয়, মৃত্যু, পাপ ও বিচারদণ্ড থেকেই বিমুক্ত। সম্ভবত এই বাক্যসকল আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীকালীন বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হত।

৫:২৬—পিতার যেমন নিজের মধ্যে জীবন আছে…: ঈশ্বরপুত্রের কণ্ঠস্বর মৃতদের পুনরুত্থিত করতে সক্ষম, কেননা পিতার মত পুত্রেরও নিজের মধ্যে জীবন বিদ্যমান এবং তিনি সেই জীবন দান করতে পারেন। পিতা ঈশ্বর হলেন জীবনের উৎস, আর পুত্র বলে যিশু পিতার সেই জীবনের সহভাগী: এখানে অন্য কথায় ব্যক্ত হচ্ছে সেই ঐশতত্ত্ব যা মাংসে আগত বাণীর বিষয়ে উপস্থাপন করে হয়েছিল, তথা: আদি থেকেও তিনি ছিলেন ঈশ্বর, জীবন ও মানুষের আলো। পিতার জীবনের সহভাগিতায় স্বয়ং পুত্র তাঁর বিশ্বাসীদের পক্ষে জীবনের উৎস হয়ে ওঠেন (৩:১৫; ৬:৫৩; ১৪:১৯; ২০:৩১)। জীবন দান করা ছাড়া পিতা এখন থেকে পুত্রের হাতে বিচার করার অধিকারও হস্তান্তর করেন: যে পুত্রের বাণী অগ্রাহ্য করে সে ইতিমধ্যেই বিচারিত। সুতরাং, পুত্রের বাণী বিশ্বাসীদের কাছে শক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাসীদের কাছে বিচারদণ্ডস্বরূপ। উল্লেখযোগ্য যে যোহনের সুসমাচারে এইখানে মাত্র মানবপুত্রই বলে যিশুর উপর বিচার করার অধিকার আরোপিত।

৫:২৮—এতে আপনারা আশ্চর্য হবেন না: এখানে অন্তিম দিবসের পুনরুত্থানের কথা সূচিত; যারা এই জীবনে সৎকর্ম সাধন করেছিল এখন তারা পুরস্কৃত হবে, অর্থাৎ এই জীবনকালে পাওয়া ঐশজীবন তারা চিরকাল ধরেই ভোগ করবে এবং দুষ্কৃতকারীরা বিচারিত হবে, তাদেরও বিচার আর বাতিল করা হবে না।

৫:৩০—নিজে থেকে আমি কিছুই করতে পারি না: ১৯ পদে প্রকাশিত সত্য এখানেও ব্যক্ত হয়: পিতা ও পুত্র একসঙ্গেই একই কাজ সাধন করেন। কিন্তু এখন যিশু পিতার বিচার সম্পাদন করেন, যিশুর বাণীর অন্তরালে পিতার অধিকার বর্তমান, এজন্য তাঁর বিচার ন্যায্য, প্রকৃত ও ফলপ্রসূ।

সুতরাং, তাঁর নির্যাতনকারী ইহুদীদের কাছে ও সকল অবিশ্বাসীদের কাছে যিশু ঘোষণা করেন, তিনি প্রেরণকারী পিতার ইচ্ছা অনুসারে ছাড়া অন্য কিছু করতে চান না: বিচার এড়াবার জন্য তারা তাঁর বাণী গভীরভাবে চিন্তা করুক এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হোক।

পরিশিষ্ট

যোহন অনুসারে পুত্ররূপে যিশুর আত্মপ্রকাশ

পুত্ররূপে যিশুর আত্মপ্রকাশ যোহন-ঐতিহ্যের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, বাস্তবিকপক্ষে অপরাপর সুসমাচার ও পত্রাবলিতে এই সংজ্ঞার উল্লেখ নেই। উপরন্তু, যোহন অনুসারে যিশুর কথা (অর্থাৎ তাঁর উপদেশগুলো ও আচার-ব্যবহার) সূক্ষ্মভাবে অনুভব করতে হলে তবে পিতা ও পুত্রের মধ্যকার সম্পর্ক উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু, লক্ষ করার বিষয় একথা যে, পুত্র সংজ্ঞাটা মানবপুত্র বা ঈশ্বরপুত্র সংজ্ঞা দু'টো থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক রাখা উচিত, কেননা 'পুত্র' এই সংক্ষিপ্ত শব্দের মধ্য দিয়ে যোহন যিশু-সম্বন্ধীয় নতুন এক দিকের উপর আলোকপাত করেন।

পরিশিষ্টটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে: ১। যোহনের সুসমাচারে পুত্র ও পিতা সংজ্ঞা দু'টো; ২। নূতন নিয়মে এবং অন্যান্য ধর্মে পুত্র ও পিতা সংজ্ঞা দু'টো; ৩। যোহনের খ্রিষ্টতত্ত্ব অনুসারে পুত্র নামের তাৎপর্য ও গুরুত্ব।

যোহনের সুসমাচারে পুত্র ও পিতা সংজ্ঞা দু'টো

পুত্র : এবিষয়-সম্পর্কিত সকল উদ্ধৃতাংশ বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, পুত্র নামটি নিম্নলিখিত প্রসঙ্গের সঙ্গে জড়িত :

– জগতে পুত্রকে প্রেরণ (৩:১৬)।

– পুত্রের প্রতি পিতার ভালবাসা; এমন ভালবাসা যা যিশুর ঐশপ্রকাশকর্মে ও পিতার কাজকর্মে তাঁর সহভাগিতায় অভিব্যক্তি লাভ করে (৩:৩৫; ৫:২০, ২৩)।

– বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ এবং অবিশ্বাসীদের বিচার করার পুত্রের ভার (৩:৩৬; ৫:২২-২৭…)।

– পুত্রের মধ্যে ও পুত্রের মাধ্যমে পিতার গৌরবায়ন (১৪:১৩; ১৭:১)।

সহজে বোঝা যায়, উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলো দ্বারা যিশুর প্রকাশকারী ও ত্রাণদায়ী কাজের মুখ্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। এজন্য আমরা একথা বলতে পারি যে, পৃথিবীস্থ যিশু-সম্পর্কিত মর্মসত্যের বিভিন্ন দিক বিশ্বাসের আলোতে তুলে ধরার জন্য যোহনের পক্ষে পুত্র নামটিই শ্রেষ্ঠ উপায়।

পিতা : পিতা নামটি খুবই প্রচলিত, এই কারণের জন্যও যে তা হল ঈশ্বরের নামান্তর। যদিও এবিষয়ে আমাদের আলোচনা সংক্ষিপ্ত তবু নিম্নলিখিত তালিকা থেকে নামটি যে কতই না গুরুত্বপূর্ণ তা প্রকাশ পায় :

– পিতা পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন (৫:৩৭; ৬:৪৪)।

– পিতা পুত্রকে তাঁর নিজের নাম, গৌরব, বাণী, কাজ, বিশ্বাসীসকলকে ও বিচার করার ভার প্রভৃতি দান করেন (১৭:৪-৮, ১১, ১২, ২২, ২৪; ৫:২২, ২৭, ৩৬; ৬:৩৭, ৩৯…)। কিন্তু 'দান' বিষয়ে পিতার শ্রেষ্ঠ দান এই যে, তিনি জগতের কাছে আপন পুত্রকে দান করলেন জগৎ যেন জীবন পায় : পুত্র-যিশুই সত্যকার জীবনদায়ী স্বর্গীয় রুটি (৬:৩২)। যোহনের ধারণা অনুসারে পিতা হলেন প্রদানকারী ঈশ্বর যিনি দান করায় নিজের পরিত্রাণদায়ী ইচ্ছা

প্রকাশ করেন; মানবজাতিকে ত্রাণ করার জন্য তাঁর প্রধান দান হল তাঁর নিজের পুত্র, এবং জগৎ ছেড়ে পুত্র চলে যাওয়ার পর পবিত্র আত্মাকে দান করলেন।

– পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ভালবাসা তাঁদের মধ্যকার ঐক্যের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে: কাজের ঐক্য, সেজন্যই পুত্র নিজে থেকে কিছুই করেন না বরং তা-ই মাত্র উচ্চারণ ও সাধন করেন যা পিতামুখী হওয়ায় দেখেছেন ও শুনেছেন (১৫:১৯··· ; ৮:২৮, ৩৮···), এবং পিতা পুত্রকে সমস্তই দেখান (৫:২০), অর্থাৎ পুত্রের হাতে জীবন দেওয়া ও বিচার করার ভার ন্যস্ত করেন (৫:২১-২৭)। ফলত পুত্র পিতার হাতে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সঁপে দেন ও পিতা সর্বদা পুত্রের সঙ্গে আছেন (৮:২৯), তাঁকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করেন (৮:৫৪···); এমনকি তাঁরা প্রকৃতপক্ষে এক (১০:৩০; ১৭:১১···): পুত্র পিতাতে ও পিতা পুত্রে বর্তমান (১০:৩৮; ১৪:১০··· ; ১৭:২১···)। সুতরাং, পুত্রকে দেখে আমরা পিতাকেও চিনি ও দেখি (৮:১৯; ১২:৪৫···)।

– পিতা জগতে যিশুর প্রকাশকারী ও ত্রাণকারী কাজ অনুপ্রাণিত ও সত্য বলে সমর্থন করেন, এমনকি পুত্রের যাবতীয় কাজের অনুপ্রেরণাদানকারী হওয়া ছাড়া পিতা পুত্রের কাজে উপস্থিত (১২:৪৯; ১৪:১০)। পিতা পুত্রকে নিজের প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত করলেন (৬:২৭) এবং তাঁর ইচ্ছাই, যারা পুত্রকে দে'খে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে তারা যেন অনন্ত জীবন পায় (৬:৪০)। উপরন্তু, যিশুর ভালবাসার খাতিরে পিতা নিজের ভালবাসায় বিশ্বাসীদেরও গ্রহণ করেন (১৪:২১) এবং যিশুর নামে উচ্চারিত তাদের যাচনাসকল পূরণ করেন (১৪:১৩)।

– যিশু পিতা থেকে আগত, এবং ক্রুশে-উত্তোলন ও গৌরবায়নের পথের মধ্য দিয়ে পিতার কাছে ফিরে যান: পিতা দ্বারা প্রেরিত হয়ে পিতার কাছে ফিরে যান; পিতাই যিশুর জীবনের উৎস ও লক্ষ্য (১৩:১; ১৪:১২···)। পুত্র পিতার কাছে বিশ্বাসীদের নিয়ে যেতে চান (১৪:৩), অতএব তাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করার জন্য পিতার কাছে ফিরে যান (১৪:২)। পিতা থেকে আগত

বিধায় ও ঐশবাণী হওয়ায় পুত্র পিতার মত জগৎসৃষ্টির আগে থেকে বিদ্যমান: বিশ্বাসীগণ তাঁর মধ্যে অদ্বিতীয় পুত্রের গৌরব প্রত্যক্ষ করল (১:১৪) এবং আদি থেকে পিতার কাছে তাঁর যে গৌরব ছিল, গৌরবান্বিত পুত্র সেই গৌরব আবার ফিরে পান। এই গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে পুত্র সকল মানুষের পরিত্রাণের জন্য (১৭:২) ও শিষ্যদের কাজ যাতে ফলপ্রসূ হয় (১৪:১২) এজন্যও প্রার্থনা করেন, এবং পিতা ও তাঁর প্রেরিত পবিত্র আত্মা জগতে তাঁর কাজ সম্পন্ন করে চলেন (১৪:২৬; ১৫:২৬; ১৬:৭)।

– যে সত্যময় ঈশ্বরকে ইহুদীরা বিশ্বাস করত তিনিই সেই পিতা ঈশ্বর। তবু যিশু স্পষ্টভাবে বলেন, যারা তাঁকে পুত্র বলে স্বীকার করে না তারা পিতাকেও স্বীকার করতে পারে না। সুতরাং, খ্রিষ্টমণ্ডলীই আত্মা ও সত্যের শরণে পিতার উপাসনা করতে সক্ষম।

সমন্বয়: উপরোল্লিখিত প্রসঙ্গ দু'টো তুলনা করে একথা স্বীকার্য যে, পুত্র প্রসঙ্গে ব্যক্ত ধারণাগুলো যে পিতা প্রসঙ্গেও বর্তমান শুধু তা নয়, বরং প্রসঙ্গ দু'টোর সমন্বয়ের ফলে সকল ধারণা অধিকতর পরিমাণে নতুন নতুন গভীর অর্থবহ হয়ে ওঠে; একথা বিশেষত পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ভালবাসা, তাঁদের সম্পূর্ণ ঐক্য ও তাঁরা যে এক, এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আরও, স্পষ্টতরভাবে অনুভব করা যায় কি করে পুত্র পিতার প্রতি বাধ্য হয়েও তবু স্বরূপে ও সত্তায় পিতার সদৃশ; উপরন্তু, পিতার পরিত্রাণদায়ী ভূমিকা উদ্ভাসিত হয়। অবশেষে, পিতা যে পুত্রের বিশেষ কাজের উৎস ও লক্ষ্যস্বরূপ, এ সত্যও উত্তমরূপে প্রকাশ পায়, এমনকি এদ্বারা পুত্রের নিজের ত্রাণমূলক দায়িত্বও বিশেষভাবে আলোকিত হয়: যথার্থই, কেবল পুত্রের মৃত্যু, পিতার কাছে তাঁর ফিরে যাওয়াটা, পিতা দ্বারা তাঁর গৌরবারোপণ এবং পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ জগতের পক্ষে জীবন ও পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত করে: এটিই ছিল পিতার উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্যে তিনি পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছিলেন।

নূতন নিয়মে এবং অন্যান্য ধর্মে পুত্র ও পিতা সংজ্ঞা দু'টো

নূতন নিয়মে: এবিষয়ে একথাই মাত্র বলা যথেষ্ট হোক যে, পলের পত্রাবলিতেও পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ও প্রেরণ ধারণাটা বিশেষভাবে বর্তমান। যোহনের সুসমাচারের চেয়ে পলের পত্রাবলি আগেই লেখা হয়েছিল বিধায় আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যোহন উল্লিখিত ধারণা দু'টো গ্রহণ করে নিজের লেখায় সেগুলো আরও গভীরভাবে আলোচনা করেছেন।

অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে: সেই সময়কার গ্রীক ঐতিহ্যে ঈশ্বরপুত্র বলে পরিচিত লোকদের কথা ছিল। তারা আসলে ফকির, তবু সময় সময় বিস্ময়কর কাজও সাধন করত। তা সত্ত্বেও, তারা যে সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র, একথা কেউই মানত না, এমনকি তারা নিজেরাই যিশুর মত ঐশপ্রকাশকারী বা পরিত্রাণদায়ী ভূমিকা নিজেদের বেলায় দাবি করত না।

জ্ঞান-মার্গপন্থীরাও তাদের উপদেশে ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তাকে পিতা ও পুত্র বলে ডাকত। কিন্তু, এ সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের ধারণার সঙ্গে যোহনের ধারণার পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। একথা বলা চলে যে, সম্ভবত যোহনের সমসাময়িক ঈশ্বর-অন্বেষীদের জিজ্ঞাসা ও সমস্যাদির সত্যময় উত্তর দেবার জন্য এবং তাদের কল্পিত ধারণাধারার স্থানে একটা বাস্তব ঘটনা উপস্থাপন করার জন্য নিজের লেখায় পিতা-পুত্রের ধারণা অনুপ্রবিষ্ট করেছেন: যিশুই সেই অনন্য পুত্র যিনি অনন্য পিতাকে প্রকাশ করতে ও তাঁর কাছে সকল মানুষকে চালনা করতে সমর্থ।

যোহনের খ্রিষ্টতত্ত্ব অনুসারে পুত্র নামের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

খ্রিষ্টতত্ত্বে পুত্র নামটিও গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু একথা বলে আমরা অনুমান করব না যে, মানবজাতির পক্ষে যিশুর সম্পূর্ণ তাৎপর্য কেবল 'পুত্র' ধারণায়ই কেন্দ্রীভূত। যোহন নিজে যিশুর মর্মসত্য প্রকাশ করার জন্য এ নাম ছাড়া অন্য কতগুলো শব্দও ব্যবহার করলেন, যথা: মানবপুত্র, নেমে আসা-আরোহণ, উত্তোলন-উন্নয়ন, গৌরবায়ন ইত্যাদি বিশিষ্ট শব্দ।

পুত্র-খ্রিষ্টতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য এই হল যে, সেটির মাধ্যমে মাংসে আগত যিশু পিতার সঙ্গে সদাই-সম্পর্কযুক্ত বলে প্রকাশিত; জগতে তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব ব্যক্ত হয়, এমন কর্তৃত্ব যা গৌরবায়নের পর সার্বজনীন হবে (১৭:২)। তাছাড়া মাংসে আগত যিশুর কার্যকলাপ চরম পরিত্রাণদায়ী ঐশপ্রকাশ বলে ফুটে ওঠে এবং তিনি নিজেই মানুষের কাছে ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী ইচ্ছার প্রকাশকারী ও সাধনকারী ব্যক্তি। এজগতে তিনি যা যা করেছেন, ঈশ্বরের আদেশ অনুসারেই তা করেছেন, আদেশটা হল ঐশজীবন দান করা। বস্তুত, তাঁর বাণীসকল আত্মা ও জীবন (৬:৬৩), এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সমুদয় ক্রিয়াকলাপ পিতার কাজেরই অংশ। সুতরাং বলতে পারি, যোহনের পুত্র-খ্রিষ্টতত্ত্বের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হল পরিত্রাণের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তত্ত্ব। পরিত্রাণ পাবার ব্যাপারে যোহন তাঁর সমসাময়িক ঈশ্বর-অন্বেষীদের আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলেন, এজন্য তাঁর যিশুর কথা উপস্থাপনা শুধু ভুলভ্রান্তিশূন্য নয়, বরং পাঠকের কাছে আকর্ষণীয়; এমনকি, কেবল সেই সময়কার পাঠকের কাছে নয়, আজকার পাঠকের কাছেও আকর্ষণীয়, কেননা জীবন-জিজ্ঞাসা বর্তমানকালেও কঠিন জিজ্ঞাসা: যিশুখ্রিষ্ট, যিনি পিতার কাছে যাবার একমাত্র পথ, এজগতে অদৃশ্যমান ঈশ্বরের বাস্তব প্রকাশ এবং জগতের কাছে ঈশ্বরের ভালবাসা-দানকারী, তিনিই আমাদের তমসাচ্ছন্ন জীবনের সত্যকার আলো এবং আমাদের জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একমাত্র পথ।

যিশুর সাক্ষীরা (৫:৩১-৪৭)

৫ [৩১] 'নিজের বিষয়ে আমি যদি নিজে সাক্ষ্য দিই, তবে আমার সাক্ষ্য যথার্থ নয়। [৩২] অন্য একজনই আছেন, যিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আর আমি জানি: আমার বিষয়ে তিনি যে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, সেই সাক্ষ্য যথার্থ। [৩৩] আপনারা যোহনের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন, আর তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। [৩৪] আমি যে মানুষেরই সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভর করি এমন নয়, কিন্তু এই সমস্ত কথা বলি যেন আপনারা পরিত্রাণ পেতে পারেন। [৩৫] তিনি ছিলেন এক জ্বলন্ত ও দীপ্তিমান প্রদীপ; আর তাঁর আলোতে আপনারা কেবল কিছুক্ষণ ধরেই উল্লাস করতে চেয়েছেন।

[৩৬] কিন্তু যোহনের সাক্ষ্যদানের চেয়ে আমার মহত্তর সাক্ষ্যদান রয়েছে: যে কাজ সম্পাদনের ভার পিতা আমার হাতে ন্যস্ত করেছেন, আমার দ্বারা সাধিত এই সমস্ত কাজই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পিতাই আমাকে প্রেরণ করেছেন। [৩৭] তাছাড়া, পিতা নিজে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্যদান করছেন; তাঁর কণ্ঠস্বর আপনারা কখনও শোনেননি, তাঁর চেহারাও কখনও দেখেননি, [৩৮] তাঁর বাণীও আপনাদের অন্তরে স্থান পাচ্ছে না, কারণ তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন, তাঁকে আপনারা বিশ্বাস করেন না। [৩৯] আপনারা তো তন্ন তন্ন করে শাস্ত্রের অনুসন্ধান করে থাকেন, কারণ মনে করছেন, তার মধ্যেই অনন্ত জীবন পাবেন, কিন্তু এই সমস্ত শাস্ত্র আমারই বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে, [৪০] অথচ আপনারা জীবন পাবার জন্য আমার কাছে আসতে সম্মত নন।
[৪১] মানব গৌরব আমি গ্রাহ্য করি না; [৪২] তাছাড়া আপনাদের জানি: আপনাদের অন্তরে ঈশ্বর-প্রেম নেই। [৪৩] আমি আমার পিতার নামে এসেছি, তবু আপনারা আমাকে গ্রহণ করতে সম্মত নন; অন্য কেউ নিজের নামে এলে তাকেই বরং গ্রহণ করবেন। [৪৪] আপনারা কেমন করেই বা বিশ্বাস করতে পারেন, যখন পারস্পরিক গৌরব গ্রাহ্য করতে করতে অনন্য ঈশ্বর থেকে আগত যে গৌরব, তার অন্বেষণ করেন না? [৪৫] মনে করবেন না যে, পিতার কাছে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনব; বরং যাঁর উপরে আপনারা আশা রেখে আসছেন, সেই মোশি নিজেই আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন। [৪৬] কারণ আপনারা যদি মোশিকে বিশ্বাস করতেন, তবে আমাকেও বিশ্বাস করতেন, যেহেতু তিনি আমারই বিষয়ে লিখেছিলেন। [৪৭] কিন্তু তিনি যা লিখলেন, তা যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন, তবে আমি যা বলছি, আপনারা কেমন করে তা বিশ্বাস করবেন?’

আত্মপ্রকাশমূলক উপদেশের পর যিশু নিজের কথা (তিনি যে বিচারকর্তা ও জীবনদাতা) সত্য বলে প্রমাণ করেন। সাক্ষীরূপে তিনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন, নিজের ক্রিয়াকর্ম, পবিত্র শাস্ত্র এবং মোশির মধ্য দিয়ে দেওয়া স্বয়ং ঈশ্বরের সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন যাতে বিশ্বাসীগণ অধিক গভীরতরভাবে বিশ্বাস করতে পারে এবং অবিশ্বাসীগণ মন ফেরাবার জন্য আর একটা সুযোগ পায়। সুতরাং, ৫ অধ্যায়ের এই অংশ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এতে সদা আধুনিক বিশ্বাসের ভিত্তি-প্রসঙ্গ মূল্যায়ন করা হয়।

৫:৩১—নিজের বিষয়ে আমি যদি নিজে সাক্ষ্য দিই… : সকলের স্বীকৃত কথা যে নিজের বিষয়ে কেউ সাক্ষ্য দিতে পারে না; সুতরাং যিশুও অন্য একজনের সাক্ষ্যদানের উপর নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন করেন: সেই একজন হলেন পিতা, যিনি তাঁকে প্রেরণ করলেন এবং অন্যান্য সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুপ্রেরণা করেন। কিন্তু পিতার সাক্ষ্যদান মানবীয় ও প্রত্যক্ষ নয় বিধায় অবিশ্বাসী ইহুদীরা সেটাকে গ্রাহ্য করে না।

৫:৩৩—আপনারা যোহনের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন: বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্যদান দু' দিক দিয়ে দেখা উচিত: মানুষের সাক্ষ্যদান বলে তা আপেক্ষিক, কিন্তু ঈশ্বরের প্রেরিতজনের সাক্ষ্যদান বলে তা গ্রহণযোগ্য, কেননা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মধ্য দিয়ে স্বয়ং ঈশ্বরই যিশুর সপক্ষে সাক্ষ্যদান করেন। কিন্তু বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে ঈশ্বরের প্রেরিতজন বলে অস্বীকার করায় ইহুদীরা তাঁর সাক্ষ্যও অস্বীকার করে; তাদের কাছে তিনি শুধু একটা প্রদীপ মাত্র যার আলোতে কেবল কিছুক্ষণ মানুষ উল্লাস করল; অপর দিকে সেই প্রদীপ চিরকালের জন্য, অর্থাৎ বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিশুর সপক্ষে এখনও জীবন্ত সাক্ষীরূপে দাঁড়ান। অতএব বাপ্তিস্মদাতা ও তাঁর কথার অস্বীকৃতি হল ইহুদীদের প্রতি যিশুর প্রথম অভিযোগ। বাপ্তিস্মদাতার সাক্ষ্যের চেয়ে যিশুর বিষয়ে মহত্তর সাক্ষ্য হল তাঁর সমস্ত কাজের সাক্ষ্য, যে-কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যিশুর সপক্ষে কাজ করেন ও সাক্ষ্যদান করেন: সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে যিশু পিতার ঐক্যে কাজ করেন। কাজের চেয়েও মহত্তর যে সাক্ষ্য রয়েছে তা হল স্বয়ং পিতার সাক্ষ্য: তিনিই প্রধান সাক্ষী। কিন্তু পিতার সাক্ষ্য শুনতে হলে পুত্রকে শোনা চাই, কেননা উভয়েই এক। পিতা শাস্ত্রের মধ্যে কথা বলেছেন এবং তাঁর বাণী জীবন্ত ছিল বটে; এখন কিন্তু সেই বাণী অর্থশূন্য যদি না তাঁর সেই প্রেরিতজনকে বিশ্বাস করি যাঁকে তিনি নিজের বাণী বলতে প্রেরণ করলেন (৩:৩৪); তাছাড়া জীবনও পাব না যদি না পুত্রের প্রতি বিশ্বাস রাখি: শাস্ত্রের ঐশপ্রকাশকারী ও পরিত্রাণদায়ী ভূমিকা পুত্রের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে, কেবল তাঁর বাণীই আত্মা ও জীবন (৬:৬৩, ৬৪)। শাস্ত্রের কথা মেনে চলা অথচ যিশুকে অগ্রাহ্য করা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর, কেননা সমুদয় শাস্ত্র যিশুতে সিদ্ধিলাভ করেছে ও তাঁর বিষয়েই ভাববাণী ঘোষণা করেছে (১২:৩৮, ৪১; ১৬:১৮…)। কিন্তু ইহুদীদের মারাত্মক দোষ

এই যে, তারা যিশুর কাছে আসতে চায় না, তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে চায় না। একথা থেকে আমরা বুঝি যে, আমরা যদি বিশ্বাস করব বলে সিদ্ধান্ত না নিই, তবে পুত্রের সপক্ষে ঈশ্বরের কতিপয় সাক্ষ্যও বিলীন হয়ে যায়। নিজেদের আচার-ব্যবহারেই আমরা বিশ্বাস করার সিদ্ধান্ত নেব এবং অবশ্যই এই সিদ্ধান্ত যিশুর দাবি অনুসারেই নেওয়া প্রয়োজন; তবু, একথার অর্থ এই নয় যে, আমরা কেবল আমাদের নিজেদের মতের উপর নির্ভর করে সেই দাবি মেনে চলব, বরং খ্রিষ্টমণ্ডলী যিশুর কার্যকলাপ, তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা যেভাবে অনুভব ক'রে সেই দাবি ব্যক্ত করে, সেইভাবেই আমরা সেটা পালন করব।

৫:৪১—মানব গৌরব আমি গ্রাহ্য করি না: এবার যিশু ইহুদীদের আরও তীব্রতরভাবে অভিযুক্ত করেন: তিনি যেমন কোন মানবীয় সাক্ষ্য মানেন না, তেমনি মানব গৌরবও মানেন না। তথাপি আমাদের পক্ষে তাঁকে গৌরব আরোপ করা উচিত, কেননা পিতা তাঁর সপক্ষে সাক্ষ্য দেন: যথার্থই, যিশু পিতার নামেই এসেছিলেন। যে যিশুকে গৌরব আরোপ করে না অর্থাৎ তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে না, পিতার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঠিক নয়, সে ঈশ্বরপ্রেম-প্রাপ্ত নয়, সেই যে প্রেম ঈশ্বর মানুষকে দান করেন এবং পারস্পরিক ভালবাসার উৎস।

৫:৪৩—আমি আমার পিতার নামে এসেছি: পুরাতন নিয়ম নবী মোশির বিষয়ে বলে, 'আমার নামে সে আমার যে সকল বাণী বলবে, সেই বাণীতে কেউ যদি কান না দেয়, তবে তার কাছ থেকে আমি জবাবদিহি চাইব' (দ্বিঃবিঃ ১৮:১৯)। এখন কিন্তু আমাদের মধ্যে মোশির চেয়ে মহান নবী উপস্থিত, এমনকি শেষ ও চরম নবী এবং ঈশ্বরের প্রেরিত অনন্য ও প্রকৃত মশীহই উপস্থিত। যিশুর জায়গায় কিন্তু ইহুদীরা অন্য মিথ্যাবাদী নবীদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত যারা ঈশ্বরের নামে কথা বলার দাবি করে অথচ নিজেদেরই নামে কথা বলে; তবু, যিশুর আগমনের পর যে কেউ নিজের উপর ঈশ্বরের

নামে পরিত্রাণদায়ী দায়িত্ব নেবার দাবি করে, সে চোর ও দস্যু (১০:৮), এবং যারা যিশুকে অস্বীকার করে তারা মিথ্যাবাদী নবীদের হাতে পড়ে।

৫:৪৪—আপনারা কেমন করেই বা বিশ্বাস… : যিশু পুনরায় ইহুদীদের ও সর্বকালের অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাসের মূল দোষ উদ্ঘাটন করেন: তারা নিজেদের অন্বেষণ করে, এবং যখন বলে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করছে তখনও তারা অহঙ্কারী।

৫:৪৫—মনে করবেন না যে… : যিশুর সময় মোশিই ছিলেন সমস্ত পরিত্রাণ-ইতিহাসের প্রধান চরিত্র; ইহুদীরা মনে করত মোশি যেভাবে ঈশ্বরের বিধান তাদের দিয়েছিলেন, সেইভাবে ঈশ্বরের দরবারে তিনি তাদের পক্ষ সমর্থনও করবেন। কিন্তু এখানে যিশু তাদের এই আশা বৃথা করে দেন, মোশি তাদের পক্ষসমর্থনকারী নন, অভিযোক্তাই হবেন, যেহেতু তারা তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেনি: বাস্তবিক (যেমন আগে লক্ষ করলাম) আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর ধারণা যে, যিশুর সপক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে পুরাতন নিয়ম এখনও গ্রহণযোগ্য।

৫:৪৬—তিনি আমারই বিষয়ে লিখেছিলেন : সেইকালে শাস্ত্রী বলে ইহুদী সমাজের একটা শ্রেণি ছিল যারা অবিরত শাস্ত্রের কথা অধ্যয়ন করত। সুতরাং, যিশুর এই প্রশ্ন থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, যোহনের ধারণায় ফরিশী ও শাস্ত্রীদের উপরেই ইহুদী জনগণের অবিশ্বাসের মহৎ দোষ আরোপণীয়।

মোশির বিধান-ই তর্ক-বিতর্কের কারণ হয়েছিল যিশু সাব্বাৎ-সংক্রান্ত নিয়ম অমান্য করেছিলেন বিধায়। এখন কিন্তু একথা পরিষ্কার ফুটে ওঠে যে, মোশি যিশুকে নয়, ইহুদীদেরই অভিযুক্ত করেন, কেননা যিশু সাব্বাৎ-সংক্রান্ত নিয়মটা অমান্য করেননি, বরং তা অর্থপূর্ণ করে তুলেছেন।

দ্বিতীয় পাস্কা পর্ব

(৬ অধ্যায়)

যোহনের সুসমাচারের এই অধ্যায় অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ: যিশু জীবনের রুটি বলে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথমে চিহ্নকর্মটিকে বর্ণনা করা হয়: বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও তবু এতে সূচিত হল সেই সকল বিষয় যা যিশুর উপদেশে বিস্তারিতভাবে অনুধাবন করা হবে। পরে আসে জলের উপর দিয়ে যিশুর হাঁটার বিবরণ যার উপর যিশুর পরবর্তী উপদেশের অন্তর্ভুক্ত বচনাদি স্থাপিত। শেষে, উপদেশটির মধ্য দিয়ে যিশু জীবনের রুটি বলে আত্মপরিচয় দেন। জনতার প্রতিক্রিয়াও উল্লেখযোগ্য: ইহুদীরা যিশুর চিহ্নকর্ম ও তার ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করে; শিষ্যদের অনেকে একই কারণে যিশুর সঙ্গ ত্যাগ করে; কেবল বারোজন প্রেরিতদূত পিতরের সাক্ষ্যদানে যিশুর প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থাকেন।

সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের বর্ণনার সঙ্গে এই বর্ণনা তুলনা করে যোহনের লক্ষ্য সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করা যায়। প্রধান সাদৃশ্য হল রুটি, মাছ, ঝুড়ি ও জনগণের সংখ্যা। তাছাড়া যোহনের বর্ণনায় এমন বৈশিষ্ট্যগুলো বিরাজমান যেগুলো দিয়ে তাঁর বর্ণনা অনন্য স্বকীয়তা ও গভীরতা অর্জন করে: সদৃশ সুসমাচারগুলি অনুসারে শিষ্যেরাই আশ্চর্য কাজ সাধন করার জন্য যিশুকে আহ্বান করেন এবং তাঁরাই রুটি বিতরণ করেন; কিন্তু এখানে স্বয়ং যিশুই লোকদের খাদ্য দান করবেন বলে সঙ্কল্প করেন এবং তিনি নিজেই রুটি বিতরণ করেন। উপরন্তু, ক্ষুধার্তদের প্রতি করুণায় নয় বরং অপেক্ষিত ও প্রতিশ্রুত মশীহরূপে আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্যে চিহ্নকর্মটি সাধন করেন।

আরও, সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের মত যোহনের বর্ণনায়ও কতকগুলো ইঙ্গিত রয়েছে যেগুলো পবিত্র সাক্রামেন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে: ‘বিতরণ করা’ ও ‘ধন্যবাদ-স্তুতি’ কথা দু’টো আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীকালে প্রভুর ভোজের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত ছিল; ‘কিছুই যেন নষ্ট না হয়’ বাক্যেও এউখারিস্তীয় রুটির প্রতি আদিমণ্ডলীর সম্মান ব্যক্ত হয়।

কিন্তু, যিশুর এই চিহ্নকর্মের গভীর তাৎপর্য অনুভব করতে হলে, ‘ইহুদীদের পাস্কাপর্ব সন্নিকট ছিল’ যোহনের এই মন্তব্যের দিকেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত: পাস্কাপর্বই হল সেই প্রকৃত লক্ষণ যা চিহ্নকর্মের মর্ম উদ্ঘাটন করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত প্রথম পাস্কাপর্বে যোহনের উদ্দেশ্য ছিল যিশুকে পাস্কাপর্বের নব-বলিরূপে এবং মানবজাতির নব-মন্দিরস্বরূপ ঘোষণা করা; এই দ্বিতীয় পাস্কাপর্বে যোহন পুনরায় যিশুকে ইহুদীদের পর্বগুলি এবং সেগুলির তাৎপর্যের সিদ্ধিস্বরূপ প্রচার করেন, এমনকি যিশু সেগুলির সিদ্ধিস্বরূপ শুধু নন, তিনি সেগুলি অতিক্রমও করেন।

ইহুদীদের পাস্কাপর্ব ‘যবের রুটি’ পর্ব ছিল, যে-রুটি পাস্কাভোজে বলীকৃত মেষশাবকের সঙ্গে খাওয়া হত। এ পর্বে ইহুদীরা মিশরদেশ থেকে সেই বেরিয়ে যাওয়াটা স্মরণ করত যখন তাদের পূর্বপুরুষেরা দাসত্ব থেকে মুক্তির দিকে অর্থাৎ কষ্ট থেকে আনন্দের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। এই উপলক্ষে সমাজগৃহে পুরাতন নিয়মের নিম্নলিখিত অংশগুলি পড়া হত: যাত্রাপুস্তক ১–১৫ অধ্যায়, ‘হাল্লেল’ সামসঙ্গীতমালা এবং ঐতিহাসিক সামসঙ্গীতগুলো যেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ৭৮ নং সামসঙ্গীত যাতে মিশরদেশ ও মরুপ্রান্তরে ভ্রমণকালে ঈশ্বরের সাধিত চিহ্নকর্মগুলো (বিশেষভাবে ‘মান্না’ খাদ্য-দান) স্মরণ করা হত। যাত্রাপুস্তক ১২:৪২ বিষয়ে যিশুর সময়ে এরূপ ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল: ‘চতুর্থ রাত্রি তখনই হবে যখন মুক্তিলাভের জন্য জগৎ পরিণামের কাছে এসে পৌঁছবে: লোহার জোয়াল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হবে, দণ্ড-শাস্তি ক্ষমা করা হবে এবং মোশি মরুপ্রান্তর থেকে আরোহণ করবেন ও মশীহ-রাজ ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসবেন। একজন মেষপালের আগে আগে চলতে থাকবেন আর অপর একজন মেষপালের আগে আগে চলতে থাকবেন: তাঁর বাণী উভয়ের মধ্যে থেকে চলতে থাকবেন আর আমিই এবং তাঁরা একসঙ্গেই চলতে থাকব। এটি হল প্রভু-নামের খাতিরে পাস্কা-রাত্রি, যে-রাত্রি ইস্রায়েলের মুক্তির জন্য পুরুষানুক্রমেই নির্ধারিত।’

সুতরাং, পাস্কাপর্বের শুধু স্মারক তাৎপর্য নয় বরং চরমকাল বা মশীহকাল নির্দেশসূচক তাৎপর্যও ছিল: নব মোশিরূপে চরম মশীহ আসবেন: মশীহের আগমনের অপেক্ষায়ই ইহুদীরা পাস্কাপর্ব উদ্‌যাপন করত।

আবার, ৭২ নং সামসঙ্গীত ব্যাখ্যায় লেখা ছিল: 'প্রথম ত্রাণকর্তা মোশি যেভাবে স্বর্গ থেকে মান্না খাদ্য নামিয়ে এনেছিলেন···, সেইভাবে করবেন চরম ত্রাণকর্তা, কেননা লেখা আছে: ভূমি রুটিতে উপচে পড়বে।' সুতরাং, পাস্কাপর্বে আসন্ন মোশিকে অপেক্ষাই ছিল চরম ত্রাণকর্তার আগমনের চিহ্ন হিসাবে মান্না খাদ্যদানের অপেক্ষা।

নবী ও মশীহরূপে আসন্ন নব-মোশি অন্যান্য নবীদের চেয়ে মহান, একথা তাঁর সাধিত আশ্চর্য কাজগুলিতে প্রমাণিত: যেমন নবী এলিশেয় নবী এলিয়ের চেয়ে মহৎ আশ্চর্য কাজ সম্পাদন করেছিলেন, তেমনি মশীহ্ এসে নবী এলিয় ও এলিশেয়ের চেয়ে মহৎ কাজ দেখাবেন।

সেইকালে প্রচলিত 'বারুকের ঐশপ্রকাশ' পুস্তকও মশীহকালের মাহাত্ম্যকে মান্না ও মাংসদানের মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করত: 'তখন মশীহ আত্মপ্রকাশ করতে লাগবেন··· এবং ক্ষুধার্ত যারা তারা তৃপ্তির সঙ্গে খাবে···, তখন মান্না অপর্যাপ্ত পরিমাণে পুনরায় নেমে আসবে··· ।'

সুতরাং, মশীহের আগমন নির্দেশসূচক মান্না বিষয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, নব-মোশিরূপে মশীহ মরুপ্রান্তরে অর্থাৎ চরম মুক্তিকালে ইস্রায়েল-জনগণকে চালিত করে মান্না-আশ্চর্য কাজের পুনঃসাধনে তাদের খাওয়াবেন।

অন্য একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, ইহুদী ঐতিহ্যে রুটি ছিল ঐশবিধানের প্রতীক, তাতে ঐশবাণীরই প্রতীক। যাত্রাপুস্তক ১৩:১৭ ব্যাখ্যায় লেখা ছিল: 'আমি পঞ্চাশ বছরব্যাপী মরুপ্রান্তরে তাদের চালিত করব, তারা যেন মান্না খেয়ে ও জল পান করে ঐশবিধানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, আর ঐশবিধান তাদের শরীরের সঙ্গে একীভূত হবে।' উল্লিখিত বচন স্পষ্টই প্রচার করে যে, মান্না-খাদ্য যথার্থই একটা আত্মিক বাস্তবতাকেই লক্ষ করে।

পুরাতন নিয়মের এই পটভূমিকা উপস্থাপন করার পর, আসুন, যোহনের বর্ণনা পাঠ করি।

রুটির চিহ্ন (৬:১-১৫)

৬ [১] এর পর যিশু গালিলেয়া-সাগরের, অর্থাৎ তিবেরিয়াস-সাগরের ওপারে গেলেন। [২] রোগীদের সুস্থ করে তুলে তিনি যে সমস্ত চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন, তা দেখেছিল বিধায় বহু লোক তাঁর অনুসরণ করছিল। [৩] কিন্তু যিশু পর্বতে উঠলেন আর সেখানে নিজ শিষ্যদের সঙ্গে বসলেন। [৪] ইহুদীদের পাস্কাপর্ব সন্নিকট ছিল। [৫] চোখ তুলে যিশু যখন দেখতে পেলেন অনেক লোক তাঁর দিকে আসছে, তখন ফিলিপকে বললেন, 'এই সমস্ত লোকদের খেতে দেবার জন্য আমরা কোথা থেকে রুটি কিনতে পারব?' [৬] তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যই তিনি একথা বলেছিলেন, তিনি তো জানতেন, তিনি কী করতে যাচ্ছিলেন। [৭] ফিলিপ তাঁকে উত্তর দিলেন, 'এদের প্রত্যেককে সামান্য কিছু দিতে হলে দু'শো রুপোর টাকার রুটিতেও কুলোবে না।' [৮] তাঁর শিষ্যদের একজন, শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়, তাঁকে বললেন, [৯] 'এখানে একটি ছেলে আছে, তার কাছে পাঁচখানা যবের রুটি ও দু'টো মাছ আছে; কিন্তু তাতে এত লোকের কী হবে?' [১০] যিশু বললেন, 'এদের বসিয়ে দাও।' সেখানে প্রচুর ঘাস ছিল। লোকেরা বসে পড়ল, পুরুষদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক পাঁচ হাজার। [১১] তখন যিশু সেই রুটি ক'খানা নিলেন, ও ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে, যারা সেখানে বসে ছিল, তাদের মধ্যে তা বিতরণ করলেন; মাছ নিয়েও তা-ই করলেন—সকলে যতখানি চাইল, ততখানি দিলেন। [১২] সবাই তৃপ্ত হলে তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'পড়ে থাকা টুকরোগুলো জড় কর, কিছুই যেন নষ্ট না হয়।' [১৩] তাই তাঁরা তা জড় করলেন, এবং সকলে খাওয়ার পরেও সেই পাঁচখানা যবের রুটি থেকে পড়ে থাকা টুকরোগুলোতে তাঁরা বারোখানা ঝুড়ি ভর্তি করলেন।

[১৪] যিশুর সাধিত এই চিহ্নকর্ম দেখে লোকেরা বলতে লাগল, 'ইনি সত্যিই সেই নবী, জগতে যিনি আসছেন।' [১৫] যিশু যখন বুঝতে পারলেন যে, তারা তাঁকে রাজা করার অভিপ্রায়ে জোর করে ধরতে আসছে, তখন একা আবার পর্বতে সরে গেলেন।

যোহন বর্ণনা-প্রারম্ভেই বলেন যিশু চলে গেলেন; যে শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের কোন উল্লেখ নেই: এতে একথা স্পষ্ট পরিস্ফুট হয় যে, বর্ণনাটি যিশুকেই সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্র করে। সুতরাং, পাঠক যিশুর প্রতি মন আকর্ষণ করুন। যে-জনতা তাঁর অনুসরণ করে, সেটা যেরুশালেমবাসীদের মত, অর্থাৎ তাদের প্রকৃত বিশ্বাস নেই, কেবল বাহ্যিক উপকার লাভের জন্য এবং আশ্চর্য কিছু দেখার জন্য তাঁর অনুসরণ করে। পর্বতের উল্লেখ আমাদের স্মরণ করায় পুরাতন নিয়মকালে সিনাই পর্বতের উপর মোশি-প্রতীকের কথা: যেমন মোশি ছিলেন ঈশ্বরের মনোনীতজন এবং ঈশ্বর ও ইস্রায়েল জনগণের মধ্যস্থ, তেমনি এখন যিশুই ঈশ্বরের সেই প্রকৃত প্রেরিতজন যিনি ঈশ্বরের নামে কাজ করতে করতে ঐশপরিত্রাণের দিকে মানুষকে চালিত করেন; তবুও মোশির চেয়ে যিশু মহান, এমনকি তিনি অতুলনীয়ভাবেই মানুষকে খাদ্য দান করেন। পাস্কাপর্বের উল্লেখও (যেমন আগে বলেছি) মিশরদেশ থেকে ইস্রায়েল জনগণের মুক্তির কথা ও মরুপ্রান্তরে মান্না খাদ্য আশ্চর্য কাজের দিকে নির্দেশ করে: যিশু এগুলিরও সিদ্ধিস্বরূপ। অনুগামী জনতার উপর দৃষ্টিপাত করে যিশু খাদ্যের সমস্যা উত্থাপন করেন। যিশু যে ক্ষুধার্তদের প্রতি করুণার খাতিরে আশ্চর্য কাজ সাধন করেন তা নয়, বরং তিনি গভীরেই কাজ করেন, মানুষের সত্যকার প্রয়োজনীয়তা মেটান অর্থাৎ চিহ্নকর্মের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। ফিলিপকে যে প্রশ্ন করা হয়, তাতেও প্রমাণিত হয় যে, যিশু পূর্ণ সচেতনতায় জানেন কী করতে যাচ্ছেন এবং সেই প্রশ্নের মাধ্যমে শিষ্যদের সতর্ক করে তুলতে চান যাতে তাঁরা আশ্চর্য কাজের বাহ্যিক দিকে মুগ্ধ না হয়ে কাজের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই যেন হৃদয়ঙ্গম করেন। আন্দ্রিয়ের বচনে বুঝি যে, আমরা এমন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন, যে-সমস্যা মানুষ উপলব্ধি ও সমাধান করতে অসমর্থ। এ বর্ণনা দিয়ে যোহন যিশুর ভূমিকা আরও স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলেন: কেবলমাত্র যিশুই জানেন মানুষের কিসের প্রয়োজন এবং শুধু তিনিই সেই প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

নিজের আশ্চর্য কাজের পটভূমিকাস্বরূপ এই পরিবেশ সৃষ্টি করে যিশু লোকদের ঘাসের উপর বসিয়ে দেন। ঘাসের কথা পাস্কাপর্বের দিকে অগ্রসর হয়, কেননা ‘প্রচুর ঘাস’ থাকাতে রুটির চিহ্নকর্ম আনন্দপূর্ণ পর্বের একটা তাৎপর্য অর্জন করে: মেষপালক-মশীহরূপে যিশু ইস্রায়েল জনগণকে শুধু নয়, ঈশ্বরের সমগ্র মানবজাতিকেই ‘নবীন

ঘাসের মাঠে শুইয়ে রেখে’ (সাম ২৩:২) উপচে পড়া অন্নভোজ অর্থাৎ জীবন-অন্নভোজই সাজান (সাম ২৩:৫)।

সদৃশ সুসমাচারত্রয় অনুসারে শিষ্যেরাই রুটিগুলো ও মাছ বিতরণ করেন; এখানে সমস্ত বর্ণনা যিশুতেই কেন্দ্রীভূত বিধায় তিনি নিজেই খাদ্য-বিতরণকারী বলে বিবৃত হন। আগে বলেছিলাম যে এ বর্ণনা থেকে কয়েকটা ইঙ্গিত ভেসে ওঠে যা এউখারিস্তীয় রুটির সাক্রামেন্তীয় অর্থ বহন করে; কিন্তু সাক্রামেন্তীয় তাৎপর্য থাকা সত্ত্বেও যোহনের বর্ণনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল যিশুকে ঐশদানগুলোর বিতরণকারীরূপে প্রচার করা। পুরাতন নিয়ম অনুসারে মরুপ্রান্তরে ভ্রমণকারী ইস্রায়েল জনগণ যথাপরিমাণেই মান্না কুড়োত এবং অবশিষ্ট অংশ নষ্ট হয়ে যেত (যাত্রা ১৬:১৬-১৮); অপর দিকে এখানে (কানা গ্রামের মত) অপেক্ষিত মশীহের দানগুলোর প্রাচুর্যের দিকেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়, এমনকি অবশিষ্ট টুকরোগুলো পর্যন্তও নষ্ট হয় না, সেগুলোতে বারোটা ঝুড়ি ভরে যায়; বারো সংখ্যা বলতে শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ বোঝাতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মশীহের দেওয়া রুটি এত প্রচুর যা অনন্তকালে পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতিকে তৃপ্ত করার জন্য যথেষ্ট: যিশুর দেওয়া রুটি সর্বযুগের মানুষের যত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।

জনতার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধীয় মন্তব্য আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা দুরূহ মনে হয়: প্রথমে তারা যিশুকে জগতে আসন্ন নবী বলে চিনতে পারল এবং পরে তাঁকে রাজা করতে যাচ্ছিল জেনে যিশু একা পাহাড়ে সরে গেলেন। সম্ভবত যোহন দেখাতে চান যে, লোকেরা যিশুকে ঠিক সেই চরম নবী বলে উপলব্ধি করতে পারল যিনি পুরাতন নিয়মের ভাববাণীর সিদ্ধিস্বরূপ (দ্বিঃবিঃ ১৮:১৫ ইত্যাদি), তবুও তাদের ধারণা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ছিল না, তারা চাইত সামাজিকই একজন নেতা, যে-নেতা রোম-সাম্রাজ্য থেকে তাদের উদ্ধার করে ইস্রায়েল জাতির রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। অর্থাৎ তারা যিশুর সাধিত চিহ্নকর্ম দেখলেও যিশু-বিষয়ে কিছুই বোঝেনি, বা ভুল বুঝল, কেননা যিশুর মশীহত্ব রাজনৈতিক গন্ডিতে সঙ্কুচিত করতে নেই। যন্ত্রণাভোগে ও ক্রুশের উপরে উত্তোলিত অবস্থায়ই তিনি নিজের প্রকৃত রাজ-অধিকার প্রকাশ করবেন। কিন্তু সেইসময় কেউই

তাঁকে রাজারূপে স্বীকার করতে চাইল না। সুতরাং, লোকদের ব্যবহারে তাদের অবিশ্বাস দেখা দেয়: তারাও রুটির জন্য ব্যস্ত, রুটিও সবসময় আশ্চর্যভাবে পেতে চায় এবং তাই করে রুটিদানকারী যিনি সেই যিশুকে গ্রহণ করতে অবহেলা করে। এক্ষেত্রে সমস্যা এ: যিশুর অনুসন্ধান করতে গিয়ে নিজেদের অনুসন্ধান করতে নেই; যিশুর অনুগামী জনতা নিজের জল্পনা-কল্পনা অনুধাবন করে বিধায় যিশুর সাধিত চিহ্নকর্মের অর্থ অনুভব করতে পারে না, ফলত বিশ্বাসলাভ থেকেও বঞ্চিত হয়। তাদের অবিশ্বাসহেতু যিশু 'একা' পর্বতে সরে যান; যেমন মোশি একা হয়ে সিনাই পর্বতে গিয়ে উঠে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন (যাত্রা ২৪:১৫), তেমনি যিশুর একা হওয়াতে পিতার সঙ্গে তাঁর সংযোগ অনুমান করা যায়; এতে তিনি যে জনতাকে পরিত্যাগ করেন এমন নয়, বরং রুটি-বিতরণ দিয়ে শুরু হওয়া চিহ্নকর্মটি সাধন করে যান; দেখাতে চান, তাদের পরিকল্পিত ও প্রত্যাশিত ধারণা থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ: আংশিকভাবে নয়, সম্পূর্ণরূপেই তাঁকে গ্রহণ করতে হয়।

আমিই আছি বলে যিশুর আত্মপ্রকাশ (৬:১৬-২১)

৬ [১৬] সন্ধ্যা হলে তাঁর শিষ্যেরা সাগর-তীরে নেমে গেলেন; [১৭] এবং নৌকায় উঠে সাগরের ওপারের দিকে, কাফার্নাউমের দিকে, রওনা হলেন। ইতিমধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছিল, আর যিশু তখনও তাঁদের কাছে আসেননি। [১৮] প্রবল বাতাস বয়ে যাওয়ায় সাগর ফুলে উঠছিল। [১৯] তাঁরা চার-পাঁচ কিলোমিটার বেয়ে এসেছিলেন, এমন সময়ে দেখলেন, যিশু সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, নৌকার দিকেই আসছেন। তাঁরা ভয় পেলেন, [২০] কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'আমিই আছি! ভয় করো না।' [২১] তাই তাঁরা তাঁকে নৌকায় তুলে নিতে চাইলেন, আর নৌকাটা তখনই গন্তব্য স্থানে এসে ভিড়ল।

এক্ষেত্রে সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের বর্ণনা যিশু দ্বারা বশীভূত ঝড়ের কথার উপর জোর দেয়। অপর দিকে যোহনের বর্ণনার উদ্দেশ্য এই, বিক্ষুব্ধ সাগরের মাঝামাঝি শ্রমরত

শিষ্যেরা যিশুর সাক্ষাৎ পাবার পর সঙ্গে সঙ্গে গন্তব্য স্থানে পৌঁছান। অন্যান্য আভাস এ এ: একা থাকতে তাঁরা অন্ধকারে ছিলেন, অর্থাৎ অসৎ-এর দ্বারা আক্রান্ত ও বিপদ থেকে মুক্তি পেতে অক্ষম; যিশুর উপস্থিতিতে সেই মারাত্মক অবস্থা পরাজিত হয়, কেননা কেবল যিশুই অসৎ ও মৃত্যুর অপশক্তিকে জয় করতে সক্ষম: বিশ্বস্রষ্টা বলে তিনি সর্বনিয়ন্তা ও ত্রাণকর্তা। তবুও বর্ণনার শীর্ষকথা যিশুর গম্ভীর আত্মপ্রকাশ-বচনে অভিব্যক্তি লাভ করে: 'আমিই আছি'। এর অর্থ এই নয়, 'এই যে আমি এসে গেলাম', বরং পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরের ত্রাণকর্তারূপে আত্মপরিচয়ের অভিমুখে ছুটে চলে। সেসময় তিনি 'আমিই আছি' বলেই ইস্রায়েল জাতির মুক্তিদাতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং এখানে যিশু ত্রাণেশ্বর বলে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি উপস্থিত থাকলে মানুষ কিসের ভয় করবে? উপরন্তু, এই বচনে তিনি নিজের বিষয়ে লোকদের ভুল-ধারণা সঠিক করেন এবং সেই আসন্ন উপদেশের অন্তর্ভুক্ত আত্মপ্রকাশের জন্যও পটভূমি প্রস্তুত করেন যখন ঘোষণা করবেন: 'আমিই স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই জীবনময় রুটি'। এইভাবে যোহন নিজের বর্ণনা পুনরায় সম্পূর্ণরূপে যিশুর আত্মপ্রকাশে কেন্দ্রীভূত করেন।

'জীবনের রুটি' বলে যিশুর আত্মপ্রকাশ (৬:২২-৩৫)

৬ [২২] পরদিন যে সমস্ত লোক তখনও সাগরের ওপারে থেকে গেছিল, তারা
দেখল যে, একটামাত্র নৌকা সেখানে রয়ে গেছিল, এবং যিশু সেই নৌকায় তাঁর
শিষ্যদের সঙ্গে ওঠেননি, কেবল শিষ্যেরাই গিয়েছিলেন। [২৩] যেখানে প্রভু
ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করার পর লোকে রুটি খেয়েছিল, সেই জায়গার কাছে তখন
অন্য কতগুলো নৌকা তিবেরিয়াস থেকে এসেছিল। [২৪] যিশু কিংবা তাঁর শিষ্যেরা
সেখানে আর কেউই ছিলেন না, লোকে তা বুঝতে পেরে সেই সব নৌকায় উঠে
যিশুর অনুসন্ধানে কাফার্নাউমে চলল। [২৫] তাঁকে সাগরের ওপারে খুঁজে পেয়ে
তারা তাঁকে বলল, 'রাব্বি, এখানে কবে এলেন?'
[২৬] যিশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি,
তোমরা চিহ্নগুলো দেখেছ বলেই যে আমাকে খুঁজছ তা নয়, সেই রুটি খেয়ে

পরিতৃপ্ত হয়েছ বলেই আমাকে খুঁজছ। [২৭] নশ্বর খাদ্যের জন্য কাজ করো না, বরং সেই খাদ্যেরই জন্য কাজ কর, যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে থেকে যায়, যা মানবপুত্রই তোমাদের দান করবেন; কারণ পিতা ঈশ্বর তাঁকেই নিজের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করেছেন।' [২৮] তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা যেন ঈশ্বরের কাজ করতে পারি, তবে আমাদের কী করতে হবে?' [২৯] যিশু তাদের এই উত্তর দিলেন, 'তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা, এটিই ঈশ্বরের কাজ।' [৩০] তাই তারা তাঁকে বলল, 'আপনি এমন কী চিহ্নকর্ম সাধন করতে যাচ্ছেন, যেন তা দেখতে পেয়ে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি? আপনি কী কাজ সাধন করতে যাচ্ছেন? [৩১] আমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, যেমনটি লেখা আছে, তিনি স্বর্গ থেকে রুটি তাদের খেতে দিলেন।' [৩২] যিশু তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি: মোশিই যে স্বর্গ থেকে রুটি তোমাদের দান করেছেন তা নয়, আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যকার রুটি তোমাদের দান করছেন; [৩৩] কারণ যে রুটি স্বর্গ থেকে নেমে আসে ও জগৎকে জীবন দান করে, সেটিই ঈশ্বরের দেওয়া রুটি।' [৩৪] তখন তারা তাঁকে বলল, 'প্রভু, তেমন রুটি আমাদের সর্বদাই দান করুন!' [৩৫] যিশু তাদের বললেন, 'আমিই সেই জীবন-রুটি: যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না।'

এই অংশের সূচনায় ভূমিকাস্বরূপ বলা হয় যে, যে সকল লোক রুটির চিহ্নকর্ম দেখতে পেয়েছিল তারা যিশুর সঙ্গে পুনঃসাক্ষাৎ ও আলোচনা করার জন্য কাফার্নাউমে ফিরে গেল। তাদের প্রথম প্রশ্নে যিশু এমন উত্তর দেন যাতে তাদের গুপ্ত ও সঙ্কীর্ণ মনোভাব ও তাদের অবিশ্বাস স্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত হয়: 'তোমরা চিহ্নগুলো দেখেছ বলেই যে আমাকে খুঁজছ তা নয়, সেই রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছ বলেই আমাকে খুঁজছ'। যিশুর সাধিত চিহ্নকর্মগুলো ঐশলক্ষণ হিসাবে দেখা চাই, যেহেতু সেগুলির উদ্দেশ্যই যিশুর গৌরব প্রকাশ করা।

৬:২৭ক—নশ্বর খাদ্যের জন্য কাজ করো না: অনন্ত জীবন লাভের জন্য যে খাদ্য অনন্তকাল ধরে থেকে যায়, সেটা মানবীয় শ্রমের মাধ্যমে লভ্য নয়, বরং মানবপুত্র দ্বারাই দান করা হয়। কিন্তু এ রুটি কখনই বা দেওয়া হবে? এবিষয়ে স্মরণযোগ্য যে, যখন যিশু ক্রুশের উপরে উত্তোলিত হবেন তখনই মাত্র তিনি নিজের মানবপুত্র-ভূমিকা অনুসারে কাজ করতে লাগবেন; জীবনকালে যিশু মানবপুত্ররূপে কিছু দান করেন না। যখন তিনি ক্রুশে উত্তোলিত হবেন তখনই ত্রাণকর্ম সাধন করবেন (৩:১৪; ৮:২৮ প্রভৃতি)। সুতরাং একথা থেকে অনুমান করা যায় যে, এখানে যিশু পরিত্রাণ-দানের কথাই অর্থাৎ যে অনন্ত জীবন তিনি গৌরবান্বিত হয়ে বিশ্বাসীদের দান করবেন সেই জীবনের কথাই এখানে বলতে চাচ্ছেন; এমনকি নিজে ঈশ্বরের প্রেরিতজন হওয়ায় তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত দান, কেননা 'স্বর্গীয় রুটি' বলেই আত্মপ্রকাশ করেছেন: 'জীবনের রুটি'-যিশু হলেন ঈশ্বরের দান এবং একাধারে সেই রুটিদানকারী, কেননা তিনি জগৎকে জীবন দান করেন।

৬:২৭খ—কারণ পিতা ঈশ্বর তাঁকেই নিজের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করেছেন: যেমন ঐশপ্রকাশকর্ম ক্ষেত্রে পিতা পুত্রের প্রচারিত সাক্ষ্যদান সত্য বলে সমর্থন করেন (৫:৩২, ৩৭; ৮:১৮), তেমনিভাবে পরিত্রাণ ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য: যিশু ঐশলোকে আরোহণ করার পর জীবনের অক্ষয় খাদ্য দান করতে সমর্থ, কেননা এই জগতে নেমে আসা মানবপুত্র বলে তিনি ঈশ্বর দ্বারাই প্রেরিত হয়েছিলেন।

৬:২৮—ঈশ্বরের কাজ: সবসময়ের মত ইহুদীরা যিশুর সব কথা ভুল বোঝে। তারা মনে করে অনন্ত জীবন পাবে বিধিবিধানের অসংখ্য নিয়মকানুন পালনের গুণে, কিন্তু যিশুর উত্তর খুবই পরিষ্কার: ঈশ্বরের নির্দেশিত কাজ একটিমাত্র: তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা। ঈশ্বর যে যিশুকে ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করেছেন, একথাই মানুষ দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে স্বীকার করুক, এবং একই বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করুক সেই প্রেরিতজনের সকল বাণী, কেননা সেই

বাণীসকল ঈশ্বরের। সুতরাং, ইহুদীদের পক্ষে বিধানের শত শত আদেশ মেনে চলা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন কাজ যদি না তারা যিশুকে মশীহ্‌ বলে স্বীকার করে। কিন্তু, যিশুর এই দাবি পূরণ করতে তারা রাজি নয়, তাদের প্রতিক্রিয়া হল যিশুকে অবিশ্বাস করা, আর শুধু তা নয়, কেমন যেন রুটির চিহ্নকর্ম যথেষ্ট নয় তারা চায় তিনি আর একটা চিহ্নকর্ম সাধন করবেন, এবং তাদের স্পর্ধা এতই বড় যে, তাঁর বিপক্ষে শাস্ত্রের একটা বাণীই ঘোষণা করে: 'তিনি স্বর্গ থেকে রুটি তাদের খেতে দিলেন'। তবু ঠিক এই শাস্ত্র-বচনের ভিত্তির উপরেই যিশু নিজের ক্রমবর্ধমান আত্মপ্রকাশ দাঁড় করান। মোশি নয়, যিশুর পিতাই সত্যকার ও প্রকৃত রুটি দান করেন। পুরাতন নিয়মের কথায় মোশি হয়েছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের নামে কাজ করে মিশরদেশ থেকে ইস্রায়েল জাতিকে বের করে এনেছিলেন এবং মরুপ্রান্তরে তাদের সেই মান্না খাদ্য দিয়েছিলেন। অতএব তাদের ঐতিহ্য অনুসারে ইহুদীরা এমন মশীহের অপেক্ষায় ছিল যিনি মোশির মত স্বর্গ থেকে পড়া মান্না খাদ্য ব্যবস্থা করবেন। এখন কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর স্বর্গীয় রুটির বিতরণকারী, এর মানে এই যে, মোশির মান্নার চেয়ে এ নতুন খাদ্য শ্রেয়, এমনকি এই নব-রুটিই স্বর্গ থেকে আগত সত্যকার খাদ্য। আরও, এখন মোশির গুরুত্ব হ্রাস পায়, কেননা আমাদের মাঝে সত্যকার ত্রাণকর্তা উপস্থিত; তিনি নশ্বর-কিছুই দান করেন না, বরং অপূর্ব-কিছুই দান করতে সক্ষম। সুতরাং, পুরাতন নিয়মকালে মোশির মাধ্যমে পূর্বনির্দেশিত শুভলগ্ন এখন সিদ্ধি লাভ করেছে: যিশুতে ঈশ্বরের পরিত্রাণ উপস্থিত, যিশুতে ঈশ্বর মানবজাতির কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করে আদিকালের তাঁর সেই সকল প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন। স্বর্গ থেকে আগত একমাত্র সত্যকার রুটি এ-ই: যা স্বর্গ থেকে নেমে আসে, তা-ই। মান্না খাদ্য স্বর্গ থেকে 'বর্ষা'র মত পড়ত, অপর দিকে ঈশ্বরের দেওয়া রুটি স্বর্গ থেকে নেমে আসে, প্রত্যক্ষভাবেই ঈশ্বর থেকে আসে এবং এজন্য শুধু ইস্রায়েল জাতিকে নয়, সমগ্র জগৎকেও ঐশজীবন দিতে পারে। কিন্তু এখনও ইহুদীরা যিশুর কথা বিশ্বাস করতে পারে না; তারা আশ্চর্য অথচ নশ্বর খাদ্যের অপেক্ষায় নিজেদের আবদ্ধ রাখে।

৬:৩৫—আমিই সেই জীবন-রুটি : রহস্যাবৃত ঐশরুটির বিষয়ে যে-কথা যিশু বলে এসেছেন, সেই সকল কথার অর্থ এখন সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় : ব্যক্তিরূপে যিশুই সেই জীবন-রুটি যার বৈশিষ্ট্য হল অবিনশ্বর ও অনন্ত জীবন দান করা। এই জীবন-রুটি পাবার জন্য যিশুর কাছে আসা, তাঁর অনুসরণ করা, অর্থাৎ তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। বিশ্বাসীগণ যিশুতে এবং যিশুর মাধ্যমে অবিনশ্বর খাদ্য পায় কেননা যিশু নিজেই ব্যক্তি হিসাবে সেই জীবন-রুটি। যিশুর প্রতি বিশ্বাস রেখে তারা আর কখনও ক্ষুধার্ত বা পিপাসিত হবে না। পুরাতন নিয়মে লেখা আছে, ঐশপ্রজ্ঞাকে গ্রহণ করাই রুটি ভোগ করা ও আঙুররস পান করার তুল্য (প্রবচন ৯:৫) এবং যারা ঐশপ্রজ্ঞাকে একবার ভোগ করে তারা পুনরায় তাকে ভোগ করতে ইচ্ছা করে (সিরা ২৪:২১)। উপরন্তু, যাত্রাপুস্তকে মান্না খাদ্যের কথা শৈল থেকে প্রবাহিত জলের সঙ্গে সর্বদা উল্লিখিত। সুতরাং, তাঁর এ উক্তির মাধ্যমেও যিশু হলেন পুরাতন নিয়মের সিদ্ধিস্বরূপ, আর শুধু তা নয় : রুটি-যিশু এই সকল প্রতীক অতিক্রমও করেন, কেননা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলে আমরা ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত হব না। অবশেষে, লক্ষ করার বিষয় হল যিশুর আত্মপরিচয়সূচক গম্ভীর বচন, 'আমিই' : পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর বিশেষত এই বচনের মধ্য দিয়েই আত্মপরিচয় দিতেন (যাত্রা ৩:১৪; হোশেয়া ১:৯ প্রভৃতি)। 'আমিই' বলায় ঈশ্বর ইহুদী জনগণের কাছে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে যা প্রকাশ করেছিলেন, 'আমিই' বলায় যিশুও তা নিজের বেলায় দাবি করেন। উপরন্তু তিনি পুরাতন নিয়মে প্রতিশ্রুত জীবন-নির্দেশসূচক প্রতীকগুলো নিজের উপর আরোপ করেন : মান্না নয়, কেবল তিনিই দিব্য খাদ্য ; কেবল তিনিই সত্যকার মেষপালক, সত্যকার আলো, মেষগুলির সত্যকার প্রবেশদ্বার, ইত্যাদি। সুতরাং, 'আমিই' বচনে যিশু ইহুদী ঐতিহ্য অপেক্ষা নিজেকেই চরম ও শ্রেষ্ঠ জীবনদাতা বলে ঘোষণা করেন : কেবল যিশুই ইস্রায়েল জাতির এমনকি সমগ্র জগতের রক্ষাকর্তা, বিধাতা ও ত্রাণকর্তা। যোহনের সুসমাচারে যিশু সাত বার করে নিজের বেলায় এই বিশেষ বচন আরোপ করেন : তখনই, যখন তিনি জীবনের রুটি, জগতের আলো, মেষগুলির প্রবেশদ্বার, প্রকৃত মেষপালক, পুনরুত্থান ও জীবন, পথ সত্য ও জীবন এবং সত্যকার আঙুরলতা বলে আত্মপরিচয় দেন। এ সকল বচনের (অর্থাৎ, কেবল যিশু পুরাতন নিয়মের অতিক্রমকারী ও তার সিদ্ধি স্বরূপ) গভীর তাৎপর্য তখন

অধিক স্পষ্টতর পরিস্ফুট হয় যখন উল্লিখিত বচনগুলি ‘প্রকৃত’, ‘সত্যকার’, ‘জীবনের’ ইত্যাদি সাহায্যকারী শব্দ দ্বারা চিহ্নিত (যেমন, আমিই সত্যকার আঙুরলতা)।

ইহুদীদের পক্ষে ‘আমিই’ বচনটা নিঃসন্দেহে প্রচণ্ড আঘাতদায়ী কথা, এমনকি এ বচন শুনে তারা চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হয়ে পড়ত: হয় যিশুকে চরম ঐশপ্রকাশকর্তারূপে স্বীকার করবে, না হয় তাঁকে ঈশ্বরনিন্দা-অভিযোগে অভিযুক্ত করে অস্বীকার করবে। তাই এখানেও বিশ্বাস-সমস্যা উপস্থিত: যে যিশুকে ও তাঁর ঐশপ্রকাশ গ্রহণ করে, সে তাঁর মাধ্যমে জীবন পেয়ে গেছে, কেননা তিনিই একমাত্র জীবন-রুটি, জীবন-রাজ্যে প্রবেশের জন্য একমাত্র দ্বার এবং পুনরুত্থান ও জীবন। এক কথায়, কেবল যিশুতেই পরিত্রাণ।

শেষে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ‘আমিই’ উপদেশগুলির উদাহরণের মধ্য দিয়ে (জীবন-রুটি, জগতের আলো ইত্যাদি উপদেশ) বর্তমান ও চরম ঐশপ্রকাশের ও পরিত্রাণের গভীর তাৎপর্য অতিশয় সূক্ষ্মভাবে ফুটে ওঠে।

বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা (৬:৩৬-৪৭)

৬ [৩৬] ‘কিন্তু আমি তোমাদের বলেছি, তোমরা দেখেছ, অথচ এখনও বিশ্বাস কর না। [৩৭] পিতা আমাকে যা কিছু দান করেন, তা আমার কাছে আসবে, এবং যে কেউ আমার কাছে আসে, তাকে আমি কখনও ফিরিয়ে দেব না, [৩৮] কারণ আমার নিজের ইচ্ছা পালন করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পালন করতে আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি। [৩৯] আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা এ: তিনি যা কিছু আমাকে দিয়েছেন, আমি তার কিছুই না হারিয়ে বরং সমস্তই যেন শেষ দিনে পুনরুত্থিত করি। [৪০] এটিই আমার পিতার ইচ্ছা: যে কেউ পুত্রকে দেখে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়, এবং আমি যেন শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করি।’

[৪১] তখন ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে গজগজ করতে লাগল, যেহেতু তিনি বলেছিলেন, আমিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে; [৪২] তারা বলছিল, ‘লোকটা কি

যোসেফের ছেলে সেই যিশু নয়, যার মাতাপিতাকে আমরা জানি? তাহলে সে কেমন করে বলতে পারে, আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি?'
[৪৩] উত্তরে যিশু তাদের একথা বললেন, 'নিজেদের মধ্যে গজগজ করো না।
[৪৪] পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না করলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না, আর তাকেই আমি শেষ দিনে পুনরুত্থিত করব।
[৪৫] নবীদের পুস্তকে লেখা আছে, তারা সকলে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা পাবে। যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনেছে ও শিক্ষা পেয়েছে, সে-ই আমার কাছে আসে। [৪৬] কেউ যে পিতাকে দেখেছে, তা নয়, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত, কেবল তিনিই পিতাকে দেখেছেন। [৪৭] আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে।'

৬:৩৬—তোমরা দেখেছ, অথচ এখনও বিশ্বাস কর না: যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখতে গিয়ে ইন্দ্রিয়গুলো ভুল-ভ্রান্তির কারণ হতে পারে, কেননা ইন্দ্রিয়গুলো নির্ভরযোগ্য নয় যেহেতু বিশ্বাস মানবীয় বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে না। ইহুদীদের দোষ ঠিক এটা, তারা চোখে দেখে বটে, অথচ ঐশমর্মসত্য উপলব্ধি করতে পারে না, ফলত যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারে না।

৬:৩৭—পিতা আমাকে যা কিছু দান করেন…: যিশু পরিত্রাণলাভের সুযোগ সকলকেই দিতে চান; একমাত্র শর্ত হল মানুষ তাঁর কাছে আসুক, অর্থাৎ তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখুক। যে বিশ্বাসী হতে রাজি, সে পিতা দ্বারা যিশুর হাতে সমর্পিত হয় যাতে যিশু দ্বারা পরিত্রাণ পায়। যে বিশ্বাসী-মণ্ডলীর সহভাগী হতে ইচ্ছুক, যিশু তাকে ফিরিয়ে দেবেন না কেননা তিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য: যিশু ও পিতা অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত, যিশুর ইচ্ছা ও পিতার ইচ্ছা এক।

৬:৩৯—তাঁর ইচ্ছা এ: যোহন স্পষ্টতররূপে পৃথিবীতে যিশুর কার্যকলাপের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে চান: যাদের পিতা যিশুর হাতে তুলে দিয়েছেন যিশু তাদের

একজনকেও হারিয়ে যেতে দেবেন না। যে যিশুর মেষপালের একজন নয়, যে সেই মেষপাল ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়, সে-ই হারিয়ে যাবে। অনন্ত জীবন-দান অর্থাৎ পরিত্রাণ-দান অন্তিম দিবসের পুনরুত্থানে পূর্ণ হবে, কিন্তু এই শর্তে যে, এখনই তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন।

৬:৪৪—**তিনি আকর্ষণ না করলে… :** ইহুদীদের ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাসের সম্মুখীন হয়ে যিশু একথা ঘোষণা করেন যে, পিতাই তাঁকে প্রেরণ করেছেন; কিন্তু আর কোন কথা বলেন না, কেননা যে বিশ্বাসী, শুধু সে-ই যিশুর দাবিতে সম্মতি দিতে পারে। এজন্য তিনি ইহুদীদের বিশ্বাস করতে ও ঈশ্বরের ডাকে নিজেদের হৃদয় উন্মুখ করতে আহ্বান করেন। ঈশ্বর তাদের ডাকেন, তাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করতে ও তাঁর সুস্নিগ্ধ স্নেহে নিজের কাছে তাদের আকর্ষণ করতে উৎসুক: ভালবাসার খাতিরেই ঈশ্বর মানুষকে আকর্ষণ করেন, যেমন নবী যেরেমিয়া ৩১:৩-এ সুন্দরভাবে লিখেছেন (গ্রীক বাইবেল): 'চরমকালীন ভালবাসায় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই আমি আমার কৃপায় তোমাকে আকর্ষণ করেছি'। ঈশ্বরের এই আকর্ষণ না থাকায় যিশুর কাছে যাওয়া যায় না, তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখাও যায় না। 'ঈশ্বর আমাকে আকর্ষণ করেন না, এজন্য আমি বিশ্বাস করতে পারি না', একথা কেউই বলতে পারে না; তবুও যদি একজন তা-ই মনে করে তাহলে সাধু আগস্তিনের কথামত সে ঈশ্বরের আকর্ষণের জন্য প্রার্থনা করুক।

৬:৪৫—**তারা সকলে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা পাবে:** বিশ্বাস হল ঈশ্বরের দান, তা সত্ত্বেও মানুষ বিশ্বাস করার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকবে; এ প্রচেষ্টা তখনই প্রকাশ পায় যখন মানুষ পিতার কথা শোনে ও তাঁর কাছে শিক্ষা নেয়। মানুষ ঐশশিক্ষা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করবে ও সেই শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করবে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে, এরূপ ঐশশিক্ষা-শ্রবণ বলতে অসাধারণ বা মরমিয়া আধ্যাত্মিক দর্শন বা অভিজ্ঞতা লাভ নয়, বরং, যেহেতু যিশু পিতার সঙ্গে এক এবং যে যিশুকে শোনে সে পিতাকেও শোনে, সেজন্য ঐশশিক্ষা-শ্রবণ বলতে যিশুর দেওয়া শিক্ষা গ্রহণ করা

বোঝায়। পিতার সহায়তায় পুত্রের বাণী সর্বকালের সুসমাচার-পাঠকের কাছে অতীতকালের বাণী নয় বরং বর্তমান ও চিরস্থায়ী বাণী যার অর্থ পবিত্র আত্মা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হয়েছে, যিশুর বাণীর সম্মুখীন হয়ে আমরা সবসময় একটা সিদ্ধান্ত নিতে আহূত (৩:১৮; ১২:৪৮)।

৬:৪৬—কেউ যে পিতাকে দেখেছে, তা নয়: কেউই প্রত্যক্ষভাবে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে না। পিতার কাছে যাওয়া সকলের পক্ষে অসাধ্য তারা যদি না যায় সেই যিশুর মধ্য দিয়ে যিনি আদি থেকে ঈশ্বরমুখী ও তাঁর কাছ থেকে আগত। ইহুদীরা কিন্তু মনে করে তারা ঐশবিধানের আজ্ঞাগুলো পালনেই পিতার কথা শুনতে পাবে, এবং জ্ঞান-মার্গপন্থীরা ভাবত ধ্যান-অনুধ্যানই তাদের কাছে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করাবে। কিন্তু যোহন ঐশবিধান ও ধ্যানের স্থানে যিশুরই কথা উপস্থাপন করেন এবং জোর দিয়ে ঘোষণা করেন যে, যিশুই ঈশ্বরের একমাত্র প্রকৃত প্রকাশকর্তা।

৬:৪৭—যে কেউ বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে: যিশু আবার সেই কথা পুনরাবৃত্তি করেন যে, অবিনশ্বর ও ঐশ জীবন পেতে হলে বিশ্বাস করাই অনন্য অপরিহার্য শর্ত।

‘জীবনের রুটি’ বলে যিশুর দ্বিতীয় আত্মপ্রকাশ (৬:৪৮-৫১)

৬ [৪৮] ‘আমিই সেই জীবন-রুটি। [৪৯] তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, তবুও তাঁরা মারা গেছেন। [৫০] এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পারে আর মরে না যায়। [৫১] আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে, আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস —জগতের জীবনের জন্য!’

যিশুর উপদেশের এই অংশটি ৩১-৩৫ পদের প্রসঙ্গ পুনরাবৃত্তি করে। কিন্তু এখানে একথাই দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে, জীবনের রুটি খাওয়া অর্থাৎ যিশুর অনুসরণ করা কিংবা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা এমন কাজ যা যথার্থই মৃত্যুকে জয় ও বিনষ্ট করে। জীবনদাতারূপে যিশুর বৈশিষ্ট্য মরুপ্রান্তরে পিতৃপুরুষদের মৃত্যুর উল্লেখেই স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, যখন ঈশ্বর স্বর্গীয় রুটি দান করেন তখন অবশ্যই তিনি ইচ্ছা করেন মানুষ সেই রুটি খাবে অর্থাৎ তাঁর প্রেরিতজনের প্রতি বিশ্বাস রাখবে, কেননা সেই প্রেরিতজন জীবনের রুটি শুধু নন বরং জীবনময় অর্থাৎ জীবনপূর্ণ, জীবনদায়ী ও জীবন-শক্তিমণ্ডিত, এবং এজন্যই নিজের জীবন দান করতে পারেন যে-জীবন তিনি দান করবেন ক্রুশের উপরে আত্মবলিদান ক'রে। এই পর্যায়ে বলা যেতে পারে, জগৎকে জীবন দান করবেন বলে পিতার যে ইচ্ছা (৬:৩৩), সেই ইচ্ছা 'জগতের জীবনের জন্য' যিশুর আত্মবলিদানে সিদ্ধিলাভ করে। মৃত্যুর হাতে নিজের মাংস সঁপে দেওয়ার জন্যই ঐশবাণী মাংস হলেন: যিশুর পরিত্রাণদায়ী মৃত্যুই হল 'বাণী হলেন মাংস' ঐশরহস্যের উদ্দেশ্য। ঐশবাণী হিসাবে যিশু ঐশপ্রকাশকর্তা ঠিকই, কিন্তু মাংসে আগত বাণী হিসাবে তিনি ত্রাণকর্তা, বিশ্বপাপহর, বলীকৃত মেষশাবক আর সেই বিদীর্ণজনও যাঁর বুক থেকে জীবন ও ঐশআশিসধারা নিঃসৃত হল (১৯:৩৪)। অধিক সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারি যে, যিশুর 'বাণী' ভূমিকা হল ঐশপ্রকাশকর্ম সাধন করা, এবং তাঁর 'মাংস' ভূমিকা ত্রাণকর্ম দ্বারাই নির্দেশিত: এটিই হল 'বাণী হলেন মাংস' নিগূঢ় সত্যের গভীর তাৎপর্য। এই গভীর সত্য আমাদের কাছে স্মরণ করিয়ে যোহন এখন একথা বলেন যে, যিশুর বলীকৃত মাংস সাক্রামেন্তীয় রুটিতেই আমাদের কাছে অর্পিত।

এউখারিস্তীয় উপদেশ (৬:৫২-৫৯)

৬ [৫২] এতে ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে তর্ক করতে লাগল; তারা বলছিল, 'লোকটা কী করে তার নিজের মাংসটা আমাদের খেতে দিতে পারে?' [৫৩] যিশু তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই। [৫৪] যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে

গেছে, আর আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব; [৫৫] কারণ আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য ও আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়। [৫৬] যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি। [৫৭] যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত, সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে। [৫৮] এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে—পিতৃপুরুষেরা যা খেয়েছিলেন, এই রুটি সেই রুটির মত নয়, তাঁরা তো মারা গেছেন; যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।' [৫৯] এই সমস্ত কথা তিনি কাফার্নাউমে সমাজগৃহে উপদেশ দানকালে বলেছিলেন।

৬:৫২—লোকটা কী করে তার নিজের মাংসটা আমাদের খেতে দিতে পারে? আবার ইহুদীরা বিশ্বাস করতে রাজি নয় বিধায় যিশু গভীরতর আত্মপ্রকাশ অর্পণ করেন। ইহুদীদের অবিশ্বাসের সম্মুখীন হলেও যিশু স্পষ্ট কথা না বলে পারেন না; এমনকি, মাংসের কথা ছাড়া একথাও ঘোষণা করেন যে, তাঁর রক্তও পান করা প্রয়োজন। 'জল ও আত্মা থেকে নবজন্ম'-এর মাধ্যমেই অর্থাৎ বাপ্তিস্মের মাধ্যমে খ্রিষ্টবিশ্বাসী ঐশজীবন পায় বটে, অথচ আর একটা শর্তই অপরিহার্য, আর সেটা হল: যিনি এউখারিস্তিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীকে ঐশজীবনে সঞ্জীবিত করে থাকেন, সেই জীবনদাতার সঙ্গে চিরস্থায়ী সংযোগ সাধন করা। যিশুর রক্ত-মাংস গ্রহণ করতে যে অনিচ্ছুক, সে 'বাণী হলেন মাংস' রহস্য ও ক্রুশের উপরে তাঁর রক্তাক্ত মৃত্যু অস্বীকার করে। সেই এউখারিস্তীয় রুটিতে মাংসে আগত ও ঐতিহাসিক ত্রাণকর্তা ঘোষিত হন এবং ঘোষিত হয় যে ক্রুশের উপরে যিশুর মৃত্যুই হল পরিত্রাণের চিরন্তন উৎস। বলা বাহুল্য যে এউখারিস্তিয়া গ্রহণে আমরা সেকালের যিশুর শারীরিক মাংস ও রক্ত গ্রহণ করি না। বাস্তবিকই যিশু সর্বকালের মত একবারই মাত্র আত্মবলিদান করলেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা গৌরবান্বিত 'মানবপুত্রেরই' মাংস ও রক্ত গ্রহণ করি, অর্থাৎ, পুনরুত্থানজনিত নব-অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যিশু নিজের ঐশআত্মাপূর্ণ মাংস ও রক্ত আমাদের দান করেন।

৬:৫৪—যে কেউ আমার মাংস খায়··· : এউখারিস্তিয়ার মধ্য দিয়ে স্বয়ং যিশুই তাঁর গ্রহণকারীদের সঙ্গে সংযুক্ত হন, তাদের সঞ্জীবিত করেন এবং যথাসময় তাদের পুনরুত্থিত করবেন। সুতরাং, এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্তের উদ্দেশ্যই যাতে আমরা যিশুর সঙ্গে প্রকৃতই সংযোগে সংযুক্ত হই।

৬:৫৫—আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য : যিশুর রক্ত-মাংস যে গ্রহণ করে, সে অনন্ত জীবনও লাভ করে : অবিনশ্বর ও ঐশ্বরিক জীবন নিজ অন্তরে রাখতে হলে মানবপুত্রের রক্ত-মাংস গ্রহণ করা অবশ্যই প্রয়োজন ; যে এউখারিস্তীয় রুটি গ্রহণ করে, তার পক্ষে ঐশজীবনের প্রতিশ্রুতিই যথার্থ, কেননা যিশুর রক্ত-মাংস ঐশজীবন পাবার জন্য সত্যকার প্রকৃত ও পুষ্টিকর খাদ্য।

৬:৫৬—যে কেউ আমার মাংস খায়··· সে আমাতে বসবাস করে : এখানে এউখারিস্তিয়ার দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় : এক দিকে সাক্রামেন্ত হিসাবে এউখারিস্তিয়া হল দিব্য একটি উপায় যা গ্রহণে বিশ্বাসী যিশুর সঙ্গে অসাধারণরূপে সংযুক্ত হয় এবং জীবনদাতার সঙ্গে এই সংযোগবলে সে তাঁর নিজেরই জীবন অর্থাৎ অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয় : বাস্তবিক, সাক্রামেন্তের উদ্দেশ্যই যেন তার মধ্য দিয়ে আমরা ঐশজীবনে প্রবেশ করতে পারি, ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যস্থায়ী ও ব্যক্তিময় বন্ধনে বা ঐক্যে আবদ্ধ হই। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের এই ঐক্য বা সংযোগ অতিশয় গভীর, এমনকি বুদ্ধির অতীত একটা রহস্য যা কেবলমাত্র স্বর্গে গেলে পর উপলব্ধি করতে পারব।

অন্য দিকে এউখারিস্তিয়া-গ্রহণ হল ক্রুশের উপরে বলীকৃত সেই মাংসে আগত বাণী-যিশুকে বিশ্বাসপূর্ণই (৬:৩১) গ্রহণের ফলস্বরূপ ; অর্থাৎ, যে এউখারিস্তিয়া গ্রহণ করে সে অবশ্যই 'মাংসে আগত বাণী' সংক্রান্ত ঐশতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বীকার ও গ্রহণ করবে :

ক। ঐশবাণী হলেন মাংস এবং এখন তিনি (বাণী) সেই মাংস অর্পণ করেন যেন মাংসে তাঁর সেই আগমনের ফল প্রচুর পরিমাণে ফলপ্রসূ হয় : সেই ফলের

নামান্তর হল ঐশজীবনদান, অর্থাৎ ঈশ্বরের ও মানুষের মধ্যকার ঐক্য: এটিই জগতের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার শীর্ষপ্রকাশ।

খ। খ্রিষ্টবিশ্বাসী মাংসে বাণী-যিশুর আগমনকে ক্রুশের উপর যিশুর মাংস-সমর্পণ পর্যন্তই স্বীকার ও গ্রহণ করবে, অর্থাৎ ক্রুশের উপর পর্যন্তই সে যিশুর অনুসরণ করার জন্য সম্মত হবে, কেননা ক্রুশ থেকেই সাক্রামেন্তীয় রুটি ও আঙুররস ঐশজীবনদায়ী শক্তি লাভ করে, ক্রুশ থেকেই যিশু নিজের রক্ত-মাংস, নিজের জীবন, এক কথায় নিজেকেই সঁপে দেন।

এইভাবে এউখারিস্তীয়া গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীগণ ঈশ্বরের জীবনে প্রবেশ করে এবং তাঁর সঙ্গে এমন সংযোগে সংযুক্ত হয় যা অনির্বচনীয়, কিন্তু একাধারে বিশ্বাসীর পক্ষে এউখারিস্তিয়া-গ্রহণই হল যিশুর মৃত্যু-নিয়তি গ্রহণ করা, তাঁর শিষ্যত্ব সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা এবং তাঁর সঙ্গে চিরস্থায়ী সংযোগে সংযুক্ত থাকার আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার ফল। সুতরাং রুটি খাওয়া ও আঙুররস পান করা নয়, বরং সেগুলির অর্থাৎ সাক্রামেন্তের সাধিত ফল যিশুর সঙ্গে সেই সম্পূর্ণ সংযোগই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৬:৫৭—যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন: মৃত্যুচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন জগৎকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পিতা পুত্রকে মানবজাতির মাঝে প্রেরণ করেন: কেবল পুত্রের মাধ্যমেই মানুষ জীবন পায়, কেননা শুধু পুত্রই স্ব-স্বরূপে ও সম্পূর্ণরূপে ঐশজীবনপ্রাপ্ত (৫:২৬), এবং বিশ্বাসে (৬:২৯, ৩৫, ৪০, ৪৭) ও এউখারিস্তিয়া গ্রহণে (৬:৫৩…) সে, পুত্রের সঙ্গে জড়িত হওয়ায়, সেই জীবন লাভ করে। উপরন্তু এই ধারণাও লক্ষণীয় যে, এই পদে যোহন অধিক সূক্ষ্মতররূপেই নিজ গভীর ভাব প্রকাশ করেন: ‘মাংস’ ও ‘রক্ত’, মানবপুত্রকে নির্দেশমূলক শব্দ দু’টো এড়িয়ে তিনি সরাসরি ও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, মানুষ যিশুকেই খাবে, কেননা তিনি নিজেই রুটি, তিনি নিজেই জীবন।

যেভাবে পিতা জীবনময় অর্থাৎ নিজে থেকে জীবনপ্রাপ্ত, এবং যেভাবে পুত্র পিতার জীবনেই জীবিত অর্থাৎ পিতা নিজের জীবনপূর্ণতায় পুত্রকে নিজে থেকে জীবনপ্রাপ্ত হতে

দেন, সেইভাবে এউখারিস্তীয় আকারে যিশুকে গ্রহণ করে যারা, পুত্র তাঁর সেই গ্রহণকারীদের পূর্ণ জীবন দান করেন: যে এউখারিস্তিয়ায় যিশুকে গ্রহণ করে, সে ঈশ্বরের জীবন-পূর্ণতায় সংস্থিত।

খ্রিষ্টমণ্ডলী আদি থেকেই যিশুর এই উপদেশ এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠানে প্রতিফলিত করে আসছে: বাস্তবিকই, ২য় ভাতিকান মহাসভার ভাষায়, এউখারিস্তিয়ায় দু'টো ভোজন-পাট উপস্থাপিত তথা, বাণী-পাট এবং রুটি ও আঙুররস-পাট: আমরা আগে বাণী-পাটে (অর্থাৎ ঐশবাণী শুনে) ঐশপ্রকাশকর্তা যিশুকে গ্রহণ করি, এবং পরে এউখারিস্তীয় পাটে নিজের মাংসদানকারী যিশুকেই গ্রহণ করি যাঁকে আগে বাণীরূপে গ্রহণ করেছি। সত্যিই, এউখারিস্তিয়াতে আমরা 'বাণী হলেন মাংস' ঐশরহস্যের সহভাগী।

৬:৫৮—এটিই সেই রুটি: উপদেশের উপসংহারস্বরূপ যোহন ঘোষণা করেন যে, উপদেশে যা ব্যক্ত হয়েছে তা সাক্রামেন্তীয় রুটি-যিশুতে সিদ্ধিলাভ করে। আর একবার মান্নার কথা উল্লেখে স্পষ্ট বলা হয় যে, মান্নার প্রতীকমূলক ভূমিকা যিশুতে পূর্ণ হয়েছে: মানবপুত্রকে খেয়ে আমরা প্রকৃত জীবন অর্থাৎ ঐশজীবন লাভ করি।

বিশ্বাস-সিদ্ধান্ত (৬:৬০-৭১)

৬ [৬০] এই উপদেশ শোনার পর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে বললেন, 'এ কথা কঠিন! তা কে শুনতে পারে?' [৬১] কিন্তু যিশু মনে মনে জানতেন, তাঁর শিষ্যেরা নিজেদের মধ্যে এবিষয়ে গজগজ করছিলেন; তাঁদের বললেন, 'এ কি তোমাদের পতনের কারণ? [৬২] তবে মানবপুত্র আগে যেখানে ছিলেন, তোমরা যখন তাঁকে সেখানে আরোহণ করতে দেখবে, তখন কীবা বলবে? [৬৩] আত্মাই জীবনদায়ী, মাংস কোন কাজের নয়। যে সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলছি, সেই কথাই আত্মা, সেই কথাই জীবন। [৬৪] কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে না।' কেননা যিশু প্রথম থেকেই জানতেন, কারা বিশ্বাসহীন এবং তাঁর

প্রতি কে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। [৬৫] তিনি আরও বললেন, ‘এজন্যই আমি তোমাদের বলেছি, কেউই আমার কাছে আসতে পারে না, যদি পিতার কাছ থেকেই তাকে এমনটি দেওয়া না হয়।’

[৬৬] এরপর থেকে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে পিছিয়ে পড়ে চলে গেলেন, তাঁর সঙ্গে আর যেতেন না। [৬৭] তখন যিশু সেই বারোজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরাও কি চলে যেতে চাও?’ [৬৮] শিমোন পিতর তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, ‘প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে। [৬৯] আর আমরা বিশ্বাস করেছি, জানতেও পেরেছি, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন।’ [৭০] উত্তরে যিশু তাঁদের বললেন, ‘আমি কি তোমাদের, এই বারোজনকেই বেছে নিইনি? তবু তোমাদের মধ্যে একজন একটা দিয়াবল।’ [৭১] একথা তিনি শিমোন ইস্কারিয়োতের ছেলে যুদাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন; এই যুদা—বারোজনের একজন—তিনিই তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন।

যিশুর কথা শুনে শ্রোতাদের যে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা এই অংশে প্রকাশিত। যিশুর বাণীর প্রভাবে শ্রোতাদের হৃদয়-মন যে চিন্তা-ভাবনা বিরাজমান তা উদ্ঘাটিত হয়, কেননা যিশুর বাণী সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য করা তত সহজ ব্যাপার নয়। প্রকৃত বিশ্বাসী হবার জন্য আমাদের পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করা প্রয়োজন, কেননা মানুষ হিসাবে কখনও যিশুকে গ্রাহ্য করতে পারব না: ঈশ্বরের শক্তি সেই পবিত্র আত্মাই জীবনদায়ী, তিনিই আমাদের নবজন্ম ও অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গি দান করতে এবং বিশ্বাসের পথে চালিত করতে পারেন।

৬:৬০—এ কথা কঠিন! যিশুর উন্মুক্ত কথার দরুন অনেকে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে। অনেকেই আছে যারা যিশুর কয়েকটা কথাই মাত্র গ্রহণ করে এবং উৎসাহের সঙ্গে মনে করে তারা আলো পেয়েছে। অথচ তাদের পতন হবে, কেননা পরীক্ষার সময়ে যখন যিশু আরও গভীরভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন তখন তাদের মন সেই নতুন বাণী সহ্য করতে পারবে না। এইভাবে যিশুকে অস্বীকার ক’রে তারা পুনরায় অন্ধকারে পিছিয়ে পড়বে।

এই পরীক্ষায় সেই বারোজনও পরীক্ষিত হয়েছেন, স্বয়ং যিশু এবিষয়ে তাঁদের পরীক্ষা করলেন এবং নিঃসন্দেহে এই যুগের মানুষ আমরাও প্রতিনিয়ত যিশু দ্বারা পরীক্ষিত: তোমরাও কি চলে যেতে চাও?

৬:৬৮—প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? যিশুকে ত্যাগ করাই হল মুক্তি-পথের একমাত্র দিশারী ও ঐশজীবনদাতাকে ত্যাগ করা। যিশুর জীবনকালে সেই বারোজন তাঁর কথার গভীর অর্থ নিঃসন্দেহে অপূর্ণাঙ্গরূপেই অনুভব করেছিলেন এবং এই উপদেশের বেলায়ও বেশি কিছু অনুভব করতে পারলেন না বটে, অথচ তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, যিশুর বাণী ঐশশক্তিপূর্ণ বাণী, কেননা তাঁরই মুখের উচ্চারিত বাণী যাঁর সঙ্গে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত। পরীক্ষার সময়ে সে-ই দাঁড়াতে পারে, যে প্রকৃত বিশ্বাসী; পিতরের স্বীকারোক্তিতে সেই সত্য প্রকাশ পায় যা সেই বারোজন যিশুর সঙ্গে সুদীর্ঘ জীবনের সাহচর্যে সন্ধান পেয়েছিলেন। শিষ্য হওয়া মাত্রই পিতর যিশুকে মশীহ (খ্রিষ্ট) বলে স্বীকার করেছিলেন, তবু এখন তাঁর খ্রিষ্টোপলব্দি সূক্ষ্মতর হয়ে উঠেছে; অপর দিকে ইহুদীরা তাদের আদিকালীন সঙ্কীর্ণ ধারণার গন্ডিতে এখনও আবদ্ধ। পিতর বিশ্বাস করেন, সমস্ত অন্তর দিয়ে যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকেন, আর সেইজন্য জানতেও পারেন, অর্থাৎ যিশুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিময় সম্পর্ক অতি গভীর হয়ে ওঠে। পিতরের সঙ্গে অন্যান্য দূতগণও, এমনকি সর্বকালের বিশ্বাসীগণ ঘোষণা করেন, যিনি স্বর্গ থেকে নেমে আসা জীবনের রুটিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন ও বিশ্বাসীদের কাছে ঐশজীবন দান করবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তাঁরা তাঁকেই মাত্র অবলম্বন করেন। 'আমিই', যিশুর এই উক্তিতে পিতরের সঙ্গে বিশ্বাসীগণ সবাই উত্তর দিয়ে ঘোষণা করে, তুমিই, অর্থাৎ তুমি ছাড়া এজগতে আর কিছুই নেই, কেননা আদি থেকেই তুমি ছাড়া আর কোন প্রকৃত 'আমিই' নেই, তুমিই ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন যিনি আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের নিজের জীবন বিরাজিত করান।

৬:৭০—আমি কি তোমাদের… বেছে নিইনি? এই প্রশ্নে যিশুর উত্তর এক দিকে আশ্বাসজনক, কেননা এতে আমরা বুঝি তিনি ভালবাসার খাতিরেই আমাদের বেছে নিয়েছেন এবং তাঁর ভালবাসাপূর্ণ মনোনয়ন অনন্তকালস্থায়ী, কিন্তু অপর দিকে উত্তরটি দুঃখজনক, কেননা অবিশ্বাস ও বিশ্বাসঘাতকতার রহস্য সর্বত্রই, এমনকি সেই বারোজনের সংঘের মধ্যেও উপস্থিত।

পরিশিষ্ট

যোহন অনুসারে এউখারিস্তিয়া

যোহনের সুসমাচার অনুসারে সমুদয় এউখারিস্তীয় উপস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য হল মাংসে ঐশবাণীর আগমন বাস্তব বলে প্রতিপন্ন করা; এবং এই ক্ষেত্রে এউখারিস্তিয়ার মুখ্য একটা উদ্দেশ্যই ক্রুশের উপর মৃত্যু পর্যন্তই 'মাংসে আগত যিশু'-রহস্যের বাস্তবতার দিকে নির্দেশ করা। উদ্দেশ্যটি কিন্তু আর একটা মুখ্য উদ্দেশ্যকে যেন নিম্নতর পর্যায় পদচ্যুত না করে; দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হল এই যে, এউখারিস্তিয়া হল: যিনি ক্রুশে উত্তোলিত হয়ে মৃত্যুবরণ করার পর মানবপুত্রের গৌরবে অর্থাৎ ত্রাণকর্তা-অধিকারে উন্নীত হয়ে বিশ্বাসীদের কাছে নিজের রক্ত-মাংস সাক্রামেন্ত রূপে অর্পণ করেন, সেই যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য এবং সেই যিশুর মাধ্যমে ঐশজীবন সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষ একটা উপায়।

এখন আসুন, উল্লিখিত ব্যাখ্যায় ভিত্তি করে সুসমাচারের ৬ অধ্যায় অনুসারে যোহনের এউখারিস্তিয়ার সাক্রামেন্তীয় ধারণা মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করি। সুতরাং, এখানে নূতন নিয়ম ভিত্তিক নয়, শুধু যোহন ভিত্তিক, এমনকি শুধু ৬ অধ্যায়ই ভিত্তিক তেমন এউখারিস্তীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হবে।

১। এউরিস্তিয়া (এবং বাপ্তিস্মও) এমন পরিত্রাণদায়ী উপায় বা সাক্রামেন্ত নয় যা খ্রিষ্টের সাধিত সমষ্টিগত পরিত্রাণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়, বরং কেবল যিশুর সেই 'প্রেরণকর্মের' (অর্থাৎ বিশেষ কাজের) সঙ্গে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই হৃদয়ঙ্গম করা

যায়, যে-প্রেরণকর্ম (বা বিশেষ কাজ) মাংসে তাঁর আগমন-লগ্ন থেকে ক্রুশে তাঁর উত্তোলন পর্যন্ত, এমনকি তাঁর গৌরবায়ন পর্যন্ত ছুটে চলে। যে এউখারিস্তিয়ায় এ সকল ধারণা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না, যোহনের ধারণা অনুসারে সেই এউখারিস্তিয়া অর্থহীন।

২। সমগ্র সুসমাচারে যিশুকে ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তা বলে উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু এখন (এই ৬ অধ্যায়ে) তাঁর এই দ্বিবিধ ভূমিকা বিশিষ্ট এক দিক থেকেই পরিলক্ষিত হয় : তিনি স্বর্গীয় রুটি, যে-রুটি ঈশ্বর দান করেন মানুষ যেন তা খায়।

৩। মানুষের পক্ষে একমাত্র অপরিহার্য শর্ত হল ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তা যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখা। বিশ্বাস ছাড়া এউখারিস্তিয়ার মাহাত্ম্য অগ্রহণীয়, সুতরাং ফলশূন্য। শুধু বিশ্বাস যিশুর বাণী ও কার্যকলাপ পরিত্রাণদায়ী করে তোলে।

৪। যিনি ঐশপ্রকাশ বহন করে স্বর্গ থেকে নেমে আসা জীবনের রুটি বলে আত্মপ্রকাশ করলেন, সেই ঐতিহাসিক যিশুর সঙ্গে এউখারিস্তিয়াতে দেওয়া তাঁর রক্ত-মাংসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান, কেননা ক্রুশের উপর তাঁর সেই মৃত্যু তাঁর ‘প্রেরণকর্মের’ (অর্থাৎ বিশেষ কাজের) একটা পর্যায়, যে-মৃত্যুতে তিনি জগতের জীবনের জন্য নিজের মাংস অর্পণ করলেন। তাঁর পরিত্রাণদায়ী মৃত্যু এউখারিস্তিয়াতে তাঁর রক্ত-মাংস দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং রুটি গ্রহণকারীরা সেই পরিত্রাণদায়ী মৃত্যুর ফল ভোগ করে। সুতরাং, এউখারিস্তিয়ার এই ভূমিকাও রয়েছে, যাতে ‘মাংসে যিশুর আগমন’ ও তাঁর আত্মবলিদানের বিষয়ে সাক্ষ্য দান করা হয় (১ যোহন ৫:৬-৮; যোহন ১৯:৩৪ ···)।

৫। বাণী-ঘোষণা ও এউখারিস্তিয়া-গ্রহণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও পরস্পর পরিপূরক সম্পর্ক বিদ্যমান। বাণীর গুরুত্ব এরূপ : ‘আত্মা ও জীবন’-দায়ী বাণীই (৬:৬৩খ) হল যিশুর আত্মপ্রকাশের প্রথম ও প্রত্যক্ষ উপায় যা দ্বারা তিনি সরাসরি বিশ্বাসের জন্য শ্রোতাদের আহ্বান করেন (৬:৪৫) এবং মাংসে আগত যিশুর বাণীই সেকালের মত আজও একই শক্তি দিয়ে পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত মণ্ডলীর প্রচারে প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে (১ যোহন ৫:৭)। অপর দিকে, এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্তের স্বকীয় ভূমিকা এই : বিশ্বাসীমণ্ডলীকে যিশুর জীবনের সহভাগী করা ও যিশুর সঙ্গে তাদের সংযুক্ত করা

(৬:৫৩-৫৭)। তার এই বিশিষ্ট ভূমিকা যিশুর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত: বাণী-যিশু এউখারিস্তিয়াকে প্রতিষ্ঠা, উৎসর্গ ও ফলপ্রদ করেন। উপরন্তু যিশু চান বিশ্বাসীমণ্ডলী তাঁর বাণী মেনে চলবে; তাঁর সকল বাণীর মধ্যে এই আজ্ঞাও রয়েছে: মাংসে আগত, ক্রুশে উত্তোলিত ও গৌরবান্বিত যিশুর সঙ্গে বিশেষ বন্ধনে সংবদ্ধ হতে হলে তাঁর রক্ত-মাংস খেতেই হবে।

৬। যোহনের সুসমাচারে রুটি ও আঙুররসের কথার উল্লেখ নেই, কেননা এগুলির গুরুত্ব সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ যাতে সেগুলির মাধ্যমে বিশ্বাসীমণ্ডলী যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়; রুটি ও আঙুররসের স্থানে যোহন কেবল মানবপুত্রের মাংস ও রক্তের কথা বলেন। যেমন বলা হয়েছে, এই শব্দ দু'টো মাংসে আগত যিশুর জীবনের কথা এবং ক্রুশের উপর তাঁর মৃত্যুর কথা লক্ষ করে; কিন্তু এখন তিনি স্বর্গীয় মানবপুত্ররূপে জীবনযাপন করে থাকেন এবং তাঁর মণ্ডলীর মধ্যে বিরাজ করেন। তবুও একাধারে সেই শব্দ দু'টো মাংসে আগত ও গৌরবান্বিত যিশুর বাস্তব উপস্থিতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এউখারিস্তীয় সাক্রামেন্তে যিশু তাঁর পরিত্রাণ, এমনকি নিজেকেই পুনরায় অর্পণ করার জন্য বর্তমান করেন। এউখারিস্তিয়াতে তিনি আমাদের কাছে আসেন, আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেন এবং আমাদের সঙ্গে এক হয়ে যান আমরা যেন তাঁর পরিত্রাণের পবিত্র ফল লাভ করি। এইভাবে এউখারিস্তিয়ার সাক্রামেন্তগত ভূমিকা আলোকিত হয়: সেটির মাধ্যমে যিশুর রক্ত-মাংস জীবনদায়ী খাদ্যরূপে অর্পিত হয় (৬:৫৩) এবং খ্রিষ্টবিশ্বাসী পিতার জীবনেই সঞ্জীবিত সেই জীবনদাতা যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

৭। এউখারিস্তিয়ার মাধ্যমে খ্রিষ্টবিশ্বাসী যিশুর রক্ত-মাংস সাক্রামেন্ত রূপে গ্রহণ করে ঈশ্বরের জীবনেই সঞ্জীবিত। সুতরাং, যিশুর মত খ্রিষ্টবিশ্বাসীও নিজের জীবন জগতের কাছে পিতার একটা দান বলে বিবেচনা করবে: যিশুর অনুসরণে সে সর্বপ্রথমে জগতের কাছে মৃত্যু পর্যন্ত বলিরূপে আত্মদান করবে, যেন পরবর্তী পর্যায়ে মানবজাতির কাছে পিতার দেওয়া খাদ্য বা দান রূপে পরিণত হয়। খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবন যে জগতের কাছে পিতার একটি দান, এতে খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনের তাৎপর্য এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ মাত্রায় আলোকিত হয়।

পর্ণকুটির পর্ব

(৭–৯ অধ্যায়)

৭ম, ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত আছে যেগুলো যেরুশালেমে পর্ণকুটির পর্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং, সূচনাস্বরূপ এই ইহুদী পর্ব বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা দান করা হোক।

যোসেফ ফ্লাভিউস নামক সেকালের প্রখ্যাত ইহুদী লেখক অনুসারে এই পর্ব ছিল হিব্রুদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র ও জনপ্রিয় পর্ব। সেপ্টেম্বর মাসের বিভিন্ন ফলসংগ্রহের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করাই ছিল পর্বটির আদিম উপলক্ষ। পরবর্তীকালে সেটাতেই নতুন একটা তাৎপর্য আরোপ করা হয়েছিল, এতে পর্বটি হয়ে উঠেছিল সিনাই পর্বতে স্থাপিত সন্ধি ও মরুপ্রান্তরে সাধিত আশ্চর্য চিহ্নকর্মগুলির স্মারক পর্ব (লেবীয় ২৩:৪৩)। প্রান্তরে ঈশ্বর ও ইস্রায়েল জনগণ পর্ণকুটিরে বাস করেছিলেন একথা স্মরণে এই পর্ব উপলক্ষে হিব্রুরা যেরুশালেমে সমাগত হয়ে ছাদে ও উঠানে পর্ণকুটির গড়ে সাত দিন ব্যাপী সেখানে বাস করত। আবার, এ পর্বের অন্য একটা অর্থ ছিল: মশীহকালে বিধর্মীরাও যেরুশালেমে এসে ঈশ্বরের আপন জনগণ বলে মনোনীত হবে।

সপ্তাহব্যাপী প্রাতঃকালীন যজ্ঞ-বলিদানের আয়োজন করে সমবেত লোকে গাছের পাতা হাতে করে উল্লাসে মেতে উঠত ও যাজকদের সঙ্গে ১১৮ নং সামগীতি গান করত। পরে যাজকেরা যজ্ঞ-বলিদানের বেদির চতুর্দিকে পরিক্রমা করতে করতে লোকে 'হোশান্না হোশান্না' (সাম ১১৮:২৫) সমবেত কণ্ঠে গাইত। পরে যাজকেরা ১২:৩ সামগীতি গানে গানে সিলোয়াম ঝরনার জলে সোনালী একটা কলসি ভর্তি করে শোভাযাত্রাসহ বেদির দিকে ফিরে যেত এবং নির্দিষ্ট স্থানে সেই জল ঢেলে দিত—এতে যেরুশালেমের উপর ঈশ্বরের প্রীতি পরিলক্ষিত হত।

সপ্তম দিনে যাজকেরা সাত বার করেই বেদির চতুর্দিকে পরিক্রমা করত বিধায় দিনটিকে 'বড় হোশান্না-দিবস' বলা হত। এদিনে মন্দির শত শত প্রদীপ ও বাতির

আলোতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠত। পরের দিন আনন্দোল্লাসের মাঝে পর্ণকুটির পর্ব শেষ হত।

যিশুর সময় পর্বটি উপলক্ষে শাস্ত্রের কতিপয় অংশ পাঠ করে শোনানো হত। সেগুলির মধ্যে বিশেষত স্মরণযোগ্য হল লেবীয় ২৩:৩৩··· ; যেরেমিয়া ১৭:৭··· ; জাখারিয়া ১৪ এবং মালাখি ৩: ১০। এ সকল উদ্ধৃতাংশ জল ও আলো বিষয়ে সম্পর্কিত; প্রকৃতপক্ষে প্রাতঃকালীন জল-অনুষ্ঠানে জল বিষয়ক উদ্ধৃতাংশ এবং সান্ধ্য জ্যোতি-অনুষ্ঠানে আলো বিষয়ক উদ্ধৃতাংশগুলি পাঠ করে শোনানো হত।

উল্লিখিত ঐতিহ্যগত ও ধর্মগত উপাদানের প্রতি লক্ষ রেখে যোহন যিশুর উচ্চারিত বাণী ও সাধিত কাজগুলো সংগ্রহ করে এমন বর্ণনা সৃষ্টি করলেন যার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, পর্ণকুটির পর্বের তাৎপর্য যিশুতেই সিদ্ধিলাভ করে, কেননা যিশুই আলো ও জলদাতারূপে এজগতে এলেন।

এই সাধারণ ভূমিকা উপস্থাপনের পর, আসুন, ৭ অধ্যায়ের উপর দৃষ্টিপাত করি। অধ্যায়টি চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: ১। ভাইদের সঙ্গে যিশুর সংলাপ, ২। যিশুর প্রতি ইহুদীদের অবিশ্বাস, ৩। নিজের উদ্ভব বিষয়ে যিশুর উপদেশ, ৪। জীবনময় জলের উৎস বলে যিশুর আত্মপ্রকাশ।

এ সকল ঘটনা উপস্থাপনে যোহন আর একবার বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যকার পার্থক্য আমাদের কাছে তুলে ধরতে চান; কিন্তু তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য যিশুর আত্মপ্রকাশে ও জগতে সেই প্রকাশের প্রতিক্রিয়ায় কেন্দ্রীভূত: বিশ্বাস করার জন্য অবিশ্বাসী দাবি করে যিশু আশ্চর্য চিহ্নকর্ম দেখাবেন, কিন্তু বিশ্বাসের অভাবে কোন চিহ্নকর্ম যিশুর দিকে অঙুলি নির্দেশ করে না। আবার, যোহন সর্বকালের জিজ্ঞাসু মানুষের পক্ষে অর্থপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা উত্থাপিত করে সেগুলির উত্তর দেন: 'যিশু কোথা থেকে আসেন?' এবং 'তিনি কোথায় যাবেন?' (৭:১৪)। অবশেষে যিশু আত্মপ্রকাশ করেন, তিনিই বিশ্বাসীর একমাত্র অবলম্বন ও পরিত্রাণের উৎস; তিনি ছাড়া পরিত্রাণ বলে আর কিছুই নেই। বিশেষত এই যাবতীয় কারণের জন্য এই অধ্যায়ের মর্মসত্য বর্তমানকালেও গুরুত্বপূর্ণ।

অবিশ্বাস পরিপ্রেক্ষিতে একথাও স্মরণযোগ্য যে, এই পর্বের সময়েই শুরু হয় যিশুর বিরুদ্ধে সেই বিচার যা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকবে। এজন্যই যিশুর যন্ত্রণাভোগ

কাহিনীতে যোহন ইহুদীদের বিচারের কথা উল্লেখ করেন না বলা চলে, কেননা সেই বিচার যিশুর প্রকাশ্য জীবনকালে (বিশেষভাবে এই অধ্যায়েই) বিবৃত।

ভাইদের সঙ্গে যিশুর সংলাপ (৭:১-১৩)

৭ [১] তারপর যিশু গালিলেয়ায় ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল বিধায় তিনি যুদেয়ায় চলাফেরা করতে চাচ্ছিলেন না।
[২] ইহুদীদের পর্ণকুটির-পর্ব সন্নিকট ছিল; [৩] তাই তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বললেন, 'এখান থেকে রওনা হয়ে তুমি বরং যুদেয়ায় চলে যাও, তুমি যে সমস্ত কাজ সাধন করছ, তোমার সেই শিষ্যেরাও যেন তা দেখতে পায়। [৪] কেউ তো গোপনে কাজ করে না, সে যদি স্পষ্টই প্রকাশ পেতে ইচ্ছা করে। তুমি যখন এই সমস্ত কাজ করে থাক, জগতের সামনেই নিজেকে প্রকাশ কর।' [৫] আসলে তাঁর ভাইয়েরাও তাঁর প্রতি কোন বিশ্বাস রাখছিলেন না। [৬] যিশু তাঁদের বললেন, 'আমার সময় এখনও আসেনি, কিন্তু তোমাদের সময় সর্বদাই উপস্থিত। [৭] জগৎ তোমাদের ঘৃণা করতে পারে না, কিন্তু আমার প্রতি তার ঘৃণা আছে, কারণ আমি তার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, তার কর্ম অসৎ। [৮] তোমরাই পর্বের উৎসবে যাও, আমি এই পর্বে যাচ্ছি না, কারণ আমার সময় এখনও পূর্ণ হয়নি।' [৯] তাঁদের এই কথা বলে তিনি গালিলেয়ায় থেকে গেলেন। [১০] কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা পর্বে চলে যাওয়ার পর তিনিও তখন—প্রকাশ্যে নয়, গোপনেই—সেখানে গেলেন।
[১১] পর্বের সময়ে ইহুদীরা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে বলছিল, 'সে কোথায়?' [১২] আর লোকদের মধ্যে তাঁর বিষয়ে ফিসফিস করে অনেক কথা বলাবলি হচ্ছিল; কেউ কেউ বলছিল, 'তিনি সৎ লোক'; আবার কেউ কেউ বলছিল, 'তা নয়; সে লোকদের ভ্রষ্ট করে।' [১৩] কিন্তু ইহুদীদের ভয়ে কেউ তাঁর সম্বন্ধে প্রকাশ্যে কথা বলত না।

৭:৩—তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বললেন… : যিশুর আত্মীয়স্বজন চান তিনি জগতের সামনে নিজের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করুন; যেরুশালেমে সমবেত লোকদের উৎসাহে তিনি অবশ্যই নামকরা মানুষ হবেন। কিন্তু তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজন থেকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি যে কত-না পৃথক তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন: আত্মপ্রকাশের জন্য তিনি জাগতিক উপায়ের উপর নির্ভর করেন না, কিভাবে ও কবে নিজেকে প্রকাশ করবেন একথা নির্ধারণ করার ভার পিতারই। যিশু এই জগতের নন, বরং তিনি জগতের অসৎ কাজকর্ম (অর্থাৎ অবিশ্বাস) উদ্ঘাটন করেন। এজন্যই জগৎ তাঁকে ঘৃণা ও অমান্য করে। তাঁর আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে ব্যক্ত হয় তাঁরা জগতেরই। তাঁরাও যিশুকে ঈশ্বরের প্রেরিতজন বলে মানেন না।

৭:১০—তাঁর ভাইয়েরা পর্বে চলে যাওয়ার পর… : যিশু পর্বে যোগদান করতে অসম্মত, অথচ গোপনে তিনিও যান, এতে আমরা বুঝি, তিনি অবিশ্বাসী আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে ও তাঁদের নিতান্ত জাগতিক ধারণা অনুসারে নয়, নিজের ঐশজ্ঞান অনুসারেই বরং যেরুশালেমে যান: তিনি নিশ্চিত জানেন যে, পিতা এই পর্বে তাঁকে প্রকাশ করবেন না। আসল সময় এসে উপস্থিত হলে তিনি অপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন, তথা: ক্রুশ মৃত্যুতেই তিনি গৌরবান্বিত হবেন।

৭:১১—ইহুদীরা তাঁকে খুঁজতে… : তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁর শত্রুরাও তাঁকে খুঁজছে, এবং লোকদের মধ্যে তাঁর বিষয়ে মতভেদ বর্তমান: কেউ কেউ আছে যারা তাঁকে নকল সাধুর মত দেখে, আবার কেউ কেউ আছে যারা তাঁকে সৎমানুষ বলে মানে, অথচ ইহুদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের ভয়ে তারা নিজেদের ধারণা ব্যক্ত করতে সাহস করে না। এখানেও যোহন স্পষ্টই যেন বলেন, সেকালে বিশেষত ইহুদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের নির্যাতনের কারণেই যিশুতে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়নি। সুসমাচার লেখা-কালে যোহনের স্থানীয় খ্রিষ্টমন্ডলী যে ইহুদীদের দ্বারা অত্যাচারিত এতে কোন সন্দেহ নেই, এমনকি ঐশপ্রকাশ পুস্তক দ্বারাও কথাটা প্রমাণিত (প্রকাশ ২:৯; ৩:৯)।

যিশু বিষয়ে অবিশ্বাসী ইহুদীদের বিচার (৭:১৪-২৪)

৭ [১৪] পর্বকালের মাঝামাঝি সময়ে যিশু মন্দিরে গিয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন। [১৫] ইহুদীরা আশ্চর্য হয়ে বলছিল : 'শিক্ষা-দীক্ষা না পেয়ে লোকটা কী করে শাস্ত্র বিষয়ে এত বিজ্ঞ?' [১৬] উত্তরে যিশু বললেন, 'আমি যে শিক্ষা দিচ্ছি, তা আমার নয়; যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই। [১৭] কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছুক হলে, তবে সে জানতে পারবে, এই শিক্ষা ঈশ্বর থেকে উদ্গত, নাকি আমি নিজে থেকে কথা বলি। [১৮] যে নিজে থেকে কথা বলে, সে নিজের গৌরবের অন্বেষণ করে; কিন্তু তাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তাঁরই গৌরবের যে অন্বেষণ করে, সে সত্যাশ্রয়ী, তার মধ্যে মিথ্যা নেই। [১৯] মোশি কি তোমাদের বিধান দিয়ে যাননি? অথচ তোমরা কেউই সেই বিধান পালন কর না। কেন আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছ?' [২০] সমবেত লোকেরা উত্তর দিল, 'আপনাকে একটা অপদূতে পেয়েছে! আপনাকে হত্যা করতে কে চেষ্টা করছে?' [২১] উত্তরে যিশু তাদের বললেন, 'আমি একটা কাজ করেছিলাম, আর তোমরা সকলে আশ্চর্য হচ্ছ। [২২] মোশি পরিচ্ছেদন করার নির্দেশ দিয়েছেন—অবশ্য এই প্রথার উৎপত্তি মোশির কাছ থেকে নয়, পিতৃপুরুষদেরই কাছ থেকে—আর তোমরা সাব্বাৎ দিনেও মানুষকে পরিচ্ছেদিত করে থাক। [২৩] মোশির বিধান যেন লঙ্ঘন না হয়, তার জন্য মানুষ যদি সাব্বাৎ দিনেও পরিচ্ছেদিত হয়, তবে আমি যে সাব্বাৎ দিনে একটি মানুষকে সর্বাঙ্গীণ সুস্থ করে তুলেছি, তাতে আমার উপর তোমাদের এত ক্ষোভ কেন? [২৪] বাইরের চেহারা দেখে বিচার না করে তোমরা বরং ন্যায় অনুসারেই বিচার কর!'

৭:১৫—ইহুদীরা আশ্চর্য হয়ে বলছিল… : সেইকালের ধারণা যে, বিজ্ঞ ধর্মগুরুর শিষ্যরূপে শিক্ষা না পেয়ে মানুষ শাস্ত্রবিদ্যা-উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত। কিন্তু যিশু ইহুদীদের এই ধারণা তুচ্ছ মনে করে ঘোষণা করেন, তাঁর শিক্ষা (অর্থাৎ জগতের কাছে তাঁর আত্মপ্রকাশ) পিতারই শিক্ষা। ইহুদীরা মনে করত, শুধু শাস্ত্রাধ্যয়নে, এমনকি মোশির বিধান অনুসারেই শাস্ত্রাধ্যয়নে মানুষ ঈশ্বরের বাণী ও ইচ্ছা অবগত হতে পারে, কিন্তু যিশু

এখন প্রচার করছেন, তিনিই সেই বাণী ও ইচ্ছার অনন্য প্রকাশকর্তা যিনি যেভাবে পিতার কাছে শিক্ষা পেয়েছেন ঠিক সেইভাবে তা প্রকাশ করেন।

৭:১৭—কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছুক হলে... : যেমন সাক্ষ্য-ক্ষেত্রে (৫ অধ্যায়) তেমনি এক্ষেত্রেও যিশুর শিক্ষা 'বাইরের চেহারা দে'খে' অর্থাৎ নিতান্ত মানবীয় ভাবে পরীক্ষা করা যায় না, বরং যিশুর কাজকর্ম ও বাণীর উপর বা তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্যদানকারী শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা বলতে প্রকৃতপক্ষে পুত্রের প্রতি বিশ্বাস রাখাই বোঝায় (৬:৪০); তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখায়ই বিশ্বাসীগণ বাস্তব ভ্রাতৃপ্রেমের মধ্য দিয়ে (১ যোহন ৩:১৮...) সত্যের সাধন করবে (৩:২১)।

৭:১৮—যে নিজে থেকে কথা বলে: ইহুদীরা নিজেদের গৌরব চায় বলে অবিশ্বাস্য। অপর দিকে যিশু পিতার সঙ্গে সর্বদা সংযুক্ত ও তাঁকে প্রকাশ করার জন্য ব্যস্ত বলে বিশ্বাসযোগ্য।

৭:১৯—মোশি কি তোমাদের বিধান দিয়ে যাননি? আগে বলা হয়েছিল, মোশি নিজে ইহুদীদের অভিযোক্তা বলে দাঁড়াবেন যেহেতু তারা শাস্ত্রের কথা বুঝতে পারেনি। এখন অন্য একটা কারণের উদয় হয়: ইহুদীরা তাঁর দেওয়া বিধানও মেনে চলে না বিধায় মোশি তাদের অভিযুক্ত করবেন। যদি ইহুদীরা সত্যিই মোশির শিষ্য হত তবে তারা মিথ্যা অভিযোগে যিশুকে অভিযুক্ত করত না, তাঁকে হত্যা করারও চেষ্টা করত না, কেননা যিশু অধর্ম নয়, পিতার গৌরবই মাত্র অন্বেষণ করেন; এবং তারা বুঝতে পারত সাব্বাৎ দিনে সাধিত সুস্থতাদানই বিধানের লঙ্ঘন নয় বরং ঈশ্বরের পরিত্রাণের বাস্তব অভিব্যক্তি। ইহুদী প্রথা অনুসারে সাব্বাৎ দিনে মানুষের পরিচ্ছেদন করা যেতে পারত পরিচ্ছেদন-রীতি ঈশ্বরের সঙ্গে মৈত্রী-সন্ধির প্রতীকস্বরূপ বিধায়। যে পরিচ্ছেদন মানব-শরীরের একটামাত্র অঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই পরিচ্ছেদন-কর্ম যখন সাব্বাৎ দিনেও

বিধেয়, তখন মানুষকে সর্বাঙ্গীণ সুস্থ করা কেমন করে অবৈধ হতে পারে? বাস্তবিকই, যিশুর একমাত্র কাজ হল মানুষকে সম্পূর্ণরূপেই পরিত্রাণ করা: রোগীকে আরোগ্যদান করায় (৫ অধ্যায়) যিশু এমন কাজ সাধন করেছিলেন যাতে পিতা রোগীর সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন যে-পাপ মানুষের অনন্য সত্যকার মারাত্মক ব্যাধি। সুতরাং, যিশুর কাজ যে শুধু মোশির বিধানের লঙ্ঘন ঘটায়নি তা নয়, বরং সেই বিধানকে পূর্ণ মাত্রায় পালন করেছে।

৭:২৪—বাইরের চেহারা দেখে বিচার না করে… : যিশু নিজে ন্যায়-বিচারকর্তা বলে এবং তাঁর নিজের ও পিতার কথা একই কথা বলে যিশুর কাজ গুরুত্বপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত তাৎপর্যমণ্ডিত। এজন্য ইহুদীদের পক্ষে নিজেদের বিচারে পিতা ও পুত্রের বিচার অনুসরণ করা দরকার, নইলে তারা নিজেরাই বিচারিত হবে। উপদেশ-শেষে যিশু তাঁর নিজের কথা ও তাঁকে বিশ্বাস করতে কঠিনভাবে সকলকে আহ্বান করেন।

যিশুর উদ্ভব (৭:২৫-৩৬)

৭ [২৫] তখন যেরুশালেমের কয়েকজন লোক বলতে লাগল, ‘এ কি সেই লোক
নয়, যাকে তারা হত্যা করতে চেষ্টা করছে? [২৬] দেখ, সে প্রকাশ্যেই কথা বলছে,
আর তারা একে কিছুই বলছে না। তবে এ যে সেই খ্রিষ্ট, সমাজনেতারা কি সত্যিই
তা জানতে পেরেছেন? [২৭] কিন্তু এ যে কোথা থেকে এসেছে, আমরা তা জানি;
আর খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন, তখন কেউ জানতে পারবে না, তিনি কোথা থেকে
আসেন।’ [২৮] তাই যিশু মন্দিরে উপদেশ দিতে দিতে জোর গলায় বলে উঠলেন,
‘তোমরা আমাকে জান বটে, আর আমি যে কোথা থেকে এসেছি, তাও জান। কিন্তু
আমি নিজে থেকে আসিনি, বরং সত্যকার যিনি, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন;
তাঁকেই তোমরা জান না। [২৯] কিন্তু আমি তাঁকে জানি, যেহেতু আমি তাঁরই কাছ
থেকে আগত আর তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন।’ [৩০] তারা তখন তাঁকে
গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ তাঁর গায়ে হাত দিল না, কারণ তাঁর ক্ষণ
তখনও উপস্থিত হয়নি। [৩১] তথাপি ভিড় করা লোকদের মধ্যে অনেকেই তাঁর

প্রতি বিশ্বাস রাখল; তারা বলছিল, ‘ইনি যে সমস্ত চিহ্নকর্ম সাধন করেছেন, খ্রিষ্ট যখন আসবেন, তখন তিনি কি তার চেয়ে বেশিই করবেন?’
[৩২] ফরিশীরা তাঁর সম্বন্ধে লোকদের এই সমস্ত বলাবলি শুনতে পেলেন, তাই প্রধান যাজকেরা ও ফরিশীরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এক দল প্রহরীকে পাঠালেন।
[৩৩] তখন যিশু বললেন, ‘আমি কিছুকাল তোমাদের সঙ্গে আছি, পরে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে ফিরে যাব। [৩৪] তোমরা আমাকে খুঁজবে, কিন্তু আমার সন্ধান পাবে না; আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমরা আসতে পার না।’ [৩৫] তখন ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, ‘সে এমন কোথায় যাবার অভিপ্রায় করছে যে, আমরা তাঁকে খুঁজে পাব না? সে কি গ্রীকদের মধ্যে সেই প্রবাসী ইহুদীদের কাছে গিয়ে গ্রীকদের ধর্মশিক্ষা দিতে চায়? [৩৬] তোমরা আমাকে খুঁজবে, কিন্তু আমার সন্ধান পাবে না—এই যে কথা সে বলল, তার অর্থ কী?’

যেরুশালেমের কয়েকজন লোক তাঁর বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করত, সেই কথায় ভিত্তি করে যিশু আত্মপ্রকাশমূলক উপদেশ দেন, যে-উপদেশ শুধু সেইকালের জন্য নয়, সবসময়ের জন্যই গ্রহণযোগ্য।

৭:২৮—তোমরা আমাকে জান বটে: যে-জনতা তাঁর উদ্ভব জানে বলে মনে করে, যিশু পুরাতন নিয়মকালের নবীদের মত মুক্তকণ্ঠে ও নির্ভীকভাবে উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করেন যে, তারা তাঁর নিজের সত্তা ও প্রকৃত উদ্ভব আদৌ জানে না। তিনি নিজে থেকে নয়, অন্যত্র থেকেই আগত, কেননা অন্য একজনের প্রেরিতজন। তাঁর প্রকৃত উদ্ভব এজগৎ থেকে নয় বরং সেই সত্যময় প্রেরণকর্তা ঈশ্বর থেকে বিধায় যিশু নিজে থেকে নয়, ঈশ্বর থেকেই আগত। অবিশ্বাসীরা প্রেরণকর্তাকে জানে না বলে যিশুকেও জানে না এবং একাধারে পিতাকেও জানে না যিশুকে জানে না ব’লে। কেবল বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁকে ঈশ্বরের প্রেরিতজনরূপে মানলে তবেই মানুষ তাঁর সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান পাবে, যে-জ্ঞান তাঁর সঙ্গে মিলনের নামান্তর (১০:১৪…)।

৭:২৯—আমি তাঁকে জানি : ঈশ্বর থেকে আগত বলে, তাঁর প্রেরিতজন বলে এবং তাঁর বাধ্যতা ও ভালবাসার বন্ধনে পুত্র হয়ে পিতার সঙ্গে সদা-সংযুক্ত বলে (৫:২৭, ৪২) যিশু ঈশ্বরকে জানেন। অপর দিকে ইহুদীরা যদিও অবিরত ঐশবাণী অধ্যয়নে রত থাকে তবুও ঈশ্বরকে জানে না। পুরাতন নিয়মের নবীগণও এই একই অভিযোগে ইহুদীদের অভিযুক্ত করেছিলেন।

৭:৩০—তারা তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করল : নিজেদের অবিশ্বাসে ইহুদীরা আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না, কারণ ঈশ্বরের নির্ধারিত ক্ষণ এখনও আসেনি যে-ক্ষণ যিশু ক্রুশে উত্তোলিত হয়ে জগৎকে পরিত্রাণ করবেন। ঈশ্বর তাঁর প্রেরিতজনকে রক্ষা করে থাকেন, অসময় তাঁর বিরুদ্ধে অনিষ্ট কিছুই করার চেষ্টা বৃথা কাজ।

৭:৩১—ইনি যে সমস্ত চিহ্নকর্ম সাধন করেছেন : এখানে যোহন অনুযায়ী ‘চিহ্নকর্ম’ ধারণাটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় : চিহ্নকর্মগুলো যিশুর মাহাত্ম্য উত্তমরূপেই প্রকট করে, তাঁকে খ্রিষ্ট (মশীহ) ও ঈশ্বরপুত্র বলে প্রকাশ করে। জনসাধারণের মধ্যে সরল লোকদের মত যারা সেগুলো বিষয়ে উন্মুক্ত মনে ধ্যান করে তারা স্বীকার করে যে, সত্যিই যিশু ঈশ্বর থেকে আগত এবং যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখার জন্য পথ খুঁজে পায় (৩:২; ৯:১৬, ৩২ … ; ১০:২১, ৪১ …)।

৭:৩৩—আমি কিছুকাল তোমাদের সঙ্গে আছি : যিশু এখনও আত্মপরিচয় দিতে থাকেন : প্রেরণকর্তার কাছে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ গৌরবায়নের পথে চলাই তাঁর লক্ষ্য। তাঁর আপনজনদের পক্ষে তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তাদের জন্য গৌরব ও পিতার অভিমুখে সেই পথ উন্মুক্ত : যিশুর চিন্তা-ভাবনা পিতায় ও তাঁর ইচ্ছা পালনে কেন্দ্রীভূত, আর তা হওয়া উচিত খ্রিষ্টমণ্ডলীর বেলায়ও।

৭:৩৪—তোমরা আমাকে খুঁজবে: ইহুদীরা ঠিক সময় তাঁকে অনুসরণ করেনি ও ঠিক জায়গায় তাঁকে খোঁজেনি বলেই যিশুর সন্ধান পাবে না। যে-জনগণ বিশ্বাসের সঙ্গেই ঈশ্বর-অন্বেষী জনগণরূপে ঈশ্বর দ্বারা মনোনীত হয়েছিল, সেই ইস্রায়েল জনগণের অবিশ্বাস ও নির্বুদ্ধিতার ইতিহাস যিশুর উল্লিখিত উক্তি দ্বারা বিচারিত হয়; তাদের পক্ষে যিশুতেই ঈশ্বরের অনুসন্ধান করা ও পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের প্রেরিতজনের প্রতি বিশ্বাস রাখেনি বিধায় ঈশ্বরকেও হারিয়ে ফেলেছে: তারা নিজেদের পাপে থেকে মরবে (৮:২১)।

বিশ্বাসীর অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত: তার পক্ষে যিশুর চলে যাওয়াটা দুঃখজনক বটে, অথচ বিশ্বাসের সঙ্গে সে নিশ্চিত যে, যিশু যেখানে আছেন সেখানে সেও একদিন যাবে: বিশ্বাসীর কাছে পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত।

৭:৩৫—সে এমন কোথায় যাবার অভিপ্রায় করছে যে… : যিশুর বাণী শোনা সত্ত্বেও ইহুদীরা কেমন যেন নিয়মিতভাবেই সেই বাণীর গভীর তাৎপর্য গ্রহণ করতে অসমর্থ। বর্তমানকালেও অবিশ্বাসীর কাছে যিশুর বাণী বোধের অতীত। তারা পরিহাসের খাতিরে কল্পনা করে যিশু গ্রীক বিধর্মীদের মাঝে প্রচার করতে যাবেন এবং বুঝে উঠতে পারে না যে তাদের কথা পরিহাস নয়, প্রকৃতপক্ষে সেই বাণী এমন এক ভাববাণীতেই পরিণত হল যা পূর্ণতা লাভ করার কথা, কেননা খ্রিষ্টমণ্ডলীর বাণীপ্রচারকেরা সত্যিই বিধর্মীদের মাঝে যিশুর কথা বহন করলেন এবং বিধর্মীরা সানন্দেই তাঁকে গ্রাহ্য করল: এর প্রমাণ হল যোহনের গ্রীক-জাতীয় স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলী!

জীবনময় জলের উৎস যিশু (৭:৩৭-৫২)

৭ [৩৭] পর্বের শেষ দিনে, অর্থাৎ উৎসবের প্রধান দিনে, যিশু দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে
বলে উঠলেন, 'কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক; [৩৮] যে
আমার প্রতি বিশ্বাসী—শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে—জীবনময় জলের নদনদী তার
অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে।' [৩৯] তিনি আত্মা সম্বন্ধেই একথা বলেছিলেন, সেই যে

আত্মাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মানুষদের পাবার কথা; কারণ আত্মা তখনও ছিলেন না, যেহেতু যিশু তখনও গৌরবান্বিত হননি।
[৪০] এই সকল কথা শুনে ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ বলতে লাগল, 'ইনি সত্যিই সেই নবী!' [৪১] কেউ কেউ আবার বলল, 'ইনিই সেই খ্রিষ্ট।' কিন্তু কেউ কেউ বলল, 'তবে খ্রিষ্ট কি গালিলেয়া থেকে আসবেন? [৪২] শাস্ত্রে কি একথা নেই যে, খ্রিষ্ট দাউদের বংশধর; এবং দাউদের আদি বাসস্থান সেই বেথলেহেম গ্রাম থেকেই তিনি আসবেন?' [৪৩] এভাবে ভিড়ের মধ্যে তাঁর কথা নিয়ে মতভেদ দেখা দিল।
[৪৪] তাদের কয়েকজন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চাইল, কিন্তু কেউই তাঁর গায়ে হাত দিল না। [৪৫] তখন সেই প্রহরীরা প্রধান যাজকদের ও ফরিশীদের কাছে ফিরে গেল; তাঁরা ওদের বললেন, 'তোমরা তাকে আননি কেন?' [৪৬] তারা উত্তর দিল, 'উনি যেভাবে কথা বলেন, কোনও মানুষ কখনও সেভাবে কথা বলেনি।' [৪৭] তাতে ফরিশীরা তাদের বললেন, 'তোমাদেরও ভ্রষ্ট করা হয়েছে নাকি? [৪৮] সমাজনেতাদের মধ্যে কিংবা ফরিশীদের মধ্যে কেউ কি তাঁকে বিশ্বাস করেছেন? [৪৯] সেই সাধারণ লোকেরা কিন্তু, যারা বিধান জানে না, তারা তো অভিশপ্ত!' [৫০] নিকোদেম, যিনি আগে তাঁর কাছে এসেছিলেন ও তাঁদের একজন ছিলেন, তাঁদের বললেন, [৫১] 'কারও বক্তব্য আগে না শুনে ও সে যে কী করে, তা না জেনে নিয়ে, আমাদের বিধান কি কোনও মানুষের বিচার করে?' [৫২] তাঁরা এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আপনিও কি গালিলেয়ার মানুষ নাকি? অনুসন্ধান করুন! দেখবেন, গালিলেয়া থেকে কোন নবীর আবির্ভূত হওয়ার কথা নয়।'

এই উদ্ধৃতাংশই ৭ অধ্যায়ের শীর্ষস্থান। এখানে যিশুর উচ্চারিত বাণী প্রবল শক্তিজনক, এমনকি একথা বলা চলে যে, যোহনের সুসমাচারে গৃহীত যিশুর সকল বাণীর মধ্যে এটিই সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ী বাণী। জীবনের উৎস বলে তাঁর কাছে যাওয়া, যিশুর এই আহ্বান এখনও সকল বিশ্বাসীর অন্তরে প্রতিধ্বনিত হতে চলেছে এবং যুগযুগান্তরেও চলবে।

৭:৩৭—পর্বের শেষ দিনে… : পর্বের পবিত্রতম মুহূর্তে যখন সিলোয়াম ঝরনা থেকে জল তোলা হয় ও যজ্ঞ-বলিদানের বেদির চতুর্দিকে শোভাযাত্রাসহ পরিক্রমা করা হয়, তখনই সেইখানে যিশু দাঁড়িয়ে আছেন: ঐশপ্রকাশকর্তা হিসাবে তিনি গাম্ভীর্যের সহিত উচ্চকণ্ঠে নিজের বাণী ঘোষণা করেন, যেন সেই বাণী জগতের সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত ও সর্বযুগ ধরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বিশ্বজগৎ ও সর্বকালের মানুষকে তাঁর কাছে আসতে ও পান করতে আহ্বান করেন, সকলকেই তিনি পরিত্রাণ দান করবেন, তৃষ্ণার্ত যারা তারা পান করুক অর্থাৎ বিশ্বাসীদের পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করা প্রয়োজন। তৃষ্ণার্ত যারা তারা যিশুর কাছে পান করুক, তিনিই সেই জীবনময় জলের ঝরনা যা থেকে 'নদনদী' প্রবাহিত। পুরাতন নিয়মকাল থেকেও নবীগণ 'জল' ও 'নদীর' প্রতীক প্রয়োগ করে পরিত্রাণ ও পবিত্র আত্মার কাল বর্ণনা করতেন:

> তোমরা আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
> পরিত্রাণের উৎসধারা থেকে। [ইশা ১২:৩]
>
> ওহে, তৃষিত লোকসকল, জলের কাছে এসো। [ইশা ৫৫:১]

ঐশপ্রকাশ পুস্তকেও একই ধারণা ব্যবহৃত:

> তারা আর কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, তৃষ্ণার্তও হবে না; রোদ বা কোন কিছুর উত্তাপ তাদের আর কখনও আঘাত করবে না, কেননা যিনি সিংহাসনের মাঝখানে রয়েছেন, সেই মেষশাবক নিজেই হবেন তাদের পালক। [প্রকাশ ৭:১৬…]
>
> যে তৃষ্ণার্ত, আমিই তাকে জীবন-জলের উৎস থেকে বিনামূল্যে জল দেব। [প্রকাশ ২১:৬]
>
> পরে তিনি আমাকে জীবন-জলের নদী দেখালেন…,
> নদী ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকেই উৎসারিত…।
> যে তৃষ্ণার্ত, সে আসুক;
> যে চায়, সে বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ করুক। [প্রকাশ ২২:১, ১৭]

৭:৩৮ক—জীবনময় জলের নদনদী: এবিষয়ে সম্পর্কিত পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নানা উদ্ধৃতাংশের একটা তালিকা দেওয়া যাক:

১। সিলোয়াম ঝরনা থেকে জল তোলার সময়ে নবী ইশাইয়ার একথা ঘোষিত ছিল: 'তোমরা আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে পরিত্রাণের উৎসধারা থেকে' (ইশা ১২:৩); সেইকালেও এই বাণী ঐশআত্মাকে নির্দেশ করত।

২। নবী ইশাইয়ার এ ভাববাণীও ঐশআত্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে পরিগণিত ছিল: 'আমি তৃষাতুর ভূমির উপরে জল, ও শুষ্ক মাটির উপরে খরস্রোত প্রবাহিত করব' (ইশা ৪৪:৩)।

৩। মরুপ্রান্তরে শৈল থেকে নির্গত জলের সঙ্গেও সম্পর্ক বর্তমান: 'শৈল থেকে বের করে আনলেন কত জলস্রোত, নদনদীর মতই বইয়ে দিলেন জল' (সাম ৭৮:১৬)।

৪। ভাবীকালীন যেরুশালেমের জন্য প্রতিশ্রুত মন্দিরের ঝরনার সঙ্গেও মিল রয়েছে (এজে ৪৭:১-১২; জাখা ১৩:১), 'সেইদিন এমনটি হবে যে, যেরুশালেম থেকে জীবনময় জল নির্গত হয়ে…' (জাখা ১৪:৮): এতে এধারণা সূচিত হয় যে, যেরুশালেম জগতের কেন্দ্রস্থলস্বরূপ এবং সকল জাতির জন্য ঐশআশীর্বাদের উৎস। এই সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, জীবনময় জলের উৎস-যিশুতেই ইস্রায়েল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাসকল সিদ্ধিলাভ করে: তিনিই সেই পবিত্র শৈল যার কাছে গেলে তৃষ্ণার্ত মানুষ জীবনময় জল পান করে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না (৪:১৪; ৬:৩৫); তিনিই সেই জলের উৎস যা থেকে স্বর্গধামের নদনদীর মত অফুরন্ত ও প্রাচুর্যপূর্ণ নদী নির্গত হয়। এখন মন্দিরের ও তার ঝরনার আর প্রয়োজন নেই, কেননা তিনিই সেই নদনদীর উৎস এবং মেষশাবক হয়ে তিনিই চরমকালের মন্দির, যে-মন্দির থেকে জীবন-জলের নদনদী নির্গত হয় (প্রকাশ ২১:২২; ২২:১-১৭); তিনিই পবিত্র আত্মার প্রদানকর্তা।

৭:৩৮খ—তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে: শাস্ত্রের এই বাণীর সরলার্থ হল, যিশু নিজে পবিত্র আত্মার প্রদানকর্তা। তথাপি যোহন অন্য একটা বিশিষ্ট তাৎপর্যের দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন: সৈন্যের বর্শার আঘাতে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর পাশ থেকে জল ও রক্ত নিঃসৃত হল। জল পাবার জন্য মোশি দু' বারই শৈল আঘাত করেছিলেন (গণনা ২০:২১), অপর দিকে যিশুর পাশ থেকে সঙ্গে সঙ্গেই জল আর রক্ত নিঃসৃত হল: জল ও রক্ত দু'টোই ক্রুশে উত্তোলিত গৌরবান্বিত যিশু থেকে লব্ধ পরিত্রাণের প্রতীক-চিহ্ন: যথার্থই, তাঁর পাশ থেকে জীবনময় জলের নদনদী অর্থাৎ পবিত্র আত্মাই প্রবাহিত। এই ব্যাখ্যা পরবর্তী পদ দ্বারা সত্য বলে স্বীকৃতি পায়:

৭:৩৯—তিনি আত্মা সম্বন্ধেই একথা বলেছিলেন, সেই যে আত্মাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মানুষদের পাবার কথা; কারণ আত্মা তখনও ছিলেন না, যেহেতু যিশু তখনও গৌরবান্বিত হননি: জীবনকালে যিশু যে-সকল কথা ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেগুলো শুধু তাঁর গৌরবপ্রকাশের পরেই গুপ্ত অর্থ অনুসারে পূর্ণতা লাভ করে ও কার্যকর হয়ে ওঠে। বিশ্বাসীকে যে-জীবনদানের প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, পিতার কাছে ফিরে গেলে ও তাঁর দ্বারা গৌরবান্বিত হলে পর সেই জীবন দান করবেন (১৯:১…)। সুতরাং, 'জীবনময় জলের নদনদী' পবিত্র আত্মাকে নির্দেশ করে এবং 'আত্মা' ও 'জীবন' শব্দ দু'টো খুবই ঘনিষ্ঠ শব্দ বলে অনুধাবন করা প্রয়োজন (৬:৬৩, ৬৮)। কিন্তু, জীবনদায়ী ও অধিকারদায়ী আত্মাকে শুধু যিশুর পুনরুত্থানের পর শিষ্যদের দেওয়া হবে (২০:২২)। পুনরুত্থানের আগেও যিশু অবশ্যই আত্মাবহনকারী (১:৩২…), তবু বিশ্বাসীগণ পরেই তাঁকে পাবে: তখনই তারা একমাত্র উৎস সেই গৌরবান্বিত যিশু থেকে অবিরতই পরিত্রাণ-জল তুলে আনতে পারবে। এ সকল কথা সুসমাচারের বর্তমানকালীন পাঠকের পক্ষে বাস্তব হয়ে উঠেছে।

৭:৪০—এই সকল কথা শুনে ভিড়ের মধ্যে… : এখানে ব্যক্ত হয় যিশু বিষয়ে সেইকালের লোকদের মতভেদ। যোহন বলতে চান, সেইকালের মানুষ যিশুকে

অপেক্ষিত ত্রাণকর্তারূপে জানতে পারত, কিন্তু ইহুদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ যিশুকে গ্রহণের জন্য নতুন নতুন আপত্তি সবসময় সৃষ্টি করতে থাকল: তাদের প্রকৃত দোষ এই যে, তারা অবিশ্বাসী ছিল।

৭:৪৫—প্রহরীরা প্রধান যাজকদের ও ফরিশীদের কাছে··· : প্রহরীদের মত সরল লোকে স্বীকার করে, যিশু অসাধারণ ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি; তারা তাঁর বাণী দ্বারা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছে। কিন্তু তাদের নেতারা অন্ধ নেতা হওয়ায় (মথি ২৩:১৩) তারা বিশ্বাস থেকে বহিষ্কৃত, এমনকি নেতাদের নিজেদের মধ্যেও যদি নিকোদেমের মত একজন সাহসের সঙ্গে বিধানের বিষয়ে তাদের বিরুদ্ধাচরণ উদ্ঘাটন করেন তারা তাঁকে নীরব থাকতে বলে। যারা যিশুর ঐশউদ্ভব অমান্য করে তারা তাঁর দীনহীন আবির্ভাব লজ্জাকর মনে করে: শুধু বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই মানবীয় বিচারবুদ্ধিজনিত আপত্তি ও বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যেতে পারে।

ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক (৭:৫৩–৮:১১)

শাস্ত্রবিদ সকলে একমত হয়ে বলেন যে, যোহনের সুসমাচারের এই কাহিনী যোহনের প্রকৃত রচনা নয়। কিন্তু কথার অর্থ এই নয় যে, এজন্য কাহিনীটি পবিত্র শাস্ত্র থেকে বহিষ্কৃত করা উচিত, বরং যোহনের লেখা না হলেও পবিত্র শাস্ত্রের প্রকৃত অঙ্গ হওয়ায় একথাও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণাপূর্ণ, সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য। এক্ষেত্রে একমাত্র অসুবিধা এই যে, ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ের মধ্যকার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। এখানে এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা খুবই সংক্ষিপ্ত হবে।

৭ [৫৩] তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেল,

৮ [১] কিন্তু যিশু জৈতুন পর্বতে গেলেন। [২] ভোরবেলায় তিনি আবার মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন, আর সমস্ত জনগণ তাঁর কাছে আসতে লাগল; তিনি সেখানে আসন নিয়ে তাঁদের উপদেশ দিতেন। [৩] শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা একজন স্ত্রীলোককে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন, যাকে ব্যভিচারের ব্যাপারে ধরা হয়েছিল। তাকে মাঝখানে

দাঁড় করিয়ে [৪] তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘গুরু, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার করার সময়ে ধরা পড়েছে; ৫ এবং বিধানে মোশি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, এই ধরনের মেয়েদের পাথর ছুড়ে মারা হবে। তবে আপনি কী বলেন?’ [৬] তাঁকে যাচাই করার জন্যই তো তাঁরা একথা বলেছিলেন, যেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার মত কোন একটা সূত্র পেতে পারেন। কিন্তু যিশু নিচু হয়ে মাটিতে আঙুল দিয়ে লিখতে লাগলেন। [৭] আর যেহেতু তাঁরা কথাটা বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন, সেজন্য তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের বললেন, ‘আপনাদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ, তিনি-ই প্রথমে একে পাথর ছুড়ে মারুন।’ [৮] আবার নিচু হয়ে তিনি আঙুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। [৯] তাঁর একথা শুনে তাঁরা বৃদ্ধ থেকে শুরু করে শেষজন পর্যন্ত একে একে চলে গেলেন। তখন মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির সঙ্গে কেবল যিশু একা রইলেন। [১০] যিশু মাথা তুলে তাকে বললেন, ‘নারী, ওঁরা কোথায়? কেউ কি তোমাকে দণ্ডিত করেনি?’ [১১] সে বলল, ‘না, প্রভু, কেউ করেনি।’ আর যিশু বললেন, ‘আমিও তোমাকে দণ্ডিত করব না। এবার যাও; এখন থেকে আর পাপ করো না।’

যিশু জটিল সমস্যার সম্মুখীন: হয় তাঁর প্রচারিত দয়ার মনোভাব অস্বীকার করবেন, না হয় মোশির বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করবেন। যে ইহুদীরা জনতার সামনে যিশুকে দোষী সাব্যস্ত করতে চায় তারা এখন খুব খুশি। কিন্তু যিশু তাদের প্রশ্নে প্রত্যক্ষ উত্তর না দিয়ে আনত হয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। সম্ভবত যিশুর এই অসাধারণ আচরণ উপস্থিত সকলের কাছে নবী যেরেমিয়ার এই বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে, পাপীদের নাম ধুলায় লেখা হবে (যেরে ১৭:১৩)। সুতরাং যিশু সকলকে স্মরণ করান যে, ঈশ্বরের দরবারে সকল মানুষ দোষী, এমনকি এক্ষেত্রে তাঁর নিজের কথা অধিক স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, ‘আপনাদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ, তিনি-ই প্রথমে একে পাথর ছুড়ে মারুন।’ পাপী বলে কোন মানুষের অন্য মানুষকে বিচার করার অধিকার নেই: শুধুমাত্র ঈশ্বরই বিচারকর্তা। উপস্থিত সবাই বুঝল ও চলে গেল, কেবল দয়ার সাগর যিশু ও সেই দয়াকাংক্ষিণী স্ত্রীলোক রইল: বস্তুত যিশু ঐশদয়াবহনকারী, ঈশ্বরের অসীম করুণা ও দয়া জানেন বিধায় তিনি বিচার নয়, ক্ষমাই করেন।

৮:১১—এবার যাও; এখন থেকে আর পাপ করো না: কিন্তু, ঈশ্বরের দেওয়া ক্ষমার লক্ষ্যই আমরা যেন ভবিষ্যতে পবিত্র জীবন যাপন করি; ঈশ্বর যখন কাউকে দণ্ডিত করেন না তখন এর কারণ হল যে, যা বিলীন হয়েছে তা তিনি ত্রাণ করতে চান, এবং যিশুর আচার-ব্যবহারে ঠিক ঈশ্বরের এই দয়াপূর্ণ ভালবাসা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়।

যিশুই জগতের আলো (৮:১২-২০)

৮ [১২] আবার যিশু তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আমিই জগতের আলো: যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে।' [১৩] তাতে ফরিশীরা তাঁকে বললেন, 'আপনি নিজের বিষয়ে নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন; আপনার সাক্ষ্য যথার্থ নয়।' [১৪] যিশু তাঁদের উত্তর দিলেন, 'যদিও আমি নিজের বিষয়ে নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, তবু আমার সাক্ষ্য যথার্থ, কারণ আমি জানি কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি, কিন্তু আপনারাই জানেন না আমি কোথা থেকে আগত আর কোথায় যাচ্ছি। [১৫] আপনাদের বিচার মাংস অনুসারেই বিচার; আমি কারও বিচার করি না, [১৬] আর যদিও বা বিচার করি, আমার বিচার যথার্থ, কারণ আমি একা নই: যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গে আছেন। [১৭] আপনাদের বিধানে লেখা আছে যে, দু'জনের সাক্ষ্য যথার্থ সাক্ষ্য। [১৮] আমি নিজের বিষয়ে নিজেই সাক্ষ্য দিই, আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই পিতাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।' [১৯] তাই তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আপনার পিতা কোথায়?' যিশু উত্তর দিলেন, 'আপনারা আমাকেও জানেন না, আমার পিতাকেও জানেন না। যদি আমাকে জানতেন, তবে আমার পিতাকেও জানতেন।' [২০] মন্দিরে উপদেশ দানকালে যিশু কোষাগার-মহলে এই সমস্ত কথা বলেছিলেন। কেউ তাঁকে গ্রেপ্তার করল না, কারণ তাঁর ক্ষণ তখনও উপস্থিত হয়নি।

৮:১২—আমিই জগতের আলো: যিশুর এ উক্তি পর্ণকুটির পর্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কেননা সেই পর্ব উপলক্ষে আলোরও প্রধান ভূমিকা ছিল। সন্ধ্যাকালে মন্দিরের মধ্যাঙ্গনে ছ'টা বিরাট সোনার লণ্ঠন স্থাপন করা হত এবং সেগুলিতে ৬৫ কেজি তেল ঢালা হত। এ লণ্ঠনগুলোর আলো যেরুশালেমের প্রতিটি প্রাঙ্গণে আলোকোজ্জ্বল করত; এর মধ্যে সমবেত জনগণ নৃত্যগীত করতে করতে গভীর উল্লাস করত। এই প্রজ্বালন দিয়ে ইহুদীরা সেই আলোময় মেঘ বা অগ্নিস্তম্ভের কথা স্মরণ করতে চাইত যেগুলো মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে ভ্রমণকালে ঈশ্বরের সহায়তা ও রক্ষাকারী উপস্থিতির দিকে নির্দেশ করত (যাত্রা ১৩:২১-২২)। সেইকাল থেকে ইস্রায়েল জনগণ ঈশ্বরকে আপন আলো ও পরিত্রাণ বলে স্বীকার করত (সাম ২৭:১, ৫) এবং তিনি যে মশীহ-কালে ইস্রায়েলের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজের গরিমার জ্যোতির্ময় প্রদর্শনের মাধ্যমে আপন মহাশক্তি প্রকাশ করবেন এই ঘটনার অপেক্ষায়ই তারা ছিল। নবী ইশাইয়া এমন ভাববাণী ঘোষণা করেছিলেন যা অনুসারে প্রভুর কষ্টভোগী দাস জাতিসকলের আলো হবেন, আর তখন জগতের সমস্ত জাতি শোভাযাত্রাসহ আলোর নগরী সেই যেরুশালেম অভিমুখে ছুটে চলবে (জাখা ১৪); সেখানে বিধর্মী ও ইস্রায়েলীয় উভয় জাতি মিলে ঈশ্বরের নব-জনগণ হয়ে উঠবে (প্রকাশ ৭), এবং তাঁর গৌরব প্রদীপস্বরূপ মেষশাবকের মধ্য দিয়েই তাদের উপর আলোকপাত করবে (প্রকাশ ২১:২৩)। এই সকল প্রতীক ও গভীর আকাঙ্ক্ষার সম্মুখীন হয়ে যিশু নিজেকেই জগতের আলো বলে ঘোষণা করেন: এখন থেকে জগতের জন্য একটা আলো মাত্র জাজ্বল্যমান বিধায় ইহুদীদের আকাঙ্ক্ষা অতিক্রম করা হয় এবং অন্য সকল আলো নিভে যায়। যিশু আদি থেকেই মানুষের আলো (১:৪) ছিলেন বটে, তবু মাংসে তাঁর ঐতিহাসিক আগমনে তাঁর আলো-ভূমিকা যে অনন্য ও বিশিষ্ট তা উত্তমরূপে প্রকাশিত হয় (১:৯)। যারা তাঁর ঐশপ্রকাশের বাণী শোনে তারা তাঁর অনুসরণ করতে ও আলোর সন্তান হতে আহূত (১২:৩৬)। যিশুর অনুসরণ করা মানে বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকা ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গৌরবের দিকে তাঁর অনুসরণ করা (১২:২৬)। বা অন্য কথায়, তাঁর অনুসরণ করাই হল বিশ্বাস ও বাধ্যতার মধ্য দিয়ে ঐশপ্রকাশকর্তার বাণী শুনে মেনে চলা। এই শর্তে মৃত্যুর বশীভূত মানুষ সঠিক দিকের সন্ধান পায়, কেননা যিশু তাকে আলোময় ঐশলোকে

উন্নীত করেন (১ যোহন ১:১৭), যে-আলোতে প্রকৃত জীবন অর্থাৎ ঈশ্বরের নিজের অনন্ত জীবন লভ্য: বাস্তবিকপক্ষে, আলোস্বরূপ যিশু হলেন জীবনের আলো। এ সকল কথা ভাবীকালে নয়, ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয় এবং চিরকালের মত পূর্ণ হয়ে থাকবে। সুতরাং যিশুর এ বাণী হল মানুষের কাছে একটা আহ্বান যাতে যিশুর অনুসরণে সে জাগতিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গন্ডি থেকে বের হয়, কেননা শুধু যিশু ক্রুশে তাঁর উত্তোলন-গৌরবায়নে নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে সক্ষম।

স্মরণযোগ্য যে, এখানে ব্যবহৃত 'আলো' ও 'অন্ধকার' শব্দ দু'টো পুরাতন নিয়ম ছাড়া কুম্রান ও গ্রীক জ্ঞানমার্গের ঐতিহ্যেও ব্যবহৃত ছিল; এর ফলে একথা প্রমাণিত হয় যে, এ সকল শব্দ ব্যবহার করায় ও এগুলোর উপর খ্রিষ্টীয় নবীন তাৎপর্য আরোপ করায় যোহন সেইকালের মানুষের কাছে নিজের খ্রিষ্টীয় ধারণাকে অর্থপূর্ণ, আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করে তুলতে চাইলেন।

৮:১৩—তাতে ফরিশীরা তাঁকে বললেন: আগেকার মত ইহুদীরা যিশুর আত্মপ্রকাশ অস্বীকার করে। কিন্তু তিনি নিজেকে পরাজিত মনে না করে প্রমাণ করেন যে তাঁর বিষয়ে তাঁর আত্মসাক্ষ্যই কেবল যথার্থ সাক্ষ্য, কেননা কোন মানুষেরই এমন ক্ষমতা নেই যাতে তাঁর বিষয়ে কিছু জানতে পারে। তিনি কিন্তু নিজের বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন, কেননা তিনি পিতা থেকে আসেন এবং নিজের জীবনের লক্ষ্য জানেন। সেইকালের মানুষের কাছে এই তিনটিই ছিল জীবন-জিজ্ঞাসা: আমি কে, কোথা থেকে এলাম এবং কোথায় যাচ্ছি। নিজের উত্তরে যিশু এ তিনটি জিজ্ঞাসা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সুতরাং তিনিই সত্যি জগতের জন্য জীবনের আলো।

৮:১৫—আপনাদের বিচার মাংস অনুসারেই বিচার: ইহুদীদের মত যারা তাঁর প্রতি অবিশ্বাসী, তারা গর্বোদ্ধত এবং অন্ধ মানুষ হলেও যিশুকে বিচার করতে চায়, তবু তিনি তাদের বিচার করেন না কেননা জীবনকালে তাঁর ভূমিকা হল ত্রাণকর্মই সাধন করা। তা সত্ত্বেও অবিশ্বাসীদের পক্ষে তাঁর পরিত্রাণদায়ী শুভসংবাদ প্রাণদণ্ডে পরিণত

হয়: তারা অন্ধকারে ও মৃত্যুতে চিরকাল থাকবে। পিতা ঈশ্বর সঙ্গে আছেন এবং তাঁর মাধ্যমে কথা বলেন বিধায় এ দণ্ডবিচার সত্য: পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ঐক্য হল যিশুর যাবতীয় কাজের ভিত্তি এবং সেই কাজকে সত্য বলে সমর্থন করে। এইভাবে ইহুদীদের আপত্তিতে পুত্র ও পিতার সাক্ষ্যই প্রতিবাদ করে: ঈশ্বরের প্রেরিতজনরূপে তাঁর আত্মসাক্ষ্য সম্পূর্ণ সত্য, পিতাই তাঁর মধ্য দিয়ে কথা বলেন বিধায়। অপর দিকে ঈশ্বরের প্রেরিতজন বলে তিনি পিতা থেকে বিচ্ছিন্নও বলে বিবেচনাযোগ্য, এর ফলে তাঁর আত্মসাক্ষ্যের তুলনায় পিতার সাক্ষ্য নতুন এক সাক্ষ্যই বলে গ্রহণযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আসল সমস্যা এই যে, যিশুর পক্ষে যিনি বাস্তব ও প্রত্যক্ষ, ইহুদীদের পক্ষে সেই ঈশ্বর অদৃশ্যমান; যথার্থই, যিশুকে অস্বীকার করায় তারা পিতাকেও জানতে পারে না। একারণেই যিশু 'আপনার পিতা কোথায়?' তাদের এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেন না: পুত্রকে গ্রাহ্য না করলে কেউই পিতাকে দেখতে, শুনতে, সম্মান করতে, এমনকি তাঁর সঙ্গে জীবন্ত সংযোগে সংযুক্তও হতে পারে না। যিশুকে অস্বীকার হেতু ইহুদীধর্ম আর পরিত্রাণদায়ী নয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্ত ও প্রত্যক্ষ সহভাগিতার পথ নয়।

ইহুদীদের সঙ্গে তর্ক (৮:২১-২৯)

৮ [২১] তিনি আবার তাঁদের বললেন, 'আমি চলে যাচ্ছি, আর আপনারা আমাকে খুঁজবেন ও আপনাদের নিজেদের পাপে থেকে মরবেন। আমি যেখানে যাচ্ছি, আপনারা সেখানে আসতে পারেন না।' [২২] তখন ইহুদীরা বললেন: 'ও কি আত্মহত্যা করবে? ও যে বলছে, আমি যেখানে যাচ্ছি, আপনারা সেখানে আসতে পারেন না।' [২৩] তিনি তাঁদের বললেন, 'আপনারা নিম্নলোকের, আমি ঊর্ধ্বলোকের; আপনারা এই জগতের, আমি এই জগতের নই। [২৪] আমি তো আপনাদের বলেছি, আপনাদের নিজেদের পাপে থেকেই মরবেন, কারণ আপনারা যদি না বিশ্বাস করেন যে, আমিই আছি, তবে আপনাদের নিজেদের পাপে থেকে মরবেন।' [২৫] তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আপনি কে?' যিশু তাঁদের উত্তর দিলেন, 'আপনাদের যা বলে আসছি, তা-ই। [২৬] আপনাদের বিষয়ে আমার অনেক কিছু বলার ও বিচার করার আছে। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি সত্যময়, ও

তাঁরই কাছে আমি যা কিছু শুনেছি, জগতের সামনে তা-ই বলে থাকি।’ [২৭] তাঁরা বুঝতে পারলেন না যে, তিনি পিতারই সম্বন্ধে তাঁদের কাছে কথা বলছিলেন। [২৮] তাই যিশু বললেন, ‘আপনারা যখন মানবপুত্রকে উত্তোলন করবেন, তখন জানতে পারবেন যে, আমিই আছি, আর আমি নিজে থেকে কিছুই করি না, কিন্তু পিতা যা আমাকে শিখিয়েছেন, আমি ঠিক তা-ই বলি। [২৯] যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; আমাকে একা রেখে যাননি, কেননা আমি সর্বদাই তাঁর মনোমত কাজ করে থাকি।’

৮:২১—আমি চলে যাচ্ছি: এই উদ্ধৃতাংশে ইহুদীরা যিশুকে তিন বার করে অস্বীকার করে। তিনি তাদের বিচার করেন না, কিন্তু তাঁর বাণী ভয়ানক: তারা যে তাঁকে খুঁজে পাবে না শুধু নয়, নিজেদের পাপে থেকেই তারা মরবে। ‘পাপ’ হল অন্ধকার ও মৃত্যুর দিকে যাওয়া, এবং ‘মরা’ হল চিরকালের মত মৃত্যুর বশে বশীভূত হওয়া: অবিশ্বাসী যারা তারা ইতিমধ্যেই সেই অনন্ত ও সর্বনাশা মৃত্যুর দিকে ছুটে চলছে। যে-পাপের কথা এখানে বলা হচ্ছে সেই পাপ হল অবিশ্বাস, অর্থাৎ ত্রাণকর্তা যিশুর অনুসরণ করার বিষয়ে সচেতন ও ইচ্ছাকৃত অস্বীকার। এই অস্বীকার যে পাপ, এর কারণ এই যে, মৃত্যুর কবলে বশীভূত মানুষ ভালবাসার খাতিরে ঈশ্বরের দেওয়া পরিত্রাণ অর্থাৎ মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি অগ্রাহ্য করে (৩:১৬-১৮)। মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হল বিশ্বাস: যিশুর অনুসরণে যারা আলোর সন্তান হয়ে উঠেছে তারা বিশেষত পারস্পরিক ভালবাসার আজ্ঞা পালনেই সেই আলোতে জীবনযাপন করতে পারে (১ যোহন ২:৭-১১)।

৮:২৩—আপনারা নিম্নলোকের: সেইকালের ধারণা যে, ঈশ্বরের বাসস্থান ঊর্ধ্বলোকে এবং মৃতদের বাসস্থান নিম্নলোকে বা পাতালে। যোহনের ভাষায় এ শব্দ দু’টো ঈশ্বরের বা মানুষের দিকে নির্দেশ করে। ‘এই জগতেরই’ কথাটাও দিয়াবলের অর্থাৎ অমঙ্গল ও ঈশ্বর-বিরোধিতার অধিপতির অধীনস্থ মানুষের দিকে অগ্রসর হয় (৩:৬ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৮:২৪—আপনারা যদি না বিশ্বাস করেন যে, আমিই আছি··· : ইহুদীদের পক্ষে পরিত্রাণলাভের একমাত্র আশাই, যিশু নিজেকে যা বলে দাবি করেন সেই কথা বিশ্বাস করা : দাবিটা 'আমিই আছি' রহস্যময় ও অতিগভীর উক্তিতে কেন্দ্রীভূত। আগেও বলা হয়েছিল যে, এধরনের কথার মধ্য দিয়েই ঈশ্বর প্রাক্তন সন্ধিকালে ইস্রায়েলের অনন্য পরাক্রমী ও শক্তিশালী ত্রাণকর্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। নব সন্ধির ঐশপ্রকাশকর্তারূপেই যিশু সেই কথা আপন বলে দাবি করেন : সকল মানুষের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য এবং সকল মানুষের চরম ত্রাণকর্ম সাধন করার জন্য ঈশ্বর যিশুতেই উপস্থিত। ইহুদীদের পাপ এই যে, তারা 'আমিই আছি' সেই ত্রাণকর্তাকে যিশুতে চিনতে পারে না এবং তাঁর বাইরে পরিত্রাণ খুঁজে থাকে, এমনকি আপন গর্বে আচ্ছাদিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে : আপনি কে? অর্থাৎ 'আমিই আছি বলে আপনি নিজেকে কী মনে করেন?' তাদের উপহাসে তিনি প্রত্যক্ষ উত্তর দেন না, পিতার যে-ইচ্ছা, সেটাই মাত্র ঘোষণা ও প্রকাশ করতে থাকেন।

৮:২৮—আপনারা যখন মানবপুত্রকে উত্তোলন করবেন··· : এখন ইহুদীরা যিশুকে অস্বীকার করে, কিন্তু যখন তিনি ক্রুশের উপর উত্তোলিত হবেন তখন তাদের পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হবে : তাঁকে 'আমিই আছি'-ত্রাণকর্তারূপে না চিনলে তারা মহাবিচারে নিজেদের দণ্ডিত করবে : সেই ক্রুশবিদ্ধ, ক্রুশে সেই উত্তোলিত-গৌরবান্বিত যিশু ঈশ্বরের এমন এক লক্ষণ যা কোন মানুষ তুচ্ছ করতে পারে না; তাঁর দিকে তাকিয়ে মানুষ স্বীকার করবে, তিনি জীবনকালে নিজে থেকে কখনও কিছুই করেননি বরং ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারেই সর্বদা কথা বলেছেন।

৮:২৯—যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন··· : যেহেতু যিশু পিতার ইচ্ছা পালন করেন সেজন্য পিতা তাঁকে একা ফেলে রাখবেন না। পিতার সপক্ষে তিনি সাক্ষ্যদান করেছেন বিধায় মানুষ তাঁকে ক্রুশে দেবে; অথচ পিতা তাঁকে ত্যাগ করবেন না, এমনকি ঠিক সেই ক্রুশের মধ্য দিয়ে তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন এবং জগতের উপর তাঁকে পরম বিজয়ী

বলে ঘোষণা করবেন, কেননা ক্রুশ-মৃত্যুতেই যিশু প্রমাণ করেন তিনি পূর্ণ মাত্রায় পিতার পরিত্রাণদায়ী ইচ্ছা মেনে চলেছেন।

যিশুর দেওয়া মুক্তি ও ইহুদীদের দাসত্ব (৮:৩০-৫৯)

৮ [৩০] তিনি এই সমস্ত কথা বলায় অনেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হলেন।
[৩১] যিশু তখন নিজের প্রতি বিশ্বাসী এই ইহুদীদের বললেন, 'তোমরা যদি আমার বাণীতে স্থিতমূল থাক, তবেই তোমরা সত্যি আমার শিষ্য; [৩২] আর তোমরা সত্যকে জানতে পারবে, ও সত্য তোমাদের মুক্ত করবে।' [৩৩] তারা তাঁকে উত্তর দিল, 'আমরা তো আব্রাহামের বংশ, কখনও কারও দাসত্বে থাকিনি। তোমরা মুক্ত হবে, এই কথা আপনি কেমন করে বলতে পারেন?' [৩৪] যিশু তাদের উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে কেউ পাপ করে, সে পাপের ক্রীতদাস। [৩৫] ক্রীতদাস তো চিরকাল ধরে ঘরে থাকে না, পুত্রই চিরকাল ধরে থাকেন। [৩৬] সুতরাং পুত্রই যদি তোমাদের মুক্ত করে দেন, তবে তোমরা প্রকৃতভাবে মুক্ত হবে। [৩৭] তোমরা যে আব্রাহামের বংশ, তা জানি; তবুও তোমরা আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছ, কারণ আমার বাণী তোমাদের অন্তরে স্থান পায় না। [৩৮] আমার পিতার কাছে যা দেখেছি, আমি সেই সমস্ত বলে থাকি; আর তোমরা তোমাদের পিতার কাছে যা কিছু শুনেছ, তা-ই বলে থাক।' [৩৯] তারা এই বলে তাঁকে উত্তর দিল, 'আব্রাহামই আমাদের পিতা।' যিশু তাদের বললেন, 'তোমরা যদি আব্রাহামের সন্তান হতে, তাহলে আব্রাহামেরই কাজ অনুসারে কাজ করতে। [৪০] কিন্তু যে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্য শুনে তোমাদের কাছে তা প্রকাশ করেছে, সেই আমাকেই তোমরা এখন হত্যা করতে চেষ্টা করছ। আব্রাহাম তেমন কাজ করেননি! [৪১] না, তোমাদের পিতার কাজ অনুসারেই তোমরা কাজ করছ।' তারা তাঁকে বলল, 'আমরা তো জারজ সন্তান নই, আমাদের একজন মাত্র পিতা আছেন, সেই ঈশ্বর।' [৪২] যিশু তাদের বললেন, 'ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হতেন, তাহলে তোমরা আমাকে ভালবাসতে, যেহেতু আমি ঈশ্বর হতে উদ্গত হয়েই এসেছি—আমি তো নিজে থেকে আসিনি, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন। [৪৩] আমি যা বলছি, তোমরা তা বোঝ না কেন?

কারণটা এ, আমার বাণী শুনবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। [৪৪] তোমরা তোমাদের পিতা সেই দিয়াবল থেকেই উদ্গত, ও তোমাদের সেই পিতার অভিলাষ পূরণ করতেই ইচ্ছা কর। সে আদি থেকেই ছিল নরঘাতক, সত্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই, কারণ তার নিজের মধ্যেই যে সত্য নেই! সে যখন মিথ্যা বলে, তখন নিজের স্বভাবমতই সে কথা বলে, কারণ সে নিজে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার জনক। [৪৫] আমি কিন্তু সত্য বলি বিধায় তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না। [৪৬] তোমাদের মধ্যে কে পাপের বিষয়ে আমাকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করতে পারে? আমি যদি সত্য বলি, তবে কেন তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না? [৪৭] যে কেউ ঈশ্বর হতে উদ্গত, সে ঈশ্বরের সমস্ত কথা শোনে; তোমরা যে শোন না, এর কারণ এই, তোমরা ঈশ্বর থেকে নও।'

[৪৮] উত্তরে ইহুদীরা তাঁকে বলল, 'আমরা কি ঠিক বলি না যে, আপনাকে একটা অপদূতে পেয়েছে, আপনি সামারীয়!' [৪৯] যিশু উত্তর দিলেন, 'আমাকে কোন অপদূতে পায়নি, আমি বরং আমার পিতাকে সম্মান করি আর তোমরা আমাকে অসম্মান কর। [৫০] আমি নিজের গৌরবের অন্বেষণ করি না; তেমন অন্বেষণ করার জন্য একজন আছেন, আর তিনিই বিচার করবেন। [৫১] আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, কেউ যদি আমার বাণী মেনে চলে, সে কখনও মৃত্যুকে দেখবে না।' [৫২] ইহুদীরা তাঁকে বলল, 'এইবার জানতে পারলাম, আপনাকে অপদূতে পেয়েছে! আব্রাহাম মারা গেছেন, নবীরাও তাই; আর আপনি বলছেন, যদি কেউ আমার বাণী মেনে চলে, সে কখনও মৃত্যু ভোগ করবে না। [৫৩] আপনি কি আমাদের পিতা আব্রাহামের চেয়েও বড়? তিনি তো মারা গেছেন, নবীরাও মারা গেছেন। আপনি কে? নিজের পরিচয় বলে কী দাবি করছেন?' [৫৪] যিশু উত্তর দিলেন, 'আমি যদি নিজে নিজেতে গৌরব আরোপ করি, তবে আমার সেই গৌরব কিছুই নয়; আমার সেই পিতাই আমাতে গৌরব আরোপ করেন, যাঁর বিষয়ে তোমরা বল, তিনি আমাদের ঈশ্বর। [৫৫] অথচ তোমরা তাঁকে জান না, কিন্তু আমি তাঁকে জানি। আর যদি বলতাম, তাঁকে জানি না, তবে তোমাদের মত মিথ্যাবাদী হতাম। কিন্তু আমি তাঁকে জানি ও তাঁর বাণী মেনে চলি। [৫৬] তোমাদের পিতা আব্রাহাম আমার দিন দেখবার আশায় উল্লসিত হয়েছিলেন; তা দেখতেই পেয়েছেন, আনন্দও করেছেন।' [৫৭] তখন ইহুদীরা তাঁকে বলল, 'আপনার বয়স এখনও পঞ্চাশ হয়নি আর আপনি নাকি আব্রাহামকে দেখেছেন?' [৫৮] যিশু তাদের বললেন, 'আমি

তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি: আব্রাহাম জন্মাবার আগে আমিই আছি।’ [৫৯] তাই তারা তাঁকে মারবার জন্য পাথর হাতে তুলে নিল, কিন্তু যিশু আড়ালে গিয়ে মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

৮:৩১—তোমরা যদি আমার বাণীতে স্থিতমূল থাক… : ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ পাবার জন্য বিশ্বাসীগণ যিশু দ্বারাই নিজেদের চালিত হতে দেবে: কিন্তু তেমন কাজে অত্যাবশ্যক শর্ত হল অধ্যবসায়, বিশেষত নির্যাতন ও সংশয়ের সময়ে; যে-বাণী ঈশ্বরেরই বাণী (১ যোহন ১:১০) এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ বাস্তবতা (১ যোহন ২:২৪…), বিশ্বাসীর অন্তরে অধিষ্ঠিত যিশুর সেই বাণী দ্বারা সেই অধ্যবসায় সৃষ্ট হবে। বিশ্বাসীগণ সেই বাণী শুনবে, আপন করবে (৬:৪৫) ও মেনে চলবে (৮:৫১)।

৮:৩২—তোমরা সত্যকে জানতে পারবে: সত্য-ই হল মানুষের পরিত্রাণের বিষয়ে ঈশ্বরের সত্য; আবার সত্য এই যে, প্রেরিতজন বলেই যিশু চরম ত্রাণকর্তা। যেমন সত্য ঈশ্বর হতে উদ্গত ও তাদেরই কাছে বোধগম্য যারা ঈশ্বর হতে উদ্গত, তেমনি ‘সত্য জানা’ বলতে যিশুর দেওয়া পরিত্রাণদায়ী সত্য অন্তরে গ্রহণ করে পবিত্র জীবনযাপনে তা বাস্তবায়িত করা বোঝায়। এই শর্তেই শিষ্য পিতার সঙ্গে যিশুর সংযোগ এবং পিতা ও পুত্রের সঙ্গে বিশ্বাসীগণের সংযোগ উপলব্ধি করতে সক্ষম (১৪:২০): এই কারণে বলা হয় যে, সত্যের মাধ্যমেই মানুষ মুক্তিলাভ করবে। যারা যিশুর প্রতি বিশ্বাসী তারা ইতিমধ্যেই অন্ধকারময় ও মৃত্যুচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন ‘এই জগৎ’ ছেড়ে দিয়েছে এবং সেই জীবন-শক্তি লাভ করেছে যা পরিত্রাণদায়ী ও ঈশ্বরের আলোপূর্ণ জীবনে জীবিত হবার জন্য অপরিহার্য বস্তু: ঐশজীবনের এই অবিনশ্বর ও অনন্ত শক্তিই ঈশ্বরসন্তানের মুক্তি, সেই মুক্তি দ্বারাই তারা ইতিমধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসা উপভোগ করে এবং তাঁর সাদৃশ্য সম্পূর্ণরূপে লাভের জন্য প্রতীক্ষা করে (১ যোহন ৩:১…)।

৮:৩৩—আমরা তো আব্রাহামের বংশ: ইহুদীরা এবারও যিশুর মর্মকথা বুঝে উঠতে পারছে না: তাদের দেশাত্মক ও ধর্মগত অনুভূতিতে তারা নিজেদের অপমানিত মনে করে, কেননা আব্রাহামের বংশের হওয়াই তাদের গর্ব এবং তাদের পরিত্রাণ-প্রাপ্তির নিশ্চয়তার ভিত্তিস্বরূপ। এই গর্ব ও নিশ্চয়তার কারণে তারা যিশুর বাণী মানতে পারে না।

৮:৩৪—যে কেউ পাপ করে··· : পাপ ও মুক্তি যে কী, তা যিশু প্রকাশ করেন। পাপ হল ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহ করা, তাঁর নিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করা এবং সেই প্রত্যাখ্যানে থেকে যাওয়া; ইহুদীদের বেলায় পাপ হল ঈশ্বরের মুক্তি-পরিকল্পনাকে সেই অবিরত ও বিদ্রোহী প্রত্যাখ্যান যা পাপ থেকে ত্রাণকর্তা যিশুকে অগ্রাহ্য করায় অভিব্যক্তি পায়: মুক্ত না হওয়ায় তারা ক্রীতদাস।

৮:৩৬—পুত্রই যদি তোমাদের মুক্ত করে দেন··· : অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, পাপ থেকে ঈশ্বরের দিকে যে-পথ, সেটা কেবল পুত্রের মধ্য দিয়েই যায়। পুত্রই তাঁর পরিত্রাণদায়ী ঐশপ্রকাশের মাধ্যমে সেই পথ উন্মুক্ত করেন এবং তাঁর সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে সেই পথে চলার ক্ষমতা মানুষকে দান করেন (৫:২৪; ৮:১২; ১৪:১৬)। তারাই প্রকৃতভাবে মুক্ত, যারা তাঁর মাধ্যমে জীবনের আলো লাভ করে।

৮:৩৭—তোমরা যে আব্রাহামের বংশ, তা জানি: বাপ্তিস্মদাতা যোহন পর্যন্ত সকল নবী প্রচার করে এসেছিলেন আব্রাহামের প্রকৃত বংশত্ব মাংসগত বংশ থেকে নয় বরং আব্রাহামের মনোভাব ও কাজের অনুকরণেই প্রকাশিত: আব্রাহাম যে যিশুকে হত্যা করতে পারতেন এ যুক্তিসঙ্গত কথা নয়, এমনকি আব্রাহামের কাজের একমাত্র সদৃশ কাজই ঈশ্বরের প্রেরিতজনের প্রতি বিশ্বাস রাখা। এখন, যখন ইহুদীদের কাজ আব্রাহামের কাজ থেকে ভিন্ন, তখন অনুমান করা যায় যে ইহুদীরা তাঁর বংশধর নয়, ঈশ্বরের সন্তানও নয়। তারা যদি সত্যিই ঈশ্বরের সন্তান হত, তাহলে যিশুকে ভালবাসত,

কেননা যিশু নিজে থেকে নয়, পিতা দ্বারাই প্রেরিত। সুতরাং, একটিমাত্র সিদ্ধান্ত অবশিষ্ট রয়েছে আর সেই সিদ্ধান্ত তাদের কার্যকলাপ এবং মিথ্যাচারী ও জিঘাংসু মনোভাব থেকে আসে: এদেন-বাগানে মিথ্যা ও ঘৃণার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে মানুষকে পাপ করিয়েছিল, যে-পাপের কারণে মানুষ ঐশজীবন হারিয়ে মৃত্যুর কবলে বশীভূত হয়েছিল, তারা সেই দিয়াবলের বংশ। 'মিথ্যা', একথার গভীর অর্থ অনুধাবন করা উচিত: যা ঈশ্বরের আলোর বিপরীত এবং কাজেই পাপের সঙ্গে সম্পর্কিত সেটাই মিথ্যা। এ মিথ্যা তখনই প্রকাশ পায় যখন মানুষ যিশুতে অভিব্যক্ত ঈশ্বরের ঐশপ্রকাশের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

৮:৪৫—**আমি কিন্তু সত্য বলি:** ইহুদীরা মিথ্যাচারী দিয়াবলের সঙ্গে এতই আবদ্ধ যে, তবেই যিশুর কথায় বিশ্বাস করত যদি তিনি মিথ্যা বলতেন! কিন্তু যিশু ঈশ্বর হতে উদ্গত, তিনি নিজে সত্য, এজন্যই সত্য ছাড়া অন্য কিছুই বলতে পারেন না, নিজের জীবনোৎসর্গ পর্যন্ত তিনি পিতার প্রতি বাধ্য হওয়ায় তাঁর মধ্যে পাপ নেই।

৮:৪৭—**যে কেউ ঈশ্বর হতে উদ্গত… :** শুধু ইহুদীরা নয়, সর্বযুগের যে সকল মানুষ ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেয় না, তারা প্রমাণ করে তারা ঈশ্বর হতে উদ্গত নয়, তাঁর সন্তান নয়, বরং দিয়াবলেরই বংশ।

৮:৪৯—**আমাকে কোন অপদূতে পায়নি:** ইহুদীদের অশেষ অভিযোগে যিশু প্রতিবাদস্বরূপ বলেন তারাই তাঁকে অসম্মান করায় ঈশ্বরকে অসম্মান করে, কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছাই সকলে তাঁর প্রেরিতজনকে সম্মান করুক। তাদের এ পাপের জন্য তারা বিচারিত হবে, এমনকি, যে ক্রুশ-মৃত্যুতে তারা যিশুকে দণ্ডিত করবে, ঠিক সেই ক্রুশ-মৃত্যুতে পিতা তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন, ফলত তারাই বিচারিত ও দণ্ডিত হবে।

৮:৫১—কেউ যদি আমার বাণী মেনে চলে··· : আবার যিশু নিজের প্রেরণকর্ম অর্থাৎ পরিত্রাণদায়ী ঐশপ্রকাশকর্ম করে চলেন। ৩১ পদে ব্যক্ত কথাটি এই পদেই জোর পায়: যে-কেউ যিশুর বাণীতে স্থিতমূল থাকে সে অনন্ত জীবন পায়। সেইকালের ইহুদীরা এবং সর্বকালের অবিশ্বাসীদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ যেন পথভ্রষ্ট না হয় বরং যিশুর বাণী মেনে চলে: যিশুর বাণী যে ঈশ্বরের বাণী বলে মানুষের অন্তরে প্রবেশ ক'রে মানুষকে শক্তিশালী করে তোলে, সেই বাণীকে খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ মেনে চলুক এবং তার দাবি সকল পূরণ করুক। যারা এই জগতে যিশুর বাণীতে স্থিতমূল থাকে ও সেই বাণী মেনে চলে তাদেরই জন্য যিশুর দেওয়া প্রতিশ্রুতি প্রযোজ্য: তারা কখনও মৃত্যুকে দেখবে না। নিয়মিতই ইহুদীরা যিশুর বাণী বাহ্যিক আক্ষরিক অর্থেই মাত্র বোঝে, কেমন যেন যিশুর দেওয়া জীবন এমন যা এই দৈহিক জীবনের ধারাবাহিকতা; তাছাড়া তাঁকে উপহাস করে তিনি যেন নিজের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে অধিক স্পষ্ট কথা বলেন, তাতে তারা তাঁকে ঈশ্বরনিন্দা অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিধান অনুসারে তাঁকে পাথর ছুড়ে মারবে।

৮:৫৪—আমি যদি নিজে নিজেতে গৌরব আরোপ করি··· : নিজে থেকে যিশু কোন গৌরব দাবি করেন না, পিতাই পুত্রে গৌরব আরোপ করেন এবং এই গৌরবারোপণই হল যিশুর সপক্ষে পিতার আর একটি সাক্ষ্যদান; এমনকি যে-পিতা পুত্রে গৌরব আরোপ করেন তিনিই সে-ই যাঁকে ইহুদীরা ঈশ্বর বলে ডাকে; তারা কিন্তু তাঁকে চিনতে পারে না, তাঁর সঙ্গে সংযুক্তও নয়। পুত্র হয়ে যিশুই পিতার সঙ্গে সর্বদা সংযুক্ত, তাঁকে জানেন এবং প্রকাশও করেন। পিতার সাক্ষ্য ছাড়া যিশু নিজের প্রভুত্বের সাক্ষীরূপে আব্রাহামকেও উপস্থিত করান: যিনি এখন ঈশ্বরের সঙ্গে আছেন, যে-দিন মশীহ জগতে আবির্ভূত হলেন সেইদিন সেই আব্রাহাম উল্লসিত হলেন। আবার ইহুদীরা যিশুকে উপহাস করে, তবু তিনি তাদের কথায় ভিত্তি করে উজ্জ্বলভাবে আত্মপ্রকাশ করেন: ঈশ্বর হয়ে তিনিই আব্রাহামের আগে বিদ্যমান সেই 'আমিই আছি' এবং পুত্র, এজন্যই অমর জীবন দান করতে সক্ষম (৮:৫১)। আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের কাছে ঈশ্বর যে পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য তিনি যিশুতে সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। যিশুর এই বাক্য ইহুদীদের কাছে

ঈশ্বরনিন্দাত্মক বাক্য, তারা তাঁকে পাথর ছুড়ে মারতে চায়, কিন্তু তাঁর ক্ষণ এখনও উপস্থিত নয়।

পরিশিষ্ট

যোহন অনুসারে ‘সত্য’

যোহনের সুসমাচার ও পত্রাবলিতে ‘সত্য’ শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত, এমনকি এধারণা যোহনের বিশিষ্ট ও স্বকীয় ধারণা। প্রমাণস্বরূপ একথা যথেষ্ট হোক যে, তাঁর লেখায় ‘সত্য’ শব্দ ও সেটির সম্পর্কিত শব্দগুলি (যেমন যথার্থ, সত্যকার ইত্যাদি শব্দ) ৭৪ বার উল্লিখিত, অপর দিকে সদৃশ সুসমাচারত্রয়ে সেই শব্দগুলি মোট ১০ বার মাত্র ব্যবহৃত।

এক্ষেত্রে বিশিষ্ট বাক্যগুলো হল: ‘সত্য জানা ও দেখা’, ‘সত্য বলা ও সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদান করা’, সত্যের সাধন করা’ এবং ‘সত্য হতে উদ্গত হওয়া’। এ তালিকা থেকে সহজে লক্ষ করা যায়, যোহন কত-না স্বকীয়ভাবে এ শব্দ ব্যবহার করেন: ‘সত্য বলা’ যিশুর কথায় যে কোন ভুল নেই নয়, তাঁর শুভসংবাদের দিকেই নির্দেশ করে; ‘সত্য জানা’র অর্থ হল তাঁর ঐশপ্রকাশ ও বর্তমানকালে খ্রিষ্টমণ্ডলীর বাণী-ঘোষণাকে জানা। এই পরিশিষ্টের প্রথম অংশে এই সকল বাক্য বিশ্লেষণ করার পর ‘সত্যময় আত্মা’ বাক্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করব এবং অবশেষে ‘সত্যকার’ ও ‘যথার্থ’ শব্দ দু’টোর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হবে। দ্বিতীয় অংশে ইহুদী ঐতিহ্য অনুযায়ী ‘সত্য’ ধারণার অর্থ সংক্ষিপ্তভাবে ফুটিয়ে তোলা হবে এবং পরিশিষ্টের উপসংহারে এবিষয়ে ঐশতাত্ত্বিক একটা সাংশ্লেষিক মূল্যায়ন উপস্থাপিত হবে।

‘সত্য’ ধারণা বিশ্লেষণ

সূচনাস্বরূপ একথাই লক্ষণীয় যে, পুরাতন নিয়মে প্রচলিত একটা বাক্য—‘অনুগ্রহ ও বিশ্বস্ততা’—যোহনের সুসমাচারে ‘অনুগ্রহ ও সত্য’-তে পরিণত হয়েছে (১:১৭)।

পরিবর্তনের কারণ এই যে, ইস্রায়েল জাতির সঙ্গে ঈশ্বরের মৈত্রী-সন্ধির বিশ্বস্ততা পুত্রকে প্রেরণেই সিদ্ধিলাভ করেছে: যিশুই চরম পরিত্রাণদায়ী ঐশপ্রকাশ, ফলত তিনিই সত্য। 'সত্য বলা' বাক্য এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সূচিত (৮:৪০… ; ১৬:৭), কেননা 'সত্য বলা' অর্থাৎ পরিত্রাণ-প্রচারকর্ম ঈশ্বরের সেই প্রেরিতজনের পক্ষেই মাত্র সাধ্য যিনি নিজে ঐশসত্যবেষ্টিত, যে-সত্য বিশ্বাসীদের কাছে জীবন ও পরিত্রাণ। তিনি বাণী, চিহ্নকর্ম ও নিজের মাধ্যমেও ঐশপরিত্রাণদায়ী ইচ্ছা ও পরিত্রাণের পথ প্রকাশ করেন বিধায় আমরা বলতে পারি, তিনি 'সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দান করেন' (৩:৩২; ১৮:৩৭ ইত্যাদি)। ঐশসত্য যিশুতে বিদ্যমান, এজন্য যিশুর বাণীসকল সত্য (১৭:১৭): তাঁর বাণী কিন্তু কোন গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন করার বাণী নয় বরং তাঁর বাণী হল 'আত্মা ও জীবন' (৬:৬৩, ৬৮)। সুতরাং, যে সেই বাণী মেনে চলে, সে অধিক শিক্ষিত বা উদ্বুদ্ধ নয় বরং সে পবিত্রীকৃত (১৭:১৭) অর্থাৎ ঐশজীবনপূর্ণ হয়ে ওঠে; সেই সত্য তার অন্তরে এমন শক্তি হয় যা পাপের দাসত্ব থেকে তাকে মুক্ত ক'রে প্রকৃত মুক্তির দিকে চালিত করে (৮:৩২-৩৬)। তবুও সেই সত্য তার আচার-ব্যবহারের নিয়ম যেন হয়: সে 'সত্যের সাধন করবে' এবং 'কাজে ও সত্যিকারে' ভ্রাতৃপ্রেম-আজ্ঞা পালন করবে (৩:২১; ১ যোহন ১:৬; ৩:১৮)। একজনের আচরণ থেকে অনুমান করা যায় সে 'সত্য হতে' অর্থাৎ 'ঈশ্বর হতে' না 'মিথ্যা হতে উদ্গত' কিনা।

পিতার কাছে যিশুর ফিরে যাওয়ার পর 'সত্যময় আত্মা' অর্থাৎ পবিত্র আত্মা সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করেন: কিন্তু তাঁর সাক্ষ্য কেবল যিশুর দেওয়া ঐশপ্রকাশ-সম্পর্কিত: তিনি শিক্ষাদান করেন এবং স্মরণ করান শিষ্যদের কাছে প্রকাশিত যিশুর সকল বাণী (১৪:২৬)। যিশুর শিষ্যেরা যে তাঁর জীবনকালে তাঁর ঐশপ্রকাশ উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েছিলেন, ঐশআত্মা পূর্ণ সত্যের মধ্যে তাঁদের চালনা করবেন (১৬:১৩)। শুধু প্রকৃত শিষ্যেরাই সেই আত্মাকে চিনতে ও গ্রহণ করতে সক্ষম (১৪:১৭)। যেহেতু ঈশ্বর ও স্বয়ং যিশুর প্রেরিত সত্যময় আত্মা (১৫:২৬; ১৬:৭) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যিশুর কাজ বহন করে যান, সেজন্য তাঁর নিজের কাজও ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তা যিশুর চরম কাজে সংগৃহীত।

‘যথার্থ’ শব্দটি পিতা ও পুত্রের সাক্ষ্য নির্দেশ করে (৫:৩১, ৩২; ৮:১৩… ; ২১:২৪)। ‘সত্য, সত্যনিষ্ঠ ও সত্যময়’ শব্দগুলি সাধারণত পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। ‘সত্যময়’ শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলতে পারি যে, ঈশ্বর পুত্রকে প্রেরণ করায় নিজের সত্য ব্যক্ত করেন এবং যিশু উপদেশ ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সেই সত্যকে প্রকাশ করেন : এতে উভয়ে সত্যময় বলে নিজেদের প্রমাণিত করেন।

অবশেষে আসুন, ‘সত্যকার’ (ও ‘সত্যের শরণে’) শব্দের দিকে মন ফেরাই (১:৯; ৪:২৩; ৬:৩২ ইত্যাদি)। যদিও এর অর্থ বহুবিধ, তবু একথা বলা চলে যে, সেটির মধ্য দিয়ে যিশু যা বলেন ও দান করেন তা-ই মাত্র সত্য ও চিরস্থায়ী, অর্থাৎ সত্যিই যিশু ঈশ্বরের প্রকৃত প্রেরিতজন এবং চরম ও অদ্বিতীয় ত্রাণকর্তা বলে পরিচয় দাবি করতে পারেন।

ইহুদী ঐতিহ্য অনুযায়ী ‘সত্য’

এই অংশে, বিশেষভাবে কুম্রান সম্প্রদায় অনুসারে ‘সত্য’ ধারণার তাৎপর্য যে কী তার বিষয়ে খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হবে। ঈশ্বর থেকে যা যা উদ্গত তা ‘সত্য’ ; তেমন ‘সত্য’ বিশেষভাবে ঐশবিধানে সংগৃহীত ; যারা বিধান অধ্যয়ন করে ও মেনে চলে তারা ঐশসত্যের সহভাগী হয়, অর্থাৎ তারা এমনভাবে উদ্বুদ্ধ হয় যার ফলে তারা ভাবী জীবন সম্বন্ধে যা বলে তা নব পরিত্রাণদায়ী ঐশপ্রকাশ বলে বিবেচনাযোগ্য। অপর দিকে খ্রিষ্টমণ্ডলী ঈশ্বরের শেষ ও চরম প্রেরিতজনরূপে শুধু যিশুকেই মানে : তাঁরই দ্বারা জগতের পরিত্রাণ বিষয়ে ঈশ্বরের সত্য পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। যিশু পুরাতন নিয়মের কথার ব্যাখ্যাতা মাত্র নন, তিনি নিজে পিতার কাছে প্রত্যক্ষভাবে পৌঁছাবার জন্য নব ঐশপ্রকাশ ও একমাত্র পথ।

মূল্যায়ন

১। 'সত্য' ধারণার মধ্য দিয়ে যোহন যিশুখ্রিস্টের ঐশপ্রকাশকর্ম ব্যাখ্যা করেন: পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর যা প্রকাশ করেছিলেন তা এখন অতিক্রম করা হয়েছে এবং পুত্রের ঐশপ্রকাশে সিদ্ধি লাভ করেছে (১:১৭)।

২। যিশু পরিত্রাণদায়ী ঐশপ্রকাশ নিজের বাণীর মাধ্যমেই বিশেষত ব্যক্ত করেন। ঈশ্বরের নিজের বাণী বলে যিশুর বাণী ঐশসত্য প্রকট করে (৩:৩৩), পরিত্রাণের দিকে পথ হয়ে ওঠে (৮:৩২) এবং মানুষকে পবিত্রীকৃত করে অর্থাৎ তাকে ঐশজীবনের সহভাগী করে তোলে (১৭:১৭, ২১)।

৩। ঈশ্বরের সত্য যিশুতে বিরাজ করে (১৪:৬); সুতরাং সত্য ও পরিত্রাণ বিষয়ে মানুষ যা অন্বেষণ করে তা যিশুতেই সম্পূর্ণরূপে ও প্রকৃতভাবে সে লাভ করবে। পরিত্রাণদায়ী সত্যের সন্ধান পাবার একমাত্র শর্ত হল বিশ্বাস সহকারে যিশুকে গ্রহণ করা ও তাঁর বাণীতে স্থিতমূল থাকা (৮:৩১ ...)।

৪। কিন্তু এ সত্য এমন, যে-সত্যের সাধন-ই করতে হয় এবং যা সদাচরণে প্রকাশ পায় (৩:২১; ১ যোহন ২:৬): উল্লেখযোগ্য ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন (১ যোহন ২:৪) এবং বিশেষভাবে পারস্পরিক ভালবাসার আজ্ঞা পালন (১ যোহন ৩:১৮)।

৫। যিশুর ঘোষিত সত্য মানুষের অন্তর প্রকটিত করে বলে (১ যোহন ৩:১৯) সেই সত্য বিচারস্বরূপ। তারাই মাত্র সেই সত্য গ্রহণ করতে সক্ষম যারা 'সত্য হতে উদ্গত' (১৮:৩৭), অর্থাৎ যারা ঈশ্বর হতে উদ্গত (৮:৪৩-৪৭)। অন্যান্য সকলে সত্যকে অগ্রাহ্য করে, কাজেই মিথ্যার বশে পড়ে। সত্য-ই হল মানুষকে বিচার করার মান।

৬। সত্য মানুষের এমন সম্পদ নয় যা সে ইচ্ছামত লুকিয়ে রাখবে, বরং সত্য সত্যময় আত্মা দ্বারা অবিরতই উন্মোচিত হবে। আত্মার আলোতে এক একটি যুগ যিশুর দেওয়া ঐশপ্রকাশ নতুনভাবে অনুভব করতে শিখবে।

৭। উপরোল্লিখিত নব-অনুভব-কাজে মিথ্যা থেকে সত্যকে নির্ণয় করার দায়িত্ব খ্রিষ্টমণ্ডলীর (১ যোহন ২:২১); আবার মণ্ডলীর দায়িত্ব সত্যময় আত্মাকে চেনা ও নকল

নবীদের চিহ্নিত করা (১ যোহন ৪:১-৬)। এই সংগ্রামে রত বিশ্বাসীগণ যদি আদি থেকে পাওয়া শুভসংবাদে (১ যোহন ২:৭, ২৪) যোগ দিয়ে থাকে, তাহলে পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেক লাভ করে তাঁরই দ্বারা পরিচালিত হবে (১ যোহন ২:২০, ২৭)।

* * *

জন্মান্ধের কাহিনী (৯ অধ্যায়)

এই অধ্যায়ের বিশিষ্ট একটা সংযোজক ভূমিকা আছে: এখানে যে-ঘটনা বর্ণনা করা হয়, সেটা দ্বিতীয় পাস্কা-পর্বকালে ঘটেছে বলে সেজন্য বলতে পারি, ৯ম অধ্যায় ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু, তাছাড়া, এ অধ্যায়টি যাবতীয় পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট, এমনকি সেগুলির উপসংহারস্বরূপ বিবেচনাযোগ্য, এবং পরবর্তী অধ্যায়ের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত তার ভূমিকাস্বরূপ। এই অধ্যায় যে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির উপসংহারস্বরূপ বিবেচনাযোগ্য, এবিষয়ে কিছু আলোচনা করা হোক। বাণী-বন্দনা থেকেই জগতের মাঝে জীবন ও আলোরূপে ঐশবাণীর অভিব্যক্তি এবং জগৎ দ্বারা তাঁর অস্বীকৃতি ঘোষিত হয়েছিল। জীবন বলে ঐশবাণীর ভূমিকা তিনটি বর্ণনায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিল: আত্মা থেকে নবজন্ম (৩ অধ্যায়), জীবনময় জল (৫ অধ্যায়) এবং জীবনের রুটি ([৬] অধ্যায়)। ৯ অধ্যায়ে ঐশবাণীর 'আলো' ভূমিকা প্রকাশ পায়; ৮ অধ্যায়ের সঙ্গে সংযোজক বিষয়বস্তু স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, তথা: 'আমিই জগতের আলো' (৮:১২ এবং ৯:৫) বাক্যটি। জন্মান্ধের আরোগ্যলাভে প্রমাণিত হয় কেমন করে আলো অন্ধকারকে পরাভূত করে ফেলেছে (১:৫)। কিন্তু এই অধ্যায় যিশু আলো ছাড়া 'জল' প্রতীকের মধ্য দিয়ে জীবন বলেও আত্মপ্রকাশ করেন: ইহুদীদের জল আর নয় (২ অধ্যায়), যাকোবের কুয়োর জলও নয় (৪ অধ্যায়) এবং সিলোয়াম জলকুণ্ডের জলও নয় (৯ অধ্যায়), বরং যিশুই ত্রাণকর্তা। তবু আলোরূপে ত্রাণকর্তা যিশু বিচারকর্তাও: যিশুর আলোতে অবিশ্বাসী ইহুদীরা নিজেদের পাপে ধরা পড়ে এবং সেই আলো দ্বারাই বিচারিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুনরায় অনুমান করা যায় যোহন সমকালীন ইহুদীদের দিকেও নির্দেশ করতে চান: যথার্থই, সেইকালে ইহুদীরা

খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অত্যাচার করত আর যিশুকে মশীহ ও প্রকৃত ঈশ্বর বলে অস্বীকার করত। বলা বাহুল্য এ সমস্যাটা বর্তমানকালেও বাস্তব: আজও খ্রিষ্টমণ্ডলীর পক্ষে যিশুর বিষয়ে সাক্ষ্যদান অপরিহার্য সমস্যা এবং তার এই সাক্ষ্যদানে সে যথেষ্ট বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।

জন্মান্ধকে আরোগ্যদান (৯:১-৭)

৯ [১] পথে যেতে যেতে তিনি একজন লোককে দেখতে পেলেন যে জন্ম থেকে অন্ধ। [২] তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাব্বি, কে পাপ করেছে, এই লোকটা, না তার পিতামাতা, যার ফলে এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে?' [৩] যিশু উত্তর দিলেন, 'নিজেরও পাপের ফলে নয়, পিতামাতারও পাপের ফলে নয়, বরং এমনটি ঘটেছে যেন ঈশ্বরের কর্মকীর্তি তার মধ্যে প্রকাশ পায়। [৪] যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, দিনের আলো যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আমাদের তাঁরই কাজ সাধন করতে হবে; রাত আসছে, তখন কেউ কাজ করতে পারবে না। [৫] যতদিন জগতে আছি, আমিই জগতের আলো।' [৬] একথা বলার পর তিনি মাটিতে থুথু ফেললেন, আর সেই থুথু দিয়ে কাদা তৈরি করে লোকটির চোখে তা মাখিয়ে দিলেন [৭] এবং তাকে বললেন, 'সিলোয়াম জলকুণ্ডে গিয়ে ধুয়ে ফেল'—সিলোয়াম কথাটার অর্থ 'প্রেরিত'। সে তখন চলে গিয়ে ধুয়ে ফেলল ও চোখে দেখতে দেখতে ফিরে এল।

৯:১—তিনি একজন লোককে দেখতে পেলেন যে জন্ম থেকে অন্ধ: পূর্ববর্ণিত চিহ্নকর্মগুলোর মত এবারও যিশুই আশ্চর্য কাজ সাধনের জন্য সম্পূর্ণ নেতৃত্ব নেন: তিনি স্পষ্টই জানেন কী করতে চান এবং সেই কাজের কী অর্থ।

৯:২—কে পাপ করেছে…? ইহুদীদের ধারণা, পিতামাতার পাপের প্রতিফল সন্তানই ভোগ করবে; এইভাবে কষ্ট-রহস্য সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান করা হত: ঈশ্বর

থেকে নয়, পাপজনিতই কষ্ট। কিন্তু যিশু রহস্যটার অর্থ উদ্ঘাটনের জন্য ব্যস্ত নন; তিনি একথা মাত্র বলেন যে, ঈশ্বরের পরিকল্পনায় কষ্টের একটা অর্থ আছে: পাপের চিহ্ন থেকে কষ্ট পরিত্রাণেরই চিহ্ন ও সুযোগ হয়ে উঠেছে, কষ্টে ঈশ্বরের কার্যকলাপ প্রকাশ পায়। বস্তুত, সেই অন্ধ লোকে ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী ইচ্ছার অভিব্যক্তি ঘটেছে।

৯:৪—**তাঁরই কাজ সাধন করতে হবে:** যিশুই পিতার প্রেরিতজন, তবু তিনি নিজের কাজে শিষ্যদেরও স্থান দেন: খ্রিষ্টমণ্ডলী হয়ে তাঁরা এক দিন জগতের সামনে সাক্ষীরূপে দাঁড়াবেন (১৫:২৭), তাঁর মত নানা কাজ সাধন করবেন (১৪:১২) এবং তাঁর পরিণতির সহভাগী হবেন (১৫:২০)। নির্যাতন ও অত্যাচার থাকা সত্ত্বেও খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ মানুষের কষ্ট ও দুর্বলতার সম্মুখীন হয়ে সবসময় ঈশ্বরের বাণীতে কান দেবে এবং ঈশ্বর তাদের হাতে যে যে কাজ ন্যস্ত করেছেন সেই কাজ সাধন করবে।

৯:৫—**আমিই জগতের আলো:** তিনি যা করতে যাচ্ছেন তার অর্থ ব্যাখ্যা করেন: যতক্ষণ তিনি এজগতে দৃশ্যগতভাবে উপস্থিত, ততক্ষণ তাঁর করণীয় কাজ হল জগতের আলো হওয়া।

৯:৬—**তিনি মাটিতে থুথু ফেললেন:** সেইকালে লোকে মনে করত লালা আরোগ্যদানের জন্য উপকারী উপায়। যিশু যে সেই প্রথা সত্য বলে সমর্থন করেন এধরনের কথা এখানে নেই। বরং দু' দিকের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত। প্রথম, মাটির কথাই লক্ষণীয়: আদিপুস্তক অনুসারে মানুষের সৃষ্টিকর্মে ঈশ্বর মাটি ব্যবহার করেছিলেন; সুতরাং, যোহন দেখাতে চান যিশুর পরিত্রাণ নবসৃষ্টিস্বরূপ। দ্বিতীয়, ইহুদী বিধান অনুসারে সাব্বাৎ দিনে যে-কোন জিনিস মাখানোই ছিল অবৈধ কাজ। কাজেই, সেই অন্ধ মানুষকে সুস্থ করার জন্য কাদা মাখিয়ে যিশু দেখাতে চান তিনি স্রষ্টা ও ত্রাণকর্তারূপেই বিধানের নিয়ম-কানুন থেকে স্বাধীন। কিন্তু, যেমন ৫

অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছিল, তেমনিভাবে এবারও ইহুদীরা সাব্বাৎ বিষয়ে যিশুর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি করে।

৯:৭—সিলোয়াম জলকুণ্ডে গিয়ে ধুয়ে ফেল: যেমন লালার বেলায় তেমনি এখনও যিশু জলের উপর কোন আরোগ্যকারী ভূমিকা আরোপ করেন না: তিনিই অদ্বিতীয় আরোগ্যদাতা ও ত্রাণকর্তা। একথা যোহন জোর দিয়ে সমর্থন করেন 'সিলোয়াম' নামের ব্যাখ্যার মাধ্যমে। হিব্রু ভাষায় সিলোয়ামের অর্থ হল 'প্রেরণকারী'। নামটি সেই প্রেরণকারী নরদমার দিকে অঙুলি নির্দেশ করে যার মধ্য দিয়ে গিয়োন ঝরনার জল জলকুণ্ডে বয়ে যেত। যোহন 'প্রেরণকারী'র স্থানে 'প্রেরিত' নাম দেওয়াতে যিশুর দিকেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন: জল দ্বারা নয়, ঈশ্বরের 'প্রেরিত' ব্যক্তি দ্বারাই সেই অন্ধ মানুষ আরোগ্যলাভ করেছে।

চিহ্নকর্মের বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক (৯:৮-৩৪)

৯ [৮] প্রতিবেশীরা ও যারা আগে তাকে ভিক্ষুক অবস্থায় দেখেছিল, তারা বলতে লাগল, 'এ কি সেই লোক নয়, যে বসে বসে ভিক্ষা করত?' [৯] কেউ কেউ বলল, 'সে-ই বটে।' আবার কেউ কেউ বলল, 'না, সে নয়, কিন্তু দেখতে তারই মত।' তখন লোকটি নিজে বলল, 'আমিই সে।' [১০] তাই তারা তাকে বলল, 'তবে কেমন করে তোমার চোখ খুলে গেল?' [১১] সে উত্তর দিল, 'যিশু নামে সেই মানুষ কাদা তৈরি করে আমার চোখে তা মাখিয়ে দিলেন এবং আমাকে বললেন, সিলোয়াম জলকুণ্ডে গিয়ে ধুয়ে ফেল; তাই আমি গেলাম, আর ধোয়ামাত্র চোখে দেখতে পেলাম।' [১২] তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটা কোথায়?' সে বলল, 'জানি না।' [১৩] যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল, তাকে তারা ফরিশীদের কাছে নিয়ে গেল। [১৪] যিশু যেদিন কাদা তৈরি করে তার চোখ খুলে দিয়েছিলেন, সেদিনটি সাব্বাৎ ছিল। [১৫] তাই ফরিশীরা তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সে কেমন করে চোখে দেখতে পেয়েছে। সে তাঁদের বলল, 'তিনি আমার চোখের উপরে কাদা লাগিয়ে দিলেন, পরে ধুয়ে ফেললাম, আর এখন দেখতে পাচ্ছি।' [১৬] তখন

কয়েকজন ফরিশী বললেন, ‘ওই লোকটা ঈশ্বর থেকে আসে না, কারণ সে সাব্বাৎ
দিন মানে না।’ কিন্তু অন্য কেউ বললেন, ‘পাপী মানুষ কেমন করে তেমন চিহ্নকর্ম
সাধন করতে পারে?’ তাই তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। [১৭] তখন তাঁরা
অন্ধটিকে আবার বললেন, ‘তার সম্বন্ধে তুমি কী বল? তোমার চোখ তো সে-ই খুলে
দিয়েছে!’ সে বলল, ‘তিনি একজন নবী।’
[১৮] সে যে অন্ধ ছিল আর এখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে, তা ইহুদীরা বিশ্বাস
করলেন না, যতক্ষণ না দৃষ্টিশক্তি-পাওয়া লোকটির পিতামাতাকে ডাকিয়ে এনে
[১৯] জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ কি তোমাদের ছেলে, যার বিষয়ে তোমরা নাকি বলছ
যে, অন্ধ হয়ে জন্মেছিল? তবে সে কেমন করে এখন চোখে দেখতে
পাচ্ছে?’ [২০] তার পিতামাতা উত্তরে তাঁদের বলল, ‘এ যে আমাদের ছেলে আর
অন্ধ হয়ে জন্মেছিল, আমরা তা জানি। [২১] কিন্তু কেমন করে যে এখন চোখে
দেখতে পাচ্ছে, তা জানি না, আর কেইবা এর চোখ খুলে দিয়েছে, তাও জানি না।
আপনারা একেই জিজ্ঞাসা করুন, এর তো বয়স হয়েছে। নিজের কথা নিজেই
বলবে।’ [২২] ইহুদীদের ভয় করত বিধায়ই তার পিতামাতা তেমন উত্তর
দিয়েছিল, কারণ এর মধ্যে ইহুদীরা এতে সম্মত হয়েছিলেন যে, যদি কেউ তাঁকে
খ্রিষ্ট বলে স্বীকার করে, সে সমাজগৃহ থেকে বিচ্যুত হবে। [২৩] এজন্যই তার
পিতামাতা বলেছিল, ‘এর বয়স হয়েছে, একেই জিজ্ঞাসা করুন।’
[২৪] সুতরাং ইহুদীরা, যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল, তাকে দ্বিতীয়বার ডাকিয়ে এনে
বললেন, ‘ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ কর! আমরা জানি যে, ওই লোকটা একজন
পাপী।’ [২৫] সে উত্তর দিল, ‘তিনি একজন পাপী কিনা, জানি না; একটা কথা
আমি জানি, অন্ধ ছিলাম, আর এখন চোখে দেখতে পাচ্ছি।’ [২৬] তাঁরা তাকে
বললেন, ‘সে তোমাকে কী করেছিল? কেমন করে তোমার চোখ খুলে
দিয়েছিল?’ [২৭] সে তাঁদের উত্তর দিল, ‘আগেও তো আপনাদের বলেছি, আর
আপনারা শোনেননি। আবার শুনতে চাচ্ছেন কেন? আপনারাও কি তাঁর শিষ্য হতে
চান?’ [২৮] তাকে ভর্ৎসনা করে তাঁরা বললেন, ‘তুমিই ওর শিষ্য, আমরা মোশিরই
শিষ্য। [২৯] আমরা জানি যে, ঈশ্বর মোশির সঙ্গেই কথা বলেছিলেন, কিন্তু ও যে
কোথা থেকে এসেছে, আমরা তা জানি না।’ [৩০] লোকটি তাঁদের উত্তর দিল, ‘এই
তো আশ্চর্যের ব্যাপার: তিনি যে কোথা থেকে আসেন, তা আপনারা জানেন না;
অথচ তিনিই আমার চোখ খুলে দিলেন। [৩১] আমরা জানি যে, ঈশ্বর পাপীদের

কথা শোনেন না, কিন্তু কেউ যদি ঈশ্বরভক্ত হয় ও তাঁর ইচ্ছা পালন করে, তবে তিনি তার কথা শোনেন। [৩২] জগতের আদি থেকে এমন কথা কখনও শোনা যায়নি যে, জন্মান্ধ মানুষের চোখ কেউ খুলে দিয়েছে। [৩৩] তিনি যদি ঈশ্বর থেকে আগত না হতেন, তাহলে কিছুই করতে পারতেন না।' [৩৪] তাঁরা প্রতিবাদ করে তাকে বললেন, 'তুমি একেবারে পাপের মধ্যেই জন্মেছ আর আমাদের শিক্ষা দেবে?' আর তাকে বের করে দিলেন।

চিহ্নকর্ম সাধন করে যিশু অন্যত্র চলে যান, আর সেখানে থেকে যায় জনতা; তারা চিহ্নকর্মের সম্মুখীন হয়ে, এমনকি যিশুরই সম্মুখীন হয়ে আপন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। জনতার বেশির ভাগ হতভম্ব, তারা ঘটনাটা বিচার করতে অক্ষম। কিন্তু ফরিশীদের মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত: অবিশ্বাসী বলে তারা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল লক্ষণের সামনেও চোখ বুজে থাকে। নিজেদের অবিশ্বাসের কারণস্বরূপ তারা সাব্বাৎ-লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করে: যিশু সাব্বাতের নিয়ম লঙ্ঘন করলেন বলে নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের লোক নন। অন্ধ মানুষের প্রতিক্রিয়া এক প্রকারে সামারীয় নারীর মত: তার বিশ্বাস ক্রমে ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। প্রথম প্রশ্নে সে উত্তরে যে-কি বলবে নিজে জানে না; পরে 'তিনি একজন নবী' উক্তিতে সে স্বীকার করে, তার বিবেচনায় যিশু ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র। কিন্তু ইহুদীরা নিজেদের অন্ধতায় অবিশ্বাসী হয়ে থাকে এবং নিজেদের অবিশ্বাস-সমর্থনে অন্ধ লোকের পিতামাতাকে ডেকে আনে; এরা কিন্তু ইহুদীদের ভয়ে স্পষ্ট কথা বলতে সাহস করে না।

৯:২২খ—এর মধ্যে ইহুদীরা এতে সম্মত হয়েছিলেন যে… : যোহনের সময়ে যারা যিশুকে বিশ্বাস করত তারা সাধারণত ইহুদী সমাজগৃহ থেকে বহিষ্কৃত হত, অর্থাৎ সমাজচ্যুত হত; এই বহিষ্করণ ছিল সেকালের একপ্রকার অত্যাচার।

৯:২৪—ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ কর: এই স্বীকারোক্তিতে ইহুদীরা ঈশ্বরকেই একমাত্র গৌরবের পাত্র বলে ঘোষণা করত। একই স্বীকারোক্তি তারাই উচ্চারণ করত যাদের ঈশ্বরের সামনে আপন দোষত্রুটি স্বীকার করা উচিত ছিল (যোশুয়া ৭:১৯; ১

শামু ৬:৫; যেরে ১৩:১৬)। সুতরাং, ইহুদীদের উদ্দেশ্য, লোকটি যিশুর সপক্ষে দেওয়া সাক্ষ্য ফিরিয়ে নেবে, ফলত তারা যিশুকে পাপী বলে অভিযুক্ত করবে। কিন্তু লোকটি তাদের উসকানিতে পরাভূত নয়, এমনকি তাদের গোপন মনোভাব যে অনুভব করতে পেরেছে তা নিজের উপহাসমূলক প্রশ্নে প্রকাশ পায়: আপনারাও কি তাঁর শিষ্য হতে চান?

৯:২৮—**তুমিই ওর শিষ্য:** এখানেও ইহুদী ও আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যকার বৈপরীত্য আলোচিত হয়; সেসময় 'খ্রিষ্টের শিষ্য' অপমানজনক কথা ছিল। উপরন্তু ইহুদীরা এবার মোশিরই শিষ্য বলে নিজেদের ঘোষণা করে, তবু এবিষয়ে যিশু আগেই তাদের বলেছিলেন যে, মোশি প্রকৃতপক্ষে তাঁরই সাক্ষী (৫:৪৬) এবং তারা যদি সত্যিই মোশির শিষ্য হত তবে তাদের উচিত যাঁর বিষয়ে মোশি লিখেছিলেন সেই ঐশপ্রকাশকারী ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস রাখা।

৯:৩০—**এই তো আশ্চর্যের ব্যাপার… :** শাস্ত্রবিদ ইহুদীরা জানেন না, অপরদিকে অশিক্ষিত একজন সাধারণ লোক হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম, এমনকি তাদের একটা উপদেশও দেয়। তার এ সাহসের জন্য লোকটিকে তাদের দ্বারা সমাজচ্যুত করা হয়।

রোগমুক্ত লোকের বিশ্বাস এবং ইহুদীদের অন্ধকরণ (৯:৩৫-৪১)

৯ [৩৫] তাঁরা তাকে বের করে দিয়েছেন, কথাটা শুনে যিশু লোকটিকে খুঁজে পেয়ে তাকে বললেন, 'মানবপুত্রের প্রতি তোমার কি বিশ্বাস আছে?' [৩৬] উত্তরে সে বলল, 'প্রভু, তিনি কে, আমি যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারি।' [৩৭] যিশু তাকে বললেন, 'তুমি তো তাঁকে দেখেছ; যিনি তোমার সঙ্গে কথা বলছেন, তিনিই।' [৩৮] সে বলল, 'প্রভু, আমি বিশ্বাস করি!' এবং তাঁর সামনে প্রণিপাত করল।

[৩৯] তখন যিশু বললেন, ‘আমি এই জগতে এসেছি এক বিচারের জন্য—যারা দেখতে পায় না, তারা যেন দেখতে পায়, এবং যারা দেখতে পায়, তারা যেন অন্ধ হয়ে যায়।’ [৪০] যে কয়েকজন ফরিশী তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা এই সমস্ত কথা শুনে তাঁকে বললেন, ‘আমরাও কি অন্ধ?’ [৪১] যিশু তাঁদের বললেন, ‘যদি অন্ধ হতেন, তাহলে আপনাদের পাপ থাকত না, কিন্তু এখন যে আপনারা বলছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের পাপ রয়ে গেছে।’

৯:৩৫—কথাটা শুনে যিশু··· : সমাজচ্যুত হওয়ায় লোকটি যখন যিশুর জন্য সবকিছু হারিয়েছে তখনই যিশু এসে উপস্থিত হয়ে তাকে পূর্ণ বিশ্বাসের দিকে চালিত করেন। আগেও বলা হয়েছিল যে, কেবল যিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা সম্ভব।

যিশু মানবপুত্র বলে আত্মপরিচয় দেন: এবিষয়ে আমরা জানি যে এই বিশেষ নাম দিয়ে যোহন নিজের কাছে সকলকে আকর্ষণ করার যিশুর অধিকার-ক্ষমতাই প্রকৃতপক্ষে লক্ষ করেন (১২:৩২)। এজন্য যিশুর প্রশ্নে একটা প্রতিশ্রুতিও বর্তমান: যদি লোকটি যিশুকে মানবপুত্ররূপে গ্রহণ করে তাহলে তিনি তাকে নিজের গৌরবের সহভাগী করবেন। মানবপুত্ররূপে পৃথিবীস্থ যিশু হলেন ঈশ্বরের গৌরব ও সান্নিধ্যের বর্তমান ও বাস্তব অভিব্যক্তি (১:৫১), কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতি তখনই পূর্ণতা লাভ করবে যখন তিনি ক্রুশে উত্তোলিত-গৌরবান্বিত হবেন (৩:১৪; ১২:২৩; ১৩:৩১), কেননা তখনই তিনি বিশ্বাসীদের সেই ঊর্ধ্বলোকে চালিত করবেন যেখান থেকে নেমে এসেছিলেন (৩:১৩; ৬:৬২)। অবশ্যই লোকটি এ সকল কথা উপলব্ধি করতে অসমর্থ, কিন্তু সুসমাচারের পাঠকগণ বোঝেন যে যিশু তাকে চোখের আলো শুধু নয়, জীবনের আলোও দান করতে চান (৮:৩২)।

৯:৩৭—যিনি তোমার সঙ্গে কথা বলছেন, তিনিই: এই বাক্যে একথা প্রমাণিত হয় যে, যিশুর প্রতিশ্রুতি-সকল উচ্চারিত হওয়া মাত্রই সিদ্ধি লাভ করে।

৯:৩৮—প্রভু, আমি বিশ্বাস করি: লোকটি যিশুর আত্মপ্রকাশের কথায় বিশ্বাস করে; এ ধরনেরই বিশ্বাস যে যথেষ্ট শুধু এমন নয়, এটিই হল যিশুর শর্তহীন অনুসরণের জন্য ও তাঁর দাবি সকল পূরণের জন্য প্রকৃত বিশ্বাস: লোকটি প্রণিপাত করায় তা প্রকাশ পায়: যিশুই প্রকৃত মন্দির, পিতার যথার্থ উপাসনার জন্য একমাত্র স্থান, যিশুতে স্বয়ং ঈশ্বর নিজের গৌরব, পরিত্রাণদায়ী শক্তি ও সাহায্যকারী ভালবাসায় মানুষের কাছে বিদ্যমান হন। 'প্রণিপাত করা': যে সম্মান ঈশ্বরকে দেওয়া হয় সেই একই সম্মানে ঈশ্বরের প্রেরিত ত্রাণকর্তাকেও সম্মানিত করা উচিত (এ পরিপ্রেক্ষিতে একথা স্মরণযোগ্য যে, বাইবেলের ভাষায় মানুষ কেবল ঈশ্বরের সামনেই 'প্রণিপাত' করে)।

৯:৩৯—আমি… এসেছি এক বিচারের জন্য: যারা ঈশ্বরের প্রেরিতজনকে অগ্রাহ্য করে, তাদের অবিশ্বাসই তাদের কাছে বিচারস্বরূপ (৩:১৮; ১২:৪৮)। এ বিচার মানুষদের দুই ভাগে পৃথক পৃথক করে: তারা যারা কেবল চোখে মাত্র নয়, বিশ্বাসপূর্ণ অন্তরেই দেখে, এবং তারা যারা দেখে বলে দাবি করে অথচ প্রকৃতপক্ষে অন্ধ অর্থাৎ ঐশসত্য দেখতে অক্ষম। পুরাতন নিয়মকাল থেকেও নবী ইশাইয়া অন্ধকরণের বাণী পূর্বঘোষণা করেছিলেন (ইশা ১২:৪০); তবু যিশুর বাণীই বিশেষত কঠোর, কেননা তার মধ্য দিয়ে মানুষের এই অন্ধকরণ মানুষের উপরেই মাত্র আরোপণীয় নয় বরং ঈশ্বরেরই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে: কথাটা রহস্যাবৃত, যোহন নিজে এ রহস্য ভেদ করবেন বলে দাবি করেন না।

৯:৪১—যদি অন্ধ হতেন… : মানুষের অন্ধকরণ ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুযায়ী, এবং যিশুর আগমনেই ঘটমান বটে; তা সত্ত্বেও মানুষের নিজের দায়িত্ব হ্রাস পায় না, এমনকি অন্ধকরণের যথার্থ দোষ মানুষেরই। ইহুদীরা ধর্মশাস্ত্র জানে বিধায় দেখতে পারে, এজন্য যদি তারা যিশুকে বুঝতে না চায় তাহলে এটিই তাদের দোষ, কাজেই তারা ঈশ্বরের বিচারদণ্ডের অধীন। বস্তুত, তাদের অন্ধতা অর্থাৎ তাদের পাপ হল ঐশপ্রকাশের সামনে

অহঙ্কারজনিত রুদ্ধতা, নিজেদের গৌরবের অন্বেষণ এবং খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ। বলা বাহুল্য, এ অবস্থা শুধু সেইকালের ইহুদীদের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

পরিশিষ্ট

মানুষের দায়িত্ব ও ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারণ

যোহনের সুসমাচারে আমরা একাধিকবার পূর্বনির্ধারণসূচক ধারণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি যা অনুসারে আমরা বুঝি যে খ্রিষ্টমণ্ডলীর সদস্য হওয়া ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারণের উপর নির্ভর করে। ধারণাটি বিশেষভাবে প্রকাশ পায় ৯:৩৯-এ: সেই পদ বলে যে পৃথিবীতে যিশুর কাজ বিচারকর্মেই সম্পন্ন হয়: যারা অন্ধ তারা দেখতে পাবে এবং যারা দেখে তারা অন্ধ হবে। আরও, ১২:৩৮-৪০-এ নবী ইশাইয়ার বাণী অনুসারে (ইশা ২:৯) ঘোষিত হয় ইহুদীরা অবিশ্বাসী হয়েছিল যেহেতু বিশ্বাস করতে পারত না। অথচ, আমরা অন্য ধরনের ধারণারও সম্মুখীন হলাম: সেগুলো অনুসারে বিশ্বাস করা এমন জিনিস যা মানুষেরই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে এবং যে-কেউ ঈশ্বরের প্রেরিতজনকে অস্বীকার করে, এই অস্বীকারের জন্য সে-ই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। সুতরাং, সুসমাচারে আলাদা দু'টো ধারণা বর্তমান, একটা মানুষের স্বাধীন দায়িত্ব এবং অপরটা ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারণ সমর্থন করে। এই পরিশিষ্টে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান করতে চাই এমন নয়, যেহেতু সমস্যাটি একটা গূঢ় তত্ত্ব। তথাপি যোহনের দেওয়া কতিপয় ইঙ্গিত অনুসারে এবিষয়ের উপর কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে।

ধারণা দু'টোর মধ্যকার বৈপরীত্য

১। যোহনের সমগ্র লেখায় যিশুর শুভসংবাদের এ-ই বৈশিষ্ট্য বিশেষত প্রকাশ পায় যে, শুভসংবাদটা খুবই কঠিন ও দুরূহ। ১ যোহন ৩:২৩-এ 'ঈশ্বরের আজ্ঞা' এভাবে সংক্ষেপিত হয়: তাঁর পুত্র যিশুখ্রিষ্টের নামে বিশ্বাস রাখা ও পরস্পরকে ভালবাসা। খ্রিষ্টবিশ্বাসীর পক্ষে বিশ্বাস ও ভালবাসা দু'টোই অপরিহার্য শর্ত: নীতি বিশ্বাসের উপর

অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে আত্মোৎসর্গের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং বিশ্বাস নীতিতে অর্থাৎ সদাচরণে প্রমাণিত। সুতরাং বিশ্বাস হল মানুষের সামনে রাখা একটা জরুরি দাবি: সে যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখার সিদ্ধান্ত নেবে এবং তেমন সিদ্ধান্ত তার কাছে অসাধ্য হবে না; বস্তুত যিশু অবিরতই বিশ্বাস করতে সকলকে (অবিশ্বাসী ইহুদীদেরও) আহ্বান করেন (৮:৫১; ১০:৩৭)।

খ্রিষ্টমণ্ডলীর নিজেরই দায়িত্ব জগতে বাণীপ্রচার করা যাতে বিশ্বাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় (১৭:১৮, ২০…)। উপরন্তু, এধারণা দু'টো প্রবলভাবেই অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব এবং ফলত অবিশ্বাস-পাপের ক্ষমাহীনতা: অবিশ্বাসী আত্মদণ্ডিত হয় (৩:১৮; ৮:২৪) এবং অবিশ্বাস হল পরিত্রাণগ্রহণের অনিচ্ছা-প্রকাশ (৫:৪০; ৭:১৭) ও পাপ (৮:২১ প্রভৃতি)। বিশ্বাস করা যে মানুষের পক্ষে অসাধ্য নয় এর প্রমাণ এই যে, সেইকালে অনেক ইহুদী খ্রিষ্টের প্রতি বিশ্বাস রেখেছিল।

বিশ্বাস বিষয়ে অন্য একটা পরিশিষ্টে আলোচনা করা হয়েছে; এখানে শুধু এই দিক দৃঢ়তার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হোক যে, বিশ্বাস মানুষের নৈতিক আচরণের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত। এমন উদ্ধৃতাংশগুলো রয়েছে, (৫:৪০… ; ৩:১৯-২১; ১ যোহন ৩:১৩… ; ইত্যাদি) যেগুলো থেকে যোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুমান করা যায় যে, মানুষের অসৎকর্মই যিশুর ঐশপ্রকাশ-উপলব্ধি থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে।

একবার বিশ্বাস-সিদ্ধান্ত নিয়ে মানুষ বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান হবার জন্য এবং যিশুর বাণীতে স্থিতমূল থাকার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকবে (৮:৩১; ১৩:১৯; ১৪:২৯; ১৬:১-৪ এবং ১ যোহন ২:২৪, ২৭, ২৮; ৩:২৩; ৪:১; ৫:১৩); যে নিষ্ঠাবান থাকার চেষ্টা করে না সে সম্ভবত একদিন বিশ্বাস ত্যাগ করবে। একই কথা নীতির ক্ষেত্রে, বিশেষত পারস্পরিক ভালবাসা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য: ইতিমধ্যেই যে পাপ থেকে শুচীকৃত হয়েছি, এমনকি যে পাপ না-করার ক্ষমতা পেয়েছি তেমন প্রতিশ্রুতি আছে বটে (১ যোহন ৩:৯), কিন্তু তবুও একাধারে এই সদুপদেশও অনবরত পুনরাবৃত্ত যে, পাপ থেকে দূরে থাক ও পারস্পরিক ভালবাসায় নিষ্ঠাবান হও।

২। ইহুদীদের অবিশ্বাস বিষয়ে, ৬ অধ্যায় যিশু বলেন যে বিশ্বাস হল পিতা ঈশ্বরের বিশেষ একটি অনুগ্রহদান: পিতা যদি মানুষকে আকর্ষণ না করেন, কেউই যিশুর কাছে

আসতে পারবে না (৬:৪৪-৪৫); পদটি ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছিল যে, পুত্রের ঐশপ্রকাশ গ্রহণের জন্য পিতার আন্তরিক প্রেরণা অপরিহার্য, মানুষ কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে যিশুর বাণীর 'শিক্ষা' নেওয়ায় অর্থাৎ সেই বাণী গ্রহণ করায় পিতার 'আকর্ষণ' দ্বারা নিজেকে চালিত হতে দেবে। তবু একথা স্বীকার্য যে, বিশ্বাস ক্ষেত্রে পিতা ও মানুষের মধ্যকার সহযোগিতা একটি রহস্য। ৬:৬৫-তেও যিশুর উক্তি ইহুদীদের অবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত এবং মানুষের দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পুনর্ঘোষিত হয়।

মনোনয়ন ও প্রত্যাখ্যানের মধ্যকার সম্পর্কও একটা সমস্যা সৃষ্টি করে: যিশুই সেই বারোজনকে বেছে নিয়েছিলেন বটে (১৫:১৬), তা সত্ত্বেও তাঁদের একজন তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতক হল। সমস্যাটা সমাধানের জন্য যোহন বলেন যিশু আগে থেকেই একথা জানতেন এবং সেবিষয়ে শাস্ত্রের একটা ভাববাণী উল্লেখ করেন (৬:৬৪; ১৩:১১, ১২, ১৮), কিন্তু এ পূর্বনির্ধারণসূচক ধারণার সঙ্গে নৈতিক একটা অভিযোগও বর্তমান: যুদা ছিল চোর (১২:৬)। সুতরাং মনোনয়ন-প্রত্যাখ্যান সমস্যাও রহস্যরূপে দাঁড়ায়।

নৈতিক দিক পুনরায় জোর দিয়ে ৮:৪৩-৪৭-এ উল্লিখিত: যিশুর আগমনে মানুষ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়: ঈশ্বর হতে উদ্গত বিশ্বাসীগণ এবং দিয়াবল হতে উদ্গত অবিশ্বাসীগণ; তথাপি উদ্ধৃতির বিশ্লেষণে একথা প্রকাশ পেয়েছে যে, লোকদের অসৎ ব্যবহারই তাদের অবিশ্বাসের দিকে আকর্ষণ করেছে। এবিষয়ে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য যে, যোহনের লেখায় এমন সত্য কখনও প্রচারিত হয় না যা অনুসারে ঈশ্বর আদি থেকে দুই শ্রেণিতে (মনোনীতজন ও অভিশপ্তজন) মানুষকে ভাগ করেছেন। বিশ্বাসীর সম্পর্কে বলা হয়, তারা তাঁর বাণী শোনে বিধায় এবং মেষপালকের কণ্ঠ জানে বিধায় (১০:৪; ১৪) ঈশ্বর হতে উদ্গত (৮:৪৩, ৪৭); তারা যে যিশুর আপনজন তা হল পিতার সিদ্ধান্ত: পিতাই পুত্রকে বিশ্বাসীগণকে দান করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ৬:৩৭, ৭৯ এবং ১৭:২, ৬, ৯, ২৭শেও বর্তমান। ঈশ্বরের এ মনোনয়ন কিন্তু চিরগতিশীল, অর্থাৎ খ্রিষ্টমণ্ডলী এ মনোনয়নের জন্য আত্মতৃপ্তি শুধু ভোগ করবে না, বরং অবিরত সচেতন থাকবে যে, জগৎ যেন বিশ্বাস করে সেজন্যই সে জগতে প্রেরিত হয়েছে; তবুও একাধারে এধারণাও উপস্থিত: যে প্রক্ষিপ্ত সন্তানেরা বিশ্বাসী হবে তারাও মণ্ডলীর পালে ঈশ্বর দ্বারা চালিত হয়েছে। সুতরাং, এ বিষয়টাও একটা রহস্য।

এবিষয়ে ইহুদী ঐতিহ্যের ধারণা

১। ঐশপূর্বনির্ধারণ ক্ষেত্রে ইহুদী ঐতিহ্য জোর দিয়ে মানুষের স্বাধীন দায়িত্ব সমর্থন করে। বেন-সিরা পুস্তকে লেখা আছে:

> আদিতে তিনি মানুষকে গড়লেন,
> পরে তাকে তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার হাতে ছেড়ে দিলেন।
> ইচ্ছা করলে তুমি আজ্ঞাগুলি পালন করবে;
> বিশ্বস্ত হওয়াই তোমার সদিচ্ছার উপরে নির্ভর করবে। [সিরা ১৫:১৪-১৫]

তবু ঐশপূর্বনির্ধারণের ধারণাও বর্তমান। যিশুর সময় সাদ্দুকীয়রা মানুষের স্বাধীন দায়িত্বই শুধু, অপরদিকে ফরিশীরা ঐশনির্ধারণের কথাও সমর্থন করত।

২। কুম্রান সম্প্রদায়ের বিবিধ লেখায় ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারণ দৃঢ়ভাবে উল্লিখিত: অবিশ্বাসী ও ধর্মত্যাগী যারা তারা ঈশ্বরের বিপরীত একটা অপশক্তির অধীন বলে গণ্য; তথাপি তাদের আচরণের জন্য তারাই দায়ী। বলা বাহুল্য, এধরনের ধারণা যোহনের ধারণার সদৃশ ধারণা। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে কতিপয় বৈসাদৃশ্যও দেখা দেয়: কুম্রান সম্প্রদায়ের সদস্যরা জনসাধারণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখত এবং জগৎকে প্রত্যাখ্যান করত, অপরদিকে খ্রিষ্টমণ্ডলী জগতের মাঝে প্রেরিত; তারা ইস্রায়েল জাতির মনোনীত ব্যক্তি বলে নিজেদের বিবেচনা করত, অপরদিকে খ্রিষ্টমণ্ডলী নবই ইস্রায়েল জনগণ বলে নিজেকে ঘোষণা করে; তারা বিধান পালনে পরিত্রাণের পথ পেত, মণ্ডলী বরং বিশ্বাস ও পারস্পরিক ভালবাসার সঙ্গে যিশুরই অনুসরণে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ লাভ করে।

ইহুদীদের কঠিন হৃদয়

যোহনের সুসমাচারের দুই জায়গায় অবিশ্বাসী ইহুদীদের ঈশ্বরের এমন দৃঢ়সঙ্কল্পের বশে বর্ণনা করা হয় যা অনুসারে তিনি তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের হৃদয় কঠিন করেছেন (৯:৩৯; ১২:৪০)। এতে ঈশ্বরের নির্দেশ প্রকাশ পায়, তথা তারা

যেন মন না ফেরায়। ঈশ্বরের এই নির্দেশ ইহুদীদের দ্বারা যিশুকে প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে জড়িত: তাদের অবিশ্বাসে ইহুদীরা যেন অন্ধকারের বশে বশীভূত (১২:৪৫)। ১ যোহন ২:১১ অনুসারে ইহুদীদের অবিশ্বাসের কারণস্বরূপ ভাইদের প্রতি তাদের হিংসায় কেন্দ্রীভূত: তারা যিশুকে এবং তাঁর মণ্ডলীকে অগ্রাহ্য করে। একথা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবিষয়ে যোহনের ধারণার ঐতিহাসিক পটভূমি: ইহুদীরা খ্রিষ্টমণ্ডলীকে অত্যাচার করত, সুতরাং যোহন খ্রিষ্টমণ্ডলীর একটা আত্মপক্ষসমর্থন লিখে গেছেন। একথা দিয়ে আমরা বলতে চাই না যে আত্মপক্ষসমর্থন-ই হয়েছে যোহনের কঠিন উক্তির কারণ; রহস্যটা রয়েছে: এক দিকে ঈশ্বর নিজে তাদের হৃদয় কঠিন করেছেন এবং অপরদিকে তাদের নিজেদের দোষ রয়েছে (৯:৪১; ১২:৪২)।

'তাদের হৃদয় কঠিন করেছেন', এবাক্যের মধ্য দিয়ে যোহন কি বলতে চান? পুরাতন নিয়মে এবাক্যের মাধ্যমে এধারণাই ব্যক্ত হত যে, যারা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেন (যাত্রা ৪:২১; ৭:৩; ৮:১১, ২৮; ৯:৩৪; দ্বিঃবিঃ ২:৩০; সাম ৯৫:৮; ইশা ৬:১০)। ৬ অধ্যায়ে যোহন মরুপ্রান্তরে বিদ্রোহী তাদের সেই পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ইহুদীদের সম্পর্ক স্থাপন করেন (৬:৪১, ৫২), অর্থাৎ তাঁর সমকালীন ইহুদীদের অবিশ্বাস পুরাতন নিয়মকালের ইস্রায়েল জনগণের আচরণের আলোতে ব্যাখ্যা করেন, এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাই যাতে তেমন অবিশ্বাসী জনগণ আরোগ্য না পায়; তথাপি একাধারে তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, বাস্তবিকপক্ষে একাধিক ইহুদী খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। সুতরাং, এক্ষেত্রেও একটা গূঢ় তত্ত্বের সম্মুখীন হই: ইহুদীরা যিশুর প্রতি বিশ্বাসী হয়নি কেন?

উপসংহারস্বরূপ একথা বলা যেতে পারে যে, ইহুদীদের হৃদয় কঠিন করা ঈশ্বরের এই নির্দেশ অর্থপূর্ণ হয়ে থাকে সর্বকালের মানুষ যেন তাদের মত ব্যবহার না করে। যোহনের ধারণাই যে ইস্রায়েল জনগণের মধ্যে ফরিশী ও ধর্মগুরুরাই বিশেষত দণ্ডনীয়; এবং তাদের জেদেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ পূর্ণ প্রকাশ পায়; অথচ ইহুদীরা সর্বকালের সেই মানুষের প্রতীক, যে মানুষ ঈশ্বরের প্রেরিত ঐশপ্রকাশকর্তা সেই যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখে না। যোহনের পক্ষে বিশ্বাস-অবিশ্বাস সমস্যা একটি রহস্য, যে রহস্যে ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারণ এবং মানুষের স্বাধীন দায়িত্ব একাধারে বর্তমান।

মন্দির উৎসর্গীকরণ পর্ব

(১০:১—১১:৫৪)

যদিও সুসমাচারের এই অংশ ৯ অধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তবুও একথা সমর্থন করা যায় যে, 'মন্দির উৎসর্গীকরণ পর্ব চলছিল' যোহনের এই মন্তব্যের জন্য (১০:২২) তা মন্দির উৎসর্গীকরণ পর্বেই বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত। বাস্তবিক, এই পর্ব উপলক্ষে যিশু ঈশ্বরপুত্র ও উত্তম মেষপালক বলে আত্মপরিচয় দেন এবং এই ভূমিকার প্রমাণস্বরূপ বলেন যে, পিতা দ্বারা তাঁর হাতে ন্যস্ত মেষগুলির মধ্যে একটিমাত্রও তিনি হারাবেন না, এমনকি, লাজারের পুনর্জীবনদানের মধ্য দিয়ে (১১ অধ্যায়) তিনি প্রমাণ করেন যে মৃত্যু থেকে তাদের পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারেন।

মন্দির উৎসর্গীকরণ পর্বটি ১৬৫ খ্রিঃ পূঃ যেরুশালেমের মন্দির পুনরুৎসর্গ স্মরণ করার জন্য মাকাবীয় যুদা দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল (১ মাকা ৪:৩৬-৫৯; ২ মাকা ১:৯-১৮; ১০:১৮)। পর্বটি আট দিন ব্যাপী চলত এবং পর্ণকুটির পর্বের মত আলোর পর্ব বলে পরিগণিত ছিল। কিন্তু, এ পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে মন্দির ও যেরুশালেমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল: ঈশ্বরই যেরুশালেমের চিরকালীন রাজা, তিনিই মন্দির পবিত্র করে তোলেন এবং নিজ পুত্র সেই মশীহ-রাজকে পবিত্র তেলে অভিষিক্ত করলেন। সুতরাং, ঈশ্বর আপন জনগণের মধ্যে উপস্থিত আর সেই জনগণকে একত্রিত ও সঞ্জীবিত করে থাকেন। এজন্য অতীতকালে এই পর্বোদ্‌যাপনে ইস্রায়েল জনগণের রাজাকে 'ঈশ্বরপুত্র' (সাম ২) ও 'ইস্রায়েলের পালক' (সাম ৮০) বলে পুনর্ঘোষণা করা হত।

যিশুর সময় এই পর্ব উপলক্ষে শাস্ত্রপাঠসূচী ছিল এরূপ: গণনা ৭, যেখানে আবাস পবিত্রীকরণ উল্লিখিত; এজে ৩৪: ঈশ্বরই উত্তম মেষপালক, এবং সাম ৩০: মৃত্যু থেকে মুক্ত ব্যক্তির ধন্যবাদজ্ঞাপন। সহজে অনুভব করতে পারি যে, উল্লিখিত বিষয় তিনটি যিশুকে লক্ষ করে, কেননা যিশুই ঈশ্বরের প্রকৃত তৈলাভিষিক্তজন (মশীহ বা খ্রিষ্ট) ও ঈশ্বরপুত্র, তিনিই উত্তম মেষপালক, তিনিই লাজারকে (মানুষকে) পুনর্জীবন দান করতে

সক্ষম। এবারও বলতে পারি, পুরাতন নিয়মের ঘটনা ও ভাববাণী-সকল যিশুতে সিদ্ধি লাভ করেছে।

মেষপালক এবং মেষগুলি (১০:১-৬)

১০ [১] 'আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, দরজা দিয়ে মেষঘেরিতে না ঢুকে যে কেউ অন্য দিক দিয়ে বেয়ে ওঠে, সে তো চোর ও দস্যু; [২] দরজা দিয়ে যে ঢোকে, সে-ই মেষগুলির পালক। [৩] দারোয়ান তারই জন্য দরজা খুলে দেয়; মেষগুলি তার কণ্ঠস্বর শোনে, ও সে নিজের মেষগুলিকে এক একটা নাম ধরে ডাকে ও তাদের বাইরে নিয়ে যায়। [৪] নিজের সমস্ত মেষ বাইরে আনবার পর সে তাদের আগে আগে চলতে থাকে, আর মেষগুলি তার কণ্ঠ চেনে বিধায় তার পিছু পিছু চলে। [৫] অচেনা লোকের পিছনে তারা চলে না, বরং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, কারণ অচেনা লোকের কণ্ঠ তারা চেনে না।' [৬] যিশু এই রূপকটা তাঁদেরই জন্য বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারলেন না তিনি তাঁদের কী বলতে চাচ্ছিলেন।

এ রূপক-কাহিনীর প্রধান চরিত্র হল মেষপালক এবং মেষগুলি। চোর ও দস্যুর উল্লেখের মধ্য দিয়ে মেষপালকের আদর্শ ভূমিকা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, মেষপালক হলেন স্বয়ং যিশু এবং মেষগুলি তাঁর বিশ্বাসীগণ।

১০:৪—সমস্ত মেষ বাইরে আনবার পর··· : মেষপালক ও মেষগুলির মধ্যে পরস্পর চেনাশোনা ও আন্তরিকতা রয়েছে: মেষগুলি তার কণ্ঠ চেনে এবং তার ডাকে তাকে অনুসরণ করায় সাড়া দেয়। এখানে দু'টো শব্দ লক্ষণীয়: অনুসরণ ও চেনা। খ্রিষ্টবিশ্বাসী যিশু দ্বারা আহূত হওয়ার পর ও তাঁর নিজের অধিকার হয়ে যাবার পর বিশ্বাসের পথে তাঁকে অনুসরণ করে, তাঁকে ঐশপ্রকাশকারী ব্যক্তি বলে চেনে, তাঁর বাণী উপলব্ধি করে এবং তাঁর জীবনের সহভাগী হয়, ঠিক ৯ অধ্যায়ের সেই জন্মান্ধ লোকের মত যে ঈশ্বরকে চেনে বলে যিশুর বাণী শোনে (৯:৩৩···) এবং বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁকে

অনুসরণ করে (৯:৩৫-৩৮)। সুতরাং, যেমন মেষপালক ও মেষগুলির মধ্যকার সম্পর্ক-ক্ষেত্রে, তেমনি যিশু ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যকার সম্পর্ক ক্ষেত্রেও ঘটে: বাণী-শ্রবণেই আমরা যিশুর শিষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত।

১০:৬—যিশু এই রূপকটা তাঁদেরই জন্য বলেছিলেন… : সবসময়ের মত এবারও অবিশ্বাসী শ্রোতারা (যাদেরই বিশেষভাবে রূপকটি লক্ষ করে!) যিশুর বাণীর অর্থ গ্রহণ করতে অক্ষম; তাদের এই আচরণে তারা প্রমাণ করে, তারা তাঁর মেষগুলির নয় এবং তাঁর কণ্ঠ চেনে না। অপরদিকে রয়েছে যিশুর বিশ্বাসীমণ্ডলী: মেষপালক যিশুর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং নকল পালকদের থেকে তার বিচ্ছেদ স্পষ্টভাবে ফোটে ওঠে।

মেষগুলির দরজা যিশু (১০:৭-১০)

১০ [৭] তাই যিশু আবার তাঁদের বললেন, 'আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমিই মেষগুলির দরজা। [৮] আমার আগে যারা এসেছিল, তারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু মেষগুলি তাদের দিকে কান দেয়নি। [৯] আমিই দরজা: কেউ যদি আমার মধ্য দিয়ে ঢোকে, সে পরিত্রাণ পাবে, সে ভিতরে যাবে আবার বাইরে আসবে এবং চারণভূমির সন্ধান পাবে। [১০] চোর আসে কেবল চুরি, হত্যা ও ধ্বংস করার জন্য; আমি এসেছি তারা যেন জীবন পায় ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়।'

বিশ্বাসীগণ যেন যিশুর রহস্য অধিক গভীরভাবে অনুভব করে, বিশেষত এই কারণেই উপরোল্লিখিত কথা বলা হয়েছে।

যিশুই দরজা, এর মানে হল, মেষগুলির দরজা একটামাত্র: ত্রাণকর্তা একজনমাত্র ও পিতার উদ্দেশে গিয়ে পৌঁছানোর পথ একটামাত্র, সেই ত্রাণকর্তা ও পথ হলেন দরজা-ভূমিকামণ্ডিত যিশু। যেহেতু তিনি সেই একমাত্র ও অপরিহার্য পথ যে-পথের মধ্য দিয়ে মানুষের পক্ষে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, সেজন্য তিনি মেষগুলির পক্ষে দরজা, এবং

যেহেতু তিনি সেই শেষ ও চরম ঐশপ্রকাশকর্তা যিনি অন্যান্য নকল ত্রাণকর্তার পথ বিপথ বলে প্রকাশ ক'রে নিজের মেষগুলির কাছে যেতে তাদের বাধা দেন, সেজন্য তিনি মেষগুলির কাছে যাওয়ার দরজা। যিশু ব্যতীত অন্য কোন চরম প্রকাশকর্তা নেই, তাঁর তুলনায় ইহুদী ধর্মীয় নেতারা আর ভাবী নবী সকল মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারী।

স্মরণযোগ্য যে, দরজাস্বরূপ ত্রাণকর্তার প্রতীক ১১৮ সামগীতির সঙ্গে জড়িত: 'এই তো প্রভুর তোরণদ্বার, এর মধ্য দিয়ে ধার্মিকেরাই প্রবেশ করবে'।

১০:৯—কেউ যদি আমার মধ্য দিয়ে ঢোকে··· : কেবল যিশুর মাধ্যমে ঐশজীবন ও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। চারণভূমির কথায় আমরা বুঝি যে, শুধু চারণভূমিতে গেলে তবে মেষগুলি জীবিত থাকতে পারে। আবার এই চারণভূমির সাদৃশ্য পুরাতন নিয়মের অধিক বার ব্যবহৃত সাদৃশ্য; এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সহায়তাকে লক্ষ করা হয় (সাম ২৩:২): ইস্রায়েল জনগণ অন্য সকল জাতির মধ্য থেকে পরিত্রাণ পায় (এজে ৩৪:১২-১৫) এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হয় (ইশা ৪৯:৯···)। কিন্তু, এখন থেকে ইস্রায়েল শুধু নয়, সকল জাতির মানুষই যিশুর মাধ্যমে ঐশজীবন পেতে পারে।

১০:১০খ—আমি এসেছি··· : প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন যে অনন্ত জীবন এতে কোন সন্দেহ নেই। এই অসাধারণ ও প্রাচুর্যপূর্ণ ঐশজীবন আগেও সেই জলের উৎস যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী (৪:১৪; ৭:৩৮) ও সেই জীবনের রুটি যা খেলে আর কখনও ক্ষুধা পাবে না (৬:৩৫)—উভয় সাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছিল। যিশুর মাধ্যমে বিশ্বাসী অনন্ত জীবন পায়, সে ইতিমধ্যেই সেই ঐশজীবন পাবার জন্য উপযুক্ত, যে-জীবন প্রকৃত ও প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন: যিশুর দেওয়া প্রতিশ্রুতি কখনও এ মর্তজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং যা প্রতিশ্রুত তা ইতিমধ্যেই এক পরিমাণে প্রাপ্ত।

উত্তম মেষপালক যিশু (১০:১১-২১)

১০ [১১] 'আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেয়। [১২] যে শুধু বেতনভোগী, যে নিজে মেষপালক নয়, মেষগুলি যার নিজের নয়, নেকড়েবাঘ আসতে দেখলেই সে মেষগুলিকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়; আর নেকড়েবাঘ সেগুলিকে ছিনিয়ে নেয় ও ছড়িয়ে ফেলে। [১৩] বেতনভোগী বলেই সে পালিয়ে যায়, এবং মেষগুলির জন্য তার কোন চিন্তা নেই। [১৪] আমিই উত্তম মেষপালক: যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে, [১৫] যেমনটি পিতা আমাকে জানেন আর আমি পিতাকে জানি, এবং মেষগুলির জন্য আমার নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই। [১৬] আর আমার আরও মেষ আছে, যারা এই ঘেরির নয়; তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে, আর তারা আমার কণ্ঠে কান দেবে; তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক। [১৭] পিতা এজন্যই আমাকে ভালবাসেন যে, আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দিই, তা যেন ফিরিয়ে নিতে পারি। [১৮] কেউই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই। তা বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে: তেমন আজ্ঞা আমি আমার পিতা থেকেই পেয়েছি।' [১৯] এই সমস্ত কথার জন্য ইহুদীদের মধ্যে আবার মতভেদ দেখা দিল: [২০] তাদের মধ্যে অনেকে বলছিল, 'ওকে অপদূতে পেয়েছে; লোকটা উন্মাদ। ওর কথা শুনছ কেন!' [২১] অন্যেরা বলছিল, 'তেমন কথা অপদূতে পাওয়া লোকের কথা নয়; অপদূত কি অন্ধদের চোখ খুলে দিতে পারে?'

যিশু যে হারানো মেষের প্রতি করুণাবিষ্ট হন, যোহন অনুসারে এজন্যই যে তিনি উত্তম মেষপালক এমন নয়। নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেন ও মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন, এজন্যই তিনি উত্তম মেষপালক। পুরাতন নিয়মের ঐতিহ্য অনুসারে ঈশ্বরই মেষপালক (বা পালক কিংবা রাখাল) রূপে অভিহিত ছিলেন, কেননা তাঁর আপন জনগণকে তিনি পালন করেন, রক্ষা করেন, সংগ্রহ করেন ও সুস্নিগ্ধ ভালবাসায় ঘিরে রাখেন। ইস্রায়েল জাতির কোনও রাজা কখনও মেষপালক, পালক বা রাখাল বলে আখ্যায়িত হননি; শুধু ভাবী মশীহ-রাজই পালক বলে অভিহিত, কেননা ইস্রায়েলের

অসৎ গণনায়কদের তুলনায় তিনি উত্তমরূপেই জনগণের পালক হওয়ার ঐশভার বহন করেন (এজে ৩৪:২৩; মিখা ৩:১-৩)। নবী জাখারিয়া এমন এক পালকের ভাববাণী দেন যাঁকে হত্যা করা হয় এবং যাঁর মৃত্যু দ্বারা মানবজাতির ইতিহাসের এক নতুন পৃষ্ঠা শুরু হয় (জাখা ১৩:৭-৯): যখন তাঁকে বিঁধিয়ে দেওয়া হয় তখন জনগণ তাঁর জন্য অশ্রুপাত করে (জাখা ১২:১৩); জৈতুন পর্বতের পথে যিশু এ ভাববাণী আপন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করেন (মার্ক ১৪:২৭) এবং যিশুর মৃত্যু বর্ণনার পর যোহন ঠিক সেই বিদ্ধজনের কথা উল্লেখ করেন (১৯:৩৭)। সুতরাং যিশু মেষগুলির পালক বলে শুধু নন, প্রকৃতপক্ষে মেষগুলির ত্রাণকর্তা বলেও পালক।

নিজ প্রাণ উৎসর্গকারী মেষপালকের বৈষম্যস্বরূপ বেতনভোগীর কথা উল্লিখিত: তারা হল ইহুদী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং উত্তরকালের যিশু ও তাঁর মণ্ডলীর সেই নির্যাতনকারী যারা বিশ্বাসীগণের চালনা ও ত্রাণ করবে বলে দাবি করবে অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের সর্বনাশ ঘটাবে।

১০:১৪—যারা আমার নিজের মেষ··· : মেষপালক মেষগুলির সঙ্গে পরস্পর জানা ও প্রেমের সম্পর্কে সংযুক্ত: যিশু তাঁর আপনজনদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। পুরাতন নিয়ম অনুসারে ‘জানা’ কথাটির অর্থ শুধু বুদ্ধিগত জানার দিকে যায় না, বরং এমন জানা বোঝায় যা মনোনয়ন ও ত্রাণকারী ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভক্তি ও তাঁর সঙ্গে মিলন স্থাপন করে (হোশেয়া ২:৮; ৬:৩; ৮:২; ১১:৩; ১৩:৪; ইশা ৪০:২১, ২৮; ৪১:২০; ৪৩:১০; ৪৫:৩; ৪৯:২৩; ৫২:৬; ৫৮:২; ৬০:১৬; ৬৩:১৬)। এই ধারণার আলোতে যিশুর বাণী ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হোক: যাদের যিশু ‘আমার আপন মেষ’ বা ‘আপনজন’ বলে সম্বোধন করেন, পিতা দ্বারা তাদের তাঁর কাছে দেওয়া হল, জগৎ থেকে (১৭:৬) তাদের নেওয়া হল; কাজেই এখানে মনোনয়ন ধারণাটা সূচিত। ঈশ্বরের এ মনোনয়নে সেই ভালবাসা উন্মুক্ত, যে ভালবাসা মিলনকে বা ঐক্যকে সৃষ্টি করে। যিশু তাঁর আপনজনদের শেষ মাত্রায় ভালবেসেছেন (১৩:১); তিনি চান, যে ভালবাসায় পিতা তাঁকে ভালবেসেছেন সেই ভালবাসা যেন তাদের মধ্যেও বিরাজ করে (১৭:২৬) এবং তারা যেন সবসময় ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন বা ঐক্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে

(১৬:২৭), যাতে করে এই বাণী সিদ্ধি লাভ করে যে, যিশু শিষ্যদের অন্তরে বসবাস করেন ও করে থাকবেন এবং শিষ্যেরা যিশুতে বসবাস করে (৬:৫৬)। যিশু বিশ্বাসীগণকে পিতা দ্বারা তাঁকে দেওয়া-মানুষকে বলে চেনেন, তাদের ভালবাসেন, তাদের জানেন ও তাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন (১৫:১৫), এজন্যই বিশ্বাসীগণও তাঁকে জানতে এবং মিলনের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম।

১০:১৫ক—যেমনটি পিতা আমাকে জানেন: পিতা ও পুত্রের মধ্যকার জানাটা এবং ভালবাসাপূর্ণ ঐক্য-সম্পর্কই হল যিশুর সঙ্গে তাঁর আপনজনদের জানা ও ঐক্যের আদর্শ ও ভিত্তিস্বরূপ।

১০:১৫খ—নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই: যিশুর প্রাণ-বিসর্জনে বিশ্বাসীদের সঙ্গে যিশুর সংযোগ পূর্ণমাত্রায় পৌঁছয়। তাদের জানেন ও ভালবাসেন বিধায় তিনি তাদের জন্য সবকিছুই বিসর্জন দেন। যিশুই বিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলনের বন্ধন সৃষ্টি করেন এবং পিতা যাদের তাঁকে দান করেছেন তাদের তিনি নিজ ভালবাসায় রক্ষা করেন।

১০:১৬—আর আমার আরও মেষ আছে: যিশু জানেন আপন প্রাণোৎসর্গের মধ্য দিয়ে পিতা ইস্রায়েল জাতিকে ব্যতীত আরও বহু মানুষকে অর্থাৎ বিধর্মীদের তাঁর কাছে আনবেন: আমরাই সেই তারা, যারা শিষ্যদের বাণীপ্রচারের মাধ্যমে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হলাম (১৭:২০)।

যিশুর দায়িত্বভার বিধর্মীদের উপরেও; তিনি তাদের চারণভূমির দিকে চালনা করবেন অর্থাৎ তাদের জন্যও তিনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন। অন্যান্য মেষগুলির মত বিধর্মীরাও তাঁর কথা শুনবে ও নকল পালকদের কথায় কান দেবে না।

কিন্তু মুখ্য ধারণা এই: যিশুর মৃত্যুতে একটিমাত্র মেষপালকের পরিচালনায় একটিমাত্র মেষপাল গঠিত হবে, এবং এতে নবী এজেকিয়েলের উচ্চারিত ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করে (এজে ৩৪:২৩…): যিশু দ্বারা একত্রিত ঈশ্বরের সন্তানেরা মনোনীত

জাতি সেই ইস্রায়েলের স্থান দখল করবে এবং অদ্বিতীয় মেষপালক যিশুর মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের অদ্বিতীয় মেষপাল হয়ে উঠবে। ঈশ্বরের এই নব জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ জনসমাজরূপে প্রকাশ পাবে (১৭:২০…)। এই ঐক্য হল যিশুর মৃত্যু (১১:৫১) ও প্রার্থনার (১৭:২০…) ফলস্বরূপ একটি দান ও একটি প্রতিশ্রুতি। এবিষয়ে একথা লক্ষণীয় যে, নব জনসমাজ যদিও পৃথিবীতে দৃশ্যমান খ্রিষ্টমণ্ডলীর দিকে নির্দেশ করে, তবুও প্রকৃতপক্ষে সেটা হল সেই জনসমাজের একটি আদর্শ, যে-জনসমাজ ঈশ্বর দ্বারা আহূত ও যিশু দ্বারা সংগৃহীত ও চালিত হয়ে ঐশজীবনে প্রতিষ্ঠিত, এবং যার ঐক্য পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ঐক্যের প্রতিবিম্ব (১৭:২১)।

১০:১৭—পিতা এজন্যই আমাকে ভালবাসেন যে… : পুত্রের প্রাণ-বিসর্জন পিতার প্রতি যিশুর বাধ্যতার প্রকাশ; কিন্তু একাধারে তাঁর অধিকারেরও প্রমাণ, কেননা পূর্ণ স্বাধীনতায় ও অবাধে যিশু প্রাণ বিসর্জন দেন ও পুনরায় তা ফিরিয়ে নেন। পিতার প্রতি বাধ্যতা এবং তাঁর আপন অধিকার হল একই ধারণার দুই দিক: সেগুলির মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথমে তাঁর প্রাণোৎসর্গের জন্য যিশুর প্রতি পিতার ভালবাসা লক্ষ করি (১০:১৭), তারপর যিশুর স্বাধীন সিদ্ধান্ত (১০:১৩ক) ও অধিকারের দিকে (১০:১৮খ) নির্দেশ করি এবং অবশেষে পুনরায় পিতার সেই আজ্ঞার দিকে ফিরে যাই (১০:১৮গ), যে-আজ্ঞা পালন করাই যিশুর দায়িত্বভার: পুত্রের বাধ্যতা এবং অধিকার পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ঐক্য দ্বারা সংযুক্ত।

উপরন্তু, ঠিক সেই প্রাণোৎসর্গের জন্যই পিতা পুত্রকে অধিক ভালবাসেন। লক্ষ করার নতুন একটা বিষয় এটাই যে, যিশুর প্রাণ ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার আছে: এতে বুঝি যে, পুনরুত্থানই প্রাণোৎসর্গের অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল: প্রাণোৎসর্গ ও পুনরুত্থান দু'টোই পিতার নির্ধারিত যিশুর প্রেরণকর্মে (বা বিশেষ কর্মে) স্থান পায়। এপ্রসঙ্গে একথাও স্মরণযোগ্য যে, যেহেতু প্রাণোৎসর্গ ও পুনরুত্থান ক্রুশে সেই উত্তোলনের একক ক্ষণের নামান্তর যে-ক্ষণে যিশু মানবপুত্ররূপে উত্তোলিত হয়ে নিজের কাছে সকলকে আকর্ষণ করেন এবং মেষপালকরূপে জাখারিয়ার পর্বোল্লিখিত ভাববাণী অনুসারে বিদ্ধ

হন, সেজন্য অনুমান করতে পারি যে, ক্রুশ-ক্ষণেই যিশু আপন উত্তম মেষপালক ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেন ও তার সিদ্ধি ঘটান।

১০:১৮—কেউই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না: যারা যিশুর মৃত্যু ঘটিয়েছে, সেই ইহুদীরাও নয় আর সেই পিলাতও নয়, বরং যিশু নিজে থেকেই ক্রুশ তুলে বহন করেন (১৯:১৭) এবং যেমন স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন তেমনিভাবে স্বেচ্ছায় তা ফিরিয়ে নেন। ভালবাসার স্বাধীনতা এমন অধিকার যা পিতাই তাঁকে দান করলেন এবং এই অধিকারসূত্রেই পুত্র প্রাণ ফিরিয়ে নিতে সক্ষম, এমনকি ঠিক এই প্রাণ ফিরিয়ে নেওয়াটায় মৃত্যুর উপর পুত্রের অধিকার পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায়; মৃত অবস্থায়ও যিশু এই ঐশঅধিকারমণ্ডিত, নিজের মৃত্যুতেই মৃত্যুকে জয় করলেন: মৃত্যু ও পুনরুত্থান হল একই ঘটনা যার উপর পুত্রের অধিকার রয়েছে। এ সত্য বোধগম্য হয়ে ওঠে যখন আমরা একথা স্মরণ করি যে, পুত্র পূর্ণ একতায় পিতার সঙ্গে কাজ করেন এবং তাঁর আজ্ঞা মেনে চলেন: যিশু নিজে থেকেই পুনরুত্থান করেন, কেননা পুনরুত্থানও পিতা দ্বারা তাঁর কাছে ন্যস্ত দায়িত্ব; প্রাণ ফিরিয়ে নেওয়াটাই পিতার গৌরবদানের নামান্তর (১২:১৬; ১৩:৩১…; ১৭:১)। যোহনের এ ধারণার মাধ্যমে আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর খ্রিষ্টোপলব্ধি বা খ্রিষ্ট-তত্ত্ব অনেক অগ্রসর হয়েছে। বস্তুত, এবিষয়ে যোহনের লেখার আগের ধারণা এই ছিল যে, পিতা ঈশ্বরই মৃত্যু থেকে যিশুকে পুনরুত্থিত করে তুলেছেন (১ থে ১:৯; গা ১:১)।

১০:১৯—এই সমস্ত কথার জন্য…: সবসময়ের মত এবারও যিশুর বাণীতে শ্রোতাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়: অনেকে সেই বাণী জীবনদায়ী বার্তা বলে গ্রহণ করে, অন্যেরা উন্মাদের প্রলাপ বলে সেই বাণী অগ্রাহ্য করে।

মন্দির উৎসর্গীকরণ পর্ব (১০:২২-৩৯)

১০ [২২] যেরুশালেমে [মন্দির] উৎসর্গীকরণ পর্ব চলছিল; [২৩] তখন শীতকাল। যিশু মন্দিরের মধ্যে শলোমন-অলিন্দে পায়চারি করছিলেন। [২৪] তাই ইহুদীরা তাঁর চারপাশে জড় হয়ে তাঁকে বললেন, ‘আর কত দিন আমাদের তেমন সংশয়ের মধ্যে রাখবেন? আপনি যদি সেই খ্রিষ্টই হন, তবে আমাদের স্পষ্টভাবে বলুন।’ [২৫] যিশু তাঁদের উত্তর দিলেন, ‘আমি তো আপনাদের বলেছি, আপনারাই বিশ্বাস করছেন না। আমার পিতার নামে যে সমস্ত কাজ সাধন করি, সেগুলিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। [২৬] কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করছেন না, কারণ আপনারা আমার পালের মেষ নন। [২৭] যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয়; তাদের আমি জানি আর তারা আমার অনুসরণ করে; [২৮] এবং আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি: তাদের কখনও বিনাশ হবে না, আমার হাত থেকেও কেউ তাদের ছিনিয়ে নেবে না। [২৯] আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে মহান, আর কেউ আমার পিতার হাত থেকে তাদের ছিনিয়ে নিতে পারে না। [৩০] আমি এবং পিতা, আমরা এক।’

[৩১] ইহুদীরা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর হাতে তুলে নিলেন। [৩২] যিশু তাঁদের বললেন, ‘পিতার পক্ষ থেকে আমি আপনাদের অনেক ভাল কাজ দেখিয়েছি; কোন্ কাজের জন্য আপনারা আমাকে পাথর মারতে যাচ্ছেন?’ [৩৩] ইহুদীরা তাঁকে উত্তর দিলেন, ‘ভাল কাজের জন্য আমরা আপনাকে পাথর মারছি না, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার জন্য, কারণ আপনি মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর করে তুলছেন।’ [৩৪] যিশু তাঁদের উত্তর দিলেন, ‘আপনাদের বিধানে কি একথা লেখা নেই, আমি বললাম: তোমরা ঈশ্বর! [৩৫] ঈশ্বরের বাণী যাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল, পিতা যদি তাদের ঈশ্বর বলেন—আর শাস্ত্র তো খণ্ড করা যায় না!—[৩৬] তবে তিনি যাঁকে পবিত্রীকৃত করলেন ও জগতে প্রেরণ করলেন, তাঁকে আপনারা কেমন করে বলতে পারেন, আপনি ঈশ্বরনিন্দা করছেন, কারণ আমি বললাম যে, আমি ঈশ্বরের পুত্র? [৩৭] আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবেই আমাকে বিশ্বাস করবেন না; [৩৮] কিন্তু যদি করি, তবে আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কাজেই বিশ্বাস রাখুন; তাতেই আপনারা জানবেন ও বুঝবেন

যে, পিতা আমাতে, আর আমি পিতাতে আছি।’ [৩৯] তাঁরা আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের হাত এড়িয়ে চলে গেলেন।

ফরিশীরা যিশুর কাছে তাঁর সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা জানতে চান: অবিশ্বাসীদের পক্ষে কোন কথা বা কোন চিহ্নকর্ম কখনও যথেষ্ট হবে না!

১০:২৫—আমি তো আপনাদের বলেছি: ঈশ্বরপুত্র বলে (১০:৩৬) যিশু মশীহ (খ্রিষ্ট) বটে এবং ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী সত্যের বহনকারী বলে তিনি রাজাও বটে (১৮:৩৭); তা সত্ত্বেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে মশীহ বা রাজারূপে আত্মপরিচয় দেন: তিনি যে ইহুদীদের ভয়ে তা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করেন না এমন নয়, বরং তাঁর আত্মপ্রকাশ পবিত্র শাস্ত্রের কথা অনুসারে। যাই হোক, তাঁর কর্মসকল থেকে, যে-কর্মে পিতা পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন (৫:৩৬), ইহুদীদের পক্ষে তাঁকে মশীহ বলে চেনা উচিত ছিল; কিন্তু তারা যদি বিশ্বাস না করে, এর কারণ হল যে তারা যিশুর মেষপালের মেষ নয়, তারা সেই কঠিন বুদ্ধির জাতির মানুষ যারা অবিরত ঈশ্বরের পরিচালনা বাস্তবায়নে বাধাবিঘ্ন ঘটিয়েছে।

১০:২৭—যে মেষগুলি আমার নিজের…: পূর্বালোচিত একটি প্রসঙ্গ এখানে পুনরাবৃত্ত হয়: বিশ্বাসীগণ জানে তারা আপন পালক যিশুর সঙ্গে একতাবদ্ধ এবং তাঁর দ্বারা ও পিতা দ্বারা সংরক্ষিত, সুতরাং কেউই তাদের ধ্বংস করতে পারে না। যিশু নিজেরই হাতে আপন মেষপালের সকলকেই ধরে রাখেন (প্রকাশ ১:১৫); এই আশ্বাসজনক বাণী নির্যাতনের সময় এবং দিয়াবলের আক্রমণের সময় বিশ্বাসীদের অনুপ্রাণিত করবে: ইতিমধ্যেই তারা মশীহকালীন চরম অবস্থায় জীবনযাপন করছে।

১০:৩০—আমি এবং পিতা, আমরা এক: তাঁর অনুসারী মেষগুলির প্রতি যত্ন ও পিতার শক্তিশালী রক্ষা বিষয় দু’টো প্রতিশ্রুত হয়ে যিশু পিতার সঙ্গে নিজের ঐক্য জোর

দিয়ে উল্লেখ করেন। আগে, পিতার সঙ্গে তাঁর সহভাগিতা (৫:১৭, ১৯, ৩০; ৮:১৬…) এবং পিতার ইচ্ছা অনুসারে তাঁর আচরণ উল্লিখিত হয়েছিল (৬:৩৮; ৮:২৬… ; ১০:১৮); এ ধারণাগুলি এখনও বর্তমান, কিন্তু মেষগুলির পরিচালনা ও রক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁদের সহযোগিতা ঐক্য হয়ে ওঠে: মেষগুলি উভয়েরই অধিকার (১৭:১০) এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ঐক্যে সংগৃহীত (১০:১৪; ১৭:২১…)। পিতা-পুত্রের ঐক্যই সেই ঐক্যের আদর্শ ও প্রতিমূর্তি, যে-ঐক্যকে বিশ্বাসীগণও লাভ করবে (১৭ অধ্যায়)। যিশুর একথায় ইহুদীরা তাঁকে পাথর ছুড়ে মারতে চায়।

১০:৩২—আমি… ভাল কাজ দেখিয়েছি: পুনরায় যিশু বিশ্বাসের দিকে ইহুদীদের আনতে চান, কিন্তু তারা যিশুর আত্মপ্রকাশের কথা ঐশমর্যাদা-প্রাপ্তির অযথা দাবি বলে বিবেচনা করে (৫:১৮)।

১০:৩৪খ—তোমরা ঈশ্বর: যে ইস্রায়েলীয়রা সিনাই পর্বতে ঐশবিধান পেয়েছিল, ঈশ্বর তাদের ‘ঈশ্বর’ বলে অভিহিত করেছিলেন (সাম ৮২:৬, গ্রীক অনুবাদ অনুসারে); সুতরাং, যিনি পুত্র ও শেষ ও চরম ঐশপ্রকাশকর্তা, তিনি কেন ‘আমি ঈশ্বরের পুত্র’ কথাটা উচ্চারণ করতে পারবেন না? যথার্থই, যিশুতেই এবং যিশুর মাধ্যমেই পুরাতন নিয়মের সকল বাণী সিদ্ধিলাভ করেছে।

১০:৩৬—তিনি যাঁকে পবিত্রীকৃত করলেন: পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ বলে (৩:৩৩…) ঈশ্বরের প্রেরিতজনই পূর্ণ অধিকারে ঐশবাণী ঘোষণাকারী; উপরন্তু যিশু পিতার কাছে যা শুনেছেন ও দেখেছেন তা ব্যক্ত করার জন্য একমাত্র উপযুক্ত প্রকাশকর্তা, আর অবশেষে তিনিই ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত ব্যক্তি (৬:২৭): এজন্যই তিনি ঈশ্বরের পবিত্রজন (৬:৬৯)। এ সকল কারণের জন্য যিশু ঈশ্বরনিন্দা না করে ঈশ্বরের পুত্র পরিচয় নিজের জন্য দাবি রাখতে পারেন: তিনি ঈশ্বর (১:১, ১৮; ২০:২৮)।

১০:৩৭—পিতার কাজ যদি না করি… : যখন কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তখনই শাস্ত্রের প্রমাণ যথার্থ; এক্ষেত্রে যিশুর কাজসকল তাঁকে ঈশ্বরের প্রেরিতজন বলে প্রমাণিত করে (৫:৩৬); সুতরাং ইহুদীরা কমপক্ষে তাঁর কাজের জন্যই তাঁকে বিশ্বাস করুক।

যোহন অনুসারে বিশ্বাসের একটা মর্মার্থ আছে যা অবিরত বিশ্বাসীকে জ্ঞান ও আন্তর নিশ্চয়তার দিকে চালনা করে; বিশ্বাসের একটিমাত্র ও অপরিহার্য মর্মার্থ হল পিতার সঙ্গে পুত্রের ঐক্য, যার মধ্য দিয়ে পুত্র শেষ ও চরম ঐশপ্রকাশকর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে ঐশপ্রকাশকর্তারূপে স্বীকার করা বলতে শুধু ঐশজ্ঞানলাভের জন্য তাঁর দ্বারা মনশ্চক্ষু উন্মুক্ত করা নয়, বরং তাঁর সঙ্গে পূর্ণ সংযোগে সংযুক্ত হওয়া বোঝায়: তাঁরই সঙ্গে যিনি বিশ্বাসীর পক্ষে পিতার কাছে যাবার একমাত্র পথ, ঐশজীবনদাতা ও দরজা। প্রথম পদক্ষেপ হল বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া, কিন্তু এ বিশ্বাস থেকে নতুন একটা সচেতনতা ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়: পিতার সঙ্গে যিশুর জীবন-সংযোগ বিষয়ে সচেতনতালাভ হল বিশ্বাসের পথের সূত্রপাত এবং অবিরত অপরিহার্য কর্তব্য। সুতরাং বিশ্বাস করাই হল এমন একটা ক্রমবর্ধমান নিশ্চয়তালাভ যা দ্বারা আমরা সচেতন হয়ে উঠি যে, যিশুতে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে ঐক্য লাভ করেছি (২০:৩০… ; ১ যোহন ৫:১১) এবং একাধারে সেই বিশ্বাস এমন একটা প্রচেষ্টা যা দ্বারা আমরা এই অনন্য পরিত্রাণদায়ী সত্য অর্জনের জন্য (আমরা যে ঈশ্বরের সঙ্গে ঐক্যপ্রাপ্ত) সতত রত থাকি।

১০:৩৮—পিতা আমাতে : এবাক্য দ্বারা সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ঐক্য ব্যক্ত হয়, যে-ঐক্য পিতা ও পুত্রের মধ্যেই মাত্র সাধ্য। কিন্তু এই ঐক্যে শিষ্যদেরও স্থান পাওয়া প্রয়োজন (১৪:২০; ১৭:২১)। এ সত্য তখনই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য ও সাধ্য হবে যখন পুনরুত্থিত ও চিরজীবন্ত যিশু আপনজনদের মধ্যে চিরকালীন ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবেন (১৪:২০); তথাপি এই ঐক্যলাভ বিশ্বাসীর সচেতন ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপরেও অবলম্বন করে। যিশুর এই কথার জন্যও ইহুদীরা তাঁকে মারতে চায়।

যর্দনের ওপারে যিশুর প্রত্যাগমন (১০:৪০-৪২)

১০ [৪০] তিনি আবার যর্দনের ওপারে ফিরে গেলেন, যেখানে যোহন প্রথমে বাপ্তিস্ম দিতেন; আর সেইখানে থাকলেন। [৪১] অনেকে তাঁর কাছে এল; তারা বলছিল, 'যোহন কোনও চিহ্নকর্ম সাধন করেননি, কিন্তু এঁর সম্বন্ধে যা কিছু যোহন বলেছিলেন, তা সমস্তই সত্য ছিল।' [৪২] আর সেখানে অনেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখল।

যোহন এ খবর বিভিন্ন উদ্দেশ্যে জানান: যেরুশালেম ও পাশাপাশি জায়গা যিশুর পক্ষে বিপদজনক জায়গা হয়ে উঠেছিল (১০:৩৯; ১১:৮); যেখানে ইহুদীদের অত্যাচার নেই সেখানে অনেকে যিশুর প্রতি বিশ্বাসী হয়; সুসমাচারের সূচনায় মশীহ (খ্রিষ্ট) বিষয়টা অনুধাবন করা হয়েছিল এবং যেরুশালেমে যিশুর শেষ কাজে পুনরায় সেই বিষয় আলোচত হয়: যর্দন নদীর ইঙ্গিতে এ দু'টো ঘটনার মধ্যকার সম্পর্ককে নির্দেশ করা হয়। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা পাঠককে স্মরণ করায় যিশুর সপক্ষে তাঁর সাক্ষ্য যে-সাক্ষ্য ইতিমধ্যে স্বয়ং যিশুর চিহ্নকর্মের মধ্য দিয়ে ও জনতার স্বীকারোক্তিতে (১০:৪১) প্রমাণিত হয়; বাপ্তিস্মদাতার তুলনায় যিশুর শ্রেষ্ঠতা পুনর্ঘোষিত হয়; অবশেষে, এই অংশ যিশুর প্রধান ও শেষ চিহ্নকর্মের (লাজারের পুনরুজ্জীবন, ১১ অধ্যায়) পটভূমিকাস্বরুপ, যে চিহ্নকর্মের ফলে 'অনেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী' হলেন (১০:৪২; ১১:৪৫)।

যিশুই পুনরুত্থান ও জীবন (১১ অধ্যায়)

তিনি যে সত্যিই সেই মেষপালক যিনি অনন্ত জীবন দান করেন এবং যাঁর হাত থেকে কেউই মেষগুলিকে ছিনিয়ে নিতে পারে না (১০:২৮), এর প্রমাণস্বরূপ যিশু যে চিহ্নকর্ম সাধন করেন তা হল লাজারের পুনর্জীবনদানের চিহ্ন। এই চিহ্নকর্ম মন্দিরের উৎসর্গ-পর্বের সময় সাধিত, কিন্তু একাধারে যিশুর আসন্ন সেই তৃতীয় পাস্কা-পর্ব লক্ষ করে যখন তিনি প্রাণোৎসর্গ করবেন (১৯ অধ্যায়)। যে সামসঙ্গীত মন্দিরের উৎসর্গ-পর্বে

গান করা হত, সেটা প্রকৃতপক্ষে যেন পুনরুজ্জীবিত লাজারেরই গাওয়া সঙ্গীত, এমনকি, যে বিশ্বাসীগণ যিশুতে অনন্ত জীবন পেয়েছে তাদেরও সঙ্গীত :

> তোমার বন্দনা করব, প্রভু : তুমি যে তুলে নিয়েছ আমায়,
> আমার শত্রুদের দাওনি আমার উপর আনন্দ করতে।
> প্রভু, পরমেশ্বর আমার, চিৎকার করেছি তোমার কাছে,
> আর তুমি আমায় করেছ নিরাময়।
> পাতাল থেকেই তুমি আমার প্রাণ তুলে এনেছ, প্রভু,
> আমি সেই গর্তে নেমে যাচ্ছিলাম আর তুমি আমায় করেছ সঞ্জীবিত। [সাম ৩০:১ …]

কানা গ্রামে যিশুর সাধিত প্রথম চিহ্নকর্মের মধ্য দিয়ে শিষ্যেরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন (২:১১); এখন, লাজারের পুনর্জীবনদানের এই শেষ চিহ্নকর্ম সাধিত হয় ঈশ্বরের গৌরবার্থে, তা দ্বারা যেন ঈশ্বরপুত্র গৌরবান্বিত হন (১১:৪)।

তাছাড়া একথাও উল্লেখযোগ্য : বাণী-বন্দনায় যিশু জগতের আলো ও জীবন বলে ঘোষিত হয়েছিলেন। আলো প্রসঙ্গ ৯ অধ্যায়ে পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছিল; এখানে (১১ অধ্যায়) জীবন প্রসঙ্গটাই উত্তমরূপে আলোচিত হয়। অবিশ্বাসী ইহুদীদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে যিশু শ্রেষ্ঠ ও শেষ চিহ্নকর্ম সম্পাদন করায়ই প্রতিক্রিয়া করেন এবং তিনি নিজে এ পরম চিহ্নকর্মের ব্যাখ্যা দেন যাতে সর্বযুগের মানুষ বিশ্বাস ও পরিত্রাণের পথে এগোতে পারে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যখন ঈশ্বরপুত্র যিশু আপন জীবনপূর্ণ অধিকার উত্তমরূপে প্রকাশ করেন, তখনই অবিশ্বাসীরা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য সঙ্কল্প নেয়। তবু যদিও যিশু মৃত্যুবরণ করেন, প্রকৃতপক্ষে তাদের ষড়যন্ত্রের ফলে মৃত্যুবরণ করেন এমন নয়, বরং ক্রুশের দিকে তাঁর জীবনযাত্রা ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী: যথার্থই, ক্রুশের উপরেই পিতা তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন। লাজারের পুনরুত্থানের চিহ্নকর্ম ঠিক এই গৌরবায়নের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

বেথানিয়া অভিমুখে যাত্রা (১১:১-১৬)

১১ [১] একজন লোক অসুস্থ ছিলেন, তিনি বেথানিয়ার লাজার; মারীয়া ও তাঁর
বোন মার্থা সেই গ্রামেই বাস করতেন। [২] ইনি সেই মারীয়া, যিনি প্রভুকে সুগন্ধি
তেল মাখিয়ে দিয়েছিলেন ও নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিয়েছিলেন; এঁরই ভাই
লাজার অসুস্থ ছিলেন। [৩] তাই তাঁর বোনেরা তাঁকে বলে পাঠালেন, 'প্রভু, আপনি
যাকে ভালবাসেন, সে অসুস্থ।' [৪] কিন্তু যিশু এই সংবাদ পেয়ে বললেন, 'এই
অসুস্থতা মৃত্যুর উদ্দেশে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরবার্থে, তা দ্বারা যেন ঈশ্বরপুত্র
গৌরবান্বিত হন।' [৫] যিশু মার্থাকে ও তাঁর বোনকে এবং লাজারকে ভালবাসতেন।
[৬] তাই লাজার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে তিনি যেখানে ছিলেন সেইখানে আরও
দু' দিন থেকে গেলেন। [৭] তারপর শিষ্যদের বললেন, 'চল, আমরা যুদেয়ায়
ফিরে যাই।' [৮] শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'রাব্বি, এই সেদিন মাত্র যে ইহুদীরা
আপনাকে পাথর ছুড়ে মারতে চেয়েছিল, আর আপনি নাকি আবার সেখানে
যাচ্ছেন?' [৯] যিশু উত্তর দিলেন, 'দিনে কি বারো ঘণ্টা নেই? দিন থাকতেই যদি
কেউ চলাফেরা করে, তবে সে হোঁচট খায় না, কারণ সে এই জগতের আলো
দেখতে পায়। [১০] কিন্তু রাতের বেলায় যদি কেউ চলাফেরা করে, তবেই সে
হোঁচট খায়, কারণ আলো তার মধ্যে নেই।' [১১] একথা বলার পর তিনি বলে
চললেন, 'আমাদের বন্ধু লাজার ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি কিন্তু তাকে জাগিয়ে তুলতে
যাচ্ছি।' [১২] শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'প্রভু, সে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সে
সুস্থ হয়ে যাবে।' [১৩] যিশু লাজারের মৃত্যুরই কথা বলছিলেন, কিন্তু তাঁরা মনে
করছিলেন যে, তিনি সাধারণ ঘুমের কথা বলছেন। [১৪] তাই যিশু তাঁদের স্পষ্টই
বললেন, 'লাজার মারা গেছে, [১৫] এবং সেখানে ছিলাম না বলে আমি তোমাদের
জন্য খুশি, যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার। কিন্তু এখন চল, তার কাছে
যাই।' [১৬] তখন থোমাস—যমজ বলে যিনি পরিচিত—অন্যান্য শিষ্যদের
বললেন, 'চল, আমরাও যাই, যেন তাঁর সঙ্গে মরতে পারি।'

সূচনাস্বরূপ এ ঘটনার প্রধান প্রধান চরিত্রের পরিচয় দেওয়া হয়: লাজার এবং তাঁর দুই বোন। এঁরা যিশুর প্রিয়জন বলে লাজারের অসুস্থতার খবর যিশুকে পাঠান তিনি যেন এসে তাঁর বন্ধুকে সুস্থ করেন।

১১:৪—এই অসুস্থতা মৃত্যুর উদ্দেশে নয়: জন্মান্ধ লোকের চিহ্নকর্মের মত (৯:৩) এখানেও যিশু নিতান্ত মানবীয় একটা ঘটনা ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ে উন্নীত করেন: এই অসুস্থতার মধ্য দিয়ে যিশুর অসাধারণ ও দৈব শক্তি শুধু নয়, গভীরতম একটা সত্য প্রকাশিত হবে: বিশ্বাসীগণ যিশুতে মৃত্যু ত্যাগ করে জীবন পায়, এবং তা ঘটবে 'ঈশ্বরের গৌরবার্থে', অর্থাৎ পুত্রের কাজের মধ্য দিয়ে পিতা অসাধারণভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চান। পুত্রের চিহ্নকর্মে পিতা ও পুত্র উভয়েরই গৌরব প্রকাশ পায় (২:১১), এবং বিশ্বাসী সেই গৌরব প্রত্যক্ষ করতে পারে (১১:৪০)। পিতা ও পুত্রের পারস্পরিক গৌরবারোপণ যোহনের সুসমাচারের মুখ্য ধারণাগুলোর অন্যতম। সেই গৌরব যিশুর ক্ষণেই বিশেষত প্রত্যক্ষ হবে যখন তিনি নিজ বাধ্যতাপূর্ণ প্রাণোৎসর্গে (১০:১৭) পিতাকে গৌরবান্বিত করেন এবং একই সময় উত্তোলিত বলেই পিতা দ্বারা গৌরবান্বিত হন (১৩:৩১ ··· ; ১৭:১)। সুতরাং লাজারের পুনরুজ্জীবনদানের এই পূর্বঘোষণায় যিশুরই নিজের মৃত্যু ও পুনরুত্থানও পূর্বঘোষিত। ঈশ্বরপুত্র একজন মৃত ব্যক্তিকে শুধু পুনরুজ্জীবিত করে তুলবেন না, বরং সেই চিহ্নকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেরই পুনরুত্থান প্রকৃতপক্ষে ঘোষণা করেন। যথার্থই, লাজারের পুনরুজ্জীবন যিশুর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণস্বরূপ হয়ে উঠবে; কিন্তু যিশুর মৃত্যুতে ঈশ্বর নিজের গৌরব ব্যক্ত করবেন: পৃথিবীতে নেমে আসবার আগে পুত্র যে জীবন-সংযোগে ছিলেন (১৭:৫), পিতা পুত্রকে সেই দিব্য জীবন-সংযোগে ফিরিয়ে আনেন এবং সকল বিশ্বাসীদের সেই ঐশজীবনের সহভাগী করার অধিকার তাঁকে দান করেন (১৭:২)।

১১:৬—লাজার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে··· : মায়ের অনুরোধে যিশু অসাধারণ একটা উত্তর দিয়েছিলেন (২:৪) এবং পরবর্তীকালেও তিনি আত্মীয়স্বজনের প্ররোচনা থেকে নিজেকে স্বাধীন প্রমাণিত করেছিলেন (৭:৩)। সুতরাং এবারও নিজের আচরণে

যিশু দেখাতে চান, তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিশিষ্ট একটা ইচ্ছার অনুগামী; একই কথা শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর সংলাপে প্রকাশিত: 'দিন থাকতেই' অর্থাৎ পিতা দ্বারা নির্ধারিত ক্ষণ ছাড়া যিশু এবং শিষ্যেরা নিরাপদেই কাজ করতে পারেন; কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে চলতে অস্বীকার করে, যারা বিশ্বাসের পথে তাঁকে অনুসরণ করতে অনিচ্ছুক, তারা পরিত্রাণ থেকে আত্মবঞ্চিত (১২:৩৫; ১ যোহন ২:১১): বিশ্বাসীর অন্তরে আলো-যিশু জাজ্বল্যমান, অপরদিকে অবিশ্বাসী মায়ার অন্ধকারে আচ্ছাদিত।

১১:১১—আমাদের বন্ধু লাজার ঘুমিয়ে পড়েছে: সুসমাচার-সূচনায়ও যিশুর দিব্য জ্ঞান লক্ষ করেছিলাম (১:৪৭; ২:২৪ ইত্যাদি) যার মাধ্যমে তিনি নিজের নিয়তি বিষয়েও আগে থেকেই অবগত (৬:৬৪; ১২:৩৩ ইত্যাদি)। শিষ্যেরা কিন্তু মানবীয়রূপে ভাবেন বলে যিশুর কথার প্রকৃত অর্থ বুঝতে অক্ষম: তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, লাজারের কাছে যাওয়ায় যিশু তৃতীয় পাস্কা-পর্বের দিকে, এমনকি তাঁরই নিজের পাস্কা-পর্বেরই দিকে অগ্রসর হন, যে-পর্বে নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জগৎকে ঐশজীবন দান করবেন।

১১:১৪—লাজার মারা গেছে: যিশুর ইচ্ছা, শিষ্যদের বিশ্বাস সুগভীর হোক। এখন যন্ত্রণাভোগের সেই সময় আসন্ন যে সময় তাঁরা ভীষণ পরীক্ষায় পরীক্ষিত হবেন। সুতরাং বিস্ময়কর কাজের সাধক বলে নয়, মশীহ (খ্রিষ্ট) ও ঈশ্বরপুত্ররূপেই তাঁকে গ্রহণ করুন। লাজারের পুনর্জীবনদানের চিহ্নকর্মের মধ্য দিয়ে তাঁরা যেন তাঁকে মৃত্যুঞ্জয়ী, জগতের জীবনদাতা ও তাঁদের নিজেদের সহায়ক বলে চিনতে পারেন (১৪:৩০···; ১৬:২০-৩৩)।

১১:১৬—চল, আমরাও যাই: যিশুর বাণীতে নিহিত প্রতিশ্রুতি থোমাস একবিন্দুও বোঝেননি, কিন্তু তিনি যিশুর প্রতি বিশ্বস্ত, এবং এই বিশ্বস্ততার জন্য আমাদের কাছেও

তিনি আদর্শ শিষ্যস্বরূপ, যাতে পরীক্ষা ও নির্যাতনের সময় আমরাও বিশ্বস্ত হয়ে নির্ভয়ে যিশুর অনুসরণ করি।

মার্থা ও মারীয়ার সঙ্গে যিশুর সংলাপ (১১:১৭-৩৮)

১১ [১৭] যিশু এসে দেখলেন, চারদিন হল লাজারকে সমাধি দেওয়া হয়েছে। [১৮] বেথানিয়া ছিল যেরুশালেমের কাছাকাছি—আনুমানিক তিন কিলোমিটার। [১৯] ভাইয়ের জন্য মার্থা ও মারীয়াকে সান্ত্বনা দিতে ইহুদীদের অনেকে তাঁদের কাছে এসেছিল। [২০] যখন মার্থা শুনতে পেলেন, যিশু আসছেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চললেন; মারীয়া বাড়িতে বসে রইলেন। [২১] মার্থা যিশুকে বললেন, 'প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তবে আমার ভাই মারা যেত না। [২২] তবু এখনও জানি যে, ঈশ্বরের কাছে আপনি যা কিছু যাচনা করবেন, ঈশ্বর তা আপনাকে মঞ্জুর করবেন।' [২৩] যিশু তাঁকে বললেন, 'তোমার ভাই পুনরুত্থান করবে।' [২৪] মার্থা তাঁকে বললেন, 'আমি জানি, শেষ দিনে পুনরুত্থানের সময়ে সে পুনরুত্থান করবে।' [২৫] যিশু তাঁকে বললেন, 'আমিই পুনরুত্থান ও জীবন: আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে। [২৬] আর জীবিত যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে কখনও মরবে না। তুমি কি তা বিশ্বাস কর?' [২৭] মার্থা তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে, আপনিই সেই খ্রিষ্ট, সেই ঈশ্বরপুত্র, সেই ব্যক্তি জগতে যিনি আসছেন।'

[২৮] একথা বলার পর তাঁর বোন মারীয়াকে ডাকতে গেলেন; তাঁকে নিচু গলায় বললেন, 'গুরু উপস্থিত, তোমাকে ডাকছেন।' [২৯] কথাটা শোনামাত্র মারীয়া শীঘ্রই উঠে তাঁর কাছে গেলেন। [৩০] যিশু তখনও গ্রামের মধ্যে আসেননি, কিন্তু মার্থা যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তিনি সেইখানে রয়ে গেছিলেন। [৩১] বাড়ির মধ্যে যে ইহুদীরা মারীয়ার সঙ্গে ছিল ও তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তাঁকে হঠাৎ উঠে বাইরে যেতে দেখে তাঁর পিছু পিছু গেল; মনে করছিল, তিনি সমাধিস্থানে চোখের জল ফেলার জন্য সেখানে যাচ্ছেন। [৩২] যিশু যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মারীয়া সেখানে এসে তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর পায়ে পড়ে তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তবে আমার ভাই মারা যেত না।' [৩৩] যিশু যখন

দেখলেন, মারীয়া চোখের জল ফেলছেন, এবং তাঁর সঙ্গে যে ইহুদীরা এসেছিল তারাও চোখের জল ফেলছে, তখন আত্মায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ও কম্পিত হলেন। [৩৪] তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাকে কোথায় রেখেছ?' তারা বলল, 'আসুন, প্রভু! দেখে যান।' [৩৫] যিশু কেঁদে উঠলেন; [৩৬] আর ইহুদীরা বলতে লাগল, 'দেখ, ইনি তাঁকে কতই না ভালবাসতেন!' [৩৭] কিন্তু তাদের কয়েকজন বলল, 'ইনি যখন সেই অন্ধের চোখ খুলে দিলেন, তখন কি এমন কিছু করতে পারতেন না, যেন এঁর মৃত্যু না হয়?' [৩৮] যিশু পুনরায় আত্মায় উত্তেজিত হয়ে সমাধির কাছে এসে পৌঁছলেন। সমাধিটা ছিল একটা গুহা, আর তার মুখে একখানা পাথর দেওয়া ছিল।

১১:১৭—চারদিন হল লাজারকে সমাধি দেওয়া হয়েছে: সেইকালের ধারণা যে, প্রাণশক্তি তিন দিন ব্যাপী মৃতদেহের কাছে থাকে, চতুর্থ দিনেই যখন শবের পচনক্রিয়া বেশ পরিমাণে হতে চলেছে তখনই সেই প্রাণশক্তি চলে যায়। এধারণা থেকে অনুমান করি, যোহন প্রমাণ করতে চান যে লাজার সত্যিই মারা গেছিলেন। উপরন্তু তিনি ঈশ্বরের সেই অতুলনীয় জ্যোতির্ময় গৌরবই পচা ও দুর্গন্ধময় শবজনিত ঘৃণার সম্মুখীন করেন, যে গৌরব বিশ্বাসীগণ যিশুর চিহ্নকর্মে প্রত্যক্ষ করতে উদ্যত হচ্ছে।

১১:২২—এখনও জানি যে… : কানা গ্রামে মা মারীয়ার মত, এখানেও শিষ্যা মার্থার বিশ্বাসই লক্ষণীয়, যে বিশ্বাস বিস্ময়কর কিছুর কাঙ্গাল নয়, বরং গুরুজী যিশুতেই সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত: সুতরাং, এখানে মার্থা আদর্শ বিশ্বাসী শিষ্যা বলে পরিগণিতা হন।

যিশু স্পষ্টই প্রচার করেন তিনি কী করতে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর কথা প্রকৃত অর্থ অনুসারে বোঝা হল না।

১১:২৫ক—আমিই পুনরুত্থান ও জীবন: পুনরুত্থান ভাবীকালের জিনিস নয়। যে পুনরুত্থানের কথা পুরাতন নিয়মে (বিশেষভাবে নবী এজেকিয়েলের ভাববাণীতে) পূর্বঘোষিত হয়েছিল, সেই পুনরুত্থান যিশুতেই উপস্থিত: যিশু ঘোষণা করেন তিনিই সেই

ব্যক্তি যাঁর উপর 'জীবন দান করা ও আপন করা' ঈশ্বরের বিশেষ অধিকার আরোপ করা হয়েছে (৫:২১…)। এই ঐশঅধিকার অন্যান্য চিহ্নকর্মগুলোর মাধ্যমেও প্রদর্শিত হয়েছিল (৪:৫০…), কিন্তু লাজারের পুনরুত্থানের চিহ্নকর্মেই সেই ঐশঅধিকার উত্তমরূপে প্রকাশ পায়। এ চিহ্নকর্ম মার্থার জন্য শুধু নয়, সর্বকালের সকল বিশ্বাসীরই জন্য! পচা শবে যে-শারীরিক প্রাণ ফিরে এসেছে, তা হল বিশ্বাসীর অন্তরে যিশুর সঞ্চারিত সেই ঐশজীবনের একটা আভাস মাত্র; জোর গলায় যিশুর উচ্চারিত ডাক 'লাজার, বেরিয়ে এসো' হল ঈশ্বরের সেই প্রেরিতজনের ডাকের ক্ষীণ একটা প্রতিধ্বনি, যে-ডাক তিনি নিজের কাছে ও ঐশজীবনের উদ্দেশে সকল বিশ্বাসীকে আহ্বান করেন (৫:২৪…)। পুনরুত্থান-যিশুতে ঐশজীবন-পূর্ণতা প্রাপ্য, কেননা তিনি নিজেই সেই ঐশজীবন।

১১:২৫খ—আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে… : বিশ্বাসীগণ আপন বিশ্বাস বিকশিত করতে আহূত, কেননা কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমেই তারা অনন্ত জীবন পাবে। এভাবে যিশুর বাণী দ্বারা মানবীয় অস্তিত্বের সঙ্গে অনন্ত জীবন তুলনা করা হয় এবং একথা ঘোষিত হয় যে, বিশ্বাসের মাধ্যমেই শারীরিক মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করা যেতে পারে, এবং এই মর্তজীবন যিশুর মাধ্যমে নতুন একটা দিক অর্জন করে: এতে আমরা মানবতা-বিষয়ে নতুন ও গভীর আত্মসচেতনতা অর্জন করি এমন নয়, বরং ঐশজীবনদাতার দেওয়া একটা সুযোগই অর্জন করি: বিশ্বাস করি যে আমাদের মৃতদেহ কবরে সমাহিত হলেও তবুও আমরা তখনও ও চিরকাল জীবিত থাকব। কিন্তু 'আমিই-আছি'-যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকাই দরকার, কেননা কেবল তিনিই সেই অবিনশ্বর অক্ষয় জীবনের প্রদানকারী। আর তিনি যে শুধু অন্তিম দিবসেই মৃতদের পুনর্জীবনদাতা তা নয়, বরং তিনি বর্তমানেই ত্রাণকর্তা বলে বর্তমানেই জীবনদাতা। সুতরাং, এখনই তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন। ঠিক এই কারণে তিনি মার্থাকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি বিশ্বাস করেন কিনা: যদি মার্থা ও সর্বকালীন বিশ্বাসী মানুষ এখনই ঈশ্বরের প্রেরিতজন বলে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তবে যিশুর সঙ্গে এ গভীর বন্ধন গুণে তারা ইতিমধ্যেই নিত্য জীবনপ্রাপ্ত।

১১:২৭—হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি··· : যিশুর কথায় মার্থার সম্মতি আছে; যদিও তাঁর কথার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম, তবু পিতরের মত (৬:৬০, ৬৩খ, ৬৮খ) তিনিও তাঁকে ত্রাণকর্তারূপে স্বীকার করেন, এমনকি কঠিন অবস্থায়ই তাঁকে স্বীকার করেন। মানবীয় বুদ্ধির আলোতে বিশ্বাসী এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্তমানকালের অর্থ বুঝে উঠতে অক্ষম, রহস্যময় উত্তরকালের মধ্যেও সে প্রবেশ করতে অক্ষম; কিন্তু সে যদি দৃঢ়ভাবে যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তবে সে এবিষয়ে নিশ্চিত থাকুক যে, ঈশ্বরের সহায়তা সে পাবেই।

'মশীহ' (খ্রিষ্ট) সম্বোধনে প্রচারিত হয় যে, ইহুদীদের প্রত্যাশা যিশুতেই পূর্ণ হয়েছে। 'ঈশ্বরপুত্র' সম্বোধনে ঘোষিত হয় যে মশীহ-যিশু ইহুদীদের প্রত্যাশার অতীত, ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্য সম্পর্কের অধিকারী। অবশেষে, 'যিনি আসছেন' বাক্য-বিশেষ (যা সেইকালে প্রত্যাশিত আসন্ন খ্রিষ্টকে নির্দেশ করত, ১:১৫, ২৭; ৬:১৪, প্রকাশ ১:৪, ৮; ৪:৮ দ্রষ্টব্য) নাম দু'টোর সঙ্গে জড়িত, তাতে মশীহ ও ঈশ্বরপুত্র যিশু ঈশ্বরের প্রেরিত ত্রাণকর্তা বলে নির্দেশিত হন। মশীহ ও ঈশ্বরপুত্র নামকরণে আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাস-ঘোষণা ব্যক্ত: আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাস ঐতিহাসিক যিশুর সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত করে।

১১:২৮—গুরু উপস্থিত : এ বাক্যের বাহ্যিক অর্থ এই যে, সান্ত্বনা পাবার জন্যই মার্থা মারীয়াকে যিশুর কাছে পাঠান; তবুও এতে অন্তর্নিহিত এ আহ্বানও রয়েছে: সুসমাচারের পাঠকও যেন মারীয়ার মত যিশুর কথা শুনে গভীরতর খ্রিষ্টবিশ্বাসের পথে এগিয়ে চলেন। অধিকন্তু একথাও উল্লেখ্য যে, ঘরে ইহুদীরাও উপস্থিত বলে যিশু সংলাপের জন্য মারীয়াকে বাইরে আসতে বলেন: বিশ্বাসীর সঙ্গে যিশুর হৃদ্যতাপূর্ণ সংলাপ ও জনতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভিন্ন ব্যাপার।

১১:৩৩—আত্মায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ও কম্পিত হলেন : অবিশ্বাসী ইহুদীরা উপস্থিত বলে যিশু উত্তেজিত। তিনি যে এই বর্তমান মারাত্মক অবস্থায়ও সাহায্যকারী অধিকারমণ্ডিত, এবিষয়ে তাদের লেশমাত্র চেতনা নেই। কিন্তু তিনি সঠিক জানেন কী

করতে উদ্যত হচ্ছেন, এজন্য ‘তাকে কোথায় রেখেছ?’ প্রশ্নে লাজারকে পুনরুত্থিত করার তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায়।

১১:৩৫—যিশু কেঁদে উঠলেন: যিশু প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করতে পারেন বটে, অথচ আমরা যদি নূতন নিয়মের সেই বাক্যগুলোর একটা তালিকা করি যেগুলোতে যিশু বা তাঁর শিষ্যেরা কাঁদেন (প্রেরিত ২০:১৯; প্রকাশ ৭:১৭; ২১:৪), তবে দেখা যাবে যে, শোক দেখাবার কারণ হল জগতের কষ্টময়, অত্যাচারী ও নির্যাতনপূর্ণ অবস্থা। বন্ধুর কবরের দিকে যাওয়ার পথে যিশু মানুষের শোকাকুল পরিণতির জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন; যোহন কবরের কথাজনিত ভয় ও ঘৃণা নিবারণ করেন না, কিন্তু তিনি চান আমরা সেই ভয় ও ঘৃণা বিশ্বাসের মাধ্যমেই জয় করি (১১:২৫, ৩৯)। শারীরিক মৃত্যুর কঠিনতা পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করলে তবেই মাত্র যিশুর শোকের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়। এই মর্মে, যিশু মানুষের সঙ্গে জড়িত ও তার কষ্ট ও দুর্বলতার সহভাগী। খ্রিষ্টবিশ্বাসী এজগতে কষ্টময় জীবনযাত্রা অবগত, যে-যাত্রা মৃত্যুতেই শেষ সীমায় পৌঁছয়, এবং তা অবগত বলেই সে বিশ্বাসসহ যিশুর দেওয়া সীমাহীন ও চিরকালীন ঐশজীবনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে (৮:৫১; ১২:২৫)।

১১:৩৭—ইনি যখন সেই অন্ধের চোখ খুলে দিলেন… : যোহনের অভিপ্রায় যেন জন্মান্ধ লোক ও লাজারের চিহ্নকর্ম একযোগেই পরিগণিত হয়: চিহ্ন দু’টোই যিশুকে মানুষের আলো ও জীবনরূপে প্রকাশ করে।

লাজারের পুনরুত্থান (১১:৩৯-৪৪)

১১ [৩৯] যিশু বললেন, ‘পাথরখানা সরাও।’ মৃত লোকটির বোন মার্থা তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, আজ তো চারদিন হল, এতক্ষণে দুর্গন্ধ হয়ে থাকবেই।’ [৪০] যিশু তাঁকে বললেন, ‘আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি বিশ্বাস করলে তবে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পাবে?’ [৪১] তাই তারা পাথরখানা সরিয়ে দিল। তখন যিশু

ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলে বললেন, 'পিতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ বলে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। [৪২] আমি তো জানতাম, তুমি সর্বদাই আমার কথা শোন, কিন্তু এখানে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদেরই জন্য কথাটা বললাম, তারা যেন বিশ্বাস করে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ।' [৪৩] একথা বলার পর তিনি জোর গলায় চিৎকার করে বললেন, 'লাজার, বেরিয়ে এসো!' [৪৪] মৃত লোকটি বেরিয়ে এলেন—তাঁর হাত-পা তখনও কাপড়ের ফালি দিয়ে বাঁধা ও তাঁর মুখ একটা রুমালে জড়ানো। যিশু তাদের বললেন, 'ওঁর বাঁধন খুলে দিয়ে ওঁকে যেতে দাও।'

১১:৪০ক—আমি কি তোমাকে বলিনি যে… : যেমনটি এর মধ্যে লক্ষ করলাম (১১:২৫), যিশু নিজের বন্ধুকে পুনরুজ্জীবিত করতে শুধু ব্যাপৃত নন, তাঁর প্রতিশ্রুতি সকল বিশ্বাসীর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রতিশ্রুতি, এ মর্মসত্য 'তুমি বিশ্বাস করলে' গভীর কথায় প্রকাশ পায়। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, যোহনের ধারণায় শারীরিক পুনর্জীবনদান যিশুর অধিকারের একটা চিহ্ন মাত্র, যে-অধিকারবলে তিনি সকল বিশ্বাসীকে প্রকৃত ও অমর জীবন দান করতে সক্ষম। তাই যিশুতে বিশ্বাস রাখতে স্বীকার করায় মার্থাই প্রকৃতপক্ষে পুনরুত্থিতা! তিনি মর্তজীবনই যাপন করেন বটে, কিন্তু সেই বিশ্বাস-স্বীকৃতি গুণে তিনি ঈশ্বরের গৌরবকে ইতিমধ্যেই দেখতে পান।

১১:৪০খ—ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পাবে: একথার অর্থ হল এই যে, মার্থা কিছুক্ষণের মধ্যে ঈশ্বরের সেই মৃত্যুঞ্জয়ী অধিকার বা প্রভাব দেখবেন; কিন্তু একাধারে এ তাৎপর্যও সূচিত যে, যিশু ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন অধিকারপ্রাপ্ত, যে অধিকারবলে মৃতদের পুনরুত্থিত করতে পারেন। এভাবে উল্লিখিত বাক্য দ্বারা ৪ পদে যিশুর উচ্চারিত বাক্য প্রমাণ ও সিদ্ধি লাভ করে, অর্থাৎ, লাজারের অসুস্থতা ও মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যেন পুত্রের চিহ্নকর্মে ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশিত হয়। সুতরাং ৪ ও ৪০ পদ দু'টোর বাক্য সমগ্র অধ্যায়ের মুখ্য বাক্য; সেগুলির মাধ্যমে লাজারের পুনরুত্থান-চিহ্নকর্মের মর্মসত্যের অভিব্যক্তি ঘটে: যিশুতে বিরাজমান ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী মহাশক্তি উত্তমরূপে

প্রমাণিত। যিশুর চিহ্নকর্মগুলো যিশুর ও ঈশ্বরের গৌরব দৃশ্যমান করে তোলে (২:১১) এবং সেগুলোতে বিশ্বাসী যারা তারাই মাত্র সেই গৌরব দেখতে সক্ষম (১:১৪গ)।

১১:৪১—যিশু ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলে… : ইহুদীদের বিশ্বাস যে বিস্ময়কর ও অসাধারণ ঘটনা ঈশ্বরের শক্তিতে ও ধার্মিক মানুষের মধ্যস্থতায় ঘটে। এখানে একথা লক্ষণীয় যে, যিশু মানবীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কখনও প্রার্থনা করেন না (১২:২৭; ১৭ অধ্যায়)। পিতার ইচ্ছায় একান্তভাবে বাধ্য বলে যিশু প্রার্থনা করেন; কিন্তু, যেহেতু তিনি পিতার সঙ্গে পূর্ণ সংযোগে সংযুক্ত এবং তাঁর ইচ্ছায় বাধ্য, সেহেতু তিনি আপন প্রার্থনা-সিদ্ধি সম্বন্ধে সর্বদাই নিশ্চিত। পিতার সঙ্গে তাঁর মিলন তাঁর 'ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তোলায়' ব্যক্ত (১৭:১): যিনি ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে এলেন তিনি সেই ঊর্ধ্বলোকের সঙ্গে অর্থাৎ পিতার সঙ্গে সর্বদাই সংযুক্ত (১:৫১); সুতরাং, ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তোলায় তিনি পুত্ররূপেই প্রকাশিত এবং এজন্যই তাঁর প্রার্থনা ধন্যবাদ-জ্ঞাপনেই পরিণত হয়।

১১:৪২—আমি তো জানতাম: যিশুর এ প্রার্থনায় লক্ষণীয় শব্দ হল 'সর্বদাই'। পুত্র পিতার ইচ্ছা 'সর্বদাই' পূরণ করেন বলে (৮:২৯) তিনি নিশ্চিত যে পিতা 'সর্বদাই' তাঁকে ভালবাসবেন ও তাঁর প্রার্থনা পূরণ করবেন। প্রার্থনা-নিবেদন ও প্রার্থনা-পূরণ হল পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ঐক্য-সম্পর্কের বিশেষ একটা অভিব্যক্তি। এ সম্পর্ক এমন যা মানুষের পক্ষে অসাধ্য, তবুও বিশ্বাসীগণ জানে যে, যিশুর নামে যা যা যাচনা করবে তা পূরণ করা হবে (১৪:১৩; ১৫:৭, ১৬; ১৬:২৩…)।

যিশু নিজের জন্য নয়, উপস্থিত জনতার জন্য প্রার্থনা করলেন যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে আসন্ন চিহ্নকর্ম হল যিশুর সপক্ষে ঈশ্বরের একটা সাক্ষ্যদান।

১১:৪৩ক—তিনি জোর গলায় চিৎকার করে বললেন… : নাটকীয় বা রমাঞ্চকর ভাবে যিশু ব্যবহার করেন না, লাজারের পুনর্জীবনদান যিশুর কঠোর তপস্যা বা মন্ত্র-

তন্ত্রের সহযোগের ফলও নয়: তিনি সবকিছুর প্রভু, সবকিছুর অধীশ্বর, তিনি সেই জীবনপূর্ণ ‘আমিই আছি’। তাঁর গৌরব ও অধিকার তাঁর ডাকে ব্যক্ত।

১১:৪৩খ—লাজার, বেরিয়ে এসো: যিশু তাঁর আপন মেষকে নাম ধরে ডাকেন, দিয়াবলের ও মৃত্যুর হাত থেকে তাকে মুক্ত করেন আর এমন জীবনদানে তাকে নবীভূত করেন, যে-জীবন তাঁর বিশ্বাসীদের কাছে দান করা অনন্ত জীবনের চিহ্ন।

১১:৪৪—ওঁর বাঁধন খুলে দিয়ে ওঁকে যেতে দাও: শেষ মাত্রা পর্যন্ত যিশুই চিহ্নকর্ম সাধনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন: পুনরুজ্জীবিত হয়েও লাজার এখনও আত্মনির্ভরশীল নন; অপরদিকে, যখন যিশু আপন সমাধিগুহা থেকে বেরিয়ে যাবেন তখন বাঁধন খোলার মত সাহায্যকারী মানুষের তাঁর প্রয়োজন হবে না।

সুতরাং এই চিহ্নকর্মের মধ্য দিয়ে যিশু জীবনদাতা, এমনকি জীবনই বলে আত্মপ্রকাশ করলেন; অথচ তাঁর জীবনযাত্রা মৃত্যুর উদ্দেশে: ‘তৃতীয় পাস্কা-পর্ব’ সন্নিকট, এবং ইহুদী ধর্মনেতারা তাঁকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র খাটাচ্ছেন। তবুও, যে বিশ্বাসীগণ তাঁকে জীবনদান করতে দেখল ও মার্থার মত তাঁর গৌরব দেখল, তারা তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুও গৌরবায়ন ও জগৎকে জীবনদান বলে উপলব্ধি করবে।

যিশুর প্রাণদণ্ড (১১:৪৫-৫৪)

১১ [৪৫] যে ইহুদীরা মারীয়ার কাছে এসেছিল, এবং যিশু যা সাধন করেছিলেন তা দেখতে পেয়েছিল, তাদের অনেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল, [৪৬] কিন্তু তাদের মধ্যে অন্য কয়েকজন ফরিশীদের কাছে গিয়ে যিশু যা যা করেছিলেন, সমস্তই তাদের জানিয়ে দিল। [৪৭] তখন প্রধান যাজকেরা ও ফরিশীরা সভা ডাকলেন; তাঁরা বললেন, ‘আমরা কী করি? ওই লোকটা তো বহু চিহ্নকর্ম সাধন করছে। [৪৮] আমরা যদি তাকে এভাবে চলতে দিই, তবে সকলে তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠবে, এবং রোমীয়েরা এসে আমাদের পুণ্যস্থান ও জাতি দু’টোই

ধ্বংস করবে।' [৪৯] কিন্তু তাঁদের মধ্যে কাইয়াফা নামে একজন—তিনি ওই বছরের মহাযাজক ছিলেন—তাঁদের বললেন, 'আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না! [৫০] আপনারা তো বিবেচনা করে বোঝেন না যে, গোটা জাতির বিনাশ ঘটবার চেয়ে জনগণের জন্য মাত্র একজন মানুষের মৃত্যু হওয়াই আপনাদের পক্ষে সুবিধাজনক।' [৫১] তেমন কথা তিনি নিজে থেকে বললেন না; কিন্তু ওই বছরের মহাযাজক হওয়ায় তিনি একটা নবীয় বাণী দিলেন—যিশুর মৃত্যু হবে জাতির জন্য, [৫২] আর কেবল জাতির জন্য নয়, চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের সকল সন্তানকে একত্রে জড় করার জন্য। [৫৩] সুতরাং সেদিন থেকে তাঁরা তাঁর মৃত্যু ঘটাবার জন্য মন্ত্রণা করতে লাগলেন।

[৫৪] ফলে যিশু আর প্রকাশ্যে ইহুদীদের মধ্যে চলাফেরা করতেন না; তিনি সেখান থেকে মরুপ্রান্তরের কাছাকাছি এফ্রাইম নামে একটা শহরে চলে গেলেন, এবং শিষ্যদের সঙ্গে সেখানে থাকলেন।

এই অংশে বর্ণিত হয় পৃথিবীতে তাঁর জীবনযাত্রা বিষয়ে যিশুর শ্রেষ্ঠ চিহ্নকর্মের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে: ইহুদীরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল। কিন্তু যেমন তিনি পূর্ণসচেতন হয়ে চিহ্নকর্ম সাধন করলেন, তেমনি এখনও জানেন যে, ইহুদীদের প্রাণদণ্ডও ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী পরিকল্পনা অনুসারেই ঘটবে।

১১:৪৫—অনেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল: চিহ্নকর্মজনিত বিশ্বাস ভাসা-ভাসা উৎসাহ নয়, বরং গভীর একটা অনুভূতি যা যেরুশালেমে তাঁর গৌরবপূর্ণ প্রবেশ পর্যন্ত চলতে থাকবে। যেরুশালেমবাসীরা এখন পর্যন্ত যিশু বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল, এখন কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হয়। অপরদিকে ফরিশীরা নিজেদের অহঙ্কারে ও নির্বুদ্ধিতার কারণে (৫:৫৪; ১২:৪৩) এই চিহ্নকর্মের সামনেও মন ফেরাতে অস্বীকৃতি দেখায়; তারা মন্দিরের জন্য আশঙ্কিত, এখনও অনুভব করে না সেই কথা যা প্রথম পাস্কা-পর্বের সময় যিশু বলেছিলেন: তিনিই পবিত্রধাম, যে পবিত্রধামে শুধু ইস্রায়েল জাতির মানুষ নয় বরং সমগ্র মানবজাতি সম্মিলিত হবার কথা। ঈশ্বরের আহ্বানই যেন

তারা তাঁর প্রেরিতজনকে গ্রহণ করে, কিন্তু ঠিক ধর্মের দোহায়ই তারা সেই প্রেরিতজনকে অগ্রাহ্য করে।

১১:৪৯—আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না: মহাযাজক কাইয়াফার কথা যদিও ভাববাণীতে পরিণত হবে, তবুও তাতে তাঁর নির্বুদ্ধিতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১১:৫১—তেমন কথা তিনি নিজে থেকে বললেন না: যোহনের সময় মহাযাজকগণ নিজেদের উপর নবী-ভূমিকা আরোপ করতেন, সুতরাং যিশুর মৃত্যু দুর্ভাগ্যের বা কোন একজন ইহুদীর ষড়যন্ত্রের উপর নির্ভর করে না, বরং পিতা ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারেই নির্ধারিত হল। কাইয়াফা, ইহুদী ধর্মসভা ও যুদা হল জগতের অধিপতি সেই দিয়াবলের হাতে পুতুল মাত্র, যে দিয়াবল যিশুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম-রত। যাই হোক, কাইয়াফার আশঙ্কা ও নবীয় বাণী দু'টোই সিদ্ধি লাভ করবে: যেরুশালেমের মন্দির অল্প বছর পর রোমীয়দের দ্বারা ধ্বংস করা হল এবং মানবজাতি ক্রুশের উপর থেকে রাজত্বকারী সেই বিদ্ধজনের কাছে সম্মিলিত হল।

১১:৫২—আর কেবল জাতির জন্য নয়: এতে যোহন প্রচার করেন, যিশু কেবল ইহুদী জাতির জন্য নয়, চরমকালীন ইস্রায়েল জাতির জন্যই মৃত্যুবরণ করলেন। পুরাতন নিয়মে নবীগণ এ ভাববাণী দিয়েছিলেন যে, চরমকালে অর্থাৎ মশীহ-কালে ইস্রায়েল জাতির বিক্ষিপ্ত বারোটি কুল পুনর্মিলিত হবে (ইশা ১১:১২… ; মিখা ২:১২; ৪:৬; ৭:১১… ; যেরে ২৩:৩; বারুক ৪:৩৬… ; এজে ১১:১৭; ২০:৩৪; ২৮:২৫; ৩৪:১২… ইত্যাদি)।

> তিনি [প্রভু] দেশগুলির জন্য একটা নিশানা উত্তোলন করবেন,
> ইস্রায়েলের বিতাড়িত সকলকে জড় করবেন;
> পৃথিবীর চার কোণ থেকে
> যুদার বিক্ষিপ্ত লোকদের সম্মিলিত করবেন। [ইশা ১১:১২]

কিন্তু এবিষয়ে যোহনের নতুনত্ব এই যে, তিনি সেই প্রাক্তন ইহুদী ধারণা আর সমর্থন করেন না যে-ধারণা অনুসারে বিধর্মী জগৎ ঈশ্বরের পর্বতে আরোহণ করবে বা ঈশ্বরের মনোনীত ইস্রায়েল জাতিতে অন্তর্ভুক্ত হবে, বরং তিনি ঘোষণা করেন যে, যিশুর মৃত্যুর মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে নতুন ও একত্রিত এক জনগণই সৃষ্টি হয়, এই নব জনগণে ইহুদী ও বিধর্মীদের মধ্যে আর কোন প্রভেদ থাকবে না: ইস্রায়েল জাতির বিক্ষিপ্ত সন্তান নয়, ঈশ্বরের সকল সন্তান অর্থাৎ সমগ্র জগৎই সম্মিলিত হবে। ১:১২ পদে বিশ্বাসীদের কাছে দেওয়া ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার ঘোষিত হয়েছিল, এখানে তাদেরই কথা বলা হয় যারা যিশুর প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মনোনীত, যারা 'ঈশ্বর হতে উদ্গত' (৮:৪৭), যারা তাঁর মেষপালের মেষ (১০:৩, ২৭), যারা তাঁর আপনজন (১৩:১), যারা পিতা দ্বারা যিশুর হাতে সমর্পিত (৬:৩৭, ৩৯; ১৭:৬): এখন তারা জগতে বিক্ষিপ্ত, কিন্তু গৌরবান্বিত যিশু তাদের নিজের কাছে আকর্ষণ করেন (১২:৩২) এবং যিশুর যে মেষপালে প্রথম মেষঘেরির মেষগুলি (অর্থাৎ ইস্রায়েলীয়রা) অন্যত্র থেকে আগত মেষগুলির সঙ্গে (অর্থাৎ বিধর্মীদের সঙ্গে) সংযুক্ত (১০:১৬), সেই অদ্বিতীয় মেষপালের প্রতিশ্রুতি যাতে পূর্ণ হয় সেইজন্য তিনি বিক্ষিপ্ত সকলকে একত্রিত করেন: অদ্বিতীয় মেষপাল হল ইহুদী ও বিধর্মীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত সেই খ্রিষ্টমণ্ডলী যার অংশগ্রহণকারীরাই সেই 'ঈশ্বরের সকল সন্তান' যারা ঐশপ্রকাশকারী ও ত্রাণকর্তার আহ্বানে সাড়া দেয়: তেমন মণ্ডলীই যিশুর পরিত্রাণদায়ী মৃত্যুর ফল (১২:২৪, ৩২)।

পরিশিষ্ট

যোহন অনুসারে 'জীবন'

'জীবন' ধারণা যে যোহনের লেখায় অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা, এতে কোন সন্দেহ নেই। জীবন শব্দটি সুসমাচারের এবং প্রথম পত্রের প্রতিটি অধ্যায় একই পরিমাণে সর্বদাই উপস্থিত। অতিগভীর ও বিস্তারিত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা আমাদের সাধ্যের অতীত; সুতরাং এই পরিশিষ্টে দু' একটা মন্তব্যই কেবল রাখা

হবে, তথা: নূতন নিয়মের অন্যান্য লেখকের সঙ্গে এবিষয়ে যোহনের সম্পর্ক কি, সেকালের ঐতিহ্য অনুসারে 'জীবন' ধারণা কী রূপ, এবং যোহন অনুসারে 'জীবন' ধারণার ঐশতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য।

নূতন নিয়মে ও যোহনের লেখায় 'জীবন' ধারণা

যোহন ও সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের লেখকগণ: অনন্ত জীবন বিষয়ে যোহনের সঙ্গে সদৃশ সুসমাচার-লেখকদের পার্থক্য রয়েছে: সদৃশ সুসমাচারগুলি অনুসারে অনন্ত জীবন ভাবীকালেরই জীবন, যোহনের বেলায় অনন্ত জীবন এই বর্তমানকালেরই জীবন: যে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে (৩:১৫, ১৬, ৩৬ ইত্যাদি) এবং মৃত্যু থেকে জীবনে প্রবেশ করেছে (৫:২৪)। এ প্রেক্ষিতে মার্কের সুসমাচারে তিনটিই বিশিষ্ট বাক্য: জীবনে প্রবেশ করা (মার্ক ৯:৪৩, ৪৫), অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়া (মার্ক ১০:১৭) এবং ভাবীকালে অনন্ত জীবন পাওয়া (মার্ক ১০:৩১)। মার্কের ধারণায় অনন্ত জীবন হল চরমকালের পরিত্রাণ বা সেই ঐশদান যা ঐশরাজ্য থেকে পাবার প্রতীক্ষায় আছি। তাছাড়া মথি 'সেই পথ যা জীবনে নিয়ে যায়' ধারণা উল্লেখ করেন (মথি ৭:১৪), এতে ইহুদী ঐতিহ্য অনুযায়ী 'দুই পথ' বলে পরিচিত কথা সূচিত: আছে পরিত্রাণের উদ্দেশে পথ, আবার আছে ধ্বংসের উদ্দেশে পথ। মার্ক ও মথি থেকে লুক কিছুটা পৃথক ভাব প্রকাশ করেন: তাঁর মতে জীবন এই বর্তমানকালের জীবনের সঙ্গেও সম্পর্কিত (লুক ১৬:২৫; প্রেরিত ১৭:২৫), যিশুই জীবন-প্রণেতা (প্রেরিত ৩:১৫) এবং ঈশ্বর জীবনদায়ী অনুতাপ বিজাতীয়দের দান করেছেন (প্রেরিত ১১:১৮)।

যোহনের ধারণায় অনন্ত জীবন যে এই বর্তমানকাল থেকেই শুরু করা জীবন একথা তাঁর খ্রিষ্ট-সম্বন্ধীয় ধারণা থেকে আসে, অর্থাৎ যোহনের কাছে যিশু এমন যিনি সর্বদাই বর্তমান ও উপস্থিত। সুতরাং অনন্ত জীবন বা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে বাক্যগুলোর তাৎপর্য ভবিষ্যৎকালের দিকে নয়, বরং এই বাস্তব ও বর্তমান কালেরই দিকে ছুটে চলে: যে অনন্ত জীবন বিশ্বাসীর জীবনকালে দান করা হয়, সেই জীবনের পক্ষে উত্তরকাল উন্মুক্ত, সেই জীবন মৃত্যুতে শেষ হয় না, এবং সেই জীবন এমন যা মৃত্যুর পরে শুরু হবে না বরং এই মর্তজীবনেই বিশ্বাসের মাধ্যমে শুরু ক'রে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের

চিরকালীন আলিঙ্গনে সিদ্ধি লাভ করবে। ১২:২৫ পদে লেখা আছে ‘অনন্ত জীবনের জন্য নিজের প্রাণ রক্ষা করা’: এতে অনুমান করি যে, যোহন জীবনের দুই ধরনের পরস্পর-বিরোধী অর্থ উপস্থাপন করতে চান, তথা: ‘এই জগতের’ অনিত্য প্রাণ এবং অবিনশ্বর অক্ষয় নিত্য জীবন; কিন্তু দু’টোর মধ্যকার মূল পার্থক্য সময়সূচক অর্থসাপেক্ষ নয়; যথার্থই, ‘এই জগৎ’ ভাবী জগতের নয় বরং ঊর্ধ্বলোকের বিপরীত জগৎ (৮:২৩): এই জগৎ হল পাপী মানুষের অবস্থা যা ঐশপরিস্থিতি থেকে সবদিক দিয়ে ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। এই জগৎ কথাটা (১২:২৫) এই কারণের জন্যই মাত্র উল্লিখিত, যাতে যে-শিষ্য মর্ত প্রাণ ‘ঘৃণা’ বা উৎসর্গ করে, সে যেন এই জাগতিক জীবন বা অবস্থা অনিত্য ও অস্থায়ী বলেই উপলব্ধি করে (১ যোহন ২:১৭)। যোহনের ভাষায় জাগতিক ও দৈহিক জীবন সর্বদা একটামাত্র শব্দ-বিশেষ দ্বারা উল্লিখিত, যা এই অনুবাদে ‘প্রাণ’ শব্দ দিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে (উল্লেখযোগ্য যে সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের বেলায় ‘প্রাণ’ শব্দটা নিত্য জীবনের দিকে নির্দেশ করে; ১০:১১, ১৫, ১৭; ১৩:৩৭··· ; ১৫:১৩)। অপরদিকে, অনন্ত ও ঐশ জীবনের জন্য ভিন্ন একটা শব্দ-বিশেষের উপর নির্ভর করা হয়, বাংলা শব্দটা হল জীবন। সুতরাং এভাবে পাঠকের কাছে যোহনের ধারণা সবসময় খুবই স্পষ্ট: প্রাণ বলতে এই দৈহিক অবস্থা মাত্র, এবং জীবন বলতে ঐশজীবনই মাত্র বোঝায়।

পল এবং যোহন: স্মরণযোগ্য যে, যোহনের লেখার চেয়ে পলের পত্রগুলো প্রায় চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর পূর্বকালীন লেখা, ফলত পলের ভাষা যোহনের মত এত স্বকীয়, সূক্ষ্ম ও স্থিরীকৃত ভাষা নয়। তিনি অনন্ত ও জাগতিক জীবন বিষয়ে সর্বদা জীবন শব্দ ব্যবহার করেন; তবু তাঁর চিন্তাধারায়ও সেই জীবনেরই কথা প্রভাব বিস্তার করে, যে-জীবন অবিনশ্বর অক্ষয় ও অনন্ত। পলের লেখায় ‘অনন্ত জীবন’ অধিকাংশ সময় চরম সিদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (রো ২:৭; ৫:২১; ৬:২২··· ; গা ৬:৮); অনন্ত জীবন হল খ্রিষ্টবিশ্বাসীর লক্ষ্য (রো ৬:২২)। কিন্তু তাছাড়া তিনি দৃঢ়ভাবে এধারণা সমর্থন করেন যে, পবিত্র আত্মা-লাভে সেই জীবন ইতিমধ্যেই প্রাপ্ত (গা ২:২০; রো ৬:১১ ইত্যাদি)। যিশুর পুনরুত্থানের পর এই জীবন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে দান করা হয়েছে এবং বিশ্বাসীর অন্তরে এখনও সক্রিয় (২ করি ৪:১২); উপরন্তু এই নব জীবন নীতিগত বা পবিত্র জীবনযাপনে ব্যক্ত হওয়া উচিত (রো ৬:৪··· ইত্যাদি)। আমাদের জাগতিক

অস্তিত্ববশত এই জীবনের বর্তমান ও ভাবী দিক পরস্পর বিরোধী দিক বলে গণনা করা হয়; মৃতদের পুনরুত্থানে এমন জীবনারোপ ঘটবে যা আগে ঘটেনি এবং এই জীবনারোপ-ঘটনা হল মানুষের পক্ষে প্রকৃত ও পূর্ণ ঘটনা (১ করি ১৫:২২ ইত্যাদি)। অথচ, একাধারে বিশ্বাসীর অন্তরে বসবাস-করা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ইতিমধ্যে পাওয়া ঈশ্বরের জীবন এবং আমাদের কাছে এই ঐশজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তির মধ্যে একটা মিল রয়েছে, পুনরুত্থানকালে আমাদের দেহ সঞ্জীবিত করার জন্য পবিত্র আত্মা ইতিমধ্যেই প্রতিনিয়ত রত (রো ৮:১১)। অবশেষে, পলের ধারণা অনুসারে, মৃত্যু জীবনের প্রতিরোধী জিনিস বলে পরিগণিত, মৃত্যু হল অমঙ্গল বা অসত্যের প্রভাব (রো ৫:১০, ১৪, ১৭; ৬:৯ ইত্যাদি) যা যিশু দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হবে (১ করি ১৫:২৬); অপরদিকে যোহনের কাছে মৃত্যু একটা অপশক্তি নয়, বরং ঐশজীবনের বিপরীত অবস্থা বলে পরিগণিত। বলা যেতে পারে যে, পল ও যোহন উভয়ের ধারণায় জীবনই ঈশ্বর থেকে আগত এমন শক্তি বা প্রভাব যা যিশুতে বা মৃত্যু থেকে তাঁর পুনরুত্থানে প্রকাশ পায়। কলসীয়দের কাছে পত্রেই বিশেষত ঐশজীবনের বর্তমান প্রাপ্তি উল্লিখিত: সেই চরম জীবন এখনই বিশ্বাসীর অন্তরে বিরাজমান, খ্রিষ্টবিশ্বাসীর একটা গৌরব রয়েছে, কিন্তু সেটা আপাতত স্বর্গে নিহিত, যথাকালেই প্রকাশিত হবে: 'তোমাদের জীবন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে। কিন্তু খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে' (কল ৩:৩-৪)। সুতরাং, যদিও কোন না কোন পত্রে (রোমীয়, গালাতীয় ও করিন্থীয়দের কাছে পত্রে) পল এমন খ্রিষ্টের কথা বলেন যিনি স্বর্গে থেকে খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে প্রভাবান্বিত করেন, তথাপি পরবর্তীকালে তিনি অগ্রগামী এই ধারণার সমর্থক হলেন যে, স্বয়ং খ্রিষ্টই আমাদের নিজের জীবন। কিন্তু, এবিষয়ে যোহন আরও এগিয়ে যান: যিশুই পুনরুত্থান ও জীবন (১১:২৫) এবং পথ, সত্য ও জীবন (১৪:৬): এই যিশু, যিনি মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের জীবন, তিনি ভাবীকালেই শুধু যে আত্মপ্রকাশ করবেন তা নয়, বরং আগে থেকেই ঈশ্বরের জীবন বলে আবির্ভূত হলেন (৫:২০; ১ যোহন ১:২)। পিতার মধ্যে জীবিত পুত্র সেই যিশু নিজে থেকে ঐশসত্তাসূত্রে ও সম্পূর্ণরূপে জীবনমণ্ডিত; পিতার কাছে

অবস্থান করেন বলে তিনি নিয়ত জীবনদাতা এবং ফলত তাঁর সকল বিশ্বাসীর জন্য জীবনের উৎস (১৭:২)।

জীবন বিষয়ে যোহনের ধারণার বৈশিষ্ট্যসমূহ

– যিশুই আরম্ভস্থল: তিনিই ঈশ্বরের সেই প্রেরিত জীবনদানকারী যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসে জগৎকে জীবনদান করেন (৬:৩৩)। এজন্য তিনি জীবনের রুটি (৬:৩৫, ৪৮), জীবনের আলো (৮:১২) ও প্রকৃত জীবন (১১:২৫; ১৪:৬) বলে অভিহিত হন।

– ঈশ্বরের এই যে-জীবন যিশু ব্যক্তি হিসাবে ধারণ করেন, আপন বাণীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ ও দান করেন (৬:৬৩, ৬৮) এবং চিহ্নকর্মগুলোর মাধ্যমে ব্যক্ত করেন ও দান করেন, সেই জীবন তাঁর বিশ্বাসীগণের কাছে দেওয়া হয়। সেই জীবনের মাধ্যমে তারা মৃত্যু থেকে মুক্তি পায়, এমনকি ভাবীকালে শুধু নয়, বর্তমানকাল থেকেই তারা মৃত্যু অতিক্রম করে (৫:২৪; ৮:৫১; ১১:২৬; ১২:২৫)।

– জীবনদান ও জীবনদানের প্রতিশ্রুতি হল মানব অস্তিত্ব ও পরিত্রাণ বিষয়ে জিজ্ঞাসু মানুষের কাছে একমাত্র সত্যাশ্রয়ী উত্তর। মানুষের আলো বলে জীবন (১:৪) জাগতিক অস্তিত্বের মায়াচ্ছন্ন অর্থ আলোকিত করে সমাধানও করে (৮:১২)। কাজেই জীবন হল পরিত্রাণ; কিন্তু এমন পরিত্রাণ যা কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমে বোধগম্য, অর্থাৎ জীবন হল বিশ্বাসজনিত ও ঈশ্বরের দেওয়া নব অস্তিত্ব।

– যিশুর দেওয়া জীবন জাগতিক বা জাদুমূলক কিছু নয়, বরং দিব্য বাস্তবতা, অর্থাৎ সেই ঈশ্বরের জীবনে অংশগ্রহণ যিনি জীবনময় পিতা ও যে কোন জীবনের উৎস (৫:২৬; ১ যোহন ১:২)। পুত্রের মাধ্যমে পিতার জীবনদান লাভে (১ যোহন ৫:১১) আমরা পিতা ও পুত্রের সহভাগিতায় উন্নীত হই (১ যোহন ১:৩; ২:২৩… ; ৫:১২)। আমাদের অর্জিত নব-অস্তিত্ব ‘ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিময় সম্পর্ক বা সহভাগিতা’ বাক্যে উত্তমরূপে ব্যক্ত হয়।

– বিশ্বাসীকে জীবনদানে পবিত্র সাক্রামেন্তগুলোর উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আরোপণীয়। পবিত্র সাক্রামেন্ত নিজ থেকে কার্যকর নয়, সেগুলো হল সাক্ষ্যদানকারী ও ক্রিয়াশীল চিহ্ন যা যিশুর সঙ্গে এবং যিশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গেও আমাদের সংযুক্ত করে (৩:৫; ৬:৫৩··· ; ১ যোহন ৫:৭···)। 'ঈশ্বর থেকে যে উদ্গত' তাকে যে-জীবন দেওয়া হয়, তা স্বভাবতই অনন্ত ও চিরস্থায়ী (৬:২৭; ১ যোহন ২:২৭; ৩:৯) এবং যিশু ও ঈশ্বরের সঙ্গে সচেতন জীবন-সংযোগে বা 'ভালবাসায় স্থিতমূল থাকায়' (১৫:৯; ১৪:২১···) বিশ্বাসীকে চালনা করবে। 'যিশুতে বসবাস করার' জন্য পবিত্র সাক্রামেন্তের ভূমিকাই বিশেষত স্মরণযোগ্য (৬:৫৬)।

আমাদের কাছে দেওয়া জীবন একটা নৈতিক দায়িত্বে রূপান্তরিত হয়: সেই জীবনলাভ ভ্রাতৃপ্রেমে প্রমাণিত হতে হয়। ঈশ্বরের দান-করা-জীবন ঈশ্বরের সঙ্গে যাপন-করা-জীবন, যা সকল মানুষের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক স্থাপনে স্বীকৃতি লাভ করবে (১ যোহন ৪:২০···)। সুতরাং, খ্রিষ্টীয় জীবনযাপন 'জীবন'-দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অনুধাবন করলে অনুমান করা যায় যে, খ্রিষ্টীয় জীবনযাপন একাধারে একটা দান ও একটা দায়িত্ব-কর্তব্য এবং শুধু তা-ই বলে তার চরম সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

সেইকালের ঐতিহ্য অনুসারে জীবন ধারণা

অন্যান্য পরিশিষ্টের মত এখানেও এবিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হবে না। একথাই যথেষ্ট হোক যে, যোহন অনুসারে জীবন ধারণাটা মোটামুটি জ্ঞান-মার্গপন্থীদের ধারণার সঙ্গে জড়িত; তারাও বলত যে, যে-উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি এখন 'বিশেষ জীবন' পেয়ে গেছে সে কখনও মরবে না। কিন্তু এ বিশেষ জীবন যে কী করে পাওয়া যায় এবিষয়ে এবং অন্য কতিপয় বিষয়েও যোহনের সঙ্গে তাদের পার্থক্য খুবই গভীর।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যোহন তাঁর সমকালীন মানুষের সমস্যাদি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করেন: কেমন করে মানুষ মৃত্যু থেকে মুক্তি পেতে ও অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারে? মানুষ কোথা থেকে আসে এবং কোথায় বা যায়? মানবজীবনের

অর্থ কী? এ সকল জীবন-জিজ্ঞাসায় যোহন নাজারেথের যিশুর কথা উপস্থাপন করেই উত্তর দেন।

যোহনের জীবন ধারণার ঐশতাত্ত্বিক তাৎপর্য

যদিও যোহনের মতে 'জীবন' ঈশ্বর থেকে আগত এবং যিশুর মাধ্যমে মানুষকে দেওয়া হয় (৩:১৬; ৫:২৬; ৬:৫৭), তবুও ধারণাটার উৎপত্তি মানুষে এবং তার পরিত্রাণ-অনুসন্ধানে সূচিত (৪:১৩…; ৬:২৭; ৭:৩৮; ৮:১২; ১৭:৩)। যোহনের ঐশতত্ত্ব অতিশয় তাত্ত্বিক ও গভীর; তা সত্ত্বেও সেই ঐশতত্ত্ব মানুষেই কেন্দ্রীভূত ও মানুষের সঙ্গে খুবই সম্পর্কযুক্ত: পরিত্রাণ-অনুসন্ধানে উদ্বিগ্ন মানুষেরই কাছে যোহন একটা পথনির্দেশ দিতে চান। এবিষয়ে জীবন ধারণাটা ঠিক মানব-জীবনের সঙ্গেই বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, তথাপি এ সত্য দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে, সেই জীবন মানবীয় প্রাণ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন জিনিস। এখানে যিশুর একথা স্মরণযোগ্য: 'এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশুখ্রিষ্টকে জানবে' (১৭:৩)। এ উক্তি থেকে বিশেষত একথাই ভেসে ওঠে যে, অনন্ত জীবন সর্বাপেক্ষা মানুষের জন্য, এমনকি মানব-অস্তিত্বের লক্ষ্য, এবং ঈশ্বরকে ও যিশুকে 'জানায়' সিদ্ধিলাভ করে; উপরন্তু প্রচারিত হয় যে, এই 'জানা' মানুষের কাছে দেওয়া একটা দায়িত্ব-কর্তব্য বা, অন্য কথায়, এই 'জানা' হল মানুষের কাছে ঈশ্বরের বিশেষ একটা সুযোগ-দান; অবশেষে এ 'জানা' এমন যা বুদ্ধিসাপেক্ষ নয় বরং পুরাতন নিয়মের ধারণা অনুসারেই গ্রহণযোগ্য: জানা বলতে আন্তরিক সহভাগিতা ও সম্পূর্ণ সংযোগ বোঝায় (১০:১৪…)।

এই জীবন যিশুর মাধ্যমেই শুধু পাওয়া যেতে পারে। ঐশজীবনলাভের জন্য মানুষ নিজের উপর নির্ভর করলে তবে মানবীয় গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে (৩:৩১; ৮:৩৪-৩৬; ৬:২৬, ৩৫)। জীবনবহনকারী যিশুতে স্থাপিত বিশ্বাসই মানুষের চোখ খুলে দেবে এবং সেই পথ উন্মুক্ত করবে যে-পথে চলে মানুষ আকাঙ্ক্ষিত জীবন পাবে। আবার, এ জীবনদানের প্রতিশ্রুতি ভাবীকালের জন্য নয়, বরং বর্তমান ও মর্ত জীবনের জন্য: বিশ্বাসের মাধ্যমে বিশ্বাসী এই জাগতিক অস্তিত্বেই সেই জীবনের ঐশ বৈশিষ্ট্য দেখে

এবং সে নিশ্চিত জানে যে, ‘জীবনের উৎস’ ঈশ্বরের মধ্যে সে শরণপ্রাপ্ত (১৭:১১, ১৪, ১৬)। তবুও, একাধারে সে এই ঐশজীবন বাস্তবায়নের জন্য আহূত, অর্থাৎ খ্রিস্টবিশ্বাসী সকল মানুষের প্রেমপূর্ণ সেবায় আহূত।

বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমাদের দান-করা-জীবন শারীরিক মৃত্যু অতিক্রম করে। বিশ্বাসী হিসাবে নব-জীবনযাপন বা নব-অস্তিত্ব, প্রকৃত আত্মসচেতনতা এবং এই আত্মসচেতনতা থেকে উৎপন্ন দায়িত্ব ও আত্মনির্ভরশীলতা, এ সকল বিষয় অর্থশূন্য হয়ে থাকে যদি ‘অন্তিমকালের উদ্দেশে জীবন’ অর্থাৎ মৃত্যুর সীমা অতিক্রম বিষয়টা অতিবাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচনা না করি; নইলে ৬:৫--৫৮; ৮:৫১; ১০:২৮; ১১:২৫··· ইত্যাদি বাক্য তাৎপর্যহীন হয়ে যায়। যিশুর বিদায় উপদেশও এবিষয়ে সম্পর্কিত (১৪:৪···) এবং মারাত্মক ভুল করি যদি সেই উপদেশে আলোচিত ‘সহায়তাকে’ শুধু জীবনকালেই শিষ্যদের প্রতি ঈশ্বরের আত্মিক একটা সহায়তা বলে বিবেচনা করি। একই প্রকারে, ‘যেখানে আছি’ ও ‘যেখানে যাচ্ছি’ যিশুর উক্তিগুলো সেই ‘স্থান’ ও জীবনের সেই ‘ধরনের’ দিকে ধাবমান যাতে তাঁর শারীরিক মৃত্যুর পরই তিনি উন্নীত হলেন (৭:৩৪··· প্রভৃতি) এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শিষ্যদেরও তিনি সেই ‘স্থান’ ও ‘ধরনের’ উত্তরাধিকারী করবেন বলে প্রতিশ্রুত হন (১২:২৬; ১৩:৩৬; ১৪:৩)।

সুতরাং, একথা স্বীকার্য যে, যোহন শারীরিক মৃত্যু, তার মর্মার্থ, তার উপর আত্মিক বিজয় ও তার আত্মিক অতিক্রম ইত্যাদি সমস্যাদির জন্য উদ্বিগ্ন। যারা এ সকল সমস্যা এড়িয়ে চলে বা সেগুলির অতিগভীর উত্তর দিতে অস্বীকার করে তারা মানুষের মত মানুষ নয়। যদি জীবনজিজ্ঞাসু বলে আমরা ব্যক্তিগতভাবেই এই মানবীয় জীবন সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন, তাহলেই যোহনের জীবন ধারণাটি বোধগম্য হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তিগতভাবে উপযুক্ত একটা উত্তর পাব; আর এই উত্তর আমাদের ব্যক্তিগত তাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণার্থেই দেওয়া উত্তর, অর্থাৎ আমরা সেই মাত্রায় তা বুঝতে ও কার্যকর করতে পারি যে-মাত্রায় ঈশ্বরের সঙ্গে জীবনসংযোগে ব্যতীত সকল মানুষের সঙ্গেও জীবনসংযোগে সংযুক্ত: ঈশ্বরের জীবনলাভ, এই পরম লক্ষ্য লাভের জন্য একটামাত্র শর্ত হল পারস্পরিক ভালবাসার আজ্ঞা পালন।

তৃতীয় পাস্কা পর্ব

(১১:৫৫–২০:৩১)

এই অধ্যায় যিশুর প্রকাশ্য জীবনের উপসংহারস্বরূপ ও একাধারে তাঁর যন্ত্রণাভোগের ভূমিকাস্বরূপ। যিশুর 'ক্ষণ' সন্নিকট এবং যোহন নিজে এই প্রেক্ষিতে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, 'ইহুদীদের পাস্কা সন্নিকট ছিল'।

বেথানিয়ায় তৈললেপন (১২:১-৭) হল রাজমর্যাদায় যিশুর অভিষেক এবং তাঁর সমাধি-ক্রিয়ার পূর্বপ্রকাশ (১৯:৩৮-৪২); যেরুশালেমে মশীহ-রাজরূপে যিশুর প্রবেশ (১২:১১-১৯) হল পিলাতের দরবারে তাঁর বিচারের প্রতীক (১৮:১৮…); আপন মৃত্যু-বিষয়ক উপদেশ (১২:২০-৩৬) সরাসরি তাঁর ক্রুশারোপণের কথা লক্ষ করে। এ থেকে সমগ্র অধ্যায়ের প্রসঙ্গ স্পষ্টভাবে অনুমান করা যায়: জীবন মৃত্যুর মধ্য থেকে আসে, যিশুর বিজয় আপন মৃত্যুর উপরেই স্থাপিত: সেই 'মৃত্যু-ক্ষণেই' মানবপুত্রের গৌরবায়ন-শুভলগ্ন উপস্থিত (১২:২৩), মরে যাওয়া গমের দানা ফলপ্রদ হয় (১২:২৪) এবং ক্রুশ সেই গৌরব হয়ে ওঠে যার মাধ্যমে মানবপুত্র সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করেন (১২:৩২)। এইভাবে যিশুর জীবনযাত্রার সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন 'ক্ষণ' তাঁর ঐশগৌরবায়নে পরিণত হয় (১২:১৭…) এবং জগতের অধিপতির অধিকার বিলুপ্ত হয় (১২:৩১)। মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও যিশুখ্রিষ্ট মৃত্যুঞ্জয়ী ও চিরকালস্থায়ী (১২:৩৪)।

বেথানিয়ায় তৈললেপন (১১:৫৫–১২:১১)

১১ [৫৫] ইহুদীদের পাস্কা সন্নিকট ছিল। আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া সেরে নেবার জন্য
অনেকে পাস্কার আগে গ্রামাঞ্চল থেকে যেরুশালেমে গেল। [৫৬] তারা যিশুকে
খুঁজছিল, আর মন্দিরে দাঁড়িয়ে এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল: 'তোমরা
কি মনে কর? তিনি কি পর্বে আসবেন না?' [৫৭] এর মধ্যে প্রধান যাজকেরা ও
ফরিশীরা আজ্ঞা দিয়েছিলেন যে, তিনি কোথায় আছেন, কেউ তা জানতে পারলে
যেন খবরটা জানিয়ে দেয়, যাতে তাঁরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।

১২ [১] পাস্কার ছ' দিন আগে যিশু বেথানিয়ায় এলেন। যে লাজারকে তিনি
মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছিলেন, সেই লাজার সেখানে থাকতেন।
[২] সেখানে যিশুর জন্য এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল, আর মার্থা
পরিচর্যা করছিলেন, এবং যারা যিশুর সঙ্গে খেতে বসেছিল, তাদের মধ্যে লাজারও
ছিলেন। [৩] মারীয়া আধ কিলো বিশুদ্ধ বহুমূল্য সুগন্ধি জটামাংসী তেল নিয়ে এসে
যিশুর পায়ে তা মাখিয়ে দিলেন, ও নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিলেন। তেলের
সুগন্ধে সারা বাড়িটা ভরে গেল। [৪] তখন শিষ্যদের মধ্যে একজন—সেই যুদা
ইস্কারিয়োৎ যিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন—বলে উঠলেন, [৫] 'এই
সুগন্ধি তেল তিনশ' রুপোর টাকায় বিক্রি ক'রে টাকাটা গরিবদের দেওয়া হয়নি
কেন?' [৬] গরিবদের জন্য তাঁর চিন্তা ছিল বিধায় কথাটা বলেছিলেন, তা নয়,
কিন্তু তিনি চোর ছিলেন ও টাকার বাক্স তাঁরই কাছে থাকায় গচ্ছিত টাকা চুরি
করতেন। [৭] যিশু বললেন, 'একে ছাড়; এই সুগন্ধি তেল এ আমার সমাধির
দিনের জন্য এভাবে রেখে দিক। [৮] গরিবেরা তো তোমাদের কাছে সর্বদাই
রয়েছে, কিন্তু আমাকে সর্বদা কাছে পাচ্ছ না।'
[৯] ইহুদীদের মধ্যে অনেকে যখন জানতে পারল যে, তিনি সেইখানে আছেন,
তখন তারা এল—শুধু তাঁর খাতিরে নয়, সেই লাজারকেও দেখবার জন্য যাঁকে
তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছিলেন। [১০] তাই প্রধান যাজকেরা স্থির
করলেন যে, লাজারকেও তাঁদের হত্যা করতে হবে, [১১] কারণ তাঁর কারণে বহু
ইহুদী চলে গিয়ে যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখছিল।

সদৃশ সুসমাচারত্রয়েও এই ঘটনা উল্লিখিত। লুক একজন নারীর কথা বলেন যে যিশুর পায় আনত হয়ে কাঁদে এবং প্রেম ও অনুতাপ প্রদর্শনে সুগন্ধি তেল দ্বারা তাঁর পা লেপন করে; নারীটি পাপী ছিল বলে উপস্থিত সকলে নিজেদের অপমানিত বোধ করেছিল। সুতরাং লুকের মর্মকথা এই ছিল: ফরিশীদের গর্বের বৈপরীত্যে ঈশ্বরের করুণা ও পাপীদের প্রতি যিশুর প্রেম প্রকাশ করা। মার্কের বর্ণনা অনুসারে একটি নারী যিশুর মাথা মহামূল্য তেল দ্বারা অভিষিক্ত করেছিল; তেমন ক্রিয়াকর্ম ছিল মশীহরূপে যিশুর অভিষেক-ক্রিয়ার প্রতীক এবং তাঁর সমাধি-ক্রিয়ার পূর্বপ্রকাশ; এসময়

অসন্তোষের কথা উঠেছিল টাকার অপব্যয়ের জন্য। সুতরাং, স্পষ্ট লক্ষ করে দেখতে পারি যোহনের বর্ণনা মার্কের বর্ণনা অনুযায়ী। মার্থার ক্রিয়াকর্মে যিশু একদিকে ইস্রায়েলের মশীহ-রাজ রূপে তৈলাভিষিক্ত হন এবং অপরদিকে সেই ক্রিয়াকর্ম তাঁর সমাধি-ক্রিয়ার পূর্বলক্ষণ বলে প্রদর্শিত হয়। অজান্তে মার্থা উপস্থিত সকলের কাছে যিশুর গৌরব প্রকাশ করলেন, যে-গৌরব যিশুর মৃত্যুতেই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে।

১২:৪—**শিষ্যদের মধ্যে একজন:** যুদা ইস্কারিয়োৎ যিশুতে প্রকৃত গরিবজন, এমনকি ইতিহাসের সকল গরিবের প্রতিমূর্তি চিনতে পারেন না। এর কারণ: তিনি প্রকৃত শিষ্য নন, নকল শিষ্যই।

যেরুশালেমে যিশুর প্রবেশ (১২:১২-১৯)

১২ [১২] পরদিন, পর্ব উপলক্ষে যে বহু লোক এসেছিল, তারা যখন শুনল, যিশু যেরুশালেমের দিকে আসছেন, [১৩] তখন খেজুরপাতা নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে গেল। তারা চিৎকার করে বলছিল,

'হোশান্না; যিনি প্রভুর নামে আসছেন,
যিনি ইস্রায়েলের রাজা, তিনি ধন্য।'

[১৪] যিশু একটা গাধার বাচ্চা খুঁজে পেয়ে তার পিঠে আসন নিলেন, যেমনটি লেখা আছে,

[১৫] *সিয়োন-কন্যা, ভয় করো না:*
দেখ, তোমার রাজা আসছেন;
তিনি গাধীর একটা বাচ্চার পিঠে আসীন।

[১৬] তাঁর শিষ্যেরা প্রথমে এই সমস্ত বুঝতে পারলেন না, কিন্তু পরবর্তীকালে যখন যিশু গৌরবান্বিত হলেন, তখন তাঁদের মনে পড়ল যে, এই সমস্ত কিছু তাঁরই বিষয়ে লেখা হয়েছিল ও তাঁর প্রতি ঘটেছিল।
[১৭] তিনি যখন লাজারকে সমাধি থেকে বেরিয়ে আসতে ডেকেছিলেন ও তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছিলেন, তখন যে সমস্ত লোক তাঁর সঙ্গে ছিল,

তারা সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছিল। [১৮] আর এজন্যও লোকের ভিড় তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গেল, কারণ তারা শুনেছিল যে, তিনি সেই চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন। [১৯] তখন ফরিশীরা একে অন্যকে বলতে লাগলেন: 'আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন যে কিছুই করে উঠতে পারছেন না। এবার জগৎসংসারই ওর পিছনে চলল!'

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে যোহন এ ঘটনার মধ্য দিয়ে ঘোষণা করতে চান জনতা যিশুকে মশীহ-রাজারই উপযুক্ত সম্মানে সম্মানিত করেছে; সদৃশ সুসমাচারগুলিও এই ঘটনা বর্ণনা করে, কিন্তু যোহনের দৃষ্টিভঙ্গি সেগুলির চেয়ে অতিগভীর।

১২:১৩—বহু লোক… খেজুরপাতা নিয়ে… : খেজুরপাতা ছিল বিজয়ী রাজার প্রতীক-চিহ্ন (১ মাকা ১৩:৫১; ২ মাকা ১৪:৪)। জনতার 'হোশান্না' চিৎকারও খেজুরপাতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, এমনকি কোন এক সময় খেজুরপাতাই 'হোশান্না' বলে অভিহিত ছিল। কাজেই একথা স্বীকার্য যে, যেরুশালেমের তীর্থযাত্রীগণ যিশুকে মশীহ-রাজ রূপে গ্রহণ ও সম্মানিত করতে চায়। এই কথা অধিক স্পষ্টতর হয়ে ওঠে যখন আমরা স্মরণ করি যে সেইকালে জনতা প্রত্যাগমনকারী বিজয়ী রাজাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য শহর থেকে বের হয়ে রাজপথেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেত; ঠিক এইভাবে যিশুর বেলায়ও ঘটে।

১২:১৩—হোশান্না; যিনি প্রভুর নামে আসছেন… : এই সম্ভাষণ-জ্ঞাপনে পর্ব উপলক্ষে আগমনকারী তীর্থযাত্রীদের গ্রাহ্য করা হত; তথাপি বিশেষত লক্ষণীয় এই কথা যে, 'হোশান্না; যিনি প্রভুর নামে আসছেন, … তিনি ধন্য' এই সম্ভাষণ হল 'হাল্লেল' বলে পরিচিত সেই সামগীতিগুলির অন্তর্ভুক্ত একটা পদ, যে-সামগীতিগুলি পর্ণকুটির ও পাস্কা পর্ব উপলক্ষে মন্দিরে গান করা হত: তিনি প্রকৃত 'ধন্য' হবেন যিনি প্রভুর নামে মশীহরূপে ইস্রায়েলকে উদ্ধারের জন্য একদিন আসবেন। এই আলোতেই যিশুর প্রতি নিবেদিত এই সম্ভাষণ পূর্ণ অর্থ অর্জন করে: তিনিই সেই প্রকৃত 'ধন্য' মশীহ যিনি পিতা

দ্বারা প্রেরিত বলে সত্যিই প্রভুর নামে আসছেন। লক্ষ করার বিষয় জনতার সম্ভাষণের শেষাংশও: 'ইস্রায়েলের রাজা'; একথা ক্রুশের উপরে টাঙানো দোষনামায়ও লেখা হবে! জনতা যিশুকে মশীহ-রাজ রূপে ঘোষণা করে আর তিনি জনতার সেই উৎসাহ গ্রহণ করেন ঠিকই, তথাপি একাধারে দেখাতে চান তিনি কী ধরনের মশীহ-রাজ: গাধার পিঠে বসায় ঘোষণা করেন তিনি ইহুদীদের প্রত্যাশিত সংগ্রামী মশীহ-রাজ নন, বরং নবী জাখারিয়ার ভাববাণী অনুসারেই তিনি শান্তি-রাজ। যিশু সেই দীনহীনদের রাজা যারা অন্তরে নির্মল, যারা ঈশ্বরের উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে জীবনযাপন করে, যারা বিশ্বাস করে কেবলমাত্র ঈশ্বরেই প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যেতে পারে। নবী জাখারিয়া ব্যতীত, এখানে নবী জেফানিয়ার একটা ভাববাণীও স্মরণযোগ্য: 'সিয়োন-কন্যা, ভয় করো না; ইস্রায়েলের রাজা সেই ঈশ্বর তোমাতে উপস্থিত!' একথাও এখন সিদ্ধিলাভ করেছে। আবার, তিনি ইসহাকের প্রতীকমূলক বলিদানের পূর্ণতাস্বরূপ: ইহুদী ঐতিহ্য অনুসারে ইসহাক একটি গাধার পিঠে চড়ে বলিদানের স্থান অভিমুখে গিয়েছিলেন।

কিন্তু, জনতার উৎসাহ যদিও ভাল, তবুও যিশুকে গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়; অল্প দিন পরে একই জনতা যিশুকে ক্রুশে দেবার জন্যই চিৎকার করবে (১৮:৪০; ১৯:৬…)। যখন যিশু ক্রুশের উপরে উত্তোলিত হয়ে বিদ্ধ হবেন তখনই তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে মশীহ-রাজ রূপে চিনতে হয়; একথাও নবী জাখারিয়া প্রচার করেছিলেন (জাখা ১২:১০): ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা, এই শর্তেই মাত্র যিশুর গৌরব সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। এবিষয়ে যোহন ঐশপ্রকাশ পুস্তকে একথাও বলেছেন: 'প্রতিটি চোখ তাঁকে দেখতে পাবে; তারাও তাঁকে দেখতে পাবে, যারা তাঁকে বিঁধিয়ে দিয়েছিল; আর পৃথিবীর সকল জাতি তাঁর জন্য নিজেদের বুক চাপড়াবে' (প্রকাশ ১:৭)।

১২:১৬—তাঁর শিষ্যেরা প্রথমে এই সমস্ত বুঝতে পারলেন না: যোহন অনুসারে যিশুর প্রতি জনতার সমাদর একটা সাক্ষ্যদান: যিশুর রাজ্য রাজনৈতিক বা পার্থিব ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না (১৮:৩৬) বরং সত্য-প্রকাশ ও ঐশপরিত্রাণ সাধনের

উপরে স্থাপিত রাজ্য (১৮:৩৭): এই মর্মেই যিশু সেই অপেক্ষিত মশীহ ও ঈশ্বরপুত্র (১:৪৯; ১১:২৭; ২০:৩১)। এ মর্মসত্য এখানে বর্ণিত 'যেরুশালেমে যিশুর প্রবেশে' অতিপ্রকাশ্য হয়ে ওঠে, কেননা যিশু নবী জাখারিয়া ও জেফানিয়ার ভাববাণী পূর্ণ করে তোলেন এবং সেই জনতা দ্বারা সমাদৃত হন যে-জনতা 'পরিত্রাণের জাতি'স্বরূপ ইস্রায়েলের প্রতীক (১:৩১)। কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা সেসময় এই মর্মসত্য বুঝতে পারলেন না, তাঁদের কাছে মর্মটা বোধগম্য হবে শুধু গৌরবায়নের পরে যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করবেন (২:২২) এবং পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করবেন (৭:৩৯): যোহনের ধারণায়, ক্রুশে উত্তোলন, পুনরুত্থান ও পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ যিশুর গৌরবায়নের একটিমাত্র ঘটনা (১২:২৩, ৩২)। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা দ্বারাই শিষ্যেরা 'স্মরণ' করতে সক্ষম হলেন (১৪:২৬; ১৬:১৪)। এখানে, 'স্মরণ' বলতে বোঝায় পূর্বঘটনাগুলোর অর্থ পবিত্র আত্মার সহায়তায় সম্পূর্ণরূপে ও গভীরতমভাবে ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করা: সেই সহায়তায়ই তাঁরা পবিত্র শাস্ত্রের খ্রিষ্টসম্বন্ধীয় তাৎপর্য এবং যেরুশালেমে যিশুর প্রবেশের মশীহসূচক অর্থ অনুভব করতে সক্ষম হলেন।

১২:১৭খ—যে সমস্ত লোক তাঁর সঙ্গে ছিল…: তিনি লাজারকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করেছেন বিধায় লোকে তাঁকে জীবনদাতা ও মৃত্যুঞ্জয়ী বলে অভ্যর্থনা জানায়।

১২:১৯—জগৎসংসারই ওর পিছনে চলল: সবসময়ের মত এবারও অবিশ্বাসীরা বুঝতে পারে না; তথাপি, যেমন কাইয়াফার বেলায় তেমনিভাবে এখনও তাদের অবিশ্বাসের কথা একটা ভাববাণীতে পরিণত হয়: কেবল অনেক ইহুদী যিশুর প্রতি বিশ্বাসী হল এমন নয়, সমগ্র জগৎসংসারও ত্রাণকর্তা যিশুর পিছনে ছুটে চলে: যিশুখ্রিষ্টই জগৎত্রাতা। বস্তুতপক্ষে, পরবর্তী বর্ণনায়ই এই ভাববাণীর পূর্বাভাস পাওয়া যায় যখন গ্রীকজাতীয় মানুষ (বর্ণনা অনুসারে তারা হল সমগ্র জগতের মানুষের প্রতীক) যিশুর অনুসরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে (১২:২০)।

গৌরবায়ন-ক্ষণের পূর্বঘোষণা (১২:২০-৩৬)

১২ [২০] পর্ব উপলক্ষে উপাসনা করার জন্য যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রীক ছিল। [২১] তারা ফিলিপের কাছে এল—তিনি গালিলেয়ার বেথ্‌সাইদার মানুষ ছিলেন—এবং তাঁর কাছে এই অনুরোধ রাখল, 'মহাশয়, আমরা যিশুকে দেখতে ইচ্ছা করি।' [২২] ফিলিপ গিয়ে আন্দ্রিয়কে বললেন, এবং আন্দ্রিয় ও ফিলিপ যিশুর কাছে এসে কথাটা জানালেন। [২৩] যিশু তাঁদের উত্তর দিলেন, 'মানবপুত্রের গৌরবান্বিত হওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। [২৪] আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে। [২৫] নিজের প্রাণকে যে ভালবাসে, সে তা হারিয়ে ফেলে, আর এই জগতে নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে, সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে। [২৬] কেউ যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক, যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, তবে আমার পিতা তাকে সম্মানিত করবেন।

[২৭] এখন আমার প্রাণ কম্পিত; তবে কী বলব? পিতা, এই আসন্ন ক্ষণ থেকে আমাকে ত্রাণ কর? কিন্তু এর জন্যই আমি এই ক্ষণ পর্যন্ত এসেছি! [২৮] পিতা, তোমার আপন নাম গৌরবান্বিত কর।' তখন স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'তা গৌরবান্বিত করেছি, আবার তা গৌরবান্বিত করব।' [২৯] সেখানে উপস্থিত লোকেরা তা শুনতে পেয়ে বলল, 'এ একটা বজ্রধ্বনি।' অন্যেরা বলল, 'এক স্বর্গদূত তাঁর সঙ্গে কথা বললেন।' [৩০] যিশু উত্তরে বললেন, 'এই কণ্ঠস্বর আমার জন্য নয়, তোমাদেরই জন্য ধ্বনিত হল। [৩১] এখন এই জগতের বিচার উপস্থিত, এখন এই জগতের অধিপতিকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। [৩২] আর আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব।' [৩৩] তিনি যে কী ধরনের মৃত্যুতে মারা যাবেন, এই কথায় তার ইঙ্গিত দিলেন। [৩৪] লোকেরা তাঁকে উদ্দেশ করে বলল, 'বিধান থেকে আমরা শিখেছি যে, যিনি খ্রিষ্ট, তিনি চিরকালস্থায়ী। তবে আপনি কেমন করে বলতে পারেন যে, মানবপুত্রকে উত্তোলিত হতে হবে? এই মানবপুত্র কে?' [৩৫] যিশু এই বলে উত্তর দিলেন, 'আর অল্পকাল মাত্র আলো তোমাদের মাঝে আছে; যতক্ষণ আলো

তোমাদের থাকে, ততক্ষণ চলতে থাক, পাছে অন্ধকার তোমাদের নাগাল পায়। যে অন্ধকারে চলে, সে কোথায় যাচ্ছে জানে না। [৩৬] আলো যতক্ষণ তোমাদের থাকে, ততক্ষণ তোমরা আলোতে বিশ্বাস রাখ, যেন আলোর সন্তান হতে পার।'
এই সমস্ত কথা বলার পর যিশু চলে গেলেন ও তাদের চোখের আড়ালে থাকলেন।

যোহনের সুসমাচারে এটিই হল যিশুর শেষ প্রকাশ্য উপদেশ, সুতরাং উপদেশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা যিশুর প্রকাশ্য জীবনের উপসংহারস্বরূপ। আলোচ্য বিষয় হল 'ক্রুশ', কিন্তু 'মানবপুত্রের উত্তোলন-উন্নয়ন' দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অর্থাৎ যিশুর 'গৌরবায়ন' ও 'পরম বিজয়লাভ' দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেই পরিলক্ষিত। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনের পথ উন্মুক্ত হয় এবং শুধু যিশুর জন্য নয়, তাঁর সকল অনুগামী ও সেবকদের জন্যও পথ উন্মুক্ত। সুতরাং, এখানে যিশুর গৌরবায়নের মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল তাঁর মৃত্যুর সার্বজনীন সফলতা: যারা বিশ্বাস করতে উৎসুক, যিশু নিজের কাছে তাদের সকলকে আকর্ষণ করবেন। জগতের অধিপতির উপর যিশুর বিজয়ে জগতের উপরে সর্বকালের বাণীপ্রচারকদের বিজয়ও ইঙ্গিত করা হয়।

১২:২০—কয়েকজন গ্রীক ছিল: সেইকালে গ্রীক অনেকে প্রাক্তন ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করে ইহুদীদের প্রচারিত ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করত। তারা সাধারণত ধার্মিক ও সৎ মানুষ ছিল। এদের কয়েকজন যিশুর সাধিত ক্রিয়াকর্মের কথা শুনে তাঁকে দেখবার জন্য, অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য, তাঁকে জানবার জন্য ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবার জন্যই ব্যাকুল। যিশুর কাছে তাদের এগিয়ে যাওয়ায় যে অবিশ্বাসী ইহুদীদের ভাববাণী অনুসারে যিশুর পিছনে 'সমগ্র জগৎসংসারের' চলার অর্থ সূচিত এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। উপরন্তু, এই অর্থও নিহিত রয়েছে যে, এই সার্বজনীনতা যিশুর মৃত্যুর ফলস্বরূপ ফলেছে (১২:২৩…) এবং তখনই তা বাস্তবায়িত হবে যখন সমগ্র জগৎ তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে অর্থাৎ খ্রিষ্টমণ্ডলীর বাণীপ্রচারের মাধ্যমে যিশুকে দেখবে।

১২:২৩—মানবপুত্রের গৌরবান্বিত হওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে: যিশু গ্রীকদের অনুরোধ গ্রহণ করেন না, প্রথমে এমন বোধ হয়; প্রকৃতপক্ষে তিনি শুধু তাদের জন্য নয়, সর্বকালের মানুষের জন্যও প্রযোজ্য উত্তর দেন অর্থাৎ দেখান কোনটাই প্রকৃত শিষ্যের পথ।

সুসমাচারের অন্যত্রও যিশুর 'ক্ষণের' কথা উল্লিখিত (৭:৩০; ৮:২০), এখন সেই ক্ষণের তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হয়ে ওঠে এবং মানবপুত্রের 'উত্তোলনের' তাৎপর্যও পূর্ণ প্রকাশিত হয় (৩:১৪; ৮:২৮)। যিশুর ক্ষণ একটামাত্র: সেই অনন্য ক্ষণে তিনি ক্রুশে উত্তোলিত হন শুধু এমন নয়, বরং তিনি ঐশগৌরবেই উন্নীত হন; এই মর্মে বলা হয়, সেই ক্ষণেই যিশু একাধারে মৃত্যুবরণ করেন, পুনরুত্থানও করেন ও গৌরবান্বিতও হন। যিশু এখানে মানবপুত্র বলে নিজেকে অভিহিত করেন কারণ স্বর্গলোকে আরোহণ করে (৬:৬২) গৌরবান্বিত হন অর্থাৎ তাঁর প্রাপ্য পরিত্রাণদায়ী অধিকার সম্পূর্ণরূপে পান (১৩:৩২; ১৭:১…) যা দ্বারাই সকল মানুষকে জীবনদান করতে ও সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করতে (১২:৩২) সক্ষম হয়ে ওঠেন। যেহেতু ক্রুশে উত্তোলনেই তিনি গৌরবান্বিত, সেজন্য তাঁর মৃত্যুর পরিত্রাণদায়ী ভূমিকাও অধিক স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয়, এমনকি তাঁর প্রকাশকারী ভূমিকাও পূর্ণতা লাভ করে যেহেতু ক্রুশে উত্তোলিত-গৌরবান্বিত যিশুতে পিতা ঈশ্বর ভালবাসাস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাঁর মৃত্যু পরিত্রাণের উৎসে পরিণত করেন।

১২:২৪—গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়… : এই দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যায় যে, মৃত্যু-ক্ষণ বাহ্যিক দিক দিয়ে যত অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ষণ হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে আলোক-উজ্জ্বল, ফলপ্রসূ ও আনন্দ-ভরাই ক্ষণ।

১২:২৫—নিজের প্রাণকে যে ভালবাসে… : এ কথাগুলো এক দিকে যিশুর আত্মবলিদানের সঙ্গে জড়িত এবং অন্য দিকে শিষ্যের জন্য প্রযোজ্য: শিষ্যের পক্ষে

মৃত্যু সবকিছুর পরিণতি নয় বরং প্রকৃত জীবনের সিদ্ধি: কষ্ট-যন্ত্রণা ও নির্যাতন-অত্যাচারকে ঐশজীবনে বিশ্বাস রেখেই জয় করতে হয়।

১২:২৬—কেউ যদি আমার সেবা করে… : মানবপুত্রের পথে চ'লে অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত ক্রুশ গ্রহণ করে শিষ্য যিশুর কাছে গিয়ে পৌঁছবে; বাণীপ্রচারে বিশ্বাসীর সাক্ষ্যদান সম্পূর্ণ ও উৎসাহমণ্ডিত হওয়া উচিত, কিন্তু একাধারে সে এবিষয়ে সচেতন হবে যে, যেমন যিশুর বেলায় ঘটেছে, তেমনিভাবে তার সাক্ষ্যও সাক্ষ্যমরত্ব পর্যন্তই যেতে পারে। যিশুর কাছে গিয়ে পৌঁছানো মানে আমাদের যথার্থ গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছানো, তাঁর সংযোগে তাঁর গৌরব দেখা (১৭:২৪)। পিতা যেমন যিশুর গৌরব প্রচার করেন এবং তাঁকে গৌরবান্বিত করেন (৮:৫০, ৫৪; ১৩:৩২), তেমনি তিনি তাঁর শিষ্যদেরও সেই গৌরবের অংশী করেন অর্থাৎ তারাও ঈশ্বরের ভালবাসা প্রত্যক্ষ করায় গৌরবান্বিত হবে (১৭:২৪-২৬)। শিষ্যেরা যিশুকে ভালবেসেছেন বলে পিতা তাদের ভালবাসেন (১৬:২৭) এবং নিজের ও পুত্রের পূর্ণ সহভাগিতায় তাদের গ্রহণ করায় তাদের ভালবাসা পরিশুদ্ধ করবেন। এই পদে যোহন অধিক পরিষ্কারভাবে 'অনুসরণ' ধারণাটা ফুটিয়ে তুলেছেন: যিশুকে মৃত্যু পর্যন্ত অনুসরণ করব যেন তাঁর বিজয় ও গৌরবের অংশী হই; ক্রুশই ত যিশুর গৌরব এবং ক্রুশই ত পথ, যে-পথে যিশুকে অনুসরণ করে আমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবপ্রাপ্ত।

১২:২৭—এখন আমার প্রাণ কম্পিত: সদৃশ সুসমাচারগুলোর অন্তর্ভুক্ত গেথসেমানী বাগানে যিশুর যন্ত্রণাভোগ-বর্ণনা অনুসারে যিশু ভীষণভাবে পরীক্ষিত হলেন, এমনকি পিতা যাতে সেই পাত্র সরিয়ে দেন প্রার্থনা করলেন (মার্ক ১৪:৩৬)। যোহনের সুসমাচারে এ সকল কথার উল্লেখ নেই; 'ক্ষণের' সম্মুখীন হয়ে যিশু উদ্বিগ্ন বটে, কিন্তু ক্ষণের গভীর দ্বিমুখী তাৎপর্য (মৃত্যু ও গৌরবের তাৎপর্য) সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতার কারণেই উদ্বিগ্ন। তিনি এ ক্ষণ আপন করে গ্রহণ করেন, সেই ক্ষণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন না ও সেই ক্ষণ থেকে অব্যাহতিও পেতে চান না। তা সত্ত্বেও, মৃত্যুর দিক দিয়ে ক্রুশ

অন্ধকারময় জিনিস: পুত্রের পক্ষে পিতার ইচ্ছায় বাধ্য হওয়া (১০:১৮), জগতের অধিপতির হস্তক্ষেপ (১৪:৩০) ও শিষ্যদের প্রত্যাখ্যান (১৬:৩২) উপভোগ করা প্রয়োজন। কিন্তু পুত্রের বাধ্যতায় পিতাকে গৌরবান্বিত করার তাঁর ইচ্ছা এবং স্বর্গ থেকে পুত্রের কাছে আপন ভালবাসা প্রকাশকারী পিতার উত্তরে এই অন্ধকারময় ক্ষণ নিজ গভীরতম ও যথার্থ তাৎপর্য অনুসারে প্রকাশ পায়।

১২:২৮—পিতা, তোমার আপন নাম গৌরবান্বিত কর: পিতার 'নাম' বলতে তাঁর স্বরূপ ও সত্তা, তাঁর ইচ্ছা, করুণা ও ভালবাসা বোঝায় (১৭:৬, ১১, ২৫, ২৬)। যিশু পিতার ইচ্ছার প্রতি বাধ্য, কিন্তু জানেন যে ভালবাসায়ই সেই ইচ্ছার অভিব্যক্তি ঘটে।

পিতার উত্তরে ('তা গৌরবান্বিত করেছি…') যোহনের ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট: পুত্র দ্বারা পিতার গৌরব প্রচার এবং পিতা দ্বারা পুত্রের গৌরব প্রকাশই হল অখণ্ড ও অনন্য কাজ (১৩:৩১…)। 'গৌরবান্বিত করেছি' উক্তিটা সম্ভবত 'ক্ষণ' পর্যন্ত পৃথিবীস্থ যিশুর সাধিত ক্রিয়াকর্ম নির্দেশ করে। ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে যিশু পিতাকে গৌরবান্বিত করেছেন (১৭:৪), কিন্তু সেটার মাধ্যমে পিতাও বাধ্য পুত্রের কাছে নিজের সহায়তা ও সহভাগিতা প্রকাশ করেছেন (৮:১৬, ২৯, ৫৪)। 'গৌরবান্বিত করব' বলে পিতা বলতে চান: এই ক্ষণেও তিনি নিজের 'নাম' গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত করতে থাকবেন (সাম ১৩৮:২; এজে ৩৬:২৩; ৩৮:২৩ ইত্যাদি): তিনি যিশুকে পুণ্যাত্মা বলে ঘোষণা করবেন, জগতের অধিপতির অধিকারে উন্নীত করবেন এবং গৌরব অর্থাৎ ত্রাণদায়ী অধিকার দান করবেন।

স্বর্গ থেকে কণ্ঠস্বরটি ধ্বনিত হওয়ায় আমরা বুঝি, যিশু গৌরবদানকারী স্বর্গস্থ পিতার দিকে তাকিয়ে 'ক্ষণ'-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

১২:২৯—এ একটা বজ্রধ্বনি: সুসমাচারের পাঠক যেন সেকালের জনতার মত ভাসা-ভাসা বিচার না করেন বরং ক্ষণ-নিগূঢ় তত্ত্বটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন; যে

যিশুর সঙ্গে গভীরভাবে সাক্ষাৎ করে না, সে সর্বদা অবিশ্বাস ও সন্দেহের অধীন হবে এবং সেই প্রেরিতজনের সপক্ষে ঈশ্বরের সাক্ষ্য কখনও চিনতে পরবে না।

১২:৩১—এখন এই জগতের বিচার উপস্থিত: অবিশ্বাস নিজে থেকেই বিচার ঘটায়। ক্রুশের উপরে যিশুর মৃত্যুতে তাদেরই সকলের বিচার করা হয় যারা যিশুর আত্মপ্রকাশ দ্বারা একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অপরিহার্যতার সম্মুখীন হয়েছে। যারা অবিশ্বাসে ও ঘৃণায় থাকবে বলে দৃঢ় সঙ্কল্প করে তারা দণ্ডিত হবে এবং তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের শত্রু জগতের সেই অধিপতিও দণ্ডিত হবে; সে তাদেরই উপর নির্যাতন ও প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না যারা বিশ্বাসের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে ও তাঁকেই নিজেদের আকর্ষণ করতে দেয়।

১২:৩২—আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে··· : জগতের বহিষ্কৃত অধিপতির জায়গায় যিশু নিজেকেই অধিপতি ও ত্রাণকর্তা বলে ঘোষণা করেন। বিশ্বাসীর পরিত্রাণই হল যিশুর 'ক্ষণের' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভূলোক থেকে যিশুকে উত্তোলন সেই ঊর্ধ্বলোকে যিশুর আরোহণের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে যেখান থেকে তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করেন (৩:১৪)। ক্রুশে উত্তোলিত হওয়ায় যিশু পিতার ইচ্ছার প্রতি নিজের বাধ্যতা প্রকাশ করেন, গৌরবান্বিত হন, পিতাকে ভালবাসাস্বরূপ প্রকাশ করেন এবং পরিত্রাণ ও বিচার করার অধিকার পান। সুতরাং, ক্রুশ হল স্বর্গলোকের প্রতীক যেখানে যিশু বিশ্বাসীদের আকর্ষণ করেন। উত্তোলিতজন হলেন সেই মানবপুত্র যিনি আগে যেখানে ছিলেন সেখানে পুনরায় আরোহণ করেন (৩:১৩; ৬:৬২); এখন তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ করার জন্য সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতা ও অধিকার প্রাপ্ত।

১২:৩৩—তিনি যে কী ধরনের মৃত্যুতে মারা যাবেন: ক্রুশ-মৃত্যুর কথা উল্লেখে যোহন কতিপয় তাৎপর্য ইঙ্গিত করেন:

১। ঐশজ্ঞানমণ্ডিত বলে যিশু কেবল নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্বাবগত নন, তিনি যে কী রূপ মৃত্যুতে মরবেন তাও আগে থেকে জানেন।

২। ক্রুশ হল রহস্যাবৃত ঐশসত্যগুলোর একটা চিহ্ন, যে-সত্যগুলো তিনি জানেন ও যে-সত্যগুলো নির্দেশ করেন যখন উত্তোলনের কথা উল্লেখ করেন।

৩। ক্রুশ যিশুর মৃত্যুর স্থান বলে সেই ক্রুশ থেকেই উত্তোলন ধারণার উৎপত্তি: এভাবেই ক্রুশ পরিত্রাণের চিহ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় (৩:১৪; ১২:৩২)।

৪। 'নিজের কাছে সকলকে আকর্ষণ করা' ধারণাটাও ক্রুশ-মৃত্যু থেকে উৎপন্ন, কাজেই সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিও উপস্থিত: ঈশ্বরের বিক্ষিপ্ত সকল সন্তানদের সম্মেলন (১১:৫২), বিধর্মীদের সংগ্রহ (১০:১৬; ১২:৩০) এবং ঈশ্বরের নব জনগণের ঐক্য।

১২:৩৪—লোকেরা তাঁকে উদ্দেশ করে বলল… : কিন্তু এবারও লোকে যিশুর কথা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক।

১২:৩৫ক—…আলো তোমাদের মাঝে আছে… : লোকদের অবিশ্বাস দেখে যিশু পুনরায় জগতের আলোস্বরূপ নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখতে সকলকে আহ্বান করেন; তারা বিশ্বাস না করলে তবে অন্ধকার তাদের গ্রাস করবে। কেবল তিনিই—ক্রুশে উত্তোলিত সেই খ্রিষ্ট-মশীহ ও মানবপুত্র—তাদের পরিত্রাণ করার জন্য অধিকারপ্রাপ্ত।

১২:৩৫খ—যতক্ষণ আলো তোমাদের থাকে… : যিশু বিচারের জন্য নয়, পরিত্রাণের জন্যই এসেছেন। এজন্য প্রকাশ্যভাবে তাঁর শেষ কথাই বিশ্বাসের দিকে একটা মিনতি: সর্বদাই, জীবনের শেষ মুহূর্তেও আমরা অন্ধকার জয় করতে পারি ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখে আলোর সন্তানরূপে রূপান্তরিত হতে পারি।

১২:৩৬খ—এই সমস্ত কথা বলার পর… : একদিন তিনি নির্যাতনকারী ইহুদীদের কাছ থেকে আত্মগোপন করেছিলেন (৮:৫৯), এখন অবিশ্বাসী জনতার কাছ থেকেও বিদায় নেন। এখন থেকে তিনি শুধু আপনজনদের কাছেই আত্মপ্রকাশ করবেন।

পাস্কা পর্ব অতিসন্নিকট বিধায় পর্ব উদ্‌যাপনের জন্য ইহুদীরা প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করত; বিশেষ কাজ ছিল পাস্কাবলির মেষশাবককে কিনে গুপ্ত স্থানে রাখা। যিশুও আত্মগোপন করে নিজের পাস্কা পর্বের জন্য প্রস্তুতি নেন, আর তখনই মাত্র প্রকাশ্যে—প্রকৃত পাস্কা-মেষরূপে—দর্শন দেবেন যখন মন্দিরে পাস্কা-মেষগুলি বলীকৃত হবে।

পরিশিষ্ট

যিশুর উত্তোলন ও গৌরবায়ন

যোহনের চেয়ে অন্যান্য রচয়িতাদেরই পূর্বলেখায় যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর কথা রোমাঞ্চকরভাবে অনুধাবিত ও বর্ণিত হয়েছিল, এমনকি বিশেষত ক্রুশের অপমানজনক দিকই জোর দিয়ে উল্লিখিত হয়েছিল (গা ৫:১১; ৬:১২ ইত্যাদি): ক্রুশ নিয়ে গর্ববোধ করা উচিত আর পরিত্রাণ লাভের জন্য ক্রুশের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। যোহন ক্রুশের তেমন অপমানসূচক দিক অতিক্রম করতে চান, কিন্তু এমনভাবেই যাতে মানুষের পক্ষে বিশ্বাস-সিদ্ধান্ত হ্রাস না পায়। ক্রুশের উপরে যিশুর মৃত্যুর আবশ্যকতা বিষয়ে (৩:১৪) এবং পিতার পরিকল্পনায় ক্রুশের বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে (১০:১৭…; ১৪:৩১) তাঁরও দৃঢ় সমর্থন আছে বটে, অথচ তাছাড়া তিনি এ ধরনের মৃত্যুর অন্তর্নিহিত মর্মার্থ পরিস্ফুট করার জন্য অতিব্যস্ত, কেননা শুধু এই মর্মার্থ উদ্ঘাটন করার পরেই তিনি যিশুর ত্রাণকর্মের সাফল্য (১২:২৪) এবং যিশু যে নিজের কাছে সকলকে আকর্ষণ করবেন তাঁর এই অধিকারও (১২:৩২) প্রমাণিত করতে পারবেন। আরও, তাঁর ধারণায় ক্রুশে যিশুর আরোপণ (১২:২৩, ৩২) 'গৌরবায়ন' ধারণায় সূচিত (৭:৩৯; ১২:১৬; ১৩:৩১…; ১৭:১)। ক্রুশের উপরে যিশুর কষ্টময় মৃত্যুকে গৌরবপ্রকাশকারী বলে প্রমাণ করার উপায় হল 'উত্তোলন' দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গির

প্রথম পর্যায় হল এই যে, যিশু ভূলোক থেকে (১২:৩২) ক্রুশের উপরে উত্তোলিত হয়েছেন; এ বাহ্যিক দৃশ্যের উপর ঐশতাত্ত্বিক একটা তাৎপর্য আরোপ করাই হল দ্বিতীয় পর্যায়: পুনরুত্থানের মাধ্যমে ও পুনরুত্থানের পরে যিশু ভূলোক থেকে ঊর্ধ্বলোকে অর্থাৎ ঈশ্বরেরই কাছে উত্তোলিত বা উন্নীত হয়েছেন।

এই পরিশিষ্টে আমরা উত্তোলন ও গৌরবায়ন বিষয়ে যোহনের সুসমাচারের অন্তর্ভুক্ত বাক্যগুলো বিশ্লেষণ করব, তারপর যোহনের সঙ্গে আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐশতত্ত্বের তুলনা করব এবং অবশেষে এবিষয়ে যোহনের ধারণার মূল্যায়ন করব।

যোহনের সুসমাচারে 'উত্তোলন' এবং 'গৌরবায়ন'

যিশুকে উত্তোলন: 'মোশি যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে' (৩:১৪); এই বাক্য ব্যাখ্যা করে দেখেছিলাম যে উল্লিখিত কথা যিশুর ক্রুশারোপণের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে ঠিকই, কিন্তু তাছাড়া এতে অন্য ঐশতাত্ত্বিক দিকগুলিও সূচিত: আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীকালীন পূর্ব ঐশতত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করে অনুমান করা যায় যে যোহনের দৃষ্টিভঙ্গিতে যন্ত্রণাভোগের কথায় প্রাধান্য দেওয়া হয় না; মানবপুত্রকে উত্তোলন স্বর্গলোকের দিকে মানবপুত্রের যাত্রারই যেন একটা বিশেষ পর্যায় বলে নির্দেশিত হয়, একথা দিয়ে বলতে চাই যে, উত্তোলনই স্বর্গারোহণের জন্য আবশ্যক শর্তস্বরূপ এবং একাধারে স্বর্গারোহণের সূত্রপাত। উপরন্তু, নিম্নলিখিত কারণ তিনটির জন্য উত্তোলনের পরিত্রাণদায়ী ভূমিকা রয়েছে: ১। উত্তোলন ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী পরিকল্পনা অনুযায়ী; ২। উত্তোলন মরুপ্রান্তরে উত্তোলিত সাপে পূর্বনির্দেশিত হয়েছিল, এবং ৩। তার পরিত্রাণদায়ী ভূমিকা ৩:১৫ পদে প্রত্যক্ষভাবেই ঘোষিত; যিশুকে উত্তোলনের উদ্দেশ্য যাতে বিশ্বাসীরা অনন্ত জীবন পেতে পারে (উল্লেখযোগ্য যে, একই উদ্দেশ্যেই যোহন 'সুসমাচার' পুস্তক লিখেছেন: 'যেন তোমরা তাঁর নামে জীবন পেতে পার', ২০:৩১)। সুতরাং, ক্রুশের গুরুত্ব এই যে, ক্রুশই উত্তোলনের প্রতীক। উত্তোলনের এ নিহিত তাৎপর্য ৮:২৮ পদে বর্তমান, সেই পদে কথিত হয় যে ঈশ্বরই স্থির করেছেন ইহুদীরা মানবপুত্রের উত্তোলন-কর্মে অংশ নেবে, অর্থাৎ ইহুদীরা নিজেদের ষড়যন্ত্রকে নয় বরং ঈশ্বরের পরিকল্পনাকেই

বাস্তবায়িত করেছে, এবং কেবল ক্রুশের উপরে যিশুকে উত্তোলিত করাতে যে তা বাস্তবায়িত করেছে এমন নয়, বরং যাঁকে তারা নিঃশেষ করে ফেলবে বলে মনে করেছে, প্রকৃতপক্ষে তাঁকে গৌরবান্বিত করার জন্যই সহযোগিতা করেছে এবং যাঁকে তারা উত্তোলিত করেছে তিনি যেন নিজের ত্রাণকর্ম সম্পন্ন করেন এই উদ্দেশ্যেও তারা অজান্তে সহযোগিতা করেছে। তাদের এই 'সহযোগিতার' ফলে অর্থাৎ উত্তোলনের ফলেই প্রকাশিত হবে মানবপুত্রের পরিচয় : তিনি সেই 'আমিই আছি'।

যন্ত্রণাভোগ-বর্ণনা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে (১৮—১৯ অধ্যায়) দেখা যায় যে এ ধারণা সেই বর্ণনায়ও বর্তমান। যিশুকে আপন রাজারূপে অস্বীকার করে (১৯:১৫) ইহুদীরা তাঁকে ক্রুশের উপর উত্তোলন করতে চায়, এইভাবে তারাই তাঁকে রাজাসনে উন্নীত করে (স্মরণযোগ্য যে আরামীয় ভাষায় উত্তোলিত ও উন্নীত একই শব্দ) ; যথার্থই, ক্রুশ হল সেই স্থান যেখানে যিশু জগতের সাক্ষাতে রাজারূপে ঘোষিত হন (ক্রুশে টাঙানো দোষনামা পালেস্তাইন দেশে প্রচলিত তিনটি প্রধান ভাষায় লিখিত হয়েছিল), ফলত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত, মানুষ দ্বারা অবজ্ঞাত এবং বাহ্যত ক্ষমতাহীন 'ইহুদীদের রাজা' সত্যকার ত্রাণকর্তা-রাজা হয়ে ওঠেন। কেবল সেই ক্রুশে উত্তোলিত যিশুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে তাঁকে রাজা ও ত্রাণকর্তারূপে ঘোষণা করা যায় (৮:২৮; ১৯:৩৭), কারণ ক্রুশের উপরে উত্তোলিত অবস্থায়ই যে তিনি গৌরবান্বিত।

অবশেষে, ১২:৩২ পদ ব্যাখ্যা করা যাক। এখানে ক্রুশবিদ্ধের পরিত্রাণদায়ী ভূমিকা উজ্জ্বলভাবে ব্যক্ত হয় : যিশু যখন ভূলোক থেকে ক্রুশের উপরে উত্তোলিত হবেন তখনই নিজের কাছে সকলকে আকর্ষণ করবেন। জগতের রাজারা সিংহাসনে বসে বলপ্রয়োগে রাজত্ব করেন, অপর দিকে যিশু ক্রুশ-আসনে বিদ্ধ হয়ে নিজের কাছে সকলকে আকর্ষণ করায় রাজত্ব করেন। ক্রুশকে গৌরবময় রাজাসন বলা এবং ক্রুশবিদ্ধজনকে ত্রাণকর্তা ও জীবনদাতা রাজা রূপে দেখা সহজ ব্যাপার নয়, সেজন্য যিশু জনতাকে বিশ্বাস করতে অনুরোধ করেন (১২:৩৪)।

এই দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি 'ক্ষণ' সম্বন্ধীয় পদগুলিতেও উপস্থিত : ক্ষণ হল মৃত্যু-ক্ষণ এবং একাধারে গৌরবায়ন-ক্ষণ। কানা গ্রামে বিবাহোৎসব বর্ণনা থেকে সমগ্র সুসমাচার ব্যাপী ক্ষণের কথা উপস্থিত (২:৪; ১২:২৩; ১৬:৩২ ইত্যাদি)। ক্ষণের কথা ব্যক্ত করে আপন

জীবন দান বা উৎসর্গ করার জন্য যিশুর ইচ্ছা। প্রথম থেকেই তিনি আত্মদান করতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁর আত্মদান সেই ক্ষণেই সিদ্ধি লাভ করল যে-ক্ষণ পিতাই নির্ধারণ করেছেন। সারা জীবন ব্যাপী যিশু পিতার হাতে সমর্পিত পুত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেন, যে-পুত্র পিতার ভালবাসার অভিসন্ধি প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত করার জন্য সর্বদা অভিপ্রেত। যখন সেই ভালবাসার অভিসন্ধি অনুসারে যিশুকে জীবনদান করতে হবে, তখনই সেই ক্ষণ পূর্ণ প্রকাশ লাভ করবে: সেই ক্ষণেই তিনি ক্রুশের উপরে উত্তোলিত হয়ে বাধ্য পুত্ররূপে আত্মদান করবেন এবং তাঁর বাধ্যতায় প্রীত হয়ে পিতা তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন, অর্থাৎ তাঁকে সেই অধিকার দেবেন যা অনুসারে যিশু বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন।

যিশুর গৌরবায়ন: যিশুর প্রকাশ্য ক্রিয়াকর্মে, বিশেষত তাঁর চিহ্নকর্মগুলোতে তাঁর আপন ঐশগৌরব প্রকাশিত (২:১১) এবং তিনি পিতার গৌরব প্রচার করেন (১১:৪০); মাংসে আগত ঐশবাণীর ক্রিয়াকর্মের মধ্যে বিশ্বাসীগণ পিতার অদ্বিতীয় পুত্রের গৌরব প্রত্যক্ষ করেছে (১:১৪); 'যাজকীয় প্রার্থনায়' যিশু বলেন, 'আমি পৃথিবীতে তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি' (১৭:৪), যার অর্থ দাঁড়ায়: পিতার আদেশের প্রতি বাধ্য হয়ে কাজ করায় তিনি ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করেছেন। তবু, প্রকৃত ও পূর্ণ গৌরবপ্রকাশ যিশুর 'ক্ষণে' বিদ্যমান (১২:২৩; ৭:৩৯; ১২:১৬), এমনকি সেই ক্ষণে পিতা ও পুত্রের পারস্পরিক গৌরব প্রকাশিত (১৩:৩১) এবং এরূপ পারস্পরিক গৌরবায়ন স্বর্গস্থ খ্রিষ্টের ক্রিয়াকর্ম দ্বারা এখনও ও যুগযুগান্তরে চলতে থাকবে (১৩:৩২; ১৪:১৩; ১৭:১, ৫); অন্য কথায় বলতে পারি, পিতা যিশুর শিষ্যদের প্রচুর ফলে গৌরবান্বিত হন (১৫:৮)। সুতরাং, এ সকল কথা থেকে এ সিদ্ধান্ত অনুমেয় যে, গৌরবায়ন ধারণার মধ্য দিয়ে যোহন যিশুর সমস্ত ত্রাণকর্ম বিশেষ আলোতে আলোকিত করতে চান, যে-কর্ম এখনও ঘটমান এবং গৌরবান্বিত যিশুর আত্মার মাধ্যমে শিষ্যদের ক্রিয়াকর্মে প্রসিদ্ধ।

পুরাতন নিয়মকালে ঈশ্বর নিজ গৌরবপ্রকাশের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী ও পরিত্রাণকারী ঈশ্বর বলে আত্মপ্রকাশ করতেন; 'তোমার গৌরব প্রকাশ কর' এরূপ উক্তির

অর্থ ছিল: তুমি যে শক্তিশালী, তুমি যে আমাদের ত্রাণ করতে পার, তা-ই প্রকাশ কর'। এধারণা যোহনেও বর্তমান: ঐতিহাসিকভাবেই ঈশ্বর পুত্রের মধ্যে ত্রাণকর্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেন, পুত্রই নিজের ও পিতার গৌরব প্রকাশ করেন, অর্থাৎ পৃথিবীতে তাঁর ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে মানুষের ত্রাণকর্ম সাধন করেন, কিন্তু বিশেষভাবে সেই ক্ষণেই তিনি পিতা দ্বারা গৌরবান্বিত হন ও পিতাকে গৌরবান্বিত করেন (১৩:৩১), কেননা সেই ক্ষণে তিনি ঈশ্বরের ভালবাসা উত্তমরূপে প্রকাশ করেন, এবং সেই ক্ষণে পিতা পুত্রের উপর বিশ্বাসীদের কাছে জীবনদান করার অধিকার আরোপ করায় আপন পরিত্রাণদায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন (১৭:২২; ১৩:৩২)। সুতরাং, যোহনের ধারণায় যিশুর পরিত্রাণদায়ী ঐশপ্রকাশ ঈশ্বরের গৌরবায়ন অনুযায়ী বিবেচনাযোগ্য।

যোহন খুব গভীর ঐশতত্ত্ববিদ; গৌরব বিষয়ে আলোচিত দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া একই বিষয়ে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি (খ্রিষ্টসম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গি) উপস্থাপন করেন: পিতা ঐতিহাসিকভাবে নিজের গৌরব পুত্রের মধ্যে প্রকাশ করেন এবং পুত্র ঐতিহাসিকভাবে (অর্থাৎ তাঁর জীবনকালে) পিতার গৌরব প্রকাশ করেন, এটি হল প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু এই পর্যায়ে যোহন স্মরণ করিয়ে দেন যে, একই ঈশ্বর বলে পিতা ও পুত্র ঘনিষ্ঠ সংযোগে সংযুক্ত, ফলে পৃথিবীস্থ যিশুর ক্রিয়াকর্মেও সেই পারস্পরিক গৌরবায়ন অবিরত ঘটমান: এটিই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি। একথা ক্রুশ-ঘটনায়, অর্থাৎ পুত্রের ত্রাণকর্মের উত্তম ঘটনায় বিশেষত প্রযোজ্য, যে-ঘটনাও হল পিতা ও পুত্রের পারস্পরিক গৌরবায়ন, কেননা সেই ক্ষণে পিতার কাছে যিশুর ফিরে যাওয়া (১৩:৩; ১৬:২৮) ও মানবপুত্রের স্বর্গারোহণ (৩:১৩; ৬:৬২) আর কার্যত তাঁর গৌরবায়নও সূচিত (১২:২৩) (এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, আরামীয় ভাষায় উত্তোলন, উন্নয়ন ও ফিরে যাওয়া একই শব্দ)। এই ধারণা খুব সংক্ষিপ্তভাবে ১৩:৩১ পদে ব্যক্ত: মানবপুত্র গৌরবান্বিত হওয়ায় ঈশ্বরও গৌরবান্বিত। গৌরব বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি দু'টো অনুসারে, যিশু এক দিকে এ পৃথিবীতেই নিজ কর্মের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত এবং অপর দিকে (তাঁর ঈশ্বরত্ব সূত্রে) আদি থেকেই তাঁর মধ্যে ঐশগৌরব অবিরত বিরাজিত। এ গভীর দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনে যোহনের উদ্দেশ্য এ: তিনি পৃথিবীস্থ যিশুতে সদাবিদ্যমান পুনরুত্থিত খ্রিষ্টকে প্রচার করতে চান। তিনি এবিষয় অবগত যে, কেবল 'গৌরবায়ন-ক্ষণের' পর যিশু অনন্ত জীবন দান করার অধিকারপ্রাপ্ত

(৭:৩৯), তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে থাকাকাল থেকেও যিশু পিতার সঙ্গে সংযুক্ত বলে বলতে পারেন, 'যে আমার বিশ্বাসী সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে'। এধারণা অধিক বোধগম্য হয় যদি আমরা স্মরণ করি যে, পৃথিবীস্থ যিশু যখন কথা বলেন ও কাজ করেন তখন আপন সন্নিবিষ্ট অবশ্যম্ভাবী উত্তোলন ও গৌরবায়ন সম্বন্ধে এবং 'আমিই আছি' তাঁর সেই প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে সতত পূর্ণ সচেতন, ফলে ঈশ্বরের যে-পরিত্রাণদায়ী অধিকার শুধু গৌরবান্বিত হওয়ার পরেই সম্পূর্ণরূপে পাবেন, মর্ত-জীবনকাল থেকেও সেই অধিকার দাবি করেন।

অবশেষে, যোহন এবিষয়ে আর একটা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন: 'যাজকীয় প্রার্থনায়' বলা হয়, যিশু পৃথিবীর সৃষ্টির আগে থেকেও পিতার কাছে যে গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন, সেই গৌরব তিনি সেই ক্ষণেই মাত্র লাভ করবেন (১৭:৫, ২৪); কিন্তু সেই প্রার্থনায় গৌরব হল পিতার কাছে যিশুর প্রাক্তন অবস্থার পুনঃস্থাপনের নামান্তর।

আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐশতত্ত্বে 'উত্তোলন ও গৌরবায়ন' ধারণা

মুটামুটি একথা স্বীকার্য যে, যোহনের চেয়ে খ্রিষ্টীয় পূর্বলেখায় যিশুর 'গৌরব' ভাবীকালীন তাৎপর্যসূচক ধারণা বলে অনুধাবিত হয়েছিল, অর্থাৎ শুধু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরেই যিশু গৌরব লাভ করেন। যোহনের ধারণার বৈষম্যে যিশুর উত্তোলন গৌরবায়নের সঙ্গে দ্বিমুখী অথচ একক ধারণা বলে অনুধাবন করা হয় না। যিশুর ক্রুশারোপণ তাঁর নিম্নতম অপমানপ্রাপ্তির পর্যায় বলে অনুধাবন করা হত (ফিলি ২:৮)। অপর দিকে, যেমন লক্ষ করেছি, যোহনের বেলায় ক্রুশের উপরে উত্তোলন ও ক্রুশে-মৃত্যুই গৌরবে উন্নয়ন: ভূলোক থেকে ক্রুশের উপর উত্তোলিত হওয়ায়ই যিশু গৌরবান্বিত; আর শুধু তা নয়, যোহন যিশুর গৌরবায়ন শুধু তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা থেকে তাঁর মৃত্যুর পূর্ববর্তী ঘটনায় পরিণত করেছেন এমন নয়, বরং তিনি যিশুর গৌরবায়ন মাংসে তাঁর আগমন-লগ্নেই প্রতিষ্ঠা করেছেন: অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ ঐশবাণী মানুষের মাঝে বাস করলেন, তাই বিশ্বাসীগণ পিতাকে ও তাঁর নিজের গৌরব প্রত্যক্ষ করলেন।

যোহনের ধারণার মুল্যায়ন

আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐশতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশে যোহনের উল্লিখিত ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষ পর্যায়স্বরূপ বিবেচনাযোগ্য। শুধু পবিত্র শাস্ত্রের প্রমাণে নয়, ঐশতাত্ত্বিক গবেষণা ও ধ্যানের মধ্য দিয়েও 'ক্রুশের অপমানকে' অতিক্রম করা হয়, যে-গবেষণা ও ধ্যান অনুযায়ী 'ক্রুশের উপর উত্তোলন' ঘটনাকে ঈশ্বরের গৌরবায়ন, আপন গৌরবে যিশুর উন্নয়ন বা আরোহণ, আর তাঁর গৌরব-রাজ্যের সূচনাস্বরূপ অনুধাবন করা হয় (স্বীকার করতে হয় যে, পলও এবিষয়ে কিছু উপলব্ধি করেছিলেন, ২ করি ২:৮; কল ২:১৫)। যিশুর জীবন যা বাহ্যিক দিক দিয়ে নগণ্য, অসিদ্ধ ও 'গুরুত্বহীন' ভাবে সমাপ্ত হয়েছিল, সেই জীবন বিশ্বাসীদের চোখে গৌরবময় প্রভায় উদ্ভাসিত, এবং সেই গুরুত্বহীন সমাপ্তি পূর্ণ সাফল্যে ও জ্যোতির্ময় বিজয়ে পরিণত হয়। তিনি মৃত্যু ও পুনরুত্থান বা অপমানপ্রাপ্তি ও গৌরবলাভের পরম্পরাক্রমাগত ঘটনা দু'টোকে একটি মাত্র ঘটনায় পরিণত করেছেন; এমন ঘটনা যা বাহ্যত অপমানপ্রাপ্তি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গৌরবায়ন: যিশুর বাহ্যিক অপমান বাস্তবিকই যিশুর গৌরবায়ন।

পল অনুসারে ক্রুশ প্রচ্ছন্ন ও রহস্যময় একটা প্রতীক-চিহ্ন (গা ৬:১৪), কেননা ক্রুশ দ্বারা তাঁর কাছে জগৎ আর জগতের কাছে তিনি চির-ক্রুশার্পিত। যদিও অন্য দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, তবু যোহনও ক্রুশে সূচিত একই প্রতীক সমর্থন করেন, বিশেষত যখন তিনি বলেন যে কেবল বিশ্বাসের চোখেই ক্রুশের গৌরবসূচক অর্থ পরিস্ফুট। যোহনের গভীর ধারণার মাধ্যমে খ্রিষ্টবিশ্বাসী উত্তোলিত-গৌরবান্বিত যিশুর মর্মসত্য অতি আন্তরিকভাবে উপলব্ধি ও ধ্যান করার যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করে।

যোহনের অন্য একটা অনুপ্রেরণাদায়ী ধারণা এই যে, পৃথিবীস্থ যিশুর ক্রিয়াকর্ম ঈশ্বরের গৌরবায়ন বলে অনুধাবিত; তাঁর কাছে যিশু ঈশ্বরের অভিব্যক্তি, অদৃশ্যমান ঈশ্বরের মূর্ত প্রকাশ এবং পিতার কাছে যাওয়ার একমাত্র পথ। এধারণাও নূতন নিয়মের অন্যান্য লেখকদের লেখায় কিছু বিদ্যমান ছিল (হিব্রু ১:১… ; ১ পিতর ১:১০…), কিন্তু যোহনের গবেষণা ও ধ্যানের ফলে 'গৌরব' ধারণার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টই মানুষের মাঝে ঈশ্বরের বাসস্থান (১:১৪) ও ঈশ্বরের মন্দিরস্বরূপ (২:২১), এমনকি ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠেন (১২:৪৫; ১৪:৯)। পৃথিবীতে কর্ম-সাধনে যিশু হলেন স্বয়ং

ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি। এধারণা যোহনের প্রাক্তন লেখকদের লেখায়ও বর্তমান হয়েও অধিক পরিষ্কার ছিল না।

উপসংহারস্বরূপ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় যে, সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের সঙ্গে তুলনা করে যোহনের প্রকৃত ও স্বীয় নতুনত্ব এই যে, তিনি পৃথিবীস্থ যিশুর সঙ্গে গৌরবান্বিত খ্রিষ্টের সম্পূর্ণ ও অত্যাবশ্যক ঐক্য ঘোষণা করেন। যে-যিশু এক দিন মানুষের মাঝে জীবনযাপন ও কাজ করেছেন এবং আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, সেই পৃথিবীস্থ যিশুতে আমরা যোহনের সুসমাচারের মধ্যে ঈশ্বরের গৌরবে চির জীবনযাপনকারী ও আমাদের পরিত্রাণের জন্য ক্রিয়াশীলভাবে সর্ববিদ্যমান খ্রিষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম: গৌরবান্বিত স্বর্গস্থ খ্রিষ্ট পৃথিবীস্থ যিশুর মাধ্যমে (অর্থাৎ সুসমাচারেরই মাধ্যমে) আমাদের কাছে এখনও কথা বলেন। এভাবে, ঠিক 'যিশুর জীবনী'-উপস্থাপনেই, সেকালের প্রচারকারী যিশু ও বিশ্বাস দ্বারা প্রচারিত খ্রিষ্টের মধ্যকার ব্যবধান পূরণ করা হয়।

এই পর্যায়ে সম্ভবত পাঠকের মনে এ রকম প্রশ্নের উদয় হতে পারে: যোহনের সুসমাচার বর্তমানকালের মানুষের কাছে কি এখনও উপযোগী হতে পারে? পৃথিবীস্থ যিশু কি অধিক পরিমাণে ধারণাগত বা কাল্পনিক হয়ে ওঠেননি যার ফলে অবাস্তব হয়ে লাগতে পারে? একমাত্র উত্তর এই যে, 'সুসমাচার' পুস্তক বিশ্বাসীদের জন্যই লেখা হয়েছিল তারা যেন খ্রিষ্টবিশ্বাস বা খ্রিষ্টোপলব্ধি গভীরভাবে ধ্যান করতে পারে (২০:৩১)। যিশুর নাটকীয় যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশের উপরে তাঁর অপমানপ্রাপ্তির উল্লেখ না থাকায় অবশ্যই কেউ ভ্রান্তিমূলকভাবে অনুমান করতে পারে, কেবল যিশুর ঈশ্বরত্বই কীর্তনীয়, কিন্তু এবিষয়ে স্মরণযোগ্য যে যোহনের লেখার উদ্দেশ্য যিশুকে ঈশ্বর বলে প্রমাণিত করা শুধু নয় বরং 'গৌরব' দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়েই যিশুখ্রিষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের শেষ ও চরম প্রকাশকেই ব্যক্ত করা: তাঁর মানবীয় ব্যক্তিত্বে, তাঁর কাজে ও বাণীতে, তাঁর বিশ্বাস ও প্রেম দাবিতে যিশু অতীন্দ্রিয় ও দূরবর্তী ঈশ্বরকে আমাদের বোধগম্য ও নিকটবর্তী করলেন। তাঁর জীবন ও মৃত্যুতে তিনি মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমময় পরিকল্পনা প্রকাশ করেন আর আমাদের মাঝে জীবনযাপন করা মানুষের মতই তা প্রকাশ করেন।

* * *

যিশুর ঐশপ্রকাশকর্মের মূল্যায়ন ও সমাপ্তি (১২:৩৭-৫০)

যিশুর ঐশপ্রকাশকর্মের উপসংহারস্বরূপ যোহন তাঁর ক্রিয়াকর্ম ও সেই ক্রিয়াকর্মের ফলের সাংশ্লেষিক একটা মূল্যায়ন উপস্থাপন করেন। সুসমাচার শেষেও (২০:৩০) এরূপ মূল্যায়ন বর্তমান, আর সেই মূল্যায়ন আস্থাবান: বিশ্বাসীগণ যেন অধিক গভীর বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে চলে। এখানকার মূল্যায়ন কিন্তু ভিন্ন রূপ, অবিশ্বাসীর কথাই জোর দিয়ে উল্লিখিত: বহু চিহ্নকর্ম দেখা সত্ত্বেও ইহুদীরা যিশুর প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে রইল। ইহুদীদের 'অবিশ্বাস' প্রসঙ্গ সুসমাচারে একাধিকবার দেখা দিয়েছে এবং তার সঙ্গে একটা পরিশিষ্টও সম্পর্কিত। এ বিষয়ের পর (১২:৩৭-৪৩) যিশুর একটি উপদেশ দেওয়া হয় (১২:৪৪-৫০) যেখানে সুসমাচারে আলোচিত প্রধান ধারণাগুলো সাংশ্লেষিকভাবে পুনরুত্থাপিত।

যদিও জগতের সাক্ষাতে যিশুর আত্মপ্রকাশকর্ম সমাপ্ত, তবু প্রকৃতপক্ষে তাঁর বাণীসকল এখনও প্রতিধ্বনিত হতে চলছে। মাংসে আগত ঈশ্বরপুত্রের ঐশপ্রকাশ নাজারেথের যিশুর ঐতিহাসিক আবির্ভাবের সঙ্গে জড়িত বটে, অথচ তাতেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়। সেই ঐশপ্রকাশ স্বভাবত সকল মানুষকেই লক্ষ করে, এবং প্রতিটি মানুষকে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আবশ্যকতার সম্মুখীন করে। সেই ঐশপ্রকাশ এখনও খ্রিষ্টমণ্ডলীর বাণীপ্রচারে প্রতিধ্বনিত হতে চলছে জগৎ যেন পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সহভাগিতা অর্জন করে (১ যোহন ১:১-৩); অধিকন্তু বিশ্বাসীগণ যখন সুসমাচার পড়ে তখন যেন যিশুর চিহ্নকর্মগুলো প্রত্যক্ষ করে: সেই চিহ্নকর্মগুলোর মধ্য দিয়ে তারা সেগুলোতে যিশুর গৌরব দেখবে অর্থাৎ স্বীকার করবে যে, পিতা পুত্রতে সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন, বা অন্য কথায়, তারা বিশ্বাস করবে যে, যিশুই ঈশ্বরের পুত্র যিনি একমাত্র জগৎত্রাতারূপে প্রেরিত হয়েছেন।

১২ [৩৭] যদিও তিনি তাদের সামনে এতগুলো চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন, তবু তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হল না। [৩৮] এমনটি ঘটল যেন নবী ইশাইয়ার এই বাণী পূর্ণ হয়:

প্রভু, আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস রেখেছে?
আর প্রভুর বাহু কার্ কাছে প্রকাশিত হয়েছে?

[৩৯] এজন্যই তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না, কারণ ইশাইয়া আবার বলেছিলেন,

[৪০] *তিনি তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন,*
তাদের হৃদয় কঠিন করেছেন;
পাছে তারা চোখে দেখতে পায়,
অন্তরে বুঝতে পারে,
ও আমার দিকে ফেরে যেন আমি তাদের সুস্থ করি।

[৪১] ইশাইয়া এই কথা বলেছিলেন, কেননা তিনি তাঁরই গৌরব দেখতে পেয়েছিলেন ও তাঁরই কথা বলেছিলেন। [৪২] তা সত্ত্বেও সমাজনেতাদের মধ্যেও অনেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলেন, কিন্তু ফরিশীদের ভয়ে তাঁরা তা স্বীকার করতেন না, পাছে সমাজগৃহ থেকে তাঁদের বের করে দেওয়া হয়; [৪৩] হ্যাঁ, ঈশ্বরের গৌরবের চেয়ে তাঁরা মানব গৌরব বেশি ভালবাসতেন।

[৪৪] যিশু জোর গলায় বলে উঠলেন, 'যে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে আমার প্রতি নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই প্রতি বিশ্বাস রাখে; [৪৫] আর যে আমাকে দেখতে পায়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সে তাঁকেই দেখতে পায়। [৪৬] আমি আলো হিসাবেই এই জগতে এসেছি, যারা আমার প্রতি বিশ্বাসী, তারা যেন অন্ধকারে আর না থাকে। [৪৭] আর কেউ যদি আমার কথা শুনেও পালন না করে, তাহলে আমি নিজে তার বিচার করব এমন নয়, কারণ জগতের বিচার করার জন্য নয়, জগৎকে পরিত্রাণ করার জন্যই আমি এসেছি। [৪৮] যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে আর আমার কথা অগ্রাহ্য করে, তার এক বিচারক আছে: যে বাণী প্রচার করেছি, শেষ দিনে সেই বাণীই তার বিচারক হবে। [৪৯] কেননা আমি নিজে থেকে কথা বলিনি; যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার সেই পিতাই আমাকে আজ্ঞা

দিয়েছেন, আমি কী বলব, কী প্রচার করব। [৫০] আর আমি জানি, তাঁরই আজ্ঞা অনন্ত জীবন! অতএব আমি যা কিছু বলি, পিতা আমাকে যেমন বলেছেন, তা তেমনিই বলি।’

১২:৩৭—যদিও তিনি… এতগুলো চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন… : যিশু বিশেষভাবে চিহ্নকর্মের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন (বর্তমান পাঠকের পক্ষে সুসমাচার পড়াই যিশুর বাস্তব আত্মপ্রকাশ) এবং সেই আত্মপ্রকাশের সম্মুখীন সেইকাল ও বর্তমানকালের মানুষ বিপরীত ধরনের সাড়া দু'টো দিতে পারে: বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সাড়া। যিশুর এই উপদেশে অবিশ্বাসের দিক বিশেষভাবে উল্লিখিত: শিষ্যদের এবং ইহুদীদের চোখের সামনে একই চিহ্নকর্মগুলো সাধিত হয়েছিল, শিষ্যেরা এত গভীরভাবে সেগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে বিশ্বাসের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, অর্থাৎ সেগুলোতে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পেরেছিলেন; অপর দিকে ইহুদীরা ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ অপূর্ণাঙ্গ উপলব্ধিতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছিল।

১২:৩৮ক—নবী ইশাইয়ার এই বাণী পূর্ণ হয়: যোহনের সমকালীন ইহুদীরা যে যিশুকে অস্বীকার করেছিল, তা পরিত্রাণের ইতিহাসে সূচিত: আদিকাল থেকেই তারা অবিশ্বাসী। স্বয়ং মোশি বলেছিলেন: ‘… সেই মহা মহা পরীক্ষা যা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ, সেই সকল চিহ্ন ও সেই সকল অলৌকিক লক্ষণ! কিন্তু তবুও প্রভু আজ পর্যন্ত বুঝবার হৃদয়, দেখবার চোখ ও শুনবার কান তোমাদের দেননি’ (দ্বিঃবিঃ ২৯:২-৩)।

১২:৩৮খ—প্রভু, আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস রেখেছে? নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে (ইশা ৫৩:১) এ বাক্য উদ্ধৃত। এতে ইশাইয়া ইহুদী জনগণের অবিশ্বাসের হেতুস্বরূপ ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের সেই অচিন্তনীয় মাহাত্ম্য তুলে ধরেন। কেবা কল্পনা করতে পারত যে সেই ‘দাস’ যিনি শুষ্কভূমিতে উৎপন্ন চারার মত আমাদের মাঝে উঠলেন, যাঁর রূপ ও শোভা নেই, এমনকি যিনি বিদ্ধ, তাঁকেই বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর

ভালবেসেছেন ও মনোনীত করেছেন এবং আমাদের পরিত্রাণের জন্য ও ঐশগৌরবে ভূষিত করার জন্য নির্ধারণ করেছেন? খুব সহজেই দেখা যায় যে, ইশাইয়ার উল্লিখিত ধারণা যোহনের ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মেলে: যোহনও একথা সমর্থন করেন যে, তাঁর গৌরব তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা ক্রুশে ও মাংসের দীনতায় আবৃত ছিল বলে যিশু প্রত্যাখ্যাত হলেন।

১২:৩৯—তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না: আপাতদৃষ্টিতে আমরা বুঝি অবিশ্বাস ঠিক যেন ঈশ্বরের একটা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, কিন্তু যোহনের প্রকৃত ধারণা ৪২ পদে ব্যক্ত। সেই পদে তিনি বলেন যে বস্তুত ধর্মীয় সমাজনেতাদের মধ্যেও অনেকেই যিশুর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। অবিশ্বাসের আসল কারণ হল মানুষের নিজের অনিচ্ছা।

১২:৪০—তিনি তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন: এখানে এ সত্য ঘোষিত হয় যে, যদিও ইহুদীদের অন্ধতা ঈশ্বরের সিদ্ধান্তসাপেক্ষ, তা সত্ত্বেও তারা ঈশ্বরের প্রেরিতজনের দ্বারা সেই অন্ধতা থেকে আরোগ্য পেতে পারত। সুতরাং তারা নিজ দোষেই অন্ধকারে থেকে গেছে। যোহন এখানে যিশুর সমকালীন ইহুদীদের কথা শুধু নয়, তাঁর বর্তমানকালীন ইহুদীদেরও কথা ইঙ্গিত করেন যারা তাদের অবিশ্বাসে রয়েছিল ও খ্রিষ্টমণ্ডলীকে অত্যাচার করত।

১২:৪১—ইশাইয়া এই কথা বলেছিলেন: যোহন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যিশুই পবিত্র শাস্ত্রের কেন্দ্রস্বরূপ; পুরাতন নিয়মের সমস্ত কথা যিশুকেই লক্ষ করে এবং তিনিই সেই সমস্ত কথার সিদ্ধিস্বরূপ। যিশুই নবীদের অপেক্ষিত ব্যক্তি ও তাঁদের ভাববাণীর অনন্য বিষয়বস্তু: ইশাইয়া পূর্ববিদ্যমান খ্রিষ্টকে আপন ঐশগৌরবে ভূষিত অবস্থায় দেখেছিলেন এবং জগতে তাঁর 'ত্রাণকর্তা' ভূমিকা সম্বন্ধে ভাববাণী দিয়েছিলেন। এরূপ ধারণা আব্রাহামের ক্ষেত্রেও ব্যক্ত হয়েছিল (৮:৫৬)।

১২:৪২—… সমাজনেতাদের মধ্যেও অনেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলেন: বিশ্বাস ঈশ্বরের একটা অনুগ্রহদান বটে, কিন্তু মানুষের পক্ষে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া আবশ্যক: সুসমাচারের পাঠক যদি প্রকৃত বিশ্বাসী এবং যিশুর সপক্ষে দাঁড়াবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প তবেই চিহ্নকর্মগুলো ও সুসমাচার পাঠ তাঁর কাছে যিশুর গৌরব প্রকাশ করে। যে ভয়বশত যিশুকে স্বীকার করতে সাহস করে না, সে কখনও পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করতে পারবে না, কেননা বিশ্বাস মানসিক স্বীকৃতি শুধু নয় বরং যিশুর সঙ্গে ব্যক্তিময় ও সম্পূর্ণ সংযোগ। অতএব, এই কথা বলা চলে যে, যিশুর চিহ্নকর্মগুলো এক দিকে যিশুকে প্রকাশ করে এবং অন্য দিকে মানুষের অন্তরের কথাও উদ্ঘাটন করে, অর্থাৎ সেগুলোর সম্মুখীন হয়ে মানুষ আত্মপ্রকাশ না করে পারবে না।

১২:৪৩—ঈশ্বরের গৌরবের চেয়ে তাঁরা মানব গৌরব… : যিশুর চিহ্নকর্মগুলোর সম্মুখীন মানুষের আচরণ থেকে অনুমান করা যায় সে যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত হতে এবং তাঁর গৌরব অন্বেষণ করতে সম্মত বা সে মানব গৌরবের ভিখারী কিনা। এ সকল কথা সুসমাচারের সর্বযুগের পাঠকের জন্য প্রযোজ্য কথা: যিশুর সপক্ষে বা তাঁর বিপক্ষে একটা সিদ্ধান্ত নিতে সবাই আহূত। কেবল নিজের 'আমি'কে ও নিজ অহঙ্কার পরিত্যাগ করলেই বিশ্বাসী হওয়া যায়, কেননা বিশ্বাস হল যিশুর মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপে প্রকাশিত ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বাধ্যতা; আরও, বিশ্বাস হল সেই একমাত্র শক্তি যা মানবীয় সঙ্কীর্ণতা থেকে আমাদের মুক্ত করে একমাত্র সত্য ঈশ্বরের অবিনশ্বর অক্ষয় ও অনন্ত জীবনের আমাদের সহভাগী করে তুলতে পারে (১৭:৩)। অবশেষে এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, মানুষের চেয়ে ঈশ্বরেরই গৌরব অন্বেষণ করা উচিত, এ সত্য বলায় যোহন আমাদের সচেতন করেন যে, বিশ্বাসী বলতে বোঝায় মানুষের পরিত্যক্ত হওয়া ও মানুষের প্রতিকূলতা ভোগ করা: বিশ্বাসী হতে হলে অভয় একান্ত প্রয়োজন।

১২:৪৪—যিশু জোর গলায় বলে উঠলেন: যারা ভয়বশত যিশুকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে ভয় করে তাদের বৈষম্যে যিশু জোর গলায়ই নিজের শুভসংবাদ ঘোষণা করেন:

পুনরায় তিনি চান, মানুষ তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হোক, কেননা এইভাবেই সে প্রেরণকর্তা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হয়। আপন মাংসে যিশু ঈশ্বরকে ছাড়া কাউকে বহন করেন না, তাঁর মধ্যে ঈশ্বরই সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান। অধিকন্তু, ঈশ্বরের ইচ্ছাই মানুষ তাঁর সহভাগিতা লাভের জন্য পুত্রের প্রতি বিশ্বাসী হোক (৬:৩৮…, ৪৬; ৭:১৮, ২৮; ৮:১৮, ২৬, ২৭, ৪২; ১৪:৮, ১১)।

১২:৪৫—আর যে আমাকে দেখতে পায়: যোহনের ভাষায় 'দেখা'-ই হল বিশ্বাস করা। চিহ্নকর্মগুলোতে যিশুর গৌরব দেখা মানে যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখা। পিতা ও যিশুর সঙ্গে সহভাগিতাজনক বিশ্বাস মাংসে যিশুর আগমন ও তাঁর ক্রিয়াকর্মে বিশ্বাসের উপর স্থাপিত: মাংসে আগত যিশুতে, তাঁর বাণী ও কাজে বিশ্বাসীগণ পিতাকে দেখে (২:২৩; ৫:২৪; ৬:২, ১৯, ৩৫, ৪০, ৬২; ৭:৩; ১৩:১৬; ১৪:৯, ১৭, ১৯; ১৭:৮, ২১, ২৪; ২০:১৪)।

১২:৪৬—আমি আলো হিসাবেই এই জগতে এসেছি: যিশুই সেই একমাত্র ত্রাণকর্তা যিনি অন্ধকার থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সক্ষম। অবশ্যই পাঠক উপরোক্ত ও পরবর্তী পদগুলিতে (১২:৪৭, ৪৯, ৫০) 'আমিই' সেই উক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পান, যে-উক্তিতে যিশু নিজেকেই অনন্য ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তা বলে দাবি করেন।

১২:৪৭—কেউ যদি আমার কথা শুনেও পালন না করে…: যিশু ঐশপ্রকাশকর্তারূপে যথাসাধ্য কাজ করলেন, তথাপি যে অবিশ্বাসী, সে নিজেরই দোষে দণ্ডিত হবে। আবার, তাঁর কথা শোনা বলতে তাঁর কথা মেনে চলা বোঝায়। একই ধরনের কথা অন্য অধ্যায়গুলোতেও বর্তমান ছিল (৩:১৮, ৩৬; ৫:২৪; ৬:৬০; ৮:৩১, ৪৩, ৪৭, ৫১; ৯:২৭, ৪০; ১০:৩, ১৬, ২০, ২৭; ১২:১৯; ১৪:২৩; ১৫:২০; ১৭:৬; ১৮:৩৭; ১৯:৮)।

১২:৪৮—যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে… : যিশু বিচারকর্তারূপে নয়, বিশেষত ত্রাণকর্তারূপেই প্রেরিত হয়েছিলেন। অবিশ্বাসী যে-বাণী গ্রহণ করেনি, যিশুর সেই বাণীই তাকে বিচার করবে। যিশুর বাণী এখানে স্বতন্ত্র একটা ভূমিকায় মণ্ডিত বাণী বলে উপস্থাপিত : পিতার নিজের বাণী বলে সেই বাণী নিজে থেকেই কার্যকর (১৭:৬-১৪, ১৭), পরিশুদ্ধকারী ও পরিত্রাণদায়ী (১৫:৩; ১৭:১৭) এবং ঐশজীবন ও প্রকৃত মুক্তিদায়ী বাণী (৮:৫১)।

১২:৪৯—আমি নিজে থেকে কথা বলিনি : এই বাক্যে সূচিত ধারণা দ্বিতীয় বিবরণের কয়েকটা ধারণার সঙ্গে, বিশেষভাবে মোশির মত ভাবী নবীর কথার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একমাত্র ব্যবধান এই যে, দ্বিতীয় বিবরণের বেলায় প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করা হত, অপর দিকে সুসমাচারের বেলায় যিশুর কথা সম্পূর্ণরূপে বাস্তব :

> আমি ওদের জন্য ওদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাব, ও তার মুখে আমার বাণী রেখে দেব ; আমি তাকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা সে তাদের বলবে। আর আমার নামে সে আমার যে সকল বাণী বলবে, সেই বাণীতে কেউ যদি কান না দেয়, তবে তার কাছ থেকে আমি জবাবদিহি চাইব। [দ্বিঃবিঃ ১৮:১৮-১৯]

মোশির মত যিশুও ঈশ্বরের কথা ও আজ্ঞা বলেন এবং বেছে নেবার জন্য জনগণের সামনে জীবন ও মৃত্যু রাখেন (দ্বিঃবিঃ ৩০:১৫, ১৯; ৩২:৪৬-৪৭)। বলা বাহুল্য যে মোশির সঙ্গে যিশুর তুলনা করা যায় না, যিশু ঈশ্বরের পুত্র ত!

১২:৫০—আর আমি জানি : এখানেও দ্বিতীয় বিবরণের একথা স্পষ্ট প্রতিধ্বনিত যে, বিধানের বাণী মানুষের কাছে জীবন (দ্বিঃবিঃ ৩২:৪৭)। কিন্তু যিশু নিজের জন্য এর চেয়ে অনেক কিছু বেশি দাবি করেন : স্বয়ং তিনি ও একমাত্র তিনিই ঈশ্বরের কাছ থেকে সেই অধিকার পেলেন যাতে অনন্ত জীবন দিতে পারেন ; সুতরাং যিশু শুধু ঐশপ্রকাশকর্তা নন, তিনি ত্রাণকর্তাও, ত্রাণকর্ম সাধনের জন্যই তিনি ঐশপ্রকাশকর্তা।

যিশুর উপদেশের মর্মকথা এ: পুত্র হলেন পিতার প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্তি বা প্রতিবিম্ব (স্মরণযোগ্য যে একথাই সমগ্র সুসমাচারের চাবিকাঠি-ধারণা!)। যিশু পিতা দ্বারা প্রেরিত হলেন এবং তিনিই তাঁর অনন্য প্রকাশকর্তা, সেজন্যই আমাদের পক্ষে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা একান্ত প্রয়োজন: যিশুকে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করাই হল পিতাকেও গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করা। যিশু এই জগতে বিচারের জন্য নয়, বরং আলো ও জীবন হিসাবে জগতের পরিত্রাণের জন্য এসেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর আগমন একটা বিচার ঘটায় আর সেই বিচার বাস্তবায়িত হয় তাঁর বাণীকে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করায়।

পরিশিষ্ট

যোহন অনুসারে 'অন্তিমকাল' ধারণা

১। তাঁর সকল উপদেশে যিশু নিজেকেই একমাত্র ত্রাণকর্তা বলে দাবি করেন, যে-ত্রাণকর্তার সম্মুখীন হয়ে মানুষের পক্ষে পরিত্রাণ বা বিচারের উদ্দেশে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। পরিত্রাণ ও বিচার ভাবী কিছু নয়, দু'টোই ইতিমধ্যেই বর্তমান (৩:১২-১৩, ৩১-৩৬; ৫:২০-৩১ ইত্যাদি এবং 'আমিই' উপদেশগুলি দ্রষ্টব্য)। যিশুর আগমনে অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী পরিত্রাণের কাল এসে গেছে (৪:২৩; ৫:২৫); তিনি মানুষের কাছ থেকে আজকেও একটা সিদ্ধান্ত দাবি করেন এবং একাধারে বিশ্বাসীর কাছে প্রত্যাশার অতীত প্রতিশ্রুতিতে প্রতিশ্রুত হন। এধারণা খুবই স্পষ্ট, আর আমরা তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলাম, বিশেষত 'জীবন', 'বিচার' ও 'পুনরুত্থান' ধারণা ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে। এখন 'চরম দিন' ও 'সেই দিন' বাক্য বিষয়ে একটা মন্তব্য রাখা হোক। ইহুদী ঐতিহ্য অনুসারে 'সেই দিন' বা 'প্রভুর দিন' কথা এই ধারণার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করত যে, ভাবীকালেই শেষ বিচার ও মৃতদের পুনরুত্থান ঘটবে। এধারণা যিশুর কাছে মার্থার কথায় উত্তমরূপে প্রকাশ পায় (১১:২৩)। ইহুদীদের সেই ধারণার বৈপরীত্যে যোহন একথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, যিশুতেই সেই অন্তিমকাল বা 'ক্ষণ' আসন্ন, এমনকি তা এসে গেছে (৪:২৩; ৫:২৫), অর্থাৎ যিশুর উপস্থিতিতে পরিত্রাণের

নবীন ও অন্তিম কাল প্রতিষ্ঠিত হল এবং যিশুর সেই ‘ক্ষণে’ই অর্থাৎ যখন মানবপুত্রের গৌরব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে তখনই সেই নবীন ও অন্তিম কাল চিরকালের মতও পরিত্রাণকাল হয়ে উঠল।

যোহনের সুসমাচারে এবিষয়ে অপর একটা দিক অনুধাবিত হয়, তথা: অন্তিমকাল যিশুর গৌরবায়নেই শুরু হয়; ঐতিহাসিক আবির্ভাবের পরে যিশু পিতার কাছে ফিরে গিয়ে সেখানেই বিশ্বাসীদের অপেক্ষা করেন। ধারণার এদিক (অন্তিমকাল যিশুর গৌরবায়নে প্রতিষ্ঠিত) যা উপরোল্লিখিত প্রথম দিকের সঙ্গে (অন্তিমকাল যিশুর ঐতিহাসিক উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত) কিছুটা পৃথক, বিশেষভাবে বিদায় উপদেশেই বর্তমান (১৩-১৭ অধ্যায়)। ‘গৌরব’ প্রসঙ্গেও (‘যিশুর উত্তোলন ও গৌরবায়ন’ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) একই পার্থক্য দেখা দিয়েছিল: যিশুর উপস্থিতি থেকেই পরিত্রাণ প্রতিষ্ঠিত এবং একাধারে সেই পরিত্রাণের পূর্ণতা পিতার কাছে যিশুর গৌরবায়নের পরেই ঘটে।

আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীতে ‘সেই দিন’ বলতে এমন দিন বোঝাত যখন যিশু দুর্জনদের বিচারকর্তা ও বিশ্বাসীদের ত্রাণকর্তারূপে পুনরাগমন করবেন; যোহনের ভাষায় ‘সেই দিন’ হল প্রকৃতপক্ষে সেই ‘ক্ষণ’ যখন যিশু পুনরুত্থিত হয়ে পিতার পাশে আসীন (১৪:২০; ১৬:২৩, ২৬)। ভাবীকালে শুধু নয়, সেই ‘ক্ষণ’ থেকেই বিশ্বাসীগণ প্রভুর সঙ্গে সংযুক্ত বলে ভবিষ্যতের দিকে আশঙ্কার সঙ্গে চেয়ে থাকবে না আর প্রভুর সঙ্গে সদা একত্র হবার জন্য খ্রিষ্টের বিজয়ী পুনরাগমনের অপেক্ষায়ও থাকবে না (১ থে ৪:১৭), বরং ইতিমধ্যেই, এই জগতে থাকতেই, বিশ্বাসীগণ যিশুর সঙ্গে গভীর ও ঘনিষ্ঠ সংযোগ লাভ করেছে, যে-সংযোগ গুণে তিনি তাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন (১৪:২১…)। এই জগতে থেকে যদিও বিশ্বাসীর পক্ষে যিশুর গৌরবের পূর্ণতা দেখা অসাধ্য (তাঁর পূর্ণ গৌরব সে তখনই দেখবে যখন ‘যিশু যেখানে আছেন সেখানে সেও থাকবে’, ১৭:২৪), তবু সে এ বর্তমানকাল থেকেই যিশু ও পিতার সঙ্গে জীবনদায়ী ও ফলপ্রসূ সংযোগ ভোগ করে। সহায়ক যিনি, সেই পবিত্র আত্মাই বিশ্বাসীর কাছে যিশুর সংযোগলাভের পথ উন্মুক্ত করেন।

২। যোহনের এ বিশিষ্ট ও স্বকীয় ধারণার মূল কারণগুলোর অন্যতম এই যে, তিনি সাধারণত ব্যবহৃত সময়সাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন না। তিনি এ দ্বন্দ্বের উপর

নির্ভর করেন: নিম্নলোক বা ঊর্ধ্বলোক থেকে এবং জগৎ বা ঈশ্বর হতে উদ্গত হওয়া। যখন মানুষ অস্বীকার করে সে এই জগতের একজন এবং যিশুর শুভসংবাদ গ্রহণ করে তখনই সে ঈশ্বরের একজন হয়ে ওঠে ও পরিত্রাণ পায়, অর্থাৎ তার পক্ষে পরিত্রাণ পাবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করা প্রয়োজন নেই। অবশ্যই (যেমন বলা হয়েছে) ঐশগৌরবের পূর্ণতা সে তখনই শুধু লাভ করবে যখন গৌরবান্বিত যিশু যেখানে আছেন সেখানে সেও গিয়ে পৌঁছবে।

উপরন্তু যোহন খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন যাতে তাঁর লেখার মাধ্যমে সমকালীন কৃষ্টি বা সংস্কৃতির জিজ্ঞাসা ও আকাঙ্ক্ষা সমূহ একটা উপযুক্ত উত্তর পায়: গ্রীকগণ এবং জ্ঞান-মার্গপন্থীগণ মানবীয় জীবনের অর্থ ও তার উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য ব্যাকুল ছিল এবং এই জীবনযাত্রার সনাতন লক্ষ্য অন্বেষণের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করত। যোহনের সুসমাচার এ সকল জিজ্ঞাসা ও আকাঙ্ক্ষার অনুকূল।

কিন্তু, তাঁর এই ধারণা তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত: তাঁর পক্ষে যিশুই সব; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল যিশুতেই কেন্দ্রীভূত: যিশুর আগমন-লগ্নই জগতের দীর্ঘ ইতিহাসের একমাত্র প্রকৃত ও সত্যকার সময়। একারণেই যোহন ইতিহাসের ভবিষ্যতের জন্য বেশি চিন্তান্বিত নন। তিনি ভবিষ্যতের গুরুত্ব আদৌ অস্বীকার করেন না, এর প্রমাণস্বরূপ স্মরণযোগ্য সুসমাচারের সেই সকল স্থান যেখানে প্রচারিত হয় যে বিশ্বাসীগণ এই মর্তে পূর্ণ গৌরব পাবে না বরং সাক্ষ্যমরণ পর্যন্তই যিশুর অনুসরণ করা আবশ্যক (১২:২৬; ১৩:৩৬)। তা সত্ত্বেও, যিশুর প্রতি বিশ্বাসী হওয়ায়ই আমরা পরিত্রাণপ্রাপ্ত এবং তাঁকে অস্বীকার করায়ই আমরা বিচারিত: আমাদের এই 'বিশ্বাস' সিদ্ধান্ত আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করে বিধায় যোহন জোর দিয়ে একথা প্রচার করেন যে, যে-কোন মানুষের পক্ষে বর্তমানকালই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই বর্তমানকালেই সে আপন ভবিষ্যৎকাল নির্ধারণ করে।

৩। যোহনের এই ধারণা কি আজকালের মানুষের কাছে শিক্ষণীয় কিছু দিতে পারে? বর্তমানকালে আমাদের চিন্তা বিশেষত ভবিষ্যতের দিকে চলে: মানবজাতির ভবিষ্যৎ কী রূপ হবে? আবার, ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যাকুল সমাজের মধ্যে খ্রিষ্টমণ্ডলীর কী দায়িত্ব ও কী কর্তব্য? যোহনের সুসমাচার যে এ ধরনের জিজ্ঞাসার সরাসরি উত্তর দিতে পারে না

এতে কোন সন্দেহ নেই, যেহেতু যোহনের উদ্দেশ্য হল, প্রতিটি মানুষের কাছে ‘মানব অস্তিত্ব’ সমস্যা সমাধান করা, আর এই সমস্যার সমাধান এরূপ: এই জগতে ঐতিহাসিকভাবে আগত যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখা; তাঁর সাধিত ত্রাণকর্মে চিরকাল ধরেই মানুষ পরিত্রাণ পেয়েছে। মানবজাতি ভবিষ্যৎকালে যে দিকে যাক না কেন, সে এবিষয়ে নিশ্চিত থাকুক যে, যিনি আপন পুত্রকে প্রেরণ করেছেন মানুষ যেন যুগ যুগান্তর ব্যাপী তাঁর ঐশজীবনেরই সহভাগী হয়, সেই ঈশ্বর আপন ভালবাসায়ই তাকে কখনও ত্যাগ করবেন না।

দ্বিতীয় খণ্ড

আপনজনদের কাছে যিশুর আত্মপ্রকাশ, তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান

(১৩–২১ অধ্যায়)

১২ অধ্যায়ে জগতের কাছে যিশুর আত্মপ্রকাশকর্ম শেষ হয়েছে, এখন (১৩ অধ্যায় থেকে) যোহনের সুসমাচারের দ্বিতীয় অংশ শুরু হয়। সর্বপ্রথমে, বিদায় ভোজের সময়ে আপনজনদের কাছে যিশুর বিদায় উপদেশ উপস্থাপন করা হয় (১৩–১৭ অধ্যায়), তারপর তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কাহিনী বর্ণনা করা হয় (১৮–২০ অধ্যায়)। এবিষয়ে সকলের সমর্থন আছে যে, আপনজনদের কাছে যিশুর বিদায় উপদেশ তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সূত্রপাত-ভূমিকা বলে গণ্য করা উচিত, ফলে সমগ্র সুসমাচার-পুস্তক একটিমাত্র ধারাবাহিক বিবরণ হয়ে ওঠে যা যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানেই শীর্ষ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়।

১৩ অধ্যায় ব্যাখ্যা করার আগে, ১৩–১৭ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত বিদায় উপদেশের প্রযোজ্য একটা সাধারণ সূচনা উপস্থাপন করা যাক।

প্রথম, এবিষয় লক্ষণীয় যে, ১২ অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচিত ‘জীবন’ ও ‘আলো’ প্রসঙ্গ দু’টো এখন আর দেখা দেয় না এবং মুখ্য প্রসঙ্গই সেগুলোর স্থান দখল করে, তথা : ভালবাসা প্রসঙ্গ।

দ্বিতীয়, বিদায় উপদেশ বিদায় ভোজের ঘরে উপস্থিত শিষ্যদের জন্যই শুধু নয়, যিশুর মৃত্যুক্ষণ পর্যন্তই মাত্র সীমাবদ্ধও নয়, বরং সর্বকালের শিষ্যদের জন্য নিবেদিত, এবং যিশুর পুনরুত্থান থেকে তাঁর গৌরবময় পুনরাগমনকাল পর্যন্তই পরিব্যাপ্ত; অর্থাৎ, খ্রিষ্টমণ্ডলীকেই সেই উপদেশের প্রকৃত ও নির্দিষ্ট গ্রহীতা হতে হয়, এবং যদিও সেই উপদেশে যোহনের স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর অবস্থা-পরিস্থিতিই বিশেষত প্রতিবিম্বিত, তবুও

জগতের মাঝে উপস্থিত সর্বকালীন খ্রিষ্টমণ্ডলীর অবস্থাও পূর্ববর্ণনা লাভ করে। সুতরাং, একথা স্পষ্ট হোক যে, বিদায় উপদেশ জগতের কাছে নয়, খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কাছে নিবেদিত, তারা যেন নিজেদের মনোনয়ন সম্পর্কে সচেতন হয় এবং উপদেশটির শিক্ষা খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের মূলকেন্দ্র বলে গ্রহণ করে, যে-শিক্ষা বিশ্বাসী বলে তাদেরই কাছে মাত্র বোধগম্য।

তৃতীয়, উল্লিখিত বিদায় উপদেশের মত উপদেশ পুরাতন নিয়ম (আদি ৪৭:২৫-৫০; যোশুয়া ২৩–২৪:৩২; ১ শামু ১২; সমগ্র দ্বিতীয় বিবরণ; তোবিত ১৪:৩-১১; ১ মাকা ২:৪৯-৭০; ২ মাকা ৭:১-৪২) এবং ইহুদী ধর্মীয় লেখায়ও বর্তমান ছিল (আদি ৪৭:২৯··· সম্পর্কিত 'বারোজন কুলপতির উইল')। তেমন উপদেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ: ১। মরণাপন্ন বা মৃত্যুর সম্মুখীন একজন ব্যক্তি আপন পরিজন বা জনগণকে কাছে ডেকে শেষ উপদেশ প্রদান করেন; ২। উপদেশের মর্মকথা হল বিধান মেনে চলা; ৩। সেই ব্যক্তি নিজ জীবনী বর্ণনা করেন যাতে শ্রোতারা তাঁর আদর্শ পালন করে; ৪। চরমকালে জনগণের নিয়তি বিষয়ে ভাববাণী দেন। পুরাতন নিয়ম ব্যতীত এ ধরন উপদেশ নূতন নিয়মেও বিদ্যমান (লুক ২২:২১-৩৮; প্রেরিত ২০:১৭-৩৮; ২ পিতর; ১ তিমথি ১:১২-১৭; ২ তিমথি)। যোহনের সুসমাচারে অন্তর্ভুক্ত যিশুর বিদায় উপদেশের ক্ষেত্রেও উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমান: ১। মৃত্যুর আগে তিনি আপন শিষ্যদের কাছে ডাকেন; ২। তাঁদের কাছে শেষ শিক্ষা প্রদান করেন; ৩। শিষ্যদের অনুসরণীয় আদর্শ বলে আত্মপরিচয় দেন; ৪। আপন অনুপস্থিতিতে তাঁদের কষ্ট, জগতের নির্যাতন এবং বিশ্বস্তদের বিজয় ও সান্ত্বনা বিষয়ে ভাববাণী দেন। আরও সুনির্দিষ্টভাবে কথা বলতে হলে বলা যায় যে যোহনের সুসমাচারে ধ্রুবভাবে আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ হল: ভালবাসার আজ্ঞা, জগতের নির্যাতন, যিশুর দেওয়া সান্ত্বনা এবং যিশুর সঙ্গে একাত্ম বা সংযুক্ত হয়ে থাকার বিশ্বাসীদের কর্তব্য।

চতুর্থ, যিশুর বিদায় উপদেশের মর্মার্থ হল, ১। আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর ধারণা পর্যালোচনা ক'রে যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান-বিষয়ক অনন্য ও চরম ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করা; ২।

যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ফলে সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসী যে নব জীবনে সঞ্জীবিত, সেই জীবন বর্ণনা করা।

পঞ্চম, আগে বলা হয়েছে যে, যিশুর এই উপদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলীর পরবর্তীকাল অর্থাৎ যিশুর পুনরাগমন কাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তেমন কাল কঠিন কাল, তেমন কালে মণ্ডলী জগৎ দ্বারা নির্যাতিত, এমনকি তেমন কাল মণ্ডলীর যন্ত্রণার কাল, ঠিক যেমন যিশুর বেলায় ঘটেছিল সেই সন্ধ্যায় যখন তিনি আপনজনদের কাছে বিদায় উপদেশ রেখে গেছিলেন: যিশুর মত তাঁর ভক্তগণও সন্দেহ, মর্মপীড়া ও আপনজনদের প্রত্যাখ্যান ভোগ করবেন। মণ্ডলীর যন্ত্রণাভোগ অর্থাৎ জগতের নির্যাতন খ্রিষ্টমণ্ডলী দ্বারা যেন বিপদ বলে পরিগণিত না হয়, কেননা সেই নির্যাতনই বা যন্ত্রণাভোগই তার জীবনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। ঠিক এই যন্ত্রণাভোগ-নির্যাতন দৃষ্টিকোণ অনুসারেই যিশুর বিদায় উপদেশ পাঠ করা প্রয়োজন। তাঁর বিদায়গ্রহণই যে তাঁর উপদেশ দেওয়ার বাহ্যিক কারণ এমন নয়, বরং তাঁর বিদায়ই উপদেশটির প্রকৃত বিষয়। যিশুর বিদায়গ্রহণ ও এর ফলে শিষ্যদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে যোহন এক দিকে জগতের মাঝে খ্রিষ্টমণ্ডলীর অবস্থা প্রকাশ করেন, অপর দিকে এই অবস্থাজনিত প্রশ্নগুলো উল্লেখ করেন: কি করে যিশু এখনও উপস্থিত এবং কোথায় তাঁর সন্ধান পাব? নির্যাতনের সময়ে শিষ্যেরা কোথা থেকে আনন্দ পাবে? এ প্রশ্নগুলোর যোহন খুবই স্পষ্ট উত্তর দেন: যিশুর চলে যাওয়াটা প্রকৃতপক্ষে চলে যাওয়া নয়, বরং ফিরে যাওয়া: যিশু অনুপস্থিত নন, তিনি উপস্থিত! তাঁর বিদায়গ্রহণে তাঁর অনুগামীরা বিশ্বাসী-ই হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাঁর মৃত্যুতে তিনি যে স্বর্গলোকের গৌরবে গিয়ে পৌঁছন এমন নয়, তাঁর মৃত্যুতে পিতা ঈশ্বর ও যিশুর গৌরব আমাদেরও পরিপ্লুত করে।

যিশুর বিদায় ভোজ

(১৩ অধ্যায়)

এই অধ্যায়ে যোহন বিশেষ ঘটনা দু'টোর দিকেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন : শিষ্যদের পাদপ্রক্ষালন ও বিশ্বাসঘাতকের পরিচয়দান। পরে যিশু আপনজনদের কাছে বিদায়-বাণী দেন। আশ্চর্যের বিষয় এটাই হতে পারে যে, যোহন সাক্রামেন্তীয় রুটির কোন কথাই উল্লেখ করেন না (এবিষয় সংক্রান্ত পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

শিষ্যদের পাদপ্রক্ষালন (১৩:১-১৭)

১৩ [১] পাস্কাপর্বের আগে, এজগৎ ছেড়ে পিতার কাছে চলে যাওয়ার ক্ষণ
উপস্থিত হয়েছে জেনে, যিশু, তাঁর যে আপনজনেরা এই জগতে ছিলেন, তাঁদের
অবিরতই ভালবেসে শেষ পর্যন্তই তাঁদের ভালবেসে গেলেন। [২] সান্ধ্যভোজ তখন
চলছে; দিয়াবল ইতিমধ্যে শিমোনের ছেলে যুদা ইস্কারিয়োতের হৃদয়ে তাঁর প্রতি
বিশ্বাসঘাতকতা করার সঙ্কল্প অনুপ্রবেশ করিয়েছিল।
[৩] একথা জেনে যে, পিতা তাঁরই হাতে সমস্তই তুলে দিয়েছেন, এবং তিনি যে
ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন আর ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাচ্ছেন এও জেনে,
[৪] যিশু ভোজ থেকে উঠলেন, জামা খুলে রাখলেন, এবং একটা গামছা নিয়ে তা
কোমরে জড়ালেন; [৫] তারপর একটা পাত্রে জল ঢেলে শিষ্যদের পা ধুয়ে দিতে
শুরু করলেন, আর কোমরের গামছা দিয়ে তা মুছে দিতে লাগলেন। [৬] তিনি
শিমোন পিতরের কাছে এলেন, আর ইনি তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি কি আমার
পা ধুতে যাচ্ছেন?' [৭] যিশু তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আমি যা করছি, তা তুমি এখন
জান না, কিন্তু পরে বুঝতে পারবে।' [৮] পিতর তাঁকে বললেন, 'আপনি আমার পা
কখনও ধুয়ে দেবেন না!' যিশু তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাকে ধৌত না করলে
আমার সঙ্গে তোমার কোন অংশ নেই।' [৯] শিমোন পিতর বললেন, 'প্রভু, আমার
পা শুধু নয়, হাত ও মাথাও ধুয়ে দিন।' [১০] যিশু তাঁকে বললেন, 'যে স্নান
করেছে, তার ধৌত হওয়ার আর প্রয়োজন নেই, সে সর্বাঙ্গেই শুদ্ধ। তোমরা তো

শুদ্ধ, তবু সকলে নও।’ [১১] কেননা তিনি জানতেন, কে তাঁর প্রতি
বিশ্বাসঘাতকতা করবেন; এজন্যই তিনি বললেন, ‘তোমরা সকলে শুদ্ধ নও।’
[১২] তাঁদের পা ধুয়ে দেবার পর, নিজের জামা পরে আবার আসন নেবার পর
তিনি তাঁদের বললেন, ‘আমি তোমাদের প্রতি যা করলাম, তোমরা কি তা বুঝতে
পার? [১৩] তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলে ডাক, আর ঠিকই বল, কারণ আমি
তা-ই। [১৪] তবে, প্রভু ও গুরু হয়ে আমি যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন
তোমাদেরও পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত। [১৫] আমি তোমাদের একটা
আদর্শ দিলাম, আমি তোমাদের জন্য যেমনটি করলাম, তোমরাও যেন তেমনটি
কর। [১৬] আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, দাস নিজের প্রভুর চেয়ে বড় নয়,
নিজের প্রেরণকর্তার চেয়ে প্রেরিতজনও বড় নয়। [১৭] এ সমস্ত জেনে যদি তোমরা
তা পালন কর, তবে তোমরা সুখী।’

১৩:১ক—পাস্কাপর্বের আগে: যে পাস্কাপর্বে যিশু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন, সেটা যোহনের বর্ণনায় গুরুত্বপূর্ণ ও মুখ্য একটা সময় (১১:৫৫; ১২:১; ১৮:২৮, ৩৯; ১৯:১৪), ঐতিহাসিক কারণে নয়, ঐশতাত্ত্বিক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা যিশুই নব সন্ধির প্রকৃত পাস্কা-মেষশাবক বলে মরলেন যাঁর একটা হাড়ও ভগ্ন হল না (১৯:৩৬)।

১৩:১খ—তাঁর চলে যাওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে: তাঁর যে কী ঘটবে অর্থাৎ তাঁর ক্ষণ যে উপস্থিত হয়েছে এবিষয়ে যিশু আগে থেকেই অবগত: ক্ষণটি হল তাঁর মৃত্যু-ক্ষণ (৭:৩০; ৮:২০) এবং একাধারে তাঁর গৌরব-ক্ষণ (১২:২৩)। এই পদে ক্ষণটি এজগৎ থেকে পিতার কাছে চলে যাওয়া বলে বর্ণিত, কেননা এজগতে তাঁর ক্রিয়াকর্মের সময় পরিণতির দিকে যাচ্ছে (৯:৫; ১৭:১১, ১৩)।

১৩:১গ—শেষ পর্যন্তই তাঁদের ভালবেসে গেলেন: এখানে উত্তম মেষপালকের (১০ অধ্যায়) উপদেশের কথা প্রতিধ্বনিত: তারাই যিশুর ‘আপনজন’ যারা তাঁর মেষপালভুক্ত, তাঁর কণ্ঠস্বর শোনে, তাঁর দ্বারা চালিত ও পালিত এবং যাদের সঙ্গে

পারস্পরিক চেনাশোনা ও ভালবাসা বর্তমান। আপনজনদের প্রতি যিশুর ভালবাসা অনন্য ও অতুলনীয়, আর এই ভালবাসার গভীরতম ও চূড়ান্ত প্রমাণ ক্রুশের উপরে তাঁর মৃত্যুতেই বিশেষত প্রকাশ পায়। যোহনের ব্যবহৃত 'ভালবাসা' গ্রীক শব্দ মানবীয় ভালবাসাকে বোঝায় না, বরং ঐশভালবাসারই দিকগুলির দিকেই মাত্র নির্দেশ করে: এমন ভালবাসা যা ঈশ্বর হতে উদ্গত এবং শুধু ঈশ্বরের ভালবাসার তুলনায় জ্ঞাতব্য, কাজেই সম্পূর্ণ অটল বিশ্বাসযোগ্য অপরিবর্তনশীল ও বিনামূল্যে দেওয়া ভালবাসা। সুতরাং এই দিব্য ভালবাসা অনুভবের চাবিকাঠি মানবীয় অভিজ্ঞতা নয়, বরং যিশুর জীবন, এমনকি ক্রুশের উপরে তাঁর মৃত্যুই যা মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধির শীর্ষ ঘটনাস্বরূপ।

আপনজনদের প্রতি যিশুর ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণের চিহ্ন বলে পাদপ্রক্ষালন গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা; এর প্রমাণস্বরূপ একথা যথেষ্ট হোক যে, সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের 'বিদায় ভোজ' বর্ণনার বৈষম্যে যোহন এউখারিস্তীয় রুটি ও আঙুররস নয় বরং পাদপ্রক্ষালনই উল্লেখ করেন। বস্তুত, পাদপ্রক্ষালনে প্রতীকমূলক তাৎপর্য রয়েছে যার মাধ্যমে যিশুর মৃত্যু এবং সেই মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠিত শিষ্যদের সঙ্গে যিশুর পূর্ণ সংযোগ পূর্বঘোষিত (১৩:৭)। সুতরাং, এ সকল কথা থেকে এধারণা অনুমেয় যে, ১৩ অধ্যায়ের এই প্রথম পদটি পাদপ্রক্ষালন বর্ণনার ভূমিকা শুধু নয় বরং সুসমাচারের এই সমস্ত দ্বিতীয় অংশের শিরনাম বলে গ্রহণযোগ্য।

১৩:২—দিয়াবল ইতিমধ্যে… : যে-সময় যিশু ভালবাসার খাতিরে শিষ্যদের সেবা করেন, সেই একই সময় ঈশ্বর ও যিশুর প্রতিদ্বন্দ্বী দিয়াবলও (৮:৪৪; ১৪:৩০) যুদার মাধ্যমে কাজে রত আছে।

১৩:৩—পিতা তাঁরই হাতে সমস্তই তুলে দিয়েছেন: দিয়াবলের তীব্র প্রচেষ্টা (৭:৩০… ; ১০:১৮) এবং এই জগতের অধিপতির বাহ্যিক বিজয় সত্ত্বেও (১৪:৩০) সবকিছুর উপর যিশুর আধিপত্য ও প্রভুত্ব অপরাজেয়, কেননা সেই প্রভুত্ব ও আধিপত্য

পিতা ঈশ্বরের মহাশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন ও ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে উদ্যত হচ্ছেন, তিনি ঈশ্বরের সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে শক্তিশালী (৮:৪৪) এবং তিনি সচেতন যে তাঁর বাহ্যত-প্রতীয়মান পরাজয় ও তাঁর বিশ্বাসীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে পরবর্তীকালীন নির্যাতন ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে ধ্বংস করতে অক্ষম।

১৩:৪—ভোজ থেকে উঠলেন: সেইকালে পাত্রে জল ঢেলে ভোজনকারীদের পা ধুয়ে দেওয়া ছিল ক্রীতদাসেরই কাজ: এই নিচু ধরনের সেবাকর্ম যিশুর অপমানজনক মৃত্যু নির্দেশ করে, যে-মৃত্যু কিন্তু জগতের জন্য পরিত্রাণলাভের জন্য একটি দান; তাতে সেই কাজ ঐশমর্যাদায়ই পরিপূর্ণ সেবাকর্ম। ত্রাণকর্তারূপে যিশু হলেন ক্রীতদাস-প্রভু: যেহেতু আপন প্রভু-মর্যাদায় পূর্ণ সচেতন সেজন্যই ক্রীতদাস হিসাবে ব্যবহার করেন; তাই এভাবে ক্রীতদাস হয়ে ব্যবহার করায় তিনি ঐশগৌরবে ভূষিত প্রভুরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন, ঠিক যেভাবে ক্রুশের উপরে দস্যু বলেই বিদ্ধ হওয়ায় তাঁর ঐশগৌরব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত।

১৩:৬—প্রভু, আপনি কি আমার পা ধুতে যাচ্ছেন? সুসমাচারের অন্যত্রও ইহুদীরা বা শিষ্যেরা যিশুর কাজ ও কথা ভুল বুঝেছেন। জগতের মায়া সর্বদাই যিশুকে শেখাতে চায় কিভাবে ব্যবহার করা উচিত এবং তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর পথ (অর্থাৎ মশীহেরই পথ) অগ্রাহ্য করে। পিতরের এই প্রথম প্রতিক্রিয়ায় যিশুর উত্তরে পবিত্র আত্মার কালের কথা পূর্বপ্রচারিত: কেবল যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরেই পবিত্র আত্মা যিশুর ব্যবহারের ও মৃত্যুমুখে তাঁর যাত্রার মর্মার্থকে শিষ্যদের কাছে উন্মুক্ত করবেন (১৪:২৬; ১৬:১২…, ২৫, ২৯-৩২)। পিতরের পুনরুক্ত প্রতিক্রিয়ায় যিশু তাঁকে ভর্ৎসনা করেন, পিতর যেন মৃত্যুর পর বিশ্বাসীদের কাছে তাঁর দেওয়া দানগুলি থেকে নিজেকে বঞ্চিত না করেন: শিষ্যেরাও তাঁর প্রাপ্য জীবনের সহভাগী হবেন (১৪:১৯), তিনি যেখানে আছেন তাঁরাও সেখানে থাকবেন (১২:২৬; ১৪:৩; ১৭:২৪), তাঁর ঐশগৌরবের অংশী হবেন (১৭:২২, ২৪) এবং যিশু ও পিতার পূর্ণ ভালবাসা প্রত্যক্ষ করবেন (১৪:২১, ২৩)।

সুতরাং, একথা বলতে পারি যে, পাদপ্রক্ষালন একটা চিহ্নকর্ম যার মাধ্যমে শিষ্যদের কাছে যিশু মৃত্যুর হাতে নিজের আত্মসমর্পণ দৃশ্যমান করেন এবং যে-ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ তারা পাবেন, সেই ভালবাসা গুণেই তিনি সেই মৃত্যুকে ফলপ্রসূ করে তোলেন।

১৩:৯—প্রভু, আমার পা শুধু নয়: পিতর যিশুর কথার গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে অক্ষম; তিনি তা-ই মাত্র বুঝেছেন যে, যিশুকে সেই কাজ করতে না দিলে তবে তাঁর সহভাগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন। তা সত্ত্বেও পিতরের আচরণ ইহুদীদের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত: তারা অবিশ্বাসী ছিল, অপর দিকে পিতরের কমপক্ষে কিছুটা বিশ্বাস আছে (১৩:১৭; ২১:৭)।

১৩:১০ক—যে স্নান করেছে… : পাদপ্রক্ষালন যার চিহ্ন, ক্রুশের উপরে যিশুর সেই মৃত্যুর কথা অধিক সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করার জন্য এখানে উল্লিখিত স্নানের দৃশ্য আমাদের কাছে অতিশয় উপযোগী: ক্রুশবিদ্ধ যিশুর পাশ থেকে প্রবাহী জল ও রক্তের ধারায় (১৯:৩৪ এবং ৭:৩৮ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য) 'স্নাত' হয়ে আমরা পাপ থেকে শুদ্ধ হই (১ যোহন ১:৭)। আবার, 'স্নান' শব্দের মধ্য দিয়ে যোহন সম্ভবত বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্তের শোধনকারী ভূমিকা ইঙ্গিত করেন।

১৩:১০খ—তোমরা তো শুদ্ধ: যিশুর সাহচর্যে শিষ্যেরা শুদ্ধ হয়েছেন বটে, কিন্তু নিজের মৃত্যুতেই যিশু বিশ্বাসীদের সঙ্গে নবীন ও চিরস্থায়ী সাহচর্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই কারণেই যিশু চান শিষ্য সকলেই তাঁর মৃত্যুর প্রতীক সেই পাদপ্রক্ষালন গ্রহণ করুন।

১৩:১০গ—তবু সকলে নও: যেমন বারবার বলা হয়েছে, আগে থেকেও যিশু জানতেন যুদা তাঁকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে।

১৩:১২—তোমাদের প্রতি যা করলাম: যিশুর এই প্রশ্নে আমরা পাদপ্রক্ষালনে নিহিত অর্থ পুনরায় ধ্যান করার জন্য আহূত। কিন্তু এই উক্তিতে, পাদপ্রক্ষালনের প্রতীকমূলক ভূমিকার উপর নয়, যিশুর কাজের আদর্শমূলক তাৎপর্যের উপর জোর দেওয়া হয়: সর্বকালের খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণও সেই আদর্শ পালন করবে।

১৩:১৩—তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলে ডাক: যে খ্রিষ্টমণ্ডলী যিশুকে গুরু ও প্রভু বলে স্বীকার ও ঘোষণা করে, সেই খ্রিষ্টমণ্ডলীর পক্ষে যিশুর নিচু ধরনের সেবাকর্মের আদর্শ অনুকরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু, যিশুর একথা নৈতিক একটা পরামর্শ বলে গ্রহণীয় নয় বরং তাঁর নবীন একটা আত্মপ্রকাশ যার মধ্য দিয়ে তিনি আপন ভালবাসা, সেবা ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব ও ধারণা দৃশ্যমান করেন, যে-মনোভাব ও ধারণা অনুসারে তিনি জীবনযাপন করলেন এবং যে-মনোভাব ও ধারণায় তাঁর ঐশমর্যাদা প্রতিবিম্বিত: সেবা ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমেই যিশু পিতার হাতে ত্রাণকর্মের জন্য আত্মসমর্পণ করলেন এবং এইভাবেই তিনি হয়ে উঠলেন পিতার প্রতিমূর্তি, তাঁর দ্বারা গৌরবান্বিত হলেন এবং খ্রিষ্টমণ্ডলীর গুরু ও প্রভু বলে ঘোষিত হলেন।

১৩:১৪—তোমাদেরও পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত: পাদপ্রক্ষালন বিষয়ে যা বলে এসেছি, তা সাংশ্লেষিকভাবে পুনরায় উপস্থাপন করা হোক: যেমন যিশুর জন্য, তেমনি মণ্ডলীর জন্যও ঈশ্বরের ও আপন গৌরব পাবার ও প্রকাশ করার পথ হল বিনীত সেবাকর্মের পথ: শুধু এই শর্তেই খ্রিষ্টমণ্ডলী তার প্রভুর সঙ্গে একাত্ম ও তাঁর দ্বারা প্রেরিত এবং ফলত তাঁর আশীর্বাদের পাত্র নিজেকে মনে করতে পারে; এটিই হল যিশুর কথার প্রথম অর্থ।

কিন্তু দু' একটা মন্তব্য রয়েছে যেগুলি গভীরতর একটা অর্থের দিকে এগোয়: প্রথম, একথা স্বীকার্য যে, জীবনকালে যিশু একবারই মাত্র শিষ্যদের পা ধুয়ে দিলেন, এবং তাঁর এই কাজ এত অসাধারণ ও অপ্রত্যাশিত ছিল যে শিষ্যেরা হতভম্ব না হয়ে পারলেন না; সাধারণত শিষ্যেরাই তাঁকে সেবা করতেন। সুতরাং, যিশু যখন একবারই মাত্র এই

ধরনের নিচু কাজ করলেন, তখন অনুমান করতে পারি যে, 'আমি তোমাদের একটা আদর্শ দিলাম' তাঁর এই কথা সেই একবার-মাত্র সাধিত কাজের দিকে নয় বরং সারা জীবন ধরেই আমাদের জন্য যে কী প্রকৃতপক্ষে করলেন সেই দিকে নির্দেশ করে। দ্বিতীয়, এই বাক্য ব্যাখ্যা সূচনায় লক্ষ করলাম যে এখানে (১৩:১-৩) যোহনের সুসমাচারের প্রধান প্রধান প্রসঙ্গ উপস্থিত: যিশু পিতা থেকে আগত হয়ে পিতার ভালবাসা আমাদের কাছে বিতরণ করেন এবং পুনরায় পিতার কাছে ফিরে যান: যিশু পিতার প্রেরিতজনরূপেই বিশেষত আমাদের মধ্যে উপস্থিত, এবং শেষ ও চরম প্রেরিতজন বলেই তাঁর হাতে একটা প্রেরণকর্ম ন্যস্ত করা হয়েছে এবং সেই কর্ম সাধনের জন্য পূর্ণ অধিকারও তাঁকে দেওয়া হয়েছে: এই পূর্ণ অধিকারবলেই তিনি 'আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন'। কিন্তু পাদপ্রক্ষালন-কাজটা যতই বিনীত কাজ হোক না কেন, তবুও যিশুর ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দেবার জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্যই উপরে একথা বলা হয়েছিল যে, 'পাদপ্রক্ষালন' একটি চিহ্নরূপেই গ্রহণযোগ্য যার মধ্য দিয়ে যিশুর সমস্ত জীবন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর আসন্ন মৃত্যুরই অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়: পাদপ্রক্ষালনে এসত্য প্রচারিত হয় যে, ঈশ্বরপুত্র বলে ও পিতার দেওয়া অধিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তি বলে যিশু মানুষের মাঝে ক্রীতদাসরূপেই আবির্ভূত হলেন এবং শেষ মাত্রা পর্যন্তই, অর্থাৎ মানুষ দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হওয়া পর্যন্তই ক্রীতদাসরূপে তাদের সেবা করে গেলেন। একথা বলা চলে যে, পাদপ্রক্ষালনে মাংসে যিশুর আগমনের পূর্ণ অর্থ, অর্থাৎ তাঁর জীবন, যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পূর্ণ অর্থ সূচিত; ফলত পবিত্র সাক্রামেন্তেরও পূর্ণ অর্থ সূচিত: 'আমাদের জন্য, আমাদের সঙ্গে ও আমাদের মধ্যে ঈশ্বর' হবার জন্যই যিশু প্রকৃত খাদ্যরূপে আমাদের হাতে নিজেকে সঁপে দেন।

সুতরাং, পাদপ্রক্ষালন এমন একটা চিহ্নকর্ম যার মধ্য দিয়ে যিশু নিজের প্রেরণকর্ম শুধু নয় বরং স্বয়ং ঈশ্বরের স্বরূপও প্রকাশ করেন, তথা: ঈশ্বর এমন যিনি মানুষের সেবা করেন। কিন্তু, ঈশ্বর যখন আমাদের সেবা করায়ই উত্তমরূপে ও প্রকৃতপক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন, এবং যিশুও (যিনি ঐশবাণীরূপে বিশ্বস্রষ্টা ও ঈশ্বর বিষয়ে চরম সত্য) আমাদের ক্রীতদাস বলেই আত্মপ্রকাশ করেন, তখন আমাদের অস্তিত্ব বা জীবনের পরম লক্ষ্যও উদ্ভাসিত হয়: পারস্পরিক সেবাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। তখনই আমাদের জীবনের

উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় যখন ঈশ্বর ও যিশুর আদর্শ অনুকরণে ভালবাসার খাতিরে সম্পূর্ণরূপে মানুষের সেবা করি।

উপসংহারস্বরূপ একথা বলতে পারি যে, বিনীত ও নিচু ধরনের কাজ ব্যতীত যিশু আমাদের কাছে এমন কাজ প্রত্যাশা করেন যা তাঁর সমগ্র জীবনকে লক্ষ করে: জগতের প্রতি পিতা ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য যিশুর অনুকরণে আমাদেরও মৃত্যু পর্যন্ত ভাই মানুষের জন্য সতত প্রাণোৎসর্গ করা প্রয়োজন। মৃত্যু পর্যন্ত ক্রীতদাস-ভূমিকা বহন করায়ই আমরা যিশুর প্রভুত্বের অংশী হব। এই মনোভাব নিয়ে জীবনযাপন করব এবং এই মনোভাব নিয়ে এউখারিস্তিয়া গ্রহণ করব; অন্যথা আমাদের জীবন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর উপযুক্ত জীবন নয় এবং সেই রুটি-গ্রহণ আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অর্থহীন।

১৩:১৫খ—তেমনটি কর: বিভিন্ন কারণে এ বচন অতিগুরুত্বপূর্ণ। প্রথম: বচনটি শুধু যোহনের সুসমাচারে নয়, লুকের সুসমাচারেও প্রভুর ভোজ-বর্ণনা শেষাংশে উপস্থিত (লুক ২২:১৯); তাতে পাদপ্রক্ষালনে প্রভুর ভোজের সাক্রামেন্তীয় দিক উত্তমরূপে প্রমাণিত। দ্বিতীয়, 'তোমাদের জন্য যেমনটি করলাম' (১৩:১৫ক) বচনটি ১৩:১৪ পদ-ব্যাখ্যা যথার্থ বলে সমর্থন করে, যেহেতু এখানে যিশু পা ধোয়ার কথা না ব'লে 'যেমনটি করলাম' বাক্যই ব্যবহার করেন; অর্থাৎ তিনি কেমন যেন বলেন: সারা জীবন ধরে তোমাদের জন্য যেমনটি করলাম, তোমরাও তেমনটি কর। তাতে সদৃশ সুসমাচারত্রয়ে বর্ণিত প্রভুর ভোজও প্রকৃত অর্থ অর্জন করে: 'আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর' বলতে 'আমার স্মরণার্থে এই অনুষ্ঠান কর' শুধু বোঝায় না, বরং যিশু চান, রুটি ও আঙুররসের আকারে তাঁর দেহ-রক্ত যারা গ্রহণ করবে তারা যেন তাঁর স্মরণার্থে তাঁরই আদর্শে সকলের জন্য প্রাণোৎসর্গ করে। একথা পরবর্তী পদ দ্বারাই প্রমাণিত।

১৩:১৭—যদি তোমরা তা পালন কর…: যিশুর দেওয়া আদর্শ অন্তরেই মাত্র উপলব্ধি করা যথেষ্ট নয়, এমনকি প্রকৃত উপলব্ধিটা বাস্তবায়নেই প্রমাণিত হয়। খ্রিষ্টীয় জীবন এই সত্য-উপলব্ধি থেকে উদ্গত: যিশু আমাদের সেবার জন্যই আমাদের হাতে

নিজেকে সঁপে দিলেন বলে আমরাও প্রতিবেশীর সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োজিত থাকব; ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন বলে আমরাও সেবার মধ্য দিয়ে প্রতিবেশীকে ভালবাসতে পারি।

বিশ্বাসঘাতকের পরিচয়দান (১৩:১৮-৩০)

১৩ [১৮] 'তোমাদের সকলের বিষয়ে আমি কথা বলছি না; আমি জানি কাকে বেছে নিয়েছি। কিন্তু শাস্ত্রের এই বচনটা পূর্ণ হওয়া চাই: যে আমার রুটি খেত, সে আমার বিরুদ্ধে পা বাড়িয়েছে। [১৯] তা ঘটবার আগেই আমি এখন তোমাদের বলে রাখছি, তা যখন ঘটবে, তখন তোমরা যেন বিশ্বাস কর যে, আমিই আছি। [২০] আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমি যাকে পাঠাই, তাকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, এবং আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।'

[২১] এই সমস্ত কথা বলার পর যিশু আত্মায় কম্পিত হলেন, এবং সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে।' [২২] তিনি যে কার্ কথা বলছেন, শিষ্যেরা তা সঠিকভাবে বুঝতে না পেরে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন। [২৩] তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন—যিশু যাঁকে ভালবাসতেন—যিশুর কোলে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন; [২৪] শিমোন পিতর তাঁকে ইশারা করে বললেন, 'বল, তিনি যার কথা বলছেন, সে কে?' [২৫] তাই শিষ্যটি সেভাবে বসে থেকে যিশুর বুকের দিকে মাথা কাত হয়ে তাঁকে বললেন, 'প্রভু, সে কে?' [২৬] যিশু উত্তর দিলেন, 'রুটির টুকরোটা ডুবিয়ে আমি যাকে দেব, সে-ই।' আর তখন তিনি রুটির টুকরোটা ডুবিয়ে নিয়ে তা শিমোন ইস্কারিয়োতের ছেলে যুদাকে দিলেন। [২৭] আর সেই রুটি-টুকরোর সাথে সাথেই শয়তান তাঁর অন্তরে ঢুকল। তখন যিশু তাঁকে বললেন, 'তুমি যা করতে যাচ্ছ, তা শীঘ্রই করে ফেল।' [২৮] যাঁরা ভোজে বসে ছিলেন, তাঁদের কেউই বুঝতে পারলেন না যে, তিনি কিসের জন্য এই কথা বলেছিলেন; [২৯] টাকার বাক্স যুদার কাছে থাকত বিধায় কেউ কেউ মনে করলেন, যিশু তাঁকে বলেছিলেন, 'পর্ব উপলক্ষে আমাদের যা কিছু দরকার, তা কিনে আন।' কিংবা

তাঁকে গরিবদের কিছু দিতে বলেছিলেন। [৩০] রুটির টুকরোটা গ্রহণ করে নিয়ে তিনি তখনই বেরিয়ে গেলেন—আর রাত্রি হল!

এখানে আবার একথা ওঠে যে, যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু সম্বন্ধে যিশু আগে থেকেই অবগত এবং তিনি নিজেই যে-কোন কাজের বেলায় নেতৃত্ব নেন: তিনিই বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় দেন ও তাকে চলে যেতে আজ্ঞা দেন।

১৩:১৯—তা ঘটবার আগেই আমি এখন তোমাদের বলে রাখছি: শিষ্যের বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও ঈশ্বরের প্রেরিতজন বলে যিশুর অধিকার টিকে থাকে, এমনকি ক্রুশের উপরে তাঁর মৃত্যুর পর আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে যে, যুদার কুকাজ ও দিয়াবলের আক্রমণ যিশুর উত্তোলন-গৌরবায়নের উদ্দেশেই ফল দিয়েছে। এই বচনটি ৪:২৮ পদ দ্বারা আলোকিত হয়: সেই পদে কথিত আছে যে, মানবপুত্রকে উত্তোলনের পর ইহুদীরা স্বীকার করবে যিশু সেই সত্যকার 'আমিই আছি' যিনি ঐশমর্যাদা ও গৌরব গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি। উপরন্তু, বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষেত্রে ভাবী খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রযোজ্য কথাও বর্তমান, নিজের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা অর্থাৎ পাপ আবিষ্কার করার সময়ে সে যেন বিচলিত না হয়, কেননা তার গুরু ও প্রভু যিশুও সেই পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয়েছিলেন এবং পাপের শক্তি অপেক্ষা 'আমিই আছি' অর্থাৎ ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী উপস্থিতি শক্তিশালী।

১৩:৩০—আর রাত্রি হল: এই বচনে নিহিত প্রতীকমূলক তাৎপর্য প্রত্যক্ষভাবেই ফুটে ওঠে: যুদা অন্ধকারময় জগতের একজন, যে-অন্ধকার ঈশ্বরের প্রতিকূলতা-স্বরূপ; এই 'ক্ষণেই' মানুষের মাঝে যিশুর প্রেরণকর্মের সমাপ্তি। আবার, এ সংক্ষিপ্ত বচনে যুদার অন্ধকারময় কাজ সূচিত। সত্যিই, এ বচনের পর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়; তবু, ঠিক এই অস্বস্তি ও নিরাশার অনুভূতি থেকে যিশুর পরবর্তী কথা জয়ধ্বনির মত ধ্বনিত হয়: অন্ধকারময় জগৎ তাঁর ঐশগৌরবের আলোতে উদ্ভাসিত।

যিশুর বিদায়-সংবাদ (১৩:৩১-৩৮)

বিশ্বাসঘাতকের সেই বিতাড়ন, যা যিশুর 'ক্ষণ' উপস্থিত করায়, বাহ্যিক অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও পিতা দ্বারা যিশুর জ্যোতির্ময় গৌরবপ্রকাশ নির্দেশ করে। এরপর যিশু আপন বিদায়ের কথা ঘোষণা করেন এবং একথাও পূর্বঘোষণা করেন যে, তাঁর বিদায় শিষ্যদের পক্ষে দুঃখজনক এবং তাঁদের বিশ্বাসের জন্য বিপজ্জনক হবে। এজন্যই তিনি তাঁদের প্রস্তুত করার জন্য একটি বিদায় উপদেশ প্রদান করেন (১৪–১৭ অধ্যায়)।

১৩ [৩১] তিনি চলে গেলে যিশু বললেন, 'এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হলেন, এবং ঈশ্বর তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন। [৩২] ঈশ্বর যখন তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন, তখন ঈশ্বরও নিজের মধ্যে তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন, আর তাঁকে এখনই গৌরবান্বিত করবেন। [৩৩] বৎসেরা, আমি এখন আর অল্পকালের মত তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা আমাকে খুঁজবে, আর আমি ইহুদীদের যেমন বলেছিলাম, এখন তেমনি তোমাদেরও বলছি, আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে পার না। [৩৪] এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাস। [৩৫] তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে।' [৩৬] শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' যিশু তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তুমি এখন আমার অনুসরণ করতে পার না, পরেই অনুসরণ করবে।' [৩৭] পিতর তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনাকে এখনই অনুসরণ করতে পারি না কেন? আপনার জন্য আমি তো প্রাণ দেব!' [৩৮] যিশু উত্তর দিলেন, 'তুমি কি আমার জন্য প্রাণ দেবে? আমি তোমাকে সত্যি সত্যি বলছি, তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার না করা পর্যন্ত মোরগ ডাকবে না।'

১৩:৩১—এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হলেন: 'এখন' বলে যিশু যে তাঁর প্রকৃত 'ক্ষণের' কথা (১২:২৩, ৩১; ১৩:১) ইঙ্গিত করেন এতে সন্দেহ নেই। সেই ক্ষণে তিনি এজগৎ ছেড়ে পিতার কাছে চলে যান (১৩:১); সেই ক্ষণ হল যিশুর মৃত্যু-ক্ষণ যখন

তিনি ক্রুশের উপরে উত্তোলিত হওয়ায়ই ঐশগৌরবে গৌরবান্বিত (১২:৩২)। যখন এই 'ক্ষণ' সেই গ্রীকদের আগমন থেকেও উপস্থিত হয়েছিল (১২:২০-২৪) এবং যখন এই 'ক্ষণে' তিনি প্রবিষ্ট হয়েছিলেন কম্পিত হওয়ার সময়ে (১২:২৭), তখন স্পষ্টভাবে অনুমান করতে পারি যে 'ক্ষণ' বলতে যিশুর জীবনের একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তই মাত্র বোঝায় না, বরং সেই 'ক্ষণ' সেই সমস্ত মহাঘটনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যা ক্রুশের উপরে যিশুর উত্তোলনের পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছয়। 'ক্ষণ'টা ক্রুশের উপর যিশুর মৃত্যুমুখী সকল ঘটনায় বর্তমান, কাজেই যেহেতু যুদা আপন কাজে যিশুর মৃত্যু-ঘটনা উদ্বোধন করে সেজন্য বিশ্বাসঘাতকের বিতাড়নেও সেই 'ক্ষণ' বর্তমান। বিশ্বাসঘাতক চলে যাওয়ায় যিশুর 'ক্ষণ' শুরু হয়েছে এবং যোহনের 'বিশ্বাস' দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সেই 'ক্ষণ' বাহ্যত অন্ধকারময় হয়েও প্রকৃতপক্ষে হল মানবপুত্র ও পিতার পারস্পরিক গৌরবায়নের 'ক্ষণ' : ঈশ্বর দ্বারা যিশু সেই 'ক্ষণেই' গৌরবান্বিত যে-ক্ষণে মানবপুত্র হয়ে তিনি ঈশ্বরকে উত্তমরূপে গৌরবান্বিত করেন। পুত্র এই জগতে পিতাকে গৌরবান্বিত করেছিলেন এবং এই জগতে আপন প্রেরণকর্ম সম্পন্ন করে পিতাকে 'ক্রুশ-ক্ষণেই' গৌরবান্বিত করেন যে-ক্ষণেই তাঁর নিজের জীবনের সিদ্ধিস্বরূপ; ক্রুশ-ক্ষণেই তিনি পিতাকে উত্তমরূপে গৌরবান্বিত করেন বিধায় তিনি সেই একই ক্ষণে পিতা দ্বারা গৌরবান্বিত হলেন। কিন্তু, এপ্রেক্ষিতে লক্ষ করার বিষয় এই যে, গৌরবায়ন বলতে স্বর্গলোকে তাঁর প্রাপ্য গৌরব পুনর্লাভ করা শুধু নয় বরং সকল বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ অর্থাৎ ঐশজীবন প্রদান করাই বিশেষভাবে বোঝায়। অবশ্যই, যিশুর এ সকল কথা দিব্যই একটা ঘটনা বর্ণনা করে, এই বর্তমানকালে ভাবী একটা ঘটনা উপনীত করে এবং মানবপুত্র ও ঈশ্বরের পারস্পরিক গৌরবায়ন একদিকে পৃথক দু'টো ঘটনা এবং অন্যদিকে অদ্বিতীয় একটা ঘটনা বলে দেখা দেয়: এই দিব্য ঘটনা প্রকাশ করার জন্য আমাদের মানবীয় ভাষা ও ধারণা উপযুক্ত নয়, কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যাও এই কাজে উত্তীর্ণ হবে না; তা সত্ত্বেও আমরা এই রহস্যাবৃত সত্য দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। উপসংহারস্বরূপ এই কথা গ্রহণযোগ্য; একদিকে মানবপুত্রের গৌরবায়ন ঘোষিত হয় যার মধ্য দিয়ে তিনি ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে চান, এবং অন্যদিকে প্রচারিত হয় ঈশ্বরের গৌরবায়ন যা মানবপুত্রের গৌরবায়নের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ: এখনই ঐশগৌরব মানবপুত্রের মধ্যে প্রকাশ পায়

(৩১খ); মানবপুত্রে পিতাই গৌরবান্বিত হন (৩১গ) এবং যেমন মানবপুত্র নিজেতে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করেন (৩২ক) তেমনি ঈশ্বরও নিজেতে মানবপুত্রকেই গৌরবান্বিত করবেন (৩২খ) (এপ্রসঙ্গে 'যোহনের সুসমাচারে মানবপুত্র যিশু' পরিশিষ্ট, ও 'যিশুর উত্তোলন ও গৌরবায়ন' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

১৩:৩৩—বৎসেরা, আমি এখন আর অল্পকালের মত… : যখন যিশু ইহুদীদের উদ্দেশ করে একথা বলেছিলেন তখন তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে বিবাদ করেছিল (৭:৩৫); কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস এখনও উদ্বুদ্ধ হয়নি বলে তাঁর শিষ্যেরাও তাঁর কথা উপলব্ধি করতে অক্ষম। কেবল প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মাই সর্ববিষয়ে তাঁদের শিক্ষা দেবেন (১৪:২৬)।

১৩:৩৪—এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তাঁদের বিশ্বস্ততা ও অনুসরণের প্রমাণস্বরূপ শিষ্যদের কাছে দেওয়া যিশুর পারস্পরিক ভালবাসার আজ্ঞাই সেই স্থান যেখানে শিষ্যেরা যিশুকে খুঁজে পাবেন। নিঃসন্দেহে, যিশুর একথা মণ্ডলীর কালের দিকে অগ্রসর হয় যখন তিনি দৃশ্যগতভাবে শিষ্যদের মাঝে আর থাকবেন না এবং যখন তাঁর ভক্তমণ্ডলী জগতের নির্যাতনে কেমন যেন পরাজিত হবে; সুতরাং, কীভাবে যিশুর অনুসন্ধান করব? কীভাবে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকব? একমাত্র উত্তর হল: একে অন্যকে ভালবাসলে তাঁর অনুসন্ধান করি ও তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত আছি। এখন আসুন, যিশুর দান ও একাধারে তাঁর উপস্থিতি ও সান্ত্বনার প্রমাণস্বরূপ এই ভালবাসার গুণাবলি ব্যাখ্যা করি:

ক। 'তোমাদের দিচ্ছি': ভালবাসার আজ্ঞা হল যিশুর একটি অনুগ্রহদান। যেমন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকারই একটা অনুগ্রহদান (১:১২ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) তেমনি এই আজ্ঞাও একটি অনুগ্রহদান। সুতরাং এই আজ্ঞা ভীতিপ্রদর্শনমূলক একটা আদেশ নয়, বরং পুরাতন নিয়ম অনুসারেই গ্রহণযোগ্য আজ্ঞা, কেননা পুরাতন নিয়মে এ সত্য প্রকাশিত হয়েছিল যে, ঈশ্বরের বিধান একটা জীবনদায়ক দান এবং আমাদের জীবনযাত্রায় জীবন ও আলোর পথস্বরূপ।

খ। 'আজ্ঞা' : কিন্তু, মোশির 'বিধান' এ শব্দের চেয়ে যোহনের ব্যবহৃত শব্দ দ্বিতীয় বিবরণ ঐতিহ্যে প্রচলিত 'আজ্ঞা' শব্দ অনুযায়ী, তাতে ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা-প্রকাশ ইঙ্গিত করা হত। সুতরাং ভালবাসার আজ্ঞায় ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশিত, বা অন্য কথায়, ভালবাসার আজ্ঞায় ঈশ্বরেরই স্বরূপ প্রকাশিত; উপরন্তু, যোহনের প্রথম পত্র থেকে আমরা অবগত আছি যে, 'ঈশ্বর ভালবাসা'। এই আজ্ঞায় অন্যান্য আজ্ঞাবলি এবং সবকিছু বর্তমান, এজন্যই যিশু আপন শিষ্যদের জন্য শুধু এই আজ্ঞাটি যথেষ্ট বিবেচনা করেন: এই আজ্ঞা পালনে আমরা পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিরাজমান সেই ভালবাসা জানতে ও আমাদের জীবনে তা বাস্তবায়িত করতে আহূত, যে-ভালবাসার প্রতিচ্ছবি হলেন স্বয়ং যিশু। শিষ্যদের কাছে যিশুর দেওয়া আজ্ঞা হল সেই একই আজ্ঞা যা তিনি পিতার কাছ থেকে পেয়েছেন।

গ। 'নতুন' : পুরাতন নিয়মের ভালবাসার আজ্ঞার চেয়ে (লেবীয় ১৯:১৮) যে যিশুর আজ্ঞা নতুন এমন নয়, বরং যিশুর মাধ্যমেই, তাঁর সেবাকর্ম (পাদপ্রক্ষালন দ্রষ্টব্য) এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর স্বেচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই সেই আজ্ঞার নবীনতা পরিস্ফুট (১৫:১৩; ১ যোহন ৩:১৬)। বাস্তবিকই, মানবপুত্র যিনি, তাঁর মধ্যেই ঈশ্বর নিজ অতুলনীয় ভালবাসা প্রকাশ করলেন। যিশুর আগমনে ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের মাঝে প্রকাশিত হল (১ যোহন ৪:৯), এমনকি সেই ভালবাসা বাস্তব রূপ ধারণ করল: সেই সময় থেকে অন্ধকারকে পরাজয়কারী সত্যকার আলো যেমন যিশুতে দীপ্যমান ছিল তেমনি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যেও দীপ্যমান থাকে (১ যোহন ২:৮) তারা যদি যিশুর আদর্শে ও শক্তিতে ভাইদের জন্য প্রাণোৎসর্গ করে (১ যোহন ৩:১৪-১৬)। ঈশ্বরের দেওয়া ভালবাসা জীবনের নতুন এক দিক উন্মুক্ত করে, যাতে আমরা নতুন ও অপূর্বভাবেই ভাইদের ভালবাসতে সক্ষম হই। এবিষয়ে আচার্য-শিরোমণি আগস্তিন লিখেছিলেন: 'এই ভালবাসা আমাদের নবীভূত করে, তা দ্বারা আমরা নব মানুষ, নব সন্ধির উত্তরাধিকারী ও নব গীতের গায়ক হয়ে উঠি।' সুতরাং, যোহনের প্রথম পত্র অনুসারে যিশুর নতুন আজ্ঞা নৈতিক একটা আদেশ শুধু নয় বরং প্রকৃতপক্ষে নব ধরনের জীবনধারণ যা বাস্তব জীবনে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। এ ভালবাসার

অনুপ্রেরণাদানকারী ও উৎস হল যিশুর নিজের ভালবাসা, এজন্যই এই ভালবাসা নতুন ধরনের ভালবাসা এবং তার উপর নতুন ধরনের সহভাগিতা—খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সহভাগিতা—প্রতিষ্ঠিত।

ঘ। 'আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি': যে-পরিমাণে যিশু আমাদের ভালবেসেছেন সেই পরিমাণে আমরা একে অন্যকে ভালবাসব, উল্লিখিত বচন এমন অর্থ শুধু ব্যক্ত করে না, বরং 'যেহেতু' তিনি আমাদের ভালবেসেছেন, 'সেহেতু' আমরাও একে অন্যকে ভালবাসবার শক্তি পাব।

ঙ। 'পরস্পরকে': খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা একে অন্যকে ভালবাসবে এবং অন্য সকলকে ভালবাসবে না, অবশ্যই এখানে তেমন কথা নেই। বস্তুত, তাদের ভালবাসার আদর্শ হল যিশুর ক্রুশ, কাজেই সেই ভালবাসা স্বত্বত্যাগী ও সার্বজনীন হতে হয়। বচনের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে: একে অন্যকে ভালবাসার মাধ্যমেই খ্রিষ্টমণ্ডলী জাতি-ধর্মের সীমা অতিক্রম করে সকলের কাছে জগতের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য ব্যস্ত থাকবে।

চ। 'সকলে এতেই বুঝতে পারবে': ভালবাসাই সর্বকালীন খ্রিষ্টমণ্ডলীর মুখ্য বৈশিষ্ট্য; বিদায় ভোজে উপস্থিত শিষ্যেরা হলেন সর্বযুগের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রতিনিধি যারা যুগ যুগান্তরে যে কোন স্থানে থাকুক না কেন পারস্পরিক ভালবাসার মধ্য দিয়েই জগতের কাছে সাক্ষ্যদান করবে যে পিতা যিশুকে প্রেরণ করলেন (১৭:২১…)। আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা যে কত প্রচলিত ও বিজাতীয়দের দ্বারাও যে কত প্রশংসিত ছিল, একথা সুসমাচার পুস্তকে ছাড়া সেইকালের কতিপয় লেখায়ও প্রমাণিত। বিশপ ইগ্নাসিউস লিখেছিলেন, 'তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃপ্রেমে যিশুখ্রিষ্টই সম্মানিত'। মহাচার্য তের্তুল্লিয়ানুস খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রতি বিধর্মীদের প্রশংসা উল্লেখ করে বলেন, 'ওই দেখো তারা কতখানিই না একে অন্যকে ভালবাসে!' কথিত আছে যে, তাঁর বার্ধক্যকালে সুসমাচারের রচয়িতা যোহন একথাই মাত্র পুনঃ পুনঃ প্রচার করতেন: 'বৎসগণ, একে অন্যকে ভালবাস।'

১৩:৩৬—প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? : এবারও পিতর যিশুর কথা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম হলেও তবু যিশুর প্রতি তাঁর ভক্তি ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করেন। পিতরের মত অন্যান্য শিষ্যও যিশুর যন্ত্রণাভোগের আগে তাঁর কথা বুঝতে অক্ষম ছিলেন। যিশুর উত্তরে শিষ্যেরা এবং সুসমাচারের পাঠকগণ যিশুর পথের লক্ষ্য উপলব্ধি করতে পারে: আপন অনুগামীদের জন্য যিশু এমন এক অনুসরণের কথা উপস্থাপন করেন যা তাঁর নিজের লক্ষ্য পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়, লক্ষ্যটি হল সাক্ষ্যমরণ এবং পিতার সঙ্গে যিশুর ঐক্যের সহভাগিতা। এই ধারণা ১২:২৬ পদেও ব্যক্ত হয়েছিল এবং অধিক স্পষ্টতরভাবে ব্যক্ত হবে শেষ অধ্যায়ে যখন পুনরুত্থিত যিশু নিজের অনুসরণ করার জন্য পিতরকে আহ্বান করেন ও তাঁর সাক্ষ্যমরণের কথা পূর্বঘোষণা করেন (২১:১৮…)। যে যিশুর সেবা করতে চায় (১২:২৬) তার পক্ষে নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করা, যিশুর বাণীসকল শ্রবণ করা (১৩:৩৬) এবং যেখানে যেতে অনিচ্ছুক সেখানেও নিজেকে চালিত হতে দেওয়া প্রয়োজন (২১:১৮)।

১৩:৩৭—আপনাকে এখনই অনুসরণ করতে পারি না কেন? যখন বিশ্বাস ঐশঅনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে মানবীয় গুণাবলির উপর নির্ভরশীল, তখন সেই বিশ্বাসের পতন অনিবার্য; পিতরের বেলায় তেমনটি ঘটল: তিনি আপন প্রভু ও গুরুকে তিনবার করে অস্বীকার করলেন। মণ্ডলীও নিজের উপর ও বাহ্যিক নিশ্চয়তার উপর নির্ভরশীল না হবার জন্য আহূত: পাপ সর্বদাই বিদ্যমান। যিশুর এ নিশ্চিত পূর্বঘোষণায় পিতর আর প্রতিবাদ করেন না। যিশুর এ শেষ উক্তি নিরাশাজনক ভাব সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু এই পর্যায়ে তিনি শিষ্যদের কাছে আশ্বাসজনক উপদেশ দিতে লাগলেন।

পরিশিষ্ট

যোহন অনুসারে যিশুর বিদায় ভোজ

এই পরিশিষ্টে একথার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করব যে, যোহন বিদায় ভোজ বর্ণনায় সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের বৈসাদৃশ্যে এউখারিস্তীয় রুটি সংক্রান্ত কোন কথা উল্লেখ করেন না। বলা বাহুল্য, এ পরিশিষ্টে যা যা উপস্থাপন করা হবে তা প্রকল্প বলেই শুধু গ্রহণযোগ্য।

আমরা যখন স্মরণে রাখি যে, প্রথম থেকেই আদিখ্রিষ্টমণ্ডলী 'প্রভুর ভোজ' (১ করি ১১:২০-২৬) বা 'রুটি-ছেঁড়া' (প্রেরিত এবং ১ করি ১০:১৬) অনুষ্ঠান পালন করত এবং তেমন অনুষ্ঠানটি (যার মধ্য দিয়ে যিশুর মৃত্যুকে স্মরণ করা হয়, প্রভুর উপস্থিতি জীবন্ত বলে ঘোষণা করা হয় এবং তাঁর পুনরাগমন প্রতীক্ষা করা হয়) ছিল মণ্ডলীর জীবনের কেন্দ্র ও উৎস, এমনকি হয়ে উঠেছিল মণ্ডলীর মুখ্য ধর্মানুষ্ঠান, তখন যোহনের সুসমাচারে এউখারিস্তীয় রুটি সংক্রান্ত কোনও কথা না থাকায় যে আমাদের কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে এতে সন্দেহ নেই। সমস্যাটি বড়ই; এর সমাধানে কেউ বলে এউখারিস্তিয়া সম্পর্কে যোহনের কোন চিন্তা ছিল না; অন্য কেউ বলে সুসমাচারের ৬ অধ্যায়েই (৬:৫১-৫৮) যোহনের এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্ত সম্পর্কিত শিক্ষা নিহিত; অপর কেউ এই মত সমর্থন করে যে, এউখারিস্তিয়া প্রতিষ্ঠার স্থানে পাদপ্রক্ষালনই বর্ণিত যা এউখারিস্তিয়ার গভীর সাক্রামেন্তীয় তাৎপর্য উন্মোচন করে; অবশেষে কেউ বলে যোহন সাক্রামেন্তসমূহের বিষয়ে, বিশেষত বাপ্তিস্ম ও পবিত্র সাক্রামেন্তের বিষয়েই এত জড়িত যে তাঁর লেখায় সেগুলির ইঙ্গিত একাধিক বার প্রকাশ পায়।

এ গুরু সমস্যার উপর কিছু আলোকপাত করাই নিম্নলিখিত আলোচনার উদ্দেশ্য:

১। সর্বপ্রথমে একথা উল্লেখযোগ্য যে, সদৃশ সুসমাচারত্রয়ে বর্ণিত অনেক ঘটনা (যিশুর বাপ্তিস্ম, বহু অলৌকিক কাজ প্রভৃতি) যোহনের লেখায় স্থান পায় না। এর কারণ, পাঠক অন্যান্য সুসমাচার থেকে যা যা ইতিমধ্যে জেনেছে, সেই সমস্ত জানা কথা পুনরাবৃত্তি করা বিশেষ প্রয়োজন নেই।

২। তথাপি, যা যোহন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন, তা অপরাপর সুসমাচারে বর্ণিত হয়ে থাকলেও বর্ণনা করেন (রুটির অলৌকিক কাজ, জলের উপর দিয়ে হাঁটা, যেরুশালেমে প্রবেশ প্রভৃতি)। এখানে যথাযথ একটি প্রশ্নের উদয় হল: কেন যোহন অনেক ঘটনা উল্লেখ না করে অন্য ঘটনাগুলো বর্ণনা করেন? উত্তর এ: তিনি বিশেষত সেই ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যাই এমনকি তাঁর নিজেরই ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্য চিন্তিত, যে-ব্যাখ্যা খ্রিষ্ট-তাত্ত্বিকই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চিহ্নিত।

৩। এই পর্যায়ে ৬ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। যিশুর আত্মপ্রকাশমূলক দীর্ঘ একটা উপদেশ উপস্থাপন করে যোহন রুটির অলৌকিক কাজকে এউখারিস্তীয় ভোজের নয় বরং ব্যক্তিরূপে যিশুই সংক্রান্ত চিহ্নকর্ম বলে অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করেছেন: যথার্থই সেই উপদেশ অনুযায়ী যিশু ব্যক্তি বলেই স্বর্গ থেকে নেমে আসা ও জগতের জন্য জীবনদায়ক রুটি বলে প্রকাশিত; সাক্রামেন্তীয় তাৎপর্য বর্তমান বটে, কিন্তু তেমন তাৎপর্য গৌণ। 'বিদায় ভোজ' বর্ণনা পরিপ্রেক্ষিতেও একই কথা প্রযোজ্য: বাস্তবিকই লক্ষ করলাম যে, ১৩ অধ্যায়ের প্রথম পদ পাদপ্রক্ষালনের দিকে শুধু নয়, যিশুর সমগ্র যন্ত্রণাভোগের কথার দিকেই অঙুলি নির্দেশ করে। স্বয়ং যিশুই সেই ঘটনা উদ্বোধন করেন যা তাঁর ক্ষণ অভিমুখে বিকশিত হয়: তিনিই বিশ্বাসঘাতককে শীঘ্রই কাজ শুরু করতে আদেশ করেন (১৩:২৭), পিতার কাছে তাঁর চলে যাওয়ার জন্য শিষ্যদের আনন্দ করতে বলেন (১৪:২৮), সৈন্যদের হাতে ঐশমর্যাদার সঙ্গে নিজেকে সঁপে দেন, প্রভৃতি। যোহনের মনোযোগ সম্পূর্ণরূপেই যিশু ও ক্রুশের দিকে তাঁর যাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত।

৪। কিন্তু, কেন যোহন এউখারিস্তিয়া প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বর্ণনাকেই আপনজনদের প্রতি যিশুর ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ বলে উপস্থাপন করেন না? এ প্রশ্নের উত্তরে একথাই বলা চলে যে, যোহনের ধারণায় যিশুর ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ তাঁর মৃত্যুতেই উত্তমরূপে অভিব্যক্ত যা পাদপ্রক্ষালনে নির্দেশিত। এবিষয়ে যারা বলে যে যোহন এউখারিস্তিয়া প্রতিষ্ঠার কথা জানতেন না, তাদের কথা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন; তিনি অবশ্যই জানতেন, সুতরাং, এই সিদ্ধান্ত অনুমেয় যে, তিনি পাদপ্রক্ষালন ও এউখারিস্তিয়া প্রতিষ্ঠার দিক, এ

ঘটনা দু'টো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ঘটনা বলে বিবেচনা করেন: যেমন সদৃশ সুসমাচারত্রয় অনুসারে এউখারিস্তিয়া প্রতিষ্ঠার বর্ণনাই ভোজের মাঝামাঝি উল্লিখিত এবং সেই ভোজের মুখ্য ঘটনা, তেমনি যোহনের বর্ণনা অনুসারেও পাদপ্রক্ষালনই ভোজের মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত ও সেই ভোজের কেন্দ্রস্বরূপ। তিনি এউখারিস্তিয়া প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যাই উপস্থাপন করেন, এমনকি প্রভুর ভোজ উদ্‌যাপনকারী খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্য একটা শিক্ষাই দান করলেন; সেই যিশুর অসীম ভালবাসা প্রকাশ করলেন যিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন আমরা যেন তাঁর নিজের জীবনের অংশী হই (একই ধারণা পলের লেখায় বর্তমান: 'যতবার তোমরা এই রুটি খাও ও এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা তো প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতদিন না তিনি আসেন', ১ করি ১১:২৬)। এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পাদপ্রক্ষালনটা এউখারিস্তিয়ার প্রতীক নয়, বরং যিশুর মৃত্যুরই প্রতীকমূলক তাৎপর্য গুণে তার মধ্য দিয়ে প্রভুর ভোজের অংশগ্রহণকারীরা সেই প্রভুর ভোজের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে উপকৃত। তা যদি না হয়, তবে যোহনের সুসমাচারে যে সম্পাদকমণ্ডলী 'ব্যভিচারিণী নারীর' ঘটনা উপস্থাপন করেছিল তারা অবশ্যই প্রভুর ভোজ-বর্ণনায় এউখারিস্তিয়া পতিষ্ঠানের কথাও যোগ দিত।

৫। বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত বিষয়েও যোহন অনুষ্ঠানটি বর্ণনা না করে কেবল তার অন্তর্নিহিত গভীর তাৎপর্য উদ্ঘাটন করেছিলেন (৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য); যোহনের বিবেচনায় অনুষ্ঠানটি গৌণ, তিনি ঊর্ধ্বলোক থেকে নবজন্ম অর্থাৎ পবিত্র আত্মা থেকে নবজন্মের কথাই মুখ্য মনে করেন। সুতরাং, তাঁর উদ্দেশ্য এই: খ্রিষ্টমণ্ডলী যেন পবিত্র সাক্রামেন্তগুলোর তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করে। একথা বলা চলে যে, যোহন পবিত্র সাক্রামেন্তগুলো ব্যাখ্যাই করেন: সেগুলোর অনুষ্ঠান বর্ণনা না করলেও সেগুলোর অন্তর্নিহিত সত্য ও বাস্তবতা-সকল সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, বিশ্বাস ক্ষেত্রে এটিই প্রকৃত নবীকরণ। এউখারিস্তিয়া প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে, নিঃসন্দেহে যোহন জানতেন সেটি বিদায় ভোজেই ঘটেছিল; জানতেন বলেই তিনি তার প্রকৃত ও মুখ্য তাৎপর্যই উদ্ঘাটন করতে প্রবৃত্ত হলেন, তথা: যিশুর ভালবাসার ধ্রুব ও চিরকালস্থায়ী অভিব্যক্তি, তাঁর মৃত্যুর স্মৃতিকরণ ও তাঁর জীবনে সহভাগিতা। সেইকালে যে খ্রিষ্টভক্তজন রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করত এবং সেই সাক্রামেন্ত যে কিভাবে

প্রবর্তিত হয়েছিল তাও জানত, তাদের পক্ষে সেই প্রবর্তন-বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন পুনরাবৃত্তির চেয়ে সম্ভবত যোহনের ব্যাখ্যাই উপকারী হল যার মধ্য দিয়ে তারা এউখারিস্তিয়ার অচিন্তনীয় ও অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্য বিষয়েই জ্ঞান লাভ করল।

বিদায় উপদেশ (১ম খণ্ড)

(১৪ অধ্যায়)

যোহনের সুসমাচারের দ্বিতীয় অংশের সূচনায় বিদায় উপদেশের সাধারণ ভূমিকা উপস্থাপন করা হল বলে এখন শুধু বিদায় উপদেশের প্রথম খণ্ডের কাঠামোর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করবে। উপদেশটাকে দু'-ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে: ১। যিশু পিতার কাছে যাচ্ছেন (১৪:১-১৭) এবং ২। যিশু শিষ্যদের কাছে আবার ফিরে আসবেন (১৪:১৮-৩১)।

যিশু পিতার কাছে যাচ্ছেন (১৪:১-১৭)

১৪ [১] 'তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখ, আমার
প্রতিও বিশ্বাস রাখ। [২] আমার পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে; যদি না
থাকত, তবে তোমাদের বলেই দিতাম; আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে
যাচ্ছি। [৩] আর চলে গিয়ে তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করার পর আমি আবার
আসব এবং তোমাদের নিজের কাছে নিয়ে যাব, আমি যেখানে আছি, সেখানে
তোমরাও যেন থাকতে পার। [৪] আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা তো তার পথ
জান।'
[৫] থোমাস তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন আমরা তা জানি না,
তবে কেমন করে পথটা জানতে পারি?' [৬] যিশু তাঁকে বললেন, 'আমিই সেই
পথ, সেই সত্য, সেই জীবন! পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে
আমার মধ্য দিয়ে যায়। [৭] তোমরা যদি আমাকে জানতে, তাহলে আমার
পিতাকেও জানতে। তোমরা তো তাঁকে এখন জান, দেখতেও পেয়েছ
তাঁকে।' [৮] ফিলিপ তাঁকে বললেন, 'প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন, তাতে
আমরা তুষ্ট হব।' [৯] যিশু তাঁকে বললেন, 'ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের
সঙ্গে আছি আর তুমি আমাকে জান না? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও

দেখেছে; কেমন করে তুমি বলছ, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন? [১০] তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন? আমি যে সমস্ত কথা তোমাদের বলি, নিজে থেকে তা বলি না, কিন্তু যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন। [১১] তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর: আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন; অন্তত, এই সমস্ত কাজের খাতিরেই বিশ্বাস কর।

[১২] আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, আমি যে সমস্ত কাজ করি, তা সেও করবে, এবং তার চেয়ে মহত্তর কাজও করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। [১৩] তোমরা আমার নামে যা কিছু যাচনা করবে, আমি তা পূরণ করব, পিতা যেন পুত্রেতে গৌরবান্বিত হন। [১৪] তোমরা যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচনা কর, তবে আমিই তা পূরণ করব।

[১৫] তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে। [১৬] আর আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন: [১৭] সেই সত্যময় আত্মাকেই দেবেন, জগৎ যাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখতে পায় না, জানেও না। তোমরা তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের কাছে কাছে থাকেন ও তোমাদের অন্তরে থাকবেন।'

১৪:১—ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখ: শিষ্যদের উৎসাহিত করার পর যিশু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখতে তাঁদের আহ্বান করেন; ঈশ্বরের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস অটল থাকলে তাঁরা যিশুর প্রতিও বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হবেন। ঈশ্বরে ও যিশুতে বিশ্বাস একই বিশ্বাস; যিশুতে বিশ্বাস দৃঢ় না রাখলে ঈশ্বরে বিশ্বাস টলে যাবে।

১৪:২—আমার পিতার গৃহে: যাঁর সঙ্গে শিষ্যদের একতাবদ্ধ থাকা প্রয়োজন, যিশুর সেই পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান রয়েছে। যেহেতু যিশু প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য একটা বাসস্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছেন, সেজন্য তাঁর অনুগামীরা তাঁর সঙ্গেও একতাবদ্ধ হয়ে থাকবে, কেননা তিনিই মাত্র তাঁদের সেখানে চালনা করতে পারেন। যিশুর

গন্তব্যস্থান শিষ্যদেরও একই গন্তব্যস্থান, এবং জগৎ ছেড়ে তাঁর চলে যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্যই যাতে তাঁরা সেই গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছন: গন্তব্যস্থান হল যিশুর সঙ্গে ও তাঁর মাধ্যমে পিতার সঙ্গে সংযোগ যা বিশ্বাসের মাধ্যমে ও সেই পাওয়া ঐশজীবনের মাধ্যমে ইতিমধ্যেও ভোগ করি।

১৪:৩—আমি আবার আসব: আদিখ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ যিশুর সঙ্গ পুনরায় পাবার জন্য খুবই ব্যাকুল ছিল: যিশুর গৌরবময় পুনরাগমনেই তারা আবার তাঁর সঙ্গ পাবে এবং তাদের আন্তর আশা ছিল তাঁর পুনরাগমনকাল সন্নিকট। নিঃসন্দেহে, যিশুর এই উক্তি প্রতিধ্বনিত করে যোহন আদিখ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রত্যাশার দিকে নির্দেশ করেন, কিন্তু তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিকোণ অনুসারেই তা উপস্থাপন করেন, তথা: যিশুর পুনরাগমন তাঁর পুনরুত্থানের পর পরেই ঘটেছে, সে-সময় থেকেই যিশু শিষ্যদের মধ্যে সতত বিদ্যমান, এবং তিনি যেখানে আছেন সে-সময় থেকেই শিষ্যেরাও সেখানে থাকবেন, অর্থাৎ বিশ্বাসের মাধ্যমেই তাঁরা আবার তাঁর সঙ্গ পাবেন।

১৪:৪—আমি যেখানে যাচ্ছি…: গন্তব্যস্থানটি বা যিশু ও পিতার সঙ্গে পূর্ণ সংযোগ পাবার জন্য শিষ্যেরা এর মধ্যেই যিশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকবেন, কেননা তিনিই পিতার কাছে যাবার একমাত্র পথ। যেমন ১০ অধ্যায়ে যিশু মেষঘেরির একমাত্র দরজা বলে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তেমনি এখন ‘পথ’ ধারণার মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয় যে, যিশুই একমাত্র ত্রাণকর্তা।

১৪:৬—আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন: জীবনদায়ী সত্য প্রকাশ করায় ও সত্যকার জীবন দান করায় যিশু তাদের জীবনের পূর্ণতার দিকে অর্থাৎ পিতার কাছেই সকল বিশ্বাসীকে চালনা করেন বিধায় তিনি বিশ্বাসীদের পক্ষে পথ। অতএব এই বচনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পথস্বরূপ যিশুর ভূমিকা। আরও স্পষ্টভাবে অনুবাদ করা যেতে পারে: ‘আমিই সেই পথ, অর্থাৎ সেই সত্য ও সেই জীবন’। ‘সত্য’ ও ‘জীবন’ প্রেক্ষিতে

নির্দিষ্ট দু'টো পরিশিষ্টে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে; এখানে সংক্ষেপে শুধু একথা স্মরণ করব যে, যিশুই সত্য, কেননা তিনিই পিতার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি ও পুরাতন নিয়মকালে প্রবর্তিত ঐশপ্রকাশের সিদ্ধি। সুতরাং, 'সত্য' বলতে তাত্ত্বিক একটা শিক্ষা নয় বরং ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তা যিশুকেই বোঝায়। অধিকন্তু, যিশুই জীবন, কেননা স্বভাবতই তিনি ঈশ্বরের ঐশজীবনের অংশীদার ও সেই জীবনের একমাত্র বিতরণকারী। পথ, সত্য ও জীবন বলে যিশুর এই আত্মপ্রকাশ-বচন (যার অর্থ এই পদের দ্বিতীয় অংশে অধিকতর স্পষ্টভাবে উন্মোচিত: 'পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়') হল যোহনের ঐশতাত্ত্বিক প্রধান প্রধান ধারণাগুলোর মধ্যে অন্যতম, এমনকি একথা বলা চলে যে, যিশুর এই বচন সমগ্র সুসমাচারে অনুধাবিত একটা লক্ষ্য ও যিশুর উপরে সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত যোহনের 'পরিত্রাণ' তত্ত্বের একটা সারসংগ্রহ: মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছায় অদৃশ্যমান ও বোধের অতীত ঈশ্বর যিশুতে এত দৃশ্যমান ও বোধগম্য হয়ে উঠলেন যে যিশুর প্রকাশিত সত্য বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে ও তাঁর দেওয়া জীবনের সহভাগিতা পেয়ে মানুষ নিজের অস্তিত্বের লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

১৪:৭—তোমরা যদি আমাকে জানতে…: যিশুর দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো ভাবীকালের জন্য নয়, বরং যে-সময় বিশ্বাসী তাঁকে একমাত্র ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করে সেই সময়েই সেগুলো সিদ্ধিলাভ করে। প্রতিটি মানুষের লক্ষ্য পিতার সঙ্গে সংযোগ পাওয়া ঠিকই, কিন্তু এই সংযোগ ইতিমধ্যেই প্রাপ্য যদি সম্পূর্ণরূপে সেই যিশুকে গ্রাহ্য করি যিনি সেই লক্ষ্যের উদ্দেশে একমাত্র পথ, এমনকি পিতার সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ ঐক্য গুণে, শুধু পথ নন বরং স্বয়ং লক্ষ্য। ফিলিপের পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরে যিশু আবার ঘোষণা করেন কেমন করে তাঁর মধ্য দিয়ে পিতার কাছে যাওয়া সাধ্য। বিশ্বাসের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি যে যিশু পিতার প্রেরিতজন ও তাঁর মধ্যে পিতাই কথা বলেন, কাজ করেন ও দৃষ্টিগোচর হন। ফিলিপের মত আমাদের জন্যও এ সতর্কবাণী উচ্চারিত, আমরা যেন ঈশ্বরের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগের জন্য ও অসাধারণ মরমিয়া বা দিব্য দর্শন

লাভের জন্য ব্যস্ত না হই, বরং কেবল যিশু ও তাঁর বাণীসকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি, কেননা তাঁর মধ্যেই পিতা ঈশ্বর দৃষ্টিগোচর।

১৪:১০—তুমি কি বিশ্বাস কর না যে… : বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত যে যিশু পিতাতে এবং পিতা যিশুতে, অর্থাৎ আমরা পিতার সঙ্গে যিশুর সম্পূর্ণ ঐক্য প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং, যিশুর সকল কথা তাঁর নিজের কথা নয়, বরং পিতার কাছে শোনা কথা (৮:২৬) ও পিতা দ্বারা তাঁর কাছে দেওয়া আজ্ঞা (১২:৪৯) এবং তাঁর দ্বারা সাধিত কাজ সকলও পিতারই কাজ। আমরা যদি এই ধারণা অনুসারেই যিশুর ক্রিয়াকর্ম না দেখি, তাহলে আমাদের বিশ্বাস বিলীন হবে; ঠিক এই কারণে যিশু শিষ্যদের ও তাঁর সর্বকালীন অনুগামীদের এ ধরনের বিশ্বাস পাবার জন্য অনুরোধ রাখেন।

১৪:১২—আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে… : বর্তমান ও পরবর্তী পদের কথার সূক্ষ্ম উপলব্ধির জন্য, মার্ক ১১:২৩… ও মথি ২১:১২… পদে ব্যক্ত ধারণা বিষয়ে কিছু আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়: সেই পদ দু'টোতে বলা হয়, যার বিশ্বাস আছে সে একটা পর্বত পর্যন্ত সরিয়ে দিতে পারবে এবং তার যে-কোন যাচনা পূরণ করা হবে। অলৌকিক কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীকালে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ছিল (লুক ১৭:৬; মথি ১৭:২০; মার্ক ১৬:১৭… ; প্রেরিত)। যোহনও এ বিষয়টি অবগত, কিন্তু উল্লিখিত ধারণাগুলো গ্রহণ করা সত্ত্বেও নিজের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেই সেই ধারণাগুলো উপস্থাপন করেন: যে-কাজগুলো প্রতিটি বিশ্বাসী সম্পাদন করে সেগুলো প্রকৃতপক্ষে যিশুরই কাজ; বস্তুত, পিতার কাছে চলে যাওয়ার পরও যিশুই কাজ করেন। উপরন্তু, যিশুর কাজ যেভাবে বিবেচনা করা হত, বিশ্বাসীদের কাজও ঠিক সেইভাবে বিবেচনা করা উচিত: অর্থাৎ সেগুলো 'অলৌকিক কাজ' শুধু নয় বরং 'চিহ্নকর্ম' যার উদ্দেশ্য হল সেই যিশুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা যিনি জীবনদাতা। সুতরাং, কেবল বাহ্যিক কাজ নয়, বরং এমন কাজ যা পরিত্রাণ পাবার জন্য মানুষকে সাহায্য করে। আবার, যে মহত্তর কাজ বিশ্বাসী সাধন করবে সেগুলো হল বিশ্বাসীর মধ্য দিয়ে পিতার কাছে ফিরে যাওয়া

যিশুরই সাধিত মহত্তর কাজ, তথা: মানব-জগতে ঈশ্বরের জীবন্ত শক্তির গভীরতর অনুপ্রবেশ (১৭:২), চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত সন্তানদের সম্মিলিত করা (১১:৫২) এবং জগতের অবিশ্বাসের প্রমাণ দেওয়া (১৬:৮-১১)।

১৪:১৩—আমার নামে যা কিছু যাচনা করবে… : যেমন যিশু পিতার কাজ সাধন করায়ই এই জগতে তাঁকে গৌরবান্বিত করেছেন (৫:৩৬; ১০:২৫…), তেমনি এখনও তিনি শিষ্যদের মধ্য দিয়ে সেই কাজ করে আসেন যাতে তাঁদের কাজও পিতার অনুমোদিত কাজ হয়, এবং তাতে পিতা যেন গৌরবান্বিত হন। বস্তুত, যিশুর মধ্যে ও শিষ্যদের মধ্যে পিতাই মাত্র কাজ করেন। অতএব এই পদে যিশুর যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত, তা এ: পিতার কাছে তাঁর যাওয়ার পর ও সেই যাওয়া গুণেই শিষ্যেরা পিতার সঙ্গে ও পিতার জন্য যিশুর কাজ সাধনে সহভাগিতা করবেন। বলা বাহুল্য যে, যে যে যাচনা পূরণ করা হবে, সেগুলো হল বাণীপ্রচারের দায়িত্ব এবং সেই ক্ষেত্রে বিবিধ অসুবিধা সম্পর্কিত যাচনা। আরও, যেমন যিশু পিতা দ্বারা প্রেরিত ও তাঁর সঙ্গে পূর্ণ সংযোগে সংযুক্ত বলেই পিতার নাম করতেন, তেমনি এখন বিশ্বাসীগণ যিশু দ্বারা প্রেরিত ও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একাত্মতায় আবদ্ধ বলেই তাঁর নাম করবে। বিশ্বাসীগণ যিশুর প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাস রাখে বিধায় এবং তিনি নিজে তাদের ভালবাসেন বিধায় পিতা তাদের যাচনা পূরণ করেন।

১৪:১৪—যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচনা কর: এই বচন থেকে অধিক স্পষ্টতরভাবে একথা প্রকাশ পায় যে, স্বয়ং যিশু শিষ্যদের জন্য কাজ করতে থাকেন।

১৪:১৫—তোমরা যদি আমাকে ভালবাস: পিতার কাছে যিশু শিষ্যদের জন্য যথাসাধ্য কাজ করবেন ঠিকই, কিন্তু যেন শিষ্যেরা ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার বন্ধনে তাঁর সঙ্গে আবদ্ধ থাকেন।

১৪:১৬—তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন: পবিত্র আত্মার দানই শিষ্যদের কাছে যিশুর অপ্রত্যাশিত প্রতিশ্রুতিগুলোর অন্যতম। 'অপর একজন' বলায় তিনি বুঝিয়ে দেন যে তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত তিনি নিজেই শিষ্যদের সহায়ক ছিলেন (১ যোহন ২:১-এ যিশুই প্রত্যক্ষভাবে 'সহায়ক' বলে অভিহিত): যথার্থই, তিনি মেষপালকের মত তাঁদের চড়িয়েছিলেন। প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মা চিরকালের মত শিষ্যদের সঙ্গে থেকে তাঁদের রক্ষা ও সাহায্য করবেন।

১৪:১৭—সত্যময় আত্মা: আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীকালে পবিত্র আত্মা 'সত্যময় আত্মা' বলেও পরিচিত ছিলেন; এই নামের মধ্য দিয়ে তাঁর ভূমিকার অভিব্যক্তি হয়: তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদান করেন (১ যোহন ৫:৬), পূর্ণ সত্যের মধ্যে শিষ্যদের চালনা করেন (১৬:১৩), এবং ভ্রান্তিময় আত্মা থেকে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পৃথক করেন (১ যোহন ৪:৬)। খ্রিষ্টমণ্ডলী যেন প্রতিকূল জগতে সুষ্ঠুভাবে চলাফেরা করে এবং সত্যিকারে খ্রিষ্টেরই মণ্ডলী হয়ে আপন গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় দিতে পারে সেইজন্য পবিত্র আত্মা সহায়করূপে প্রেরিত: তিনি বিশ্বাসীদের বিশ্বাস দৃঢ় করবেন তারা যেন যিশুর প্রকৃত শিষ্যরূপেই জগতের মধ্যে তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দান করে। পিতার কাছে ফিরে গিয়ে যিশু স্বর্গ থেকে শিষ্যদের কাজ ফলপ্রসূ করেন, কিন্তু সত্যময় আত্মা তাদের অনুপ্রাণিত করেন, জগতের মাঝে তাদের কাজে সহায়তা করেন এবং অবিরতই তাদের অন্তরে ঐশশক্তি সঞ্চার করেন।

এখানে পুনরায় শিষ্যদের ও জগতের মধ্যকার বিচ্ছেদ প্রকাশ পায়, জগৎ নিজের স্বভাববশত পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করতে অক্ষম, অপরদিকে শিষ্যেরা প্রত্যক্ষ 'জানা' ও নিশ্চয়তা গুণেই তাঁকে পেয়ে থাকেন বলে তাঁকে জানেন; উল্লিখিত জ্ঞান ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা ও পবিত্র আত্মা-প্রাপ্তি থেকে উদ্গত (১ যোহন ৩:২৪; ৪:১৩)। পবিত্র আত্মা 'তাদের কাছে' ও 'তাদের অন্তরে' থাকবেন, অর্থাৎ তাঁর অবিরত উপস্থিতিতে শিষ্যেরা সহায়তা, অনুপ্রেরণা ও শক্তি পেয়ে আছে। পবিত্র আত্মা সমষ্টিগতভাবে সমস্ত মণ্ডলীর কাছে ও তার মধ্যে থাকবেন বটে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কাছে ও তার অন্তরেও থাকবেন: প্রতিটি বিশ্বাসীর পক্ষে আনন্দের সাথে পবিত্র আত্মার

সঙ্গে এই ব্যক্তিময় সংযোগ বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত, শুধু এভাবেই তাঁর কাজ ও তাঁর সত্তা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব।

যিশু শিষ্যদের কাছে আবার ফিরে আসবেন (১৪:১৮-৩১)

১৪ [১৮] 'আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় রেখে যাব না; তোমাদের কাছে
আসব। [১৯] আর অল্পকাল, পরে জগৎ আমাকে আর দেখতে পাবে না, কিন্তু
তোমরা আমাকে দেখতে পাবে, কারণ আমি জীবিত আছি, তোমরাও জীবিত
থাকবে। [২০] সেদিন তোমরা জানবে যে, আমি আমার পিতাতে আছি, এবং
তোমরা আমাতে আছ আর আমি তোমাদের অন্তরে আছি। [২১] আমার আজ্ঞাগুলো
গ্রহণ করে নিয়ে যে তা পালন করে, সে-ই আমাকে ভালবাসে; আর যে আমাকে
ভালবাসে, সে হবে আমার পিতার ভালবাসার পাত্র, আমিও তাকে ভালবাসব, এবং
তার কাছে আত্মপ্রকাশ করব।'
[২২] যুদা—ইস্কারিয়োৎ নন, অন্য যুদা—তাঁকে বললেন, 'প্রভু, এ কেমনটি হয়
যে, আপনি শুধু আমাদেরই কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন, জগতের কাছে
নয়?' [২৩] যিশু তাঁকে উত্তর দিলেন, 'যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, তবে সে
আমার বাণী মেনে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার
কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান। [২৪] যে আমাকে
ভালবাসে না, সে আমার বাণী মেনে চলে না; আর এই যে বাণী তোমরা শুনছ, তা
আমার নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তা সেই পিতারই বাণী।
[২৫] এখনও তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই আমি এই সমস্ত কথা তোমাদের
বলেছি, [২৬] কিন্তু সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, আমার নামে যাঁকে পিতা
পাঠাবেন, তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন, আর আমি যা কিছু তোমাদের
বলেছি, তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন। [২৭] তোমাদের জন্য শান্তি
রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি—জগৎ যেভাবে তা দান করে
থাকে, আমি সেভাবে তা তোমাদের দান করি না। তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না
হয়, যেন ভীত না হয়। [২৮] তোমরা শুনেছ, আমি তোমাদের বলেছি, চলে যাচ্ছি,
আবার তোমাদের কাছে আসব। তোমরা যদি আমাকে ভালবাসতে, তবে পিতার

কাছে যাচ্ছি বলে তোমাদের আনন্দ হত, কেননা পিতা আমার চেয়ে মহান। [২৯] তা ঘটবার আগেই আমি এখন তোমাদের বলে দিলাম, তা যখন ঘটবে, তখন যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার। [৩০] আমি তোমাদের সঙ্গে আর বেশিক্ষণ কথা বলব না, কারণ এই জগতের অধিপতি আসছে। আমার উপর তার কোন অধিকার নেই, [৩১] কিন্তু জগৎকে এ জানতে হবে যে, আমি পিতাকে ভালবাসি, এবং পিতা আমাকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছেন, আমি সেইমত করি। তবে ওঠ, এখান থেকে চলে যাই।'

১৪:১৮—আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় রেখে যাব না: যিশুর মৃত্যু আসন্ন, কিন্তু তাঁর এই বচন থেকে অনুমান করা যায় মৃত্যু আপনজনদের সঙ্গে তাঁর একাত্মতার পক্ষে ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন বিচ্ছেদ মাত্র বলে বিবেচনাযোগ্য।

১৪:১৯—আর অল্পকাল: যে-জগৎ সর্বদা যিশুকে অগ্রাহ্য করেছে সে-ই মাত্র তাঁকে আর দেখতে পাবে না; অপরদিকে শিষ্যদের কাছে তিনি এমন এক দর্শনদানের প্রতিশ্রুত যা তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর সঙ্গে সংযোগের উপর নির্ভর করে। যেমন পবিত্র আত্মা তাঁদের সঙ্গে ও তাঁদের অন্তরে থাকবেন বলে (১৪:১৭) তাঁরা সেই সত্যময় আত্মাকে জানেন, তেমনি যিশু জীবিত আছেন ও তাঁরাও জীবিত থাকবেন বলে তাঁরা যিশুকে দেখতে পাবেন। যিশুর এই প্রতিশ্রুতি পুনরুত্থানের দিনে পূর্ণ হবে, তখনই শুধু শিষ্যেরা তাঁকে দেখবেন, যিশুর জীবিত অবস্থায়ই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, তাঁর নিজের জীবন পাবেন এবং ফলত তাঁর দর্শনও পাবেন, আর যেমন তিনি চিরকাল জীবিত থাকবেন তেমনি তাঁদের জীবনও কোন সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ হবে না। যিশুর পুনরুত্থানজনিত দর্শন ভালবাসার সংযোগে স্থাপিত চিরকালীন 'জানায়' পরিণত হবে (১৪:২০-২১)।

১৪:২০—সেদিন তোমরা জানবে যে… : যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বাসজনিত প্রকৃত ‘জানা’টা (১০:৩৮) যিশুর পুনরুত্থানের দিনে শুরু হয়, কেননা সেই দিনই সদাবর্তমান পরিত্রাণকালের সূত্রপাত ঘটে (১৬:২৩…)। বিশ্বাসের মাধ্যমে আগেও শিষ্যদের বোঝা উচিত ছিল যে যিশু পিতাতে ও পিতা যিশুতে বিরাজমান, তবুও পুনরুত্থিত যিশুর দর্শনেই তাঁরা তা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন: তখনই তাঁদের অসম্পূর্ণ বিশ্বাস বিশ্বাসজনিত পূর্ণ ‘জানায়’ রূপান্তরিত হবে এবং সেই পুনরুত্থানের মাধ্যমে সর্বকালীন বিশ্বাসীগণও পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করতে সক্ষম হবে। সুতরাং, এই নব ‘জানা’র বিষয়বস্তু হল আপন পূর্ব গৌরবে পিতার সঙ্গে যিশুর পুনঃসংযোগ এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে ও পিতার সঙ্গে শিষ্যদেরও পুনঃসংযোগ: তাঁরাও যিশু ও পিতার মধ্যকার জীবন-সংযোগের সহভাগী হবেন।

১৪:২১—আমার আজ্ঞাগুলো গ্রহণ করে নিয়ে… : পুনরুত্থানের পরবর্তীকালীন যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিষ্যদের জন্য উন্মুক্ত হবে, তা ভালবাসা-ভিত্তিক ও ভালবাসা-জনিত: সে-ই যিশুকে ভালবাসে ও পিতারও ভালবাসার পাত্র হবে যে তাঁর আজ্ঞা গ্রহণ করে নিয়ে পালন করে। যেমন পবিত্র আত্মার প্রেরণের বেলায়, তেমনি ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ পাবার জন্য অপরিহার্য শর্ত এই যে, শিষ্যেরা যিশুর বাণী ও শিক্ষা পালন করুক, অর্থাৎ শিষ্য তাঁর বাণীর প্রতি বিশ্বস্ত হওয়ায়ই যিশুর প্রতি বিশ্বাসী হোক, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার যে আহ্বান, সেই আহ্বানে ভালবাসার সঙ্গেই সাড়া দিক।

১৪:২৩—আমরা তার কাছে আসব: আন্তর অনুপ্রেরণা বা বাহ্যিক উত্তেজনা বিশ্বাসের মাপকাঠি নয়; প্রকৃত বিশ্বাসী যিশুর বাণী মেনে চলে: সে-ই পিতার ভালবাসার পাত্র হবে যে যিশুকে ভালবাসে ও তাঁর কথা সকল মেনে চলে। এরপর তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি স্বয়ং আর পিতা সেই শিষ্যের কাছে এসে তার অন্তরকে করবেন তাঁদের নিজেদের বাসস্থান। এটিই বিদায় উপদেশের প্রথম খণ্ডের শীর্ষস্থান। শিষ্যদের

কাছে আত্মপ্রকাশকারী যিশুর সঙ্গে পিতাও শিষ্যদের কাছে আসবেন; তাঁরা ঈশ্বরের জীবনের ও ভালবাসার সহভাগিতায় পরিপ্লুত হবেন। এভাবে 'পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে' প্রতিশ্রুতিও পূর্ণতা লাভ করে, এমনকি সেই প্রতিশ্রুতি কেমন যেন উল্টোভাবেই পূর্ণ হয়: শিষ্য পিতার গৃহে গিয়ে বাসস্থান পাবে এমন নয়, যিশু ও পিতা উভয়ই শিষ্যের কাছে এসে তার অন্তরকে নিজেদের বাসস্থান করবে। পুরাতন নিয়ম অনুসারে ইস্রায়েল জনগণের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি (যাত্রা ২৫:৮; ২৯:৪৫; লেবীয় ২৬:১১) যা চরমকালেই ঘটবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিল (এজে ৩৭:২৬… ; জাখা ২:১৪), সেই উপস্থিতি খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যে বর্তমানকালেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শিষ্যেরা সেখানে আছেন যেখানে যিশু আছেন (১৪:৩), অর্থাৎ তাঁরা ঈশ্বরের ভালবাসায় জীবনযাপন করেন।

১৪:২৪—যে আমাকে ভালবাসে না… : যিশুর বাণীর অমান্যকারী জগৎ পিতার প্রকাশকারী যিশুকে প্রত্যাখ্যান করে বলে যিশুর দর্শন পাবে না।

১৪:২৫—…আমি এই সমস্ত কথা তোমাদের বলেছি: শিষ্যদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষা সমাপ্ত হল, পবিত্র আত্মাই তাঁর কথাসকল তাঁদের স্মরণ করাবেন। একই বচনে এই অর্থও সূচিত যে, যিশু থাকাকালে শিষ্যেরা তাঁর কথার মর্মার্থ অনুভব করতে অক্ষম হয়েছিলেন।

১৪:২৬—পবিত্র আত্মা… সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন: শিষ্যদের বর্তমান অপূর্ণাঙ্গ অনুভব তখনই পূর্ণ হবে যখন পবিত্র আত্মাকে দান করা হবে। যেহেতু এই সংক্ষিপ্ত উপদেশে যিশু সম্পূর্ণ ও বোধগম্য রূপে নিজের বক্তব্য কথা ব্যক্ত করতে পারেননি, সেজন্য তিনি শিক্ষার অবশিষ্টাংশ জানাবার ভার পবিত্র আত্মার উপরে ন্যস্ত করেন: পবিত্র আত্মাই যিশুর ঐশপ্রকাশকর্ম বহন করে যাবেন, তবুও নতুন বা অতিরিক্ত কোন শিক্ষা যোগ করবেন না, যিশুরই শিক্ষা গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য শিক্ষা

দেবেন! যথার্থই, যিশুর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় তিনি শেখাবেন, অর্থাৎ তিনি খ্রিষ্টমণ্ডলীর কাছে যিশুর প্রচারিত শুভসংবাদ (বিশেষত যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের তাৎপর্য) নতুন, গভীর ও বাস্তবরূপে স্পষ্ট করে তুলবেন। এবিষয়ে স্মরণযোগ্য যে, নূতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত লেখাসমূহ পবিত্র আত্মার উপরোল্লিখিত ভূমিকার ফল; কিন্তু একথার অর্থ এই নয় যে, এখন তাঁর কাজ শেষ হয়েছে: তিনি এখনও ও চিরকাল ধরে ক্রিয়াশীলভাবে উপস্থিত থাকবেন বিশ্বাসীগণ যেন যিশু বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে, আর সেই শিক্ষা যেন জীবন্তই হয়।

১৪:২৭—শান্তি রেখে যাচ্ছি: আজকালের মুসলমানদের মত সেইকালের ইহুদীরা পারস্পরিক 'ছালাম' অর্থাৎ 'শান্তি' সম্ভাষণ জ্ঞাপন করত। কিন্তু যিশুর মুখে শান্তি একটা সম্ভাষণ শুধু নয়, তাঁর শান্তি বাস্তব একটা উপহার যা তিনি মাত্র দান করতে সক্ষম। আবার, সেই শান্তি হল তাঁর পুনরুত্থানের প্রতিষ্ঠিত চরম পরিত্রাণ যা পুরাতন নিয়মের নবীদের কথায় প্রতিশ্রুত হয়েছিল:

আহা, কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ
যে শুভসংবাদ প্রচার করে,
শান্তি ঘোষণা করে,
মঙ্গলের শুভসংবাদ প্রচার করে,
ঘোষণা করে পরিত্রাণ,
সিয়োনকে বলে, 'তোমার পরমেশ্বর রাজত্ব করেন। [ইশা ৫২:৭]

আমি তাদের সঙ্গে শান্তির এক সন্ধি স্থির করব,
তাদের সঙ্গে এমন সন্ধি স্থির করব যা চিরন্তন। [এজে ৩৭:২৬]

শান্তির কথা নূতন নিয়মেও বর্তমান:

ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব,
মর্তলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি! [লুক ২:১৪]

হায় তুমি [যেরুশালেম], তুমিও যদি আজকের এই দিনে,
যা শান্তিজনক তা বুঝতে পারতে। [লুক ১৯:৪২]

তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে বাণী প্রেরণ করলেন,
এবং তাদেরই কাছে যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা
এই শান্তির শুভসংবাদ বহন করা হল যে,
ইনিই সকলের প্রভু। [প্রেরিত ১০:৩৬]

যিশুর যন্ত্রণাভোগকালের জন্য শুধু নয়, যখন শিষ্যেরা জগৎ দ্বারা নির্যাতিত হবেন সেই ভাবীকালের জন্যই বিশেষত যিশু শিষ্যদের শান্তি দান করেন।

যে শান্তি তিনি তাঁদের দান করেন তা তাঁর নিজেরই শান্তি, আর যেহেতু তিনিই শান্তিদাতা সেজন্যই তিনি নির্ধারণ করেন কী ধরনের শান্তি দান করতে যাচ্ছেন: তাঁর শান্তি হল তাঁর সমস্ত জীবন, তাঁর ভালবাসা ও সেই আনন্দ যে আনন্দ শিষ্যদের ঘিরে রাখে। অপরদিকে, জগতের দেওয়া শান্তি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন জিনিস, এমনকি জগতের এমন কিছুই নেই যা শান্তি বলার যোগ্য। সুতরাং, জগৎ শান্তি দান করতে অসমর্থ। এজন্য যিশু শিষ্যদের সতর্ক থাকতে বলেন, কেননা ভবিষ্যতে তাঁরা তাঁর শান্তি নাও চিনতে পারবেন; যথার্থই যিশুর দেওয়া শান্তি তার বিপরীতে অর্থাৎ নির্যাতনেও প্রকাশ পায়। অতএব, যিশুর শান্তির পাত্র হওয়া বলতে শান্তিদাতারূপে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকা ও ক্রুশের উপরে তাঁর সঙ্গে উত্তোলিত হওয়া বোঝায়, এমনকি জগৎ দ্বারা ক্রুশের উপরে উত্তোলিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পরম বিজয়ের নিশ্চয়তা পোষণ করব, যে-নিশ্চয়তা স্বয়ং যিশুরই বিজয়ের উপর স্থাপিত: 'আমি জগৎকে জয় করেছি' (১৬:৩৩)।

১৪:২৮ক—তোমরা যদি আমাকে ভালবাসতে… : শিষ্যদের মন যেন কম্পিত না হয় এমন কথা শুধু নয়, যিশু চান পিতার কাছে তাঁর যাওয়ার জন্য তাঁরা আনন্দ করুক। এই আনন্দ যিশুর প্রতি তাঁদের ভালবাসা থেকে উদ্গত হওয়া উচিত, যে-ভালবাসা তাঁর কথা পালনে কেন্দ্রীভূত। সুতরাং, শান্তি ব্যতীত আনন্দও খ্রিষ্টমণ্ডলীর অত্যাবশ্যক একটি বৈশিষ্ট্য।

১৪:২৮খ—পিতা আমার চেয়ে মহান: এই বচনের অর্থ এই নয় যে, ঐশসত্তা বা ঐশগৌরব ক্ষেত্রে যিশু পিতার চেয়ে গৌণ। বাস্তবিকই যিশু নিজে পিতার একই জীবনের পূর্ণতা (৫:২৬), একই ঈশ্বরত্ব (১:১) ও একই ঐশগৌরব (১৭:৫) নিজের জন্য দাবি করলেন। সুতরাং বচনের অর্থ এই যে, পুত্রের চেয়ে পিতা মহান কেননা সবই যা হয় (কাজেই পুত্রকে প্রেরণ ও গৌরবায়ন) তা তাঁর কাছ থেকে উদ্গত ও তাঁর দ্বারা পরিকল্পিত ও নির্ধারিত। এই পদ যিশুর গৌরবায়নের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে, এমনকি ১৭ অধ্যায় অনুসারে বিশ্বাসী সকলের গৌরবায়নের দিকেও অঙুলি নির্দেশ করে (১৭:২): পুত্রের চেয়ে সেই মহান পিতা পুত্রকে গৌরবান্বিত করায় আপন মাহাত্ম্য প্রকটিত করেন, আর পুত্রের এই গৌরবায়ন শিষ্যদের পক্ষে হল যিশুর সমুদয় প্রতিশ্রুতির সিদ্ধিস্বরূপ: বস্তুতপক্ষে, গৌরবান্বিত হওয়ায় যিশু শিষ্যদের জন্য বাসস্থান প্রস্তুত করেন (১৪:২)। সুতরাং, শিষ্যদের আনন্দ যিশুর গৌরবের সহভাগিতায়ই পূর্ণতা লাভ করে।

১৪:২৯—তা ঘটবার আগেই আমি… : উত্তরকালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার পর যিশু পুনরায় বর্তমান অবস্থায় ফিরে আসেন এবং শিষ্যদের উৎসাহিত করেন তাঁরা যেন অগ্নি-পরীক্ষার সময় হতাশ না হয়ে বরং বিশ্বাস রাখে।

১৪:৩০—এই জগতের অধিপতি আসছে: জগৎকে অন্ধকারের মধ্যে আবদ্ধ রাখবার জন্য দিয়াবল যত সংগ্রাম করুক না কেন, যিশুর উপর তার কোন অধিকার নেই।

১৪:৩১—জগৎকে এ জানতে হবে যে… : বাহ্যিক দিক দিয়ে যিশু দিয়াবলকে কাজ করতে দেন এবং ফলত নিজেকে হত্যা করতে দেন বিধায় জগৎ পিতার প্রতি যিশুর ভালবাসা জানতে পারবে। এই ভালবাসা এতেই প্রকাশ পায় যে, যিশু সর্বদাই পিতার আজ্ঞা অনুসারে কাজ করেছেন। জগৎ যে পিতার প্রতি যিশুর ভালবাসা জানতে

পারবে একথা কিছু অদ্ভুত লাগতে পারে, অথচ এতে যোহনের ধারণা পুনরায় প্রমাণিত যে, সমগ্র জগৎ যিশুকে প্রত্যাখ্যান করেনি; স্বভাবতই জগৎ খারাপ নয়, বিশ্বাস করলে সেও পরিত্রাণ পেতে পারে।

বিদায় উপদেশ (২য় খন্ড)

(১৫:১—১৬:৪)

সুসমাচারের এই অধ্যায় পাঠ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারি না যে, যিশুর এই উপদেশ ৪ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত উপদেশের সঙ্গে অনেক দিক দিয়ে সম্পর্কযুক্ত। এজন্যই অতীতকালের শাস্ত্রবিদগণ এধারণা উত্থাপন করেছিলেন যে, এই অধ্যায়টি অন্য কথায় ৪ অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু সম্প্রতিকালে এ ধরনের ধারণা আর কোন সমর্থন পায় না, বরং সকলের মত যে ৪ অধ্যায়ের মূলকথার উপর স্থাপিত হয়েও যিশুর এই উপদেশ সম্পূর্ণরূপে নতুন ও স্বতন্ত্র একটা উপদেশ বলে বিবেচনাযোগ্য। ৪ অধ্যায়ের উপদেশে যিশু যা যা দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, এখানে তা সিদ্ধি লাভ করেছে বলে প্রমাণিত, তথা: খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ যিশুর সঙ্গে তাদের সংযোগ থেকে ফল দেখাতে ও জগতের ঘৃণা সহ্য করতে আহূত। সুতরাং, এই সিদ্ধান্ত থেকে একথা অনুমেয় যে, বিদায় উপদেশের এই দ্বিতীয় খন্ড ৪ অধ্যায়ের উপদেশকে বিস্তারিত করে ও বিদায় ভোজে উপস্থিত শিষ্যদের সময়কাল অতিক্রম করে উত্তরকালের সকল বিশ্বাসীর অবস্থা লক্ষ করে।

অধ্যায়টিকে দু' ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: সত্যকার আঙুরলতা যিশু (১৫:১-১৭) এবং জগতের নির্যাতন ও পবিত্র আত্মার সাক্ষ্যদান (১৫:১৮—১৬:৪)।

সত্যকার আঙুরলতা যিশু (১৫:১-১৭)

১৫ [১] 'আমিই সত্যকার আঙুরলতা, আর কৃষক হলেন আমার পিতা।
[২] আমার যে শাখায় ফল ধরে না, তা তিনি ফেলে দেন, আর যে সব শাখায় ফল
ধরে, সেগুলিকে তিনি পরিশুদ্ধ করেন, যেন তাতে আরও বেশি ফল ধরে।
[৩] আমি যে বাণী তোমাদের শুনিয়েছি, সেই বাণী গুণে তোমরা এর মধ্যে পরিশুদ্ধ
হয়েছ। [৪] আমি যেমন তোমাদের অন্তরে রয়েছি, তেমনি তোমরা আমাতে থাক।

আঙুরলতায় না থাকলে শাখা যেমন নিজে থেকে ফল ফলাতে পারে না, তেমনি আমাতে না থাকলে তোমরাও ফলশালী হতে পার না।
[৫] আমি হলাম আঙুরলতা, তোমরা হলে শাখা: যে আমাতে থাকে আর আমি যার অন্তরে থাকি, সে-ই প্রচুর ফলে ফলশালী হয়, কেননা আমার বাইরে [থাকলে] তোমরা কিছুই করতে পার না। [৬] কেউ যদি আমাতে না থাকে, তবে সে শাখার মত বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় আর শুকিয়ে যায়; সেই শাখাগুলি জড় করে আগুনে ফেলা হয় ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। [৭] তোমরা যদি আমাতে থাক ও আমার সমস্ত কথা তোমাদের অন্তরে থাকে, তাহলে তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা যাচনা কর, তোমাদের জন্য তা-ই করা হবে। [৮] তোমরা যদি প্রচুর ফলে ফলশালী হও এবং আমার শিষ্য রূপে দাঁড়াও, তবে আমার পিতা তাতেই গৌরবান্বিত হন। [৯] পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি; আমার ভালবাসায় স্থিতমূল থাক। [১০] যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি ও তাঁর ভালবাসায় থাকি। [১১] এই সমস্ত তোমাদের বলেছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে এবং তোমাদের সেই আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হয়।
[১২] আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি। [১৩] আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই। [১৪] আমি তোমাদের যা আজ্ঞা করি, তোমরা যদি তা পালন কর, তবেই তোমরা আমার বন্ধু। [১৫] আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ দাস নিজের প্রভু কী করেন তা জানে না; তোমাদের আমি বন্ধু বলছি, কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি। [১৬] তোমরা যে আমাকে বেছে নিয়েছ এমন নয়, আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি, তোমাদের নিযুক্তও করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে, যাতে তোমরা পিতার কাছে যা কিছু আমার নামে যাচনা কর, তিনি তা তোমাদের দেন। [১৭] আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।’

১৫:১—আমিই সত্যকার আঙুরলতা: যেমনটি আগে যিশু পিতার দেওয়া সত্যকার রুটি বলে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন (৬:৩২), তেমনি এখন গাম্ভীর্যের সঙ্গে সত্যকারই আঙুরলতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন: এমন একমাত্রই আঙুরলতা যা স্বীয় ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিতা। পিতা যে পাশচরিত্র মাত্র এমন নয়, বরং তিনি কৃষক অর্থাৎ পিতাই আঙুরলতা ফলশালী করেন এবং শিষ্যেরা প্রচুর ফলে ফলশালী হওয়ায় গৌরবান্বিত। কৃষক বলে পিতা আঙুরলতা-যিশুতে কাজ করেন আর এতে শিষ্যদের কাজও গুরুত্ব লাভ করে।

১৫:২—আমার যে শাখায় ফল ধরে না: আঙুরলতার অনন্য ভূমিকাই ফল দেওয়া, এজন্য পিতা সেটাকে যত্ন করেন। ফলবিহীন শাখা কেটে ফেলার কথা সম্ভবত খ্রিষ্টমন্ডলীর সেই সকল সভ্যকে চিহ্নিত করে যারা অবাধ্য ও কলঙ্কপূর্ণ: স্বয়ং পিতাই আঙুরলতা থেকে তাদের উচ্ছিন্ন করেন।

১৫:৩—তোমরা এর মধ্যে পরিশুদ্ধ হয়েছ: যে-শিষ্যেরা যিশুর বাণী বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন তাঁরা সেই জীবন ও আত্মায় পূর্ণ বাণী গুণে (৬:৬৩) পরিশুদ্ধ হয়ে গেছেন। সুতরাং, বাণী হলেন শুচিতা লাভের উৎস ও খ্রিষ্টীয় জীবনেরও উৎস। বিশ্বাস এমন বাহ্যিক জিনিস নয় যা একবার পেয়ে আর হারানো যায় না। বরং খ্রিষ্টবিশ্বাসীর পক্ষে নিরন্তর সচেষ্ট থাকা উচিত সে যেন বাণীর দাবিতে বিশ্বস্তভাবে সাড়া দেয় ও সেই বাণীকে অন্তরে সতত-বিকাশকারী নবজন্ম ও জীবনের বীজ বলে গ্রহণ করে। বস্তুত, ঐশবাণী এমন যথার্থই ক্রিয়াশীল শক্তি যা অবিরতই মানুষকে পরিশুদ্ধ করে ও নবমানুষরূপে সৃষ্টি করে।

১৫:৪—আমাতে থাক: আঙুরলতার ভূমিকাই ফল দেওয়া ঠিকই, কিন্তু শিষ্যেরা কেবল নিজেদের উপরেই নির্ভর করলে তবে ফলশালী হতে পারবেন না; শুধু যিশুতে থাকলেই তাঁরা ফলশালী হবেন। নিঃসন্দেহে, একথা ভাবীকালের শিষ্যদের জন্য ঘোষিত

তারা যেন তাদের ফলদায়ী কাজের মূলকারণ সম্বন্ধে সদা সচেতন থাকে: যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকাই একান্ত প্রয়োজন (৮:৩১)। যিশুর সঙ্গে সংযোগটা ইন্দ্রিয়গোচর নয় বলে বোধের অতীত বটে, অথচ বিশ্বাসের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবই সংযোগ (এপ্রসঙ্গে ৬:৫৬ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এখানে যোহনের প্রথম পত্রের ধারণা প্রতিধ্বনিত: খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাস অটুট করার জন্য ও নৈতিক দায়িত্বসমূহ পালনে তাদের উৎসাহিত করার জন্য একথাই উপযুক্ত কথা বলে তাদের স্মরণ করানো উচিত, তথা: যিশুর সঙ্গে তাদের পাওয়া সংযোগ ও সেই সংযোগ থেকে উদ্গত দায়িত্বসমূহ।

এই পদে কোন্ কোন্ ফলের কথা বলা হয়? প্রকৃত ফলগুলো হল যিশুর সংযোগে যাপিত জীবনের ফলগুলো, বিশেষভাবে বিশ্বাস ও ভালবাসার ফল। কিন্তু, বাণীপ্রচারমূলক একটা দিকও এখানে বর্তমান, তথা: শিষ্যেরা নতুন নতুন মানুষকে খ্রিষ্টবিশ্বাসী করে তোলার জন্য সর্বদা চেষ্টা করবে, এতে 'গমের দানা' রূপেই যেন যিশুর মৃত্যু ফলপ্রদ হয়। তথাপি, যেমন বলা হয়েছে, ফলের কথা মণ্ডলীতে যিশুর পরিত্রাণকারী ও জীবনদায়ী শক্তি বিকাশকে লক্ষ করে যা বিশেষত ভালবাসার ফলেই ফলশালী।

১৫:৫—আমি হলাম আঙুরলতা: মরমিয়া বা দিব্য দর্শনলাভের জন্য নয়, ফলশালী হবার জন্যই শিষ্যেরা আহূত; যিশুর সঙ্গে শিষ্যদের সংযোগটা ক্রিয়াশীল; সংযোগের উদ্দেশ্যই যাতে শিষ্যেরা ফলশালী হন: যিশুকে ছাড়া তাঁরা কিছুই করতে পারবেন না; সে-ই শুধু নিজের খ্রিষ্টীয় জীবনের ফল দেখাতে সক্ষম, যে যিশুর সংযোগেই জীবন যাপন করে।

১৫:৬—কেউ যদি আমাতে না থাকে… : এটিই শিষ্যের বিচার-বর্ণনা যখন শিষ্য যিশু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। কী করে যিশু থেকে শিষ্যের বিচ্ছেদ ঘটে? তা ঘটে বিশ্বাস-ত্যাগ ও 'মৃত্যুজনক পাপ' সাধনের মাধ্যমে (১ যোহন ৫:১৬)। আদিখ্রিষ্টমণ্ডলী

অনুসারে পাপের দণ্ড ছিল নরকের আগুন (মথি ১৩:৪০-৪২); অপর দিকে যোহনের দৃষ্টিভঙ্গিতে যিশু ও ঈশ্বর থেকে বিচ্ছেদই হল পাপের মারাত্মক দণ্ড।

১৫:৭—তোমরা যদি আমাতে থাক… : যারা যিশুর বাণী গ্রহণ করে অর্থাৎ যিশুকে ঈশ্বরের প্রেরিতজনরূপে গ্রহণ করে এবং তাঁর বাণী মেনে চলে, তাদের যাচনা পূরণ করা হবে কেননা যিশুর সঙ্গে তাদের সংযোগ গুণে তারা এমন কিছুই মাত্র যাচনা করবে যা যিশুর কাজ ফলশালী করার জন্যই সম্পর্কিত। যিশুর সংযোগে থাকায়ই তারা সেই দান পায় যা দ্বারা জানতে পারবে কী কী যাচনা করা উচিত (১ যোহন ৫:১৪…)।

১৫:৮—আমার পিতা তাতেই গৌরবান্বিত হন: যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত শিষ্যদের ফলের জন্যই পিতা গৌরবান্বিত, অর্থাৎ শিষ্যদের ফলের মাধ্যমেই তিনি সত্যিকারে সমাদৃত, কেননা কৃষক হয়ে তিনি আঙুরলতার প্রচুর ফল দেখতে উৎসুক। পিতা ও শিষ্যদের কাজ একই ফলসংগ্রহেই সিদ্ধি লাভ করে এবং আঙুরলতা-যিশুই সেই একমাত্র স্থান যাতে থেকে ও যার মাধ্যমে ফলসংগ্রহ-কাজ সম্ভব হতে পারে। শিষ্যেরা যেন প্রচুর ফল দেখাতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে পিতা যথাসাধ্য কাজ করেন (১৫:২) এবং ফলসংগ্রহ যাতে আরও প্রচুর হয় সেজন্য তিনি শিষ্যদের যাচনা পূরণ করেন (১৫:৭)। পুত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হল পিতাকে গৌরবান্বিত করা, আর এই মর্মে পিতার কাছে চলে যাওয়ার পর তিনি শিষ্যদের মধ্য দিয়ে কাজ করেন।

এই পদে যিশুর শিষ্যত্ব বিষয়েও স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। এ দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে ৮:৩১, ৯:২৭… ও ১৩:৩৫-এ বর্তমান: যিশুর প্রকৃত শিষ্য হতে হলে তাঁর বাণীতে থাকা আবশ্যক আর পারস্পরিক ভালবাসার আজ্ঞা পালন করা প্রয়োজন। এ বৈশিষ্ট্য দু'টো ছাড়া এখানে নতুন একটা শর্ত উত্থাপিত হয়: ফলশালী হওয়াতেই, সর্বাপেক্ষা ভালবাসার ফল দেখাতেই আমরা যিশুর প্রকৃত শিষ্যের পরিচয় দিতে পারি।

অবশেষে একথাও লক্ষণীয় যে, সুসমাচার প্রারম্ভে (১:৩৯) যিশুর শিষ্য হতে হলে 'তাঁর কাছে' থাকা যথেষ্ট; কিন্তু এখানে অর্থাৎ সুসমাচার শেষেই যিশু চান তাঁর শিষ্যেরা

যিশুতেই থাকুক। বাহ্যিক সাহচর্য থেকে শিষ্য যিশুর সঙ্গে ঐক্যের উদ্দেশে চালিত হয়: যিশুর সঙ্গে ঐক্যলাভই শিষ্যদের লক্ষ্য।

১৫:৯—পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন: শিষ্য হবার জন্য আমাদের যিশুর ভালবাসায় স্থিতমূল থাকা দরকার। শিষ্যদের মনোনীত ও সংগৃহীত করায় যিশু পিতার সেই ভালবাসা দান করেন যে ভালবাসা তাঁকে ঘিরে রাখে এবং তাঁর কাজ সাধনের জন্য প্রেরণাস্বরূপ। কিন্তু, এক্ষেত্রে নতুন একটা সতর্ক বাণীর উদয় হয়: 'আমার ভালবাসায় স্থিতমূল থাক এবং তোমরা যে আমার শিষ্য তার প্রমাণ দাও'। যিশুর শিষ্যত্বের ফল হল যিশুর ভালবাসার একটা দান যা পারস্পরিক ভালবাসায় প্রকাশ পায় এবং এমন ভালবাসা যা যিশুর মৃত্যুতে আদর্শ ও প্রমাণ লাভ করে।

১৫:১০—যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর…: যিশুকে ভালবাসেন বলেই শিষ্যেরা তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করার জন্য নিজেদের বাধ্য মনে করে। এজন্য একথা বলা চলে যে, খ্রিষ্টীয় আদর্শ অনুসারে জীবনযাপনের একমাত্র শর্ত হল যিশুতে স্থিতমূল থাকা। সুতরাং, যিশুর আজ্ঞাগুলো আমাদের ভালবাসার পরীক্ষা বলে নয়, বরং আমাদের প্রতি ঈশ্বর ও যিশুর ভালবাসার আন্তর অনুভব বা জীবন্ত অভিজ্ঞতা বলে বিবেচনাযোগ্য।

১৫:১১—এই সমস্ত তোমাদের বলেছি…: যিশুর সঙ্গে সংযোগ থেকেই আনন্দের আবির্ভাব। এই আনন্দ হল পুনরুত্থানকালের আনন্দ যা আমাদের অন্তরে পুনরুত্থিত যিশুর চিরকালীন উপস্থিতির উপর প্রতিষ্ঠিত ও পুরাতন নিয়মকালে ঘোষিত ভাববাণীর পূর্ণতা:

> সেদিন সকলে বলবে,
> 'দেখ, ইনিই আমাদের পরমেশ্বর; …
> এসো, তাঁর পরিত্রাণের জন্য উল্লাস করি, আনন্দ করি! [ইশা ২৫:৯]

সানন্দে চিৎকার কর, সিয়োন কন্যা!
জয়ধ্বনি তোল, ইস্রায়েল!
আনন্দ কর, সমস্ত হৃদয় দিয়ে উল্লাস কর, যেরুশালেম কন্যা! [জেফা ৩:১৪]

সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ;
সানন্দে চিৎকার কর, যেরুশালেম কন্যা।
এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন। [জাখা ৯:৯]

আগে বাপ্তিস্মদাতা যোহনও এই আনন্দের কথা ঘোষণা করেছিলেন (৩:২৯) এবং পরবর্তী অধ্যায়ের উপদেশেও আনন্দই প্রধান বিষয়। এই আনন্দ যিশুর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত আছে ('আমার' আনন্দ), এবং শিষ্যদের উপর বর্ষিত হবে। পলের মত (গা ৫:২২; রো ১৪:১৭) যোহন অনুসারেও আনন্দ হল মণ্ডলী ও প্রতিটি বিশ্বাসীর অন্তরে যিশু ও পবিত্র আত্মার উপস্থিতির ফল। কিন্তু যোহন জোর দিয়ে একথা উল্লেখ করেন যে, এই আনন্দকে 'পরিপূর্ণ' হতে হয়: শিষ্যদের কাছে যিশুর দেওয়া আনন্দের এমন পরিপূর্ণতা লাভ করার কথা যা চরম পরিত্রাণের পূর্ণতার মত, অর্থাৎ এই আনন্দ অনন্ত অবিনশ্বর অক্ষয় স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ (১৬:২২)।

১৫:১২—আমার আজ্ঞা এ: শিষ্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য প্রেক্ষিতে যিশুর কথা অধিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে: তাঁর ভালবাসায় স্থিতমূল থাকতে হলে তারা একে অন্যকে ভালবাসবে। এই ভালবাসায় যিশুর সকল আজ্ঞা কেন্দ্রীভূত ও প্রমাণিত; এই ভালবাসাই প্রকৃত শিষ্যের চিহ্ন। শিষ্যদের পারস্পরিক ভালবাসার ভিত্তি ও আদর্শ হল মৃত্যু পর্যন্তই যিশুরই ভালবাসা।

১৫:১৩—আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: যিশুর ভালবাসা যে শুধু বন্ধুর ভালবাসার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে পরিকল্পিত তা নয়, বরং যিশুর প্রাণোৎসর্গই শিষ্যদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ, তারাও যেন সেই অনুসারে ব্যবহার করে। পুরাতন নিয়মেও বন্ধুত্ব প্রসঙ্গ উপস্থিত (১ শামু ১৮:১-৩; সিরা ৬:১৫-১৭; ইশা ৪১:৮ প্রভৃতি), কিন্তু আপন

বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণোৎসর্গের কথা উল্লেখের মাধ্যমে যোহনের ভালবাসার কথা পুরাতন নিয়মের পটভূমিকা অতিক্রম করে।

১৫:১৪—তোমরা আমার বন্ধু : যিশুর বন্ধু বলেই শিষ্যদের পারস্পরিক ভালবাসার আজ্ঞা পালন করা আবশ্যক ; তখনই আমরা তাঁর শিষ্য যখন তাঁর কথামত কাজ করি।

১৫:১৫—তোমাদের আর দাস বলছি না : যিশুর বন্ধু হওয়াই হল তাঁর দান ; বস্তুত মানুষ হিসাবে আমরা ঈশ্বরের সামনে দাস মাত্র। কিন্তু শিষ্যেরা বন্ধু ; বাস্তবিকই, যিশু পিতার কাছে যা শুনেছেন তাঁদের সেই সবকিছুই জানিয়েছেন, পিতার নাম অর্থাৎ পিতার স্বরূপ পর্যন্তই তাঁদের প্রকাশ করেছেন এবং এতেই ঈশ্বরের ভালবাসা তাঁদের দান করেছেন যে, তাঁরা পিতার ঘনিষ্ঠতায় স্থান পেয়েছেন। পুরাতন নিয়মকালে শুধু কয়েকজন মহাপুরুষই ঈশ্বরের বন্ধুত্বলাভে উন্নীত হয়েছিলেন ; এখন যিশু তাঁর এই নিজের অধিকার তাঁর সকল অনুগামীদের দান করেন।

১৫:১৬—তোমরা যে আমাকে বেছে নিয়েছ এমন নয় : যেমন যিশুর বন্ধুত্ব তেমনি যিশুর মনোনয়নও ('বেছে নেওয়া') তাঁরই দান। কিন্তু একথা লক্ষণীয় যে, সেই বন্ধুত্ব ও মনোনয়নে বিরাট একটা দায়িত্ব বিদ্যমান : 'তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ'। সাধারণত এই বচনে বাণীপ্রচার-সম্প্রসারণমূলক অর্থ আরোপ করা হয় ; কিন্তু যিশুর কথার প্রকৃত তাৎপর্য খুবই বিস্তারিত : যিশুর দেওয়া দায়িত্ব ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রিয়াকর্ম-সকলের দিকে চড়িয়ে পড়ে : সমগ্র খ্রিষ্টীয় জীবন পারস্পরিক ভালবাসায়ই বিশেষত ফলবান হওয়া চাই। ফলগুলোর যে থাকবার কথা তা যিশুর এই আদেশের উপর নির্ভর করে, 'আমাতে ও আমার ভালবাসায় স্থিতমূল থাক'। শিষ্যদের কাজের ফল বলতে ধর্মান্তরিত মানুষ এমন নয়, বরং মানুষে অবস্থিত ঐশ জীবন ও ভালবাসা বোঝায় (১ যোহন ৩:১৪ ··· ; ৪:১৬)। উপরন্তু, শিষ্যদের কাজের সফলতা একথার উপরও অবলম্বন করে যে, পিতা তাঁদের যাচনা পূরণ করেন। যেমন

বারবার বলা হয়েছে, যিশুতে ও তাঁর বাণীতে স্থিতমূল থাকাই শিষ্যদের কাজের সফলতার একমাত্র শর্ত: কেবল তাঁর সঙ্গে জীবন্ত সংযোগে যুক্ত থাকলে তবেই পিতা যিশুর নামে উচ্চারিত আমাদের যাচনা পূরণ করবেন।

১৫:১৭—তোমাদের এই আজ্ঞা দিচ্ছি: যিশুর একমাত্র আজ্ঞার পুনরাবৃত্তি আজ্ঞাটির গুরুত্ব আরও স্পষ্ট করে তুলে উপদেশের এই অংশ সমাপ্ত করে।

উপসংহারস্বরূপ বলতে পারি যে এক্ষেত্রে যোহনের মর্মকথা দু'টো: ১। যিশুর বাণীর প্রতি বাধ্যতা ও আমাদের কাজের সফলতার মধ্যে একটা সম্পর্ক বিদ্যমান: তারাই শুধু ফলশালী যারা যিশুতে স্থিতমূল থাকে। ২। ঈশ্বর আমাদের একটা ফলই বিশেষভাবে দেখতে চান, সেটা হল ভালবাসা। কথা দু'টো পুরাতন নিয়মের ঐতিহ্যে স্থাপিত:

> যদি তোমরা আমার বিধিপথে চল,
> আমার আজ্ঞাগুলি মেনে চল ও সেই সমস্ত পালন কর,
> তবে আমি ঠিক সময়ে তোমাদের বৃষ্টি দান করব,
> ভূমি ফসল উৎপন্ন করবে। [লেবীয় ২৬:৩-৪]

> তোমরা এই সকল নিয়মনীতি শোন,
> এই সমস্ত কিছু মেনে চল ও পালন কর,
> তবেই… তিনি তোমাকে ভালবাসবেন, আশীর্বাদ করবেন,
> … তোমার গর্ভের ফল, তোমার ভূমির ফল, …
> এই সকলকেই আশিসমণ্ডিত করবেন। [দ্বিঃবিঃ ৭:১২-১৪]

কিন্তু বাধ্যতা ও সফলতার মধ্যকার সম্পর্ক বাহ্যিক নয় বরং আন্তরিক সম্পর্ক। দ্বিতীয় বিবরণই বিশেষত গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে যে ঐশবিধান হল জীবনের পথ: এক দিকে ঐশবিধান পালনে এমন পরিবেশের সৃষ্টি হয় যাতে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয় অর্থাৎ ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী ক্ষমতা বাস্তব রূপে রূপায়িত, এবং অপর দিকে বিধান পালনে মানুষ তাঁর আহ্বান সূক্ষ্মরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। নবী ইশাইয়া

অনুসারে (যিনি উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গির শ্রেষ্ঠ প্রকাশকারী) তাঁর আঙুরখেত থেকে ঈশ্বর যে ফলের প্রত্যাশা করেন তা হল মানুষের মাঝে ন্যায্যতা :

তিনি ন্যায় প্রত্যাশা করছিলেন,
কিন্তু দেখ, অন্যায় !
তিনি ধর্মময়তা প্রত্যাশা করছিলেন,
কিন্তু দেখ, অত্যাচারিতেরচিৎকার !
ধিক্ তোমাদের,
যারা ঘরের সঙ্গে ঘর যোগ কর… । [ইশা ৫:৭-৮]

সুতরাং, এই সিদ্ধান্ত অনুমেয় যে, যোহনের উল্লিখিত কথা দু'টোই বাইবেল-ঐতিহ্য অনুযায়ী কথা ; তবু একটা নবীনত্বও রয়েছে, সেটা এই যে, তিনি ভালবাসা ধারণাটি অতিশয় গভীর ও স্বকীয় ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পরিশিষ্ট

আঙুরলতা

যোহনের অন্যান্য বিশিষ্ট ধারণা ক্ষেত্রেও সেইকালে প্রচলিত সদৃশ ধারণাসমূহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের ঐতিহ্যে আঙুরলতা-ধারণা বিশেষভাবে বর্তমান, এমনকি একথা বলতে পারি যে এপ্রসঙ্গে যোহনের ধারণা সেই ঐতিহ্যের উপরেই সর্বাপেক্ষা নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ নবী ইশাইয়ার পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত 'আঙুরলতা বিষয়ক গান' বলে পরিচিত একটা অংশ উল্লেখ না করে পারি না :

আমার সখার উদ্দেশে আমি একটা গান গাইব,
তার আঙুরখেতের প্রেমগান।
আমার সখার ছিল একটা আঙুরখেত,
উর্বরতম এক উপপর্বতের উপর।

সে তার চারপাশ কোদাল দিয়ে কোপাল,
তার যত পাথর তুলে ফেলল,
সেখানে পুঁতল সেরা আঙুরগাছ;
তার মাঝখানে একটা উচ্চ ঘর গেঁথে তুলল,
মাড়াইকুন্ডও খুঁড়ে নিল।
সে প্রত্যাশা করছিল, লতায় ফল ধরবে,
কিন্তু ধরল বুনো আঙুর।
তাই এখন, যেরুশালেম-অধিবাসীরা ও যুদার মানুষ, বিনয় করি,
আমার ও আমার আঙুরখেতের মধ্যে তোমরাই বিচার কর।
আমার আঙুরখেতে আমার পক্ষে আর এমন কী করার ছিল,
যা আমি করিনি?
আমি যখন প্রত্যাশা করছিলাম, আঙুরফল ধরবে,
তখন কেন তাতে ধরল বুনো আঙুর?
এখন শোন, আমার আঙুরখেতের প্রতি যা করতে যাচ্ছি,
তা তোমাদের জানিয়ে দেব:
আমি তার বেড়া উঠিয়ে দেব
যাতে খেতটা চারণমাঠ হয়ে যায়;
তার প্রাচীর ভেঙে ফেলব
যাতে খেতটা পদদলিত হয়।
আমি তা মরুভূমি করব,
তার লতা ছাঁটা হবে না,
খেত কোদাল দিয়ে কোপানো হবে না,
সেখানে গজিয়ে উঠবে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ;
মেঘপুঞ্জকে আজ্ঞা দেব,
যেন তার উপর বৃষ্টির জল আর বর্ষণ না করে।
আচ্ছা, ইস্রায়েলকুলই সেনাবাহিনীর প্রভুর আঙুরখেত…। [ইশা ৫:১-৭]

নবী ইশাইয়া আঙুরখেতের দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জনগণের ইতিহাস মূল্যায়ন করেন: ঈশ্বর ইস্রায়েল জনগণকে অতিগভীর ভালবাসায় ভালবেসেছেন, অথচ ইস্রায়েল সেই ভালবাসায় উপযুক্ত সাড়া দিতে অক্ষম হয়েছে। নবী হোশেয়াও (১০:১) ইস্রায়েলকে উৎকৃষ্ট ও ফলবতী আঙুরলতা বলে বর্ণনা করেন, অথচ ইস্রায়েল ঈশ্বরের ভালবাসা উপেক্ষা করেছে, কিন্তু ঈশ্বরের ধৈর্যের একটা সীমা আছে, তিনি ইস্রায়েলের বিচার করবেন:

অথচ আমি
একেবারে উৎকৃষ্ট জাতের সেরা আঙুরলতা করেই তোমাকে পুঁতেছিলাম;
তুমি কেমন করে জারজ আঙুরলতার শাখায়
রূপান্তরিত হয়েছ? [যেরে ২:২১]

নবী এজেকিয়েলও ইস্রায়েলকে ফলহীন আঙুরলতারূপে বর্ণিত করে একথা উল্লেখ করেন যে, ফলহীন শাখা আগুনে পুড়িয়ে ফেলা ছাড়া আর অন্য কাজে লাগে না:

অন্য সকল গাছের চেয়ে আঙুরলতার গাছ,
বনের গাছপালার মধ্যে আঙুরলতার শাখা, কিসে শ্রেষ্ঠ?
কোন কিছু তৈরি করার জন্য কি তা থেকে কাঠ নেওয়া যায়?
কিংবা কোন পাত্র ঝুলাবার জন্য কি তাতে ডাণ্ডা তৈরী হয়?
দেখ, তা ইন্ধন হিসাবে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। [এজে ১৫:২-৪]

তোমার মাতা ছিল
জলাশয়ের ধারে রোপিতা একটা আঙুরলতার সদৃশ।
জলের প্রাচুর্যের ফলে
সে ফলবতী ও শাখায় পূর্ণা হল; ···
কিন্তু তাকে রোষে উৎপাটন করা হল,
তাকে ভূমিসাৎ করা হল;
পুববাতাস তাকে শুষ্ক করল,
তাকে ফল-বঞ্চিতা করল;

তার সেই দৃঢ় শাখাপ্রশাখা শুকিয়ে গেল,
আর আগুন তাকে গ্রাস করল। [এজে ১৯:১০…]

সুতরাং, পুরাতন নিয়মের ঐতিহ্য অনুসারে আঙুরলতার কথা ঈশ্বরের স্বীয় জনগণ ইস্রায়েলের দিকে নির্দেশ করে। একদিকে আছে ঈশ্বরের প্রেমপূর্ণ যত্ন এবং অপরদিকে আছে ইস্রায়েলের অবিরত ফলহীনতা; ঈশ্বর উৎকৃষ্ট ফলের অপেক্ষা করেন, কিন্তু বুনো ফল পেয়ে অবিশ্বস্ত জনগণের বিচার করেন। তথাপি, ইস্রায়েল জনগণের অসীম ফলহীনতা সত্ত্বেও আশাপূর্ণ, বিনীত ও মর্মস্পর্শী একটা আর্তনাদই এবিষয়ে পুরাতন নিয়মের পরিণতি। ঈশ্বরের যত্ন ও ইস্রায়েল জনগণের পাপজনিত শাস্তি উল্লেখ করে ৮০ নং সামসঙ্গীত অবশেষে বলে:

হে সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, ফিরে এসো,
স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ,
এ আঙুরলতার কাছে আবার এসো।
তোমার ডান হাত যা পুঁতেছে একদিন,
সেই চারাগাছ যত্ন করে পুনঃসংস্কার কর,
থাকুক তোমার ডান হাত সেই মানবপুত্রের উপর
যাকে নিজের জন্যই করেছ শক্তিশালী।

যোহন পুরাতন নিয়মের উপরোল্লিখিত ঐতিহ্য সর্বাপেক্ষা অনুসরণ করেন একথা সন্দেহের অতীত; কিন্তু তিনি পুরাতন নিয়মের ধারণা নতুন দৃষ্টিকোণ অনুসারেই অনুধাবন করেন। ঈশ্বরই কৃষক ও আঙুরলতার ভূমিকাও ফলশালী হওয়া ঠিকই, কিন্তু আঙুরলতা এখন আর ইস্রায়েল জনগণ নয় বরং স্বয়ং যিশুই। ইস্রায়েল থেকে যিশুর উপর আঙুরলতার দৃষ্টান্ত স্থানান্তরের জন্য সম্ভবত যোহন নবী এজেকিয়েলের একটা ভাববাণীর উপর নির্ভর করলেন; সেই ভাববাণী অনুসারে ইস্রায়েল জনগণ নয়, জনগণের প্রতিনিধিরূপে ইস্রায়েলের রাজাই আঙুরলতা (এজে ১৭:৬-৮)।

ঐশতাত্ত্বিক পটভূমিকা

আঙুরলতা-ধারণা ছাড়া যোহনের সুসমাচার পুরাতন নিয়মের ঐতিহ্যের অন্যান্য ধারণাও ব্যবহার করেন, এমনকি তিনি প্রচার করেন যে সেই সকল ধারণার পূর্ণতা হলেন যিশু (এবিষয়ে স্মরণযোগ্য 'মেষশাবক', 'প্রান্তরের সেই সাপ', 'স্বর্গীয় রুটি', 'জীবন্ত জলের ঝরনা', 'উত্তম মেষপালক' প্রভৃতি ধারণা)। যখন যিশুই 'ইস্রায়েলের সত্যকার রাজা' (১:৪৯; ১২:১৩), তখন তিনিই প্রকৃত ইস্রায়েল জাতির প্রতিনিধি। এতে ইহুদী ধর্মের সঙ্গে আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর বাকবিতণ্ডাও প্রকাশ পায়, ইহুদীরা যিশুকে আপন ত্রাণকর্তা ও রাজা রূপে অস্বীকার করেছিল বলে (১৯:১৪)। এবিষয়ে সদৃশ সুসমাচারত্রয়েও যথেষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান যেগুলো প্রকৃত ইস্রায়েল বলে খ্রিষ্টমণ্ডলীকে লক্ষ করে (মার্ক ১২:১-২২; মথি ২১:৩৩-৪৬; লুক ১৩:৬-৯; ২০:৯-১৯)। এক্ষেত্রে যোহনের স্বীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি যিশুর উপরেই সমগ্র ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন: যেমন মণ্ডলী নয় বরং যিশুই অনন্য ও প্রকৃত মন্দির (২:২১), তেমনি এখনও মণ্ডলী নয় বরং যিশুই নতুন ও প্রকৃত ইস্রায়েল জাতি।

আগেও লক্ষ করে দেখেছিলাম যে যোহনের সুসমাচারে পুরাতন নিয়মের প্রজ্ঞাধর্মী পুস্তকগুলো যথেষ্ট স্থান অধিকার করে; এক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য, যথার্থই বেন-সিরা পুস্তক ঐশপ্রজ্ঞাকে আঙুরলতার সঙ্গে তুলনা করে:

> আমি একটা আঙুরলতার মত, যা উৎপন্ন করে মনোহর অঙ্কুর,
> আর আমার ফুল, তা তো গৌরব ও ঐশ্বর্যের ফুল।
> আমার আকাঙ্ক্ষী সকল, আমার কাছে এগিয়ে এসো,
> আমার উৎপাদিত ফলগুলিতে পরিতৃপ্ত হও। [সিরা ২৪:১৭ …]

একথা স্বীকার্য যে, বেন-সিরার বর্ণনার সঙ্গে যোহনের সুসমাচারের যথেষ্ট মিল রয়েছে।

আঙুরলতা-উপদেশের মূল্যায়ন

উপরোল্লিখিত ৮০ নং সামসঙ্গীতের আর্তনাদ অপ্রত্যাশিতভাবে সাড়া পেয়েছে: নব ইস্রায়েল জাতিরূপে, এমনকি ইস্রায়েল জাতির রাজারূপে স্বয়ং যিশু হলেন আঙুরলতা এবং তাই বলে আঙুরলতা এখন থেকে উৎকৃষ্ট ফলে ফলবতী: এখন থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও ইস্রায়েলের নির্বোধ সাড়ার মধ্যে সেই ব্যবধান আর নেই, কেননা যিশু ঈশ্বরের দান বা অনুগ্রহ শুধু নন, তিনি মানুষের সাড়াও স্বরূপ। যিশুতে এই দান এবং এই সাড়া একীভূত হয়, যিশুতেই সেগুলোর পরিণতি: ক্রুশের উপর ঈশ্বররূপে যিশু আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেন (এটিই ঈশ্বরের দান) এবং একাধারে মানুষরূপে তিনি ঈশ্বরের জন্য মৃত্যুবরণ করেন (এতে তিনি মানুষের সাড়া)। অবশেষে, কৃষক-পিতা আঙুরলতা-যিশুতে অতীতকাল থেকে অপেক্ষিত বাধ্যতা ও ভালবাসা পেয়েছেন।

এই পরিশিষ্টের উপসংহারে একথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাক যে, অধিকাংশ প্রাক্তন ও আজকালের কয়েকজন শাস্ত্রবিদগণ আঙুরলতার দৃষ্টান্তে এউখারিস্তীয় তাৎপর্যও আরোপ করেন: আঙুরলতার ফল হল এউখারিস্তীয় আঙুররস; স্বর্গীয় রুটির উপদেশে অন্তর্ভুক্ত বিশেষ কয়েকটা কথার সঙ্গে (৬:৩২-৩৫, ৬৫) এই উপদেশের যথেষ্ট মিল লক্ষণীয়; আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীকালে প্রচলিত একটা পুঁথির সঙ্গে 'আঙুরলতা' উপদেশের সাদৃশ্য প্রতীয়মান:

> হে আমাদের পিতা,
> আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি
> তোমার দাস দাউদের সেই পবিত্র আঙুরলতার জন্য
> যা তুমি তোমার দাস যিশু দ্বারা আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছ।
> গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে। [দিদাখে ৯:২ ...]

সুতরাং, প্রকল্পসূত্রে একথা বলা যেতে পারে যে, যোহনের স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর পরিবেশে 'আঙুরলতা' উপদেশের উপর শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য আরোপিত ছিল, যার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ শিখতে পারত যে, যিশুর সঙ্গে সাক্রামেন্তজনিত সংযোগবলে তাদের চিরকালের মতই তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে এবং ফলশালীও হতে হবে।

* * *

জগতের নির্যাতন ও পবিত্র আত্মার সাক্ষ্যদান (১৫:১৮–১৬:৪)

১৫ [১৮] 'জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তবে জেনে রাখ, তোমাদের ঘৃণা
করার আগে আমাকেই ঘৃণা করেছে। [১৯] তোমরা যদি জগতেরই হতে, তবে
জগৎ তার আপনজনদের ভালবাসত; কিন্তু যেহেতু তোমরা জগতের নও, বরং
আমি জগতের মধ্য থেকে তোমাদের বেছে নিয়েছি, এজন্য জগৎ তোমাদের ঘৃণা
করে। [২০] যে কথা তোমাদের বলেছিলাম, তা মনে রাখ: দাস নিজের প্রভুর
চেয়ে বড় নয়। তারা যখন আমাকে নির্যাতন করেছে, তখন তোমাদেরও নির্যাতন
করবে; যখন আমার কথা মেনে নিয়েছে, তখন তোমাদের কথাও মেনে নেবে।
[২১] কিন্তু তারা আমার নামের জন্যই তোমাদের প্রতি সেই সমস্ত করবে, কারণ
যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তারা তাঁকে জানে না। [২২] আমি যদি না আসতাম,
তাদের সঙ্গে যদি কথা না বলতাম, তাহলে তাদের পাপ হত না; এখন কিন্তু তাদের
পাপ ঢাকবার উপায় নেই।
[২৩] আমাকে যে ঘৃণা করে, সে পিতাকেও ঘৃণা করে। [২৪] আর যদি তাদের
মধ্যে সেই সমস্ত কাজ না করতাম যা অন্য কেউ করেনি, তাহলে তাদের পাপ হত
না; এখন কিন্তু তারা দেখেইছে, অথচ আমাকে ও আমার পিতাকে ঘৃণা করেছে।
[২৫] এমনটি ঘটছে যেন তাদের বিধান-পুস্তকে লেখা এই বাণী পূর্ণ হয়: তারা
অকারণে আমাকে ঘৃণা করল। [২৬] কিন্তু সেই সহায়ক, যাঁকে আমি পিতার কাছ
থেকে তোমাদের কাছে পাঠাব,—সেই সত্যময় আত্মা, যিনি পিতার কাছ থেকে
আসেন—তিনি যখন আসবেন, তখন তিনি নিজে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন;
[২৭] আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ প্রথম থেকে তোমরা আমার সঙ্গে আছ।

১৬ [১] আমি তোমাদের এই সমস্ত বলেছি যেন [পরীক্ষার দিনে] তোমাদের
পতন না হয়। [২] তারা সমাজগৃহ থেকে তোমাদের বের করে দেবে; এমনকি,
সেই ক্ষণ আসছে, যখন কেউ তোমাদের হত্যা করলে সে মনে করবে, ঈশ্বরের পুণ্য
সেবা করছে। [৩] আর তারা এই সমস্ত করবে কারণ পিতাকেও জানেনি,
আমাকেও জানেনি। [৪] কিন্তু আমি তোমাদের এই সমস্ত বলছি, যখন তাদের সেই

ক্ষণ আসবে, তখন তোমরা যেন স্মরণ কর যে, আমি তোমাদের তা-ই বলেছিলাম। আমি প্রথম থেকে তোমাদের এই সমস্ত বলিনি, কারণ তখন নিজেই তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।'

১৫:১৮—জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে··· : যিশু একথা বলেন কেন? তিনি এই ভাববাণীর মাধ্যমে শিষ্যদের সান্ত্বনা দিতে এবং বিশ্বাসে তাঁদের দৃঢ়সঙ্কল্পিত করতে চান এমন নয়, বরং তাঁরা যেন বাণীপ্রচার করে থাকেন (১৫:২০খ) ও জগতের সামনে সাক্ষ্যদান করে থাকেন (১৫:২৭) এজন্যই তিনি তাঁদের অনুপ্রাণিত করেন। তাঁরা যিশুর একই দেওয়া কর্তব্য পালন করবেন এবং তাঁর একই পথে চলবেন। তাঁদের আগে যিশুকেই জগৎ ঘৃণা করেছে। জগৎ স্বভাবত মন্দ নয়, মানব-জগৎ বলে সে ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র (৩:১৬); যখন মানুষ ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী প্রেরিতজনকে অগ্রাহ্য করে তখনই জগৎ ঈশ্বরের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

১৫:১৯—তোমরা যদি জগতেরই হতে··· : জগৎ ও যিশুর শিষ্যেরা হল ভিন্ন জিনিস। যিশু তাঁদের বেছে নিয়েছেন বিধায় শিষ্যেরা জগৎ থেকে পৃথক। যিশুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভীত হয়ে জগৎ যিশুর মৃত্যুতে খুশি হয় আর তাঁর শিষ্যদের ঘৃণা করে, কেননা তাঁরা সর্বদা তাকে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু শিষ্যেরা যিশুর আপনজন ও তাঁর বেছে নেওয়া মানুষ বলে আত্মপরিচয় দেওয়াতে জগতের মাঝে একা হওয়ার ও তার ঘৃণার পাত্র হওয়ার পীড়া সহ্য করবেন।

১৫:২০—তারা যখন আমাকে নির্যাতন করেছে··· : খ্রিষ্টমণ্ডলীর উত্তরকাল দ্বিমুখী: একদিকে সে নির্যাতন ভোগ করবে এবং অপরদিকে জগতের অনেকে তার প্রচারিত বাণী গ্রহণ করবে। যিশু তাঁর নিজের বাণী মণ্ডলীর কাছে ন্যস্ত করে গেলেন মণ্ডলী যেন সেই বাণী প্রচার করে; সুতরাং, নির্যাতন থাকা সত্ত্বেও মণ্ডলী আপন দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারবে না।

১৫:২১—তারা আমার নামের জন্যই··· সেই সমস্ত করবে: যারা মণ্ডলীকে ঘৃণা ও নির্যাতন করে, যিশুকে যিনি প্রেরণ করলেন তারা সেই পিতাকে জানে না ও মণ্ডলীকে অগ্রাহ্য করায় যিশুকেই অগ্রাহ্য করে। দামাস্কের পথে পলের কাছে দর্শন দিয়ে যিশু একথা বলেননি, 'শৌল, শৌল, তুমি কেন আমার মণ্ডলীকে নির্যাতন কর?' বরং বলেছিলেন, 'শৌল, শৌল, তুমি কেন আমাকেই নির্যাতন কর' (প্রেরিত ৯:৪)।

১৫:২২—আমি যদি না আসতাম···: ইহুদীদের পাপ এই যে, তারা পিতার প্রেরিতজনকে প্রত্যাখ্যান করল; যেহেতু যিশু বিশ্বাসের দিকে তাদের নিয়ে যাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, সেজন্য তাদের পাপের ক্ষমা হবে না। যথার্থই, যিশুকে ঘৃণা করায় পিতার নামে তিনি যা যা বলেছেন ও করে গেছেন তা তারা অগ্রাহ্য করে; ফলত যিশুর প্রতি তাদের ঘৃণা পিতার প্রতিও ঘৃণা। যে পবিত্র শাস্ত্র যিশুকেই প্রচার করে ও যিশুতেই পূর্ণতা লাভ করে এবং যিশুর প্রতি বিরোধিতা করার জন্য গর্বের সঙ্গে তাদের দ্বারা উল্লিখিত হয়, সেই শাস্ত্র পর্যন্তই ইতিমধ্যে তাদের বিচার করেছে।

১৫:২৬—সেই সহায়ক···যখন আসবেন: যিশুর জীবনকালে তাঁর কথা ও ক্রিয়াকর্ম তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দান করত; পিতার কাছে তাঁর আগমনের পর পবিত্র আত্মাই সেই সাক্ষ্যদানের কাজ বহন করে যাবেন। তবুও পবিত্র আত্মা জগৎকে উদ্দেশ ক'রে প্রত্যক্ষভাবে কথা বলতে পারেন না বলে শিষ্যদের মাধ্যমেই কথা বলবেন: পবিত্র আত্মার সাক্ষ্য এবং শিষ্যদের সাক্ষ্য একই সাক্ষ্য। আপন সাক্ষ্যদানে পবিত্র আত্মা সর্বপ্রথমে অবিশ্বাস বিষয়ে জগৎকে অভিযুক্ত করবেন (১৬:৮-১১), উপরন্তু সহায়ক বলে তিনি শিষ্যদের সহায়তা করবেন তাঁরা যেন বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে যিশুর নামের সাক্ষ্য দিতে পারেন; অবশেষে তিনি বিশ্বাসীদের কাছে জগতের মায়ামোহ উদ্ঘাটন করবেন, পরীক্ষা ও নির্যাতনের সময় তারা যেন দৃঢ়সঙ্কল্পিত হয়ে বিশ্বাস না হারায় অর্থাৎ তিনি শিষ্য হওয়ার সৌভাগ্য তাদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের অন্তরে

অবস্থানকারী যিশুকে রক্ষা করবেন; পবিত্র আত্মার এই সহায়তা গুণেই তারা জগতের সামনে যিশুর প্রকৃত সাক্ষীরূপে দাঁড়াতে পারবে।

১৫:২৭—তোমরাও সাক্ষী: এই বচন সর্বাপেক্ষা যিশুর ক্রিয়াকর্মের প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতার দিকেই নির্দেশ করে। তবু 'আদি থেকে' কথাটা কালের একটা মুহূর্ত নির্ধারণ করে না বরং সেই উৎসের কথার দিকে আমাদের মন আকর্ষণ করে যা থেকে ভাবীকালের বাণীপ্রচারকর্ম উদ্গত: যিনি ঐতিহাসিকভাবে মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের শেষ ও চরম বাণী প্রকাশ করেছিলেন, এমনকি যিনি নিজেই 'জীবনের বাণী', সেই যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত বলেই শিষ্যদের সাক্ষ্য চিরকালীন ও চরম সাক্ষ্য। অন্য দিকে, খ্রিষ্টমণ্ডলী সেই বিশ্বাসের কথায় স্থিতমূল থাকবে যে-কথা সে আদি থেকে শুনেছে (১ যোহন ২:৪)। অতএব, 'আদি' কথাটা বিভিন্ন পর্যায়ে প্রযোজ্য: আদি থেকে ঐশবাণী বিদ্যমান ছিলেন; আদি থেকে বাণীপ্রচারক শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত; আদি থেকে শোনা ঘোষণায় খ্রিষ্টমণ্ডলী বিশ্বস্ত থাকবে। আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর সেই সুদূর কাল থেকে পবিত্র আত্মা যিশুর সকল কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে আসছেন: প্রথম যুগের বাণীপ্রচারকদের মাধ্যমে, তাঁদের সঙ্গে সংযুক্ত পরবর্তীকালের অন্যান্য প্রচারকদের মাধ্যমে এবং তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণকারী মণ্ডলীর মাধ্যমে তিনি এমন কাজ করেন যার ফলে যিশুর কাজ ও বাণী-সকল আমাদের কাছে এখনও ঘোষিত; অর্থাৎ পবিত্র আত্মাই সাক্ষী, আবার তিনিই সেই জীবন্ত সংযোগ-সূত্র যা যিশুর প্রথম শিষ্যদের সাক্ষ্য বর্তমানকালের মণ্ডলীর সাক্ষ্যের সঙ্গে প্রকৃত ও অক্ষুণ্ন ভাবে সংযোজন করে।

১৬:১—আমি তোমাদের এই সমস্ত বলেছি… : মণ্ডলীর পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ যে নির্যাতন তা নয়, বরং বিশ্বাসীদের পতন অর্থাৎ যিশুর ও তাঁর বাণীর বিষয়ে লজ্জাবোধ করে বিশ্বাস এবং ফলত পরিত্রাণকেও হারিয়ে ফেলা।

১৬:২—তারা সমাজগৃহ থেকে তোমাদের বের করে দেবে: ৯০ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদী ধর্মীয় নেতৃবর্গ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, ইহুদী জাতীয় খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা ইহুদী-সমাজগৃহ থেকে বহিষ্কৃত হবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের মনোনীত জনগণ থেকেই তারা বিচ্ছিন্ন হবে। তারা খ্রিষ্টপন্থীদের নির্যাতন করত কারণ তাদের মতে ইহুদীধর্মের বিরুদ্ধাচরণকারী খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের হত্যাকান্ড ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি-উৎসর্গস্বরূপ ছিল।

১৬:৩—তারা এই সমস্ত করবে… : কিন্তু যিশুর কথায়, যারা ধর্মীয় অন্ধতাবশত তাঁর শিষ্যদের হত্যা করার প্রয়াস করে তারা পিতাকে জানে না, ফলত ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগও পাবে না।

১৬:৪—আমি তোমাদের এই সমস্ত বলছি: যিশুর এই ভাববাণী স্মরণে শিষ্যেরা নির্যাতনকালে যেন নিষ্ঠাবান ও সহিষ্ণু হন।

বিদায় উপদেশ (৩য় খণ্ড)

(১৬:৫-৩৩)

বিদায় উপদেশের এই তৃতীয় খণ্ডও ১৪ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত বিদায় উপদেশের প্রথম খণ্ডের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং বিদায় উপদেশের দ্বিতীয় খণ্ডের মত (১৫ অধ্যায়) উত্তরকালের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রতি নিবেদিত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, পুনরুত্থিত যিশুর দেওয়া আনন্দ স্মরণ করিয়ে দিয়ে শিষ্যদের দুঃখ ও নিরাশা ঘুচিয়ে দেওয়া।

সহায়ক পবিত্র আত্মার আগমন (১৬:৫-১৫)

১৬ [৫] ‘এখন কিন্তু আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, অথচ
তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করছে না, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?
[৬] কিন্তু এই সমস্ত তোমাদের বলেছি বিধায়ই তোমাদের মন দুঃখে ভরে গেছে।
[৭] তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের সত্যকথা বলছি: আমার চলে যাওয়াটা তোমাদের
পক্ষে ভাল, কারণ আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না;
বরং যদি যাই, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব; [৮] আর তিনি এসে
জগৎকে পাপের বিষয়ে দোষী বলে সাব্যস্ত করবেন, [এবং ব্যক্ত করবেন] ধর্মময়তা
ও বিচার কী। [৯] পাপের বিষয়ে: তারা আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে না;
[১০] ধর্মময়তার বিষয়ে: আমি পিতার কাছে যাচ্ছি এবং তোমরা আমাকে আর
দেখতে পাবে না; [১১] বিচারের বিষয়ে: এই জগতের অধিপতির বিরুদ্ধে রায়
দেওয়া হয়েই গেছে।
[১২] তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন
তা সহ্য করতে পার না। [১৩] তবে তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যময় আত্মা,
তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন, কারণ তিনি নিজে থেকে কিছুই
বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও

তিনি তোমাদের বলে দেবেন। [১৪] তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন। [১৫] যা কিছু পিতার, তা সবই আমার; এজন্যই আমি বললাম যে, যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন।’

১৬:৫—এখন কিন্তু আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি… : যিশুর চলে যাওয়ার কথা অবিশ্বাসী ইহুদীদের ঘৃণাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল (৭:৩৩; ৮:১৪, ২১), এখন সেই একই কথা শিষ্যদের পক্ষে এমন বোধের অতীত কথা যা শুধু তাঁর পুনরুত্থানের পরেই সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়ে উঠবে। শিষ্যদের দুঃখ এত গভীর যে, তাঁরা যিশুর কাছে একমাত্র প্রকৃত প্রশ্ন রাখতে ভুলে যান, তথা: কোথায় যাচ্ছেন? বাস্তবিকই, এটিই হল প্রকৃত শিষ্যের একমাত্র প্রশ্ন; যিশুর চলে যাওয়ার আসল অর্থ কী? বাহ্যিক দিক দিয়ে যিশুর চলে যাওয়া একটা বিচ্ছেদ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই চলে যাওয়াটা হল গৌরবের দিকে একটা যাত্রা এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে শিষ্যদের সঙ্গে নব সংযোগ-স্থাপন। সুতরাং, পৃথিবীতে যিশুর কর্মসিদ্ধির জন্য সেই যাওয়াটা অত্যাবশ্যক (১৪:১২… ; ১৫:১৬; ১৬:৮… ; ১৭:২)। জগতের মধ্যে অনাথের মত বিক্ষিপ্ত বলেই শিষ্যেরা অতি দুঃখিত: জগৎ তাঁদের আপনজন বলে গ্রহণ করে না, উপরন্তু তাঁরা যিশু দ্বারাও পরিত্যক্ত মনে করেন। বলা বাহুল্য, জগতের মধ্যে বিক্ষিপ্ত বর্তমান খ্রিষ্টমণ্ডলীও প্রথম শিষ্যদের এই দুঃখ বার বার অনুভব করে।

১৬:৭—আমার চলে যাওয়াটা তোমাদের পক্ষে ভাল: স্বয়ং যিশু নিজের চলে যাওয়ার অর্থ ব্যাখ্যা করেন: সেই যাওয়াটা হল পবিত্র আত্মাকে প্রেরণের শর্ত। শিষ্যেরই মারাত্মক দোষ যদি সে মনে করে এই বর্তমানকাল গুরুত্বহীন কাল যেহেতু এই কাল যিশুর সেই কাল নয় এবং তাঁর গৌরবময় পুনরাগমনেরও কাল নয়। অপর দিকে এই কাল যথার্থই গুরুত্বপূর্ণ; তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে যিশু যে চরম দানগুলো বিশ্বাসীদের দেবেন, ইতিমধ্যেই তাঁরা সেগুলোর পূর্বাস্বাদ করেন এবং সেগুলোর মধ্যে প্রধান দান হল পবিত্র

আত্মার দান যাঁর মাধ্যমে তাঁরা গভীরতরভাবে যিশুকে হৃদয়ঙ্গম করবেন ও ঘনিষ্ঠ সংযোগে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকবেন।

১৬:৮—তিনি এসে জগৎকে পাপের বিষয়ে দোষী বলে সাব্যস্ত করবেন: এখানে পবিত্র আত্মার বিশেষ ভূমিকা হল পাপের বিষয়ে জগতের পাপ প্রমাণিত করা। ১৫:২৬··· এর আলোতে অনুমান করা যায় তিনি এই কাজ সম্পন্ন করেন শিষ্যদেরই মাধ্যমে, অর্থাৎ বিশ্বাসীমণ্ডলীর মাধ্যমে, আর শুধু বিচারালয়ে নয় বরং তাদের খ্রিষ্টীয় জীবন-আদর্শের মধ্য দিয়ে। ইহুদীরা মনে করত ঈশ্বরের বিচার অন্তিমকালেই ঘটবে, কিন্তু যোহন ঘোষণা করেন ঈশ্বরের বিচার সদা বর্তমান: ঈশ্বরের পক্ষসমর্থনে সেই আত্মাই আছেন যাঁকে মণ্ডলী গ্রহণ করেছে; অন্তিমকালের শেষ বিচার এখনই ঘটে। সেই 'সহায়ক' প্রমাণ করবেন যে, যথার্থ পাপ হল যিশুকে অস্বীকার করা; এ প্রমাণ প্রদর্শনও বিশ্বাসীমণ্ডলীর মাধ্যমে হয়, যে-মণ্ডলীর বিশ্বাস অবিশ্বাসী জগতের বিপক্ষ সাক্ষীস্বরূপ। যিশুতে বিশ্বাস যে ন্যায়সঙ্গত তা এতে প্রমাণিত হয় যে, পিতার কাছে থাকায় যিশু পিতা দ্বারা অবিশ্বাসীদের সমক্ষে পুন্যাত্মারূপে প্রচারিত হন এবং ফলত অবিশ্বাসীরা আপনা থেকেই অভিযুক্ত হয়ে যায়। যোহনের সুসমাচারে যিশুর ধর্মময়তা-ধারণা (বা পবিত্রতা-ধারণা) যদিও খোলাখুলি উল্লেখ না পায় তবু আবৃতভাবে বারংবার অনুধাবিত: যিশু আপন গৌরব প্রচার করেন না, তা প্রচার করার একজন আছেন, তিনি বিচারও করেন (৮:৫০), আর সেই তিনি হলেন পিতা (৮:৫৪)। ঈশ্বরের বিচার যার মধ্য দিয়ে যিশুর নিরপরাধিতা এমনকি তাঁর পবিত্রতা ও গৌরব ব্যক্ত হয় (৮:৪৬) যিশুর গৌরবায়নেই চূড়ান্তভাবে ঘটে যখন পিতা তাঁকে নিজের কাছে উন্নীত করেন। যিশুর তীব্র যন্ত্রণাভোগের সময়ও পিতা তাঁর কাছে রইলেন (৮:২৯; ১৬:৩২): যেমন পৃথিবীতে তাঁকে গৌরবান্বিত করেছিলেন তেমনি ক্রুশের উপরেও পিতা তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন (১২:২৮)। যিশুর শত্রুদের বিপক্ষে মোশি, পবিত্র শাস্ত্র এবং যিশুর কথাগুলো সাক্ষী ও অভিযোক্তা রূপে দাঁড়াবে। উপরন্তু, যিশুর উপর, তাঁর প্রধান শত্রু সেই জগতের অধিপতির কোন অধিকার নেই। সুতরাং, শিষ্যেরা যদি তাঁকে আর দেখতে না পান এর জন্য যেন দুঃখ না করেন, কেননা এতেই ব্যক্ত হয় যে পিতা তাঁর 'ধর্মময়তা' (বা

পবিত্রতা) ব্যক্ত করেছেন; অধিকন্তু তাঁদের মধ্যে পবিত্র আত্মা রয়েছেন, এতেও ব্যক্ত হয় যে যিশু পিতার কাছে সমাসীন।

অবশেষে একথা বলা হয় যে, জগতের অধিপতির বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়েই গেছে: তা সেই 'ক্ষণে' ঘটে যখন যিশু ক্রুশের উপর উত্তোলিত হন (১২:৩১)। এবারও, পবিত্র আত্মা খ্রিষ্টমণ্ডলীর মাধ্যমেই জগতের বিচার করেন, যে-মণ্ডলী বিশ্বাসের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত এবং দিয়াবলকে জয় করেছে (১ যোহন ২:১৩-১৪)। কেবল জগৎই দিয়াবলের অধীন; ঈশ্বরের সন্তানেরা তার বশীভূত নয়, কেননা তারা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে পাপ-না-করার শক্তি পেয়েছে (১ যোহন ৩:৯) এবং ঈশ্বরের পুত্রের সঙ্গে সংযোগ গুণে দিয়াবলের আক্রমণ থেকে সংরক্ষিত (১ যোহন ৫:১৮-২০)।

এ সকল কথার সারমর্ম এই: জগৎকে খ্রিষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাসের সম্মুখীন করে পবিত্র আত্মা তার অবিশ্বাস-পাপ ব্যক্ত করবেন; খ্রিষ্টমণ্ডলী নিজ ন্যায়সঙ্গত অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত কেননা পিতা যিশুর ধর্মময়তা বা নিরপরাধিতা ব্যক্ত করেছেন এবং জগৎকে বিচারিত করেছেন। এতেই অবিশ্বাসের রায় দেওয়া হয়: যে বিশ্বাস করে না তার বিচার ইতিমধ্যে হয়ে গেছে (৩:১৮)। অবশ্যই, এই সমস্ত কথার যুক্তি সেই বিশ্বাসের উপরেই নির্ভর করে, যে-বিশ্বাসকে মণ্ডলী পবিত্র আত্মার কাছ থেকে পেয়েছে। পবিত্র আত্মা বিষয়ক এ কথাগুলো থেকেই মণ্ডলীর পক্ষে এ বিশ্বাস সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হওয়া উচিত এবং নির্যাতনের সময় এ বিশ্বাস ঘোষণা করার জন্য শক্তি ও অনুপ্রেরণাও পাওয়া উচিত; কেবল এই শর্তে সেও পবিত্র আত্মার ভূমিকায় অংশ নিতে পারে।

১৬:১২—আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে: জগৎ সম্পর্কে পবিত্র আত্মার ভূমিকা ব্যক্ত করার পর যিশু মণ্ডলী সম্পর্কেই আত্মার ভূমিকা বর্ণনা করেন। ১৬:৮-১১-তে দেখা গেছে যে ওই ভূমিকা দু'টো পরস্পরের মধ্যে খুবই সংশ্লিষ্ট: পবিত্র আত্মা শুধু মণ্ডলীর মাধ্যমেই জগতের পাপ ব্যক্ত করেন, কিন্তু মণ্ডলী যদি পবিত্র আত্মার প্রতি বিশ্বাস না রাখে ও তাঁর উপর নির্ভর না করে তবে তার উপর ন্যস্ত কাজ সে সম্পন্ন করতে পারবে না।

এখন যিশু স্পষ্ট ঘোষণা করেন তাঁর বলার আর অনেক কিছু আছে, তবু তিনি এই ভার পবিত্র আত্মার উপর ছেড়ে দেন: সেই আত্মাই পূর্ণ সত্যের মধ্যে শিষ্যদের চালনা করবেন। প্রথম শিষ্যদের মত উত্তরকালীন মণ্ডলীকেও জগতের সম্মুখীন হয়ে অনেক নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করতে হবে, কিন্তু সেই সময় পবিত্র আত্মা জগতের মধ্যে মণ্ডলীর ভূমিকার তাৎপর্য উদ্ঘাটন করবেন।

১৬:১৩—তিনি যখন আসবেন… : 'সত্য' বিষয়ে আগে যথেষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে: সত্য হল যিশুর দেওয়া ঐশজীবন-সংক্রান্ত প্রকাশ, যে-প্রকাশের কথা সূক্ষ্মভাবেই বিশ্বাসীদের হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন তা যেন তাদের জীবন-ব্যবহারে বাস্তব অভিব্যক্তি লাভ করে। যেমন যিশু নিজে থেকে কিছুই বলেন না বরং প্রেরণকারী পিতার কাছে যা শুনেছেন তা-ই প্রকাশ করেন (৭:১৭… ; ৮:২৮; ১৪:১০), তেমনি পবিত্র আত্মাও যা শুনেছেন তা-ই শুধু প্রকাশ করেন: এতে অনুমান করা যায় যে যিশুর ঐশপ্রকাশ ও পবিত্র আত্মার কথার মধ্যে ধারাবাহিক সম্বন্ধ বর্তমান।

এই পদে, 'যা যা ঘটবার' বচনের অর্থ এই নয় যে পবিত্র আত্মা ভাবী গুপ্ত ঘটনা আগে থেকে প্রকাশ করবেন, বরং নিম্নোল্লিখিত অধিকারই তাঁকে দেওয়া হয়: তিনিই ভবিষ্যতে মণ্ডলীকে চালনা করবেন, মণ্ডলীর কাছে সাধারণ ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য উন্মুক্ত করবেন, যিশুর শিক্ষাকে কাল ও স্থান উপযোগী করবেন যাতে খ্রিষ্টবিশ্বাসী সাধারণ ঘটনাসমূহ যিশুর আলোতেই বিচার-বিবেচনা করতে পারে এবং এর ফলে এই সচেতনতায়ই জীবনযাপন করতে পারে যে, ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী পরিকল্পনাই তাকে ঘিরে রাখে: বাহ্যত জগৎ জয়ী, কিন্তু বস্তুত পরাভূত; যিশুই ক্রুশবিদ্ধ হয়েও প্রকৃতপক্ষে পুনরুত্থিত ও ঐশগৌরবে ভূষিত।

১৩:১৪—তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন: প্রকৃতপক্ষে পিতাই পুত্রকে গৌরবান্বিত করেন; কিন্তু যেহেতু পবিত্র আত্মা যিশুর পরিত্রাণকর্ম-সাধনে অংশ নেন সেজন্য বলা যেতে পারে যে তিনিও পুত্রকে গৌরবান্বিত করেন। পিতা পুত্রকে

গৌরবান্বিত করার উদ্দেশ্যেই সবকিছু নির্ধারণ করলেন, পবিত্র আত্মা এই পূর্ণতা থেকেই সবকিছু পান। এভাবে ব্যক্ত হয় যে যিশুই তিনি যাঁর হাতে সবকিছু ন্যস্ত করা হয়েছে ও যাঁরই ঘোষিত ঐশপ্রকাশেও ভাবীকালের মণ্ডলীর যে কোন বাণীপ্রচারকর্ম (উপদেশ ও ধর্মশিক্ষা দান, বাণীপ্রচারকর্ম সম্প্রসারণ প্রভৃতি) প্রতিষ্ঠিত।

যেমন ১৪:২৬ এর বেলায় তেমনি এখানেও অনুমান করতে পারি যে, যিশুর প্রথম শিষ্যদের ছাড়া পবিত্র আত্মা সর্বকালের খ্রিষ্টমণ্ডলীকেই পূর্ণ সত্যের মধ্যে চালনা করবেন। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সমগ্র মণ্ডলীই যিশুর ঐশপ্রকাশের সঙ্গে সংযোজিত ও উত্তরকালের ইতিহাসসাপেক্ষ নিত্যপরিবর্তনশীল পরিবেশের উপযোগী নব নব চেতনালাভ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য সেই ঐশপ্রকাশের গভীর উপলব্ধির জন্য চালিত। পবিত্র আত্মার সহায়তা গুণে মণ্ডলীর কাছে সুসমাচারে অন্তর্নিহিত সত্যগুলো অধিক স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে এবং সুসমাচারের মর্মকথা তার পক্ষে সদা নবীন শক্তিতে পরিণত হয়। যিশু তাকে যা যা বলেছেন, দান করেছেন ও প্রতিশ্রুত হয়েছেন, মণ্ডলী পবিত্র আত্মার মধ্যে ও মাধ্যমেই তা অবগত আছেন, এমনকি 'যিশু যে আমাদের অন্তরে বসবাস করেন, যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা' আমরা তা জানতে পারি (১ যোহন ৩:২৪)।

পরিশিষ্ট

যোহনের সুসমাচারে 'সহায়ক' পবিত্র আত্মা

যোহনের সুসমাচারে ১৪, ১৫ ও ১৬ অধ্যায়ে পবিত্র আত্মাকে 'সহায়ক' বলে অভিহিত করা হয়। এই পরিশিষ্টে তাঁর এই বিশিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধেই আলোচনা করা হবে, তারপর 'সহায়ক' শব্দ, ও সুসমাচারে অন্তর্ভুক্ত 'সহায়ক' সম্পর্কিত বচনগুলোর পটভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করা হবে, এবং অবশেষে যোহনের স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর আত্মসচেতনতার জন্য সেই বচনগুলোর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হবে।

যোহন অনুসারে ‘সহায়ক’এর ভূমিকাসমূহ

সর্বপ্রথমে একথাই বলা বাঞ্ছনীয় যে, গ্রীক ভাষায় ‘সহায়ক’ শব্দের প্রকৃত অর্থ হল ‘সন্নিকটে আহূত’, এবং শব্দটা সাধারণত সেই ব্যক্তির দিকে অঙুলি নির্দেশ করে যে বিচারালয়ে অভিযুক্তদের সহায়তা করে (অর্থাৎ ‘উকিল’) বা অন্য ব্যক্তির কাছে একজনের পক্ষে মধ্যস্থ ও রক্ষাকারীরূপে ওকালতি করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণীয় যে, ইহুদী ধর্মীয় ঐতিহ্যে ঈশ্বরের কাছে মধ্যস্থদের কথা খুবই প্রচলিত ছিল (স্বর্গদূত, কুলপতি, নবী, পুণ্যাত্মা ইত্যাদি চরিত্রের উপর ‘মধ্যস্থ’ ভূমিকা আরোপ করা হত)। যোহনের আগেও যে আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার ‘সহায়ক’ নাম ব্যবহৃত ছিল, এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই; কিন্তু যোহন যেমন অন্যান্য প্রচলিত ধারণার বেলায় করেছিলেন (মেষশাবক, মানবপুত্র, আলো প্রভৃতি ধারণা) তেমনি এবারও সাধারণভাবে ব্যবহৃত ‘সহায়ক’ ধারণার উপর নবীন ও গভীর বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন; সুসমাচারে অন্তর্ভুক্ত ‘সহায়ক’ বচনাদি বিশ্লেষণ করে আমরা এই নব ও গভীর বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করতে সচেষ্ট হবে।

প্রথম বচন (১৪:১৬…): এখানে ‘সহায়কের’ কোন নির্দিষ্ট ভূমিকা প্রকাশ পায় না। শিষ্যদের কাছে তাঁর আগমনেরই কথা মাত্র প্রতিশ্রুত হয়: এজগৎ ছেড়ে যিশু চলে যাওয়ার পর পিতা পবিত্র আত্মাকে শিষ্যদের কাছে দান করবেন। তিনিই যিশুর স্থানে চিরকাল ধরে তাঁদের সঙ্গে ও তাঁদের অন্তরে থাকবেন এবং তাঁদের কাছে থাকবেন বলে তাঁরা তাঁকে জানেন।

দ্বিতীয় বচন (১৪:২৬): এখানে ‘সহায়কের’ উল্লিখিত ভূমিকা হল সর্ববিষয়ে শিক্ষা দেওয়া ও যিশুর সকল কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। যোহনের প্রথম পত্রে লেখা আছে, যারা তাঁকে শোনে, সহায়ক তাদের সর্ববিষয়ে শিক্ষা দেন এবং ঠিক এই শিক্ষা গুণে শিষ্যেরা যিশুতে স্থিতমূল থাকতে সক্ষম (১ যোহন ২:২৭)।

তৃতীয় বচন (১৫:২৬…): ‘সহায়ক’ পবিত্র আত্মা যিশুর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন: শিষ্যদের অন্তরে ছাড়া, ‘সহায়কের’ এই সাক্ষ্যদান অন্য মানুষের দিকে অগ্রসর হয়; এই সাক্ষ্যদান গুণেই শিষ্যেরা জগতের ঘৃণা ও নির্যাতন সহ্য করার অনুপ্রেরণা পান। এরূপ

ধারণা অপরাপর সুসমাচারেও ব্যক্ত, সেখানে বলা হয় যে যখন জগৎ শিষ্যদের ধরে বিচারালয়ে নিয়ে যাবে তখন পবিত্র আত্মাই তাদের হয়ে কথা বলবেন।

চতুর্থ বচন (১৬:৮-১১): অভিযুক্ত শিষ্যদের সহায় ব্যতীত তিনি এবার জগতের অভিযোক্তায় পরিণত হন। খ্রিষ্টমণ্ডলীর মাধ্যমেই তিনি জগতের পাপ ব্যক্ত করবেন, যে-মণ্ডলী অটুট বিশ্বাসে যিশুর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে।

পঞ্চম বচন (১৬:১১-১৩): তিনি মণ্ডলীকে অন্তর থেকেই অনুপ্রাণিত করেন। তিনি যিশুর স্থানে রয়েছেন এবং শিক্ষা দান ক'রে ও তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে তাঁর কাজ সম্পন্ন করতে থাকেন, অর্থাৎ 'সহায়কের' বিশিষ্ট ভার হল যিশুর প্রকাশিত সত্যের পূর্ণতার মধ্যে শিষ্যদের চালনা করা ও যিশুর আলোতেই ইতিহাসের ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করার জন্য শিক্ষা দেওয়া।

'সহায়ক' নাম ও বচনাদির পটভূমি

আগে বলা হয়েছিল যে যোহনের সময়ের পূর্বেও সদৃশ সুসমাচারত্রয় নির্যাতিত ও বিচারিত বাণীপ্রচারকদের পক্ষে পবিত্র আত্মার একটা 'সহায়' ভূমিকা উল্লেখ করেছিল। এই ধারণাই সম্ভবত হল যোহনের পটভূমি যার উপর তিনি তাঁর স্বকীয় ঐশতত্ত্ব গড়ে তুলেছেন: পবিত্র আত্মা বিচারালয়েই শুধু নয় বরং বিশেষত শিক্ষক বলেই ও যিশুর কথা স্মরণকারী বলেই 'সহায়ক', এমনকি তাঁর এই বিশিষ্ট 'প্রেরণা' ও 'পরিচালনার' ভারের গুণেই যোহন যিশুর কাজ ও কথার ব্যাখ্যাকর্তা নিজেকে গণ্য করতে পেরেছেন। সুতরাং, পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বরের অনুপ্রেরণাদায়ী ও বলদায়ী শক্তিস্বরূপ যিনি মণ্ডলীকে নিশ্চিত করেন যে, সে সত্যপ্রাপ্ত, ও ঈশ্বরেরই আপন প্রিয় সম্পদ। কিন্তু এই আত্মা যিশুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত: তাঁর মাধ্যমেই শুধু আত্মা মণ্ডলীর পক্ষে জীবন্ত ও বাস্তব জিনিস হয়ে উঠেছেন বিধায়ই আত্মা আপন সত্তায় ও কাজে সর্বদাই যিশুকে লক্ষ করেন। আত্মা সাক্ষ্যদান করেন যিশুই সেই ব্যক্তি যিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হলেন (১ যোহন ৫:৬): এটিই হল খ্রিষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাস-সচেতনতা ও অভিজ্ঞতা। পিতার কাছে চলে যাওয়ার সময় যিশু এই আত্মার দান প্রতিশ্রুত হয়ে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা

ব্যাখ্যা করেন; আত্মাই হবেন তাঁর প্রতিনিধি যিনি মণ্ডলীর মধ্যে থেকে তাঁর পরিত্রাণদায়ী ঐশপ্রকাশকর্ম চালিয়ে যাবেন ও তাকে ফলপ্রসূ ও ক্রিয়াশীল করে তুলবেন।

উপসংহারস্বরূপ একথা বলা চলে যে, 'সহায়ক' সম্পর্কিত বচনাদি যদিও আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর সাধারণ ঐতিহ্যজনিত ধারণা, তবুও যোহনের স্বীয় ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের ফল। বচনাদিতে এই বিশ্বাস ব্যক্ত হয় যে, যিশু অনন্য ও চরম ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তা বলে এই জগতে এসেছেন এবং পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর মধ্যে নিত্য বর্তমান, ও তার কাছে যিশুর কাজ ও কথার মর্মসত্য সদা নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

খ্রিষ্টমণ্ডলীর আত্মসচেতনতার জন্য 'সহায়ক' বচনাদির গুরুত্ব

এই আলোচনা থেকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যা শুধু যোহনের স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলী ক্ষেত্রে নয়, সার্বজনীন খ্রিষ্টমণ্ডলী ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১। যোহনের স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর দৃঢ় সচেতনতাই সে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ও তাঁর দ্বারা চালিত; সে তাঁর উপস্থিতি ও ক্রিয়াকর্ম বিষয়ে এমন সচেতন যে সেগুলি দ্বারাই তার জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত। সেই সহায়ক সত্যময় আত্মা সর্বদাই শিষ্যদের সঙ্গে ও তাদের অন্তরে থাকবেন (১৪:১৬), যিশুর এই প্রতিশ্রুতি যোহনের খ্রিষ্টমণ্ডলীর বেলায় পূর্ণতা লাভ করেছিল। পবিত্র আত্মাকে প্রাপ্তি বিষয়ে অবগত হয়েই মণ্ডলী জগতের সামনেও তার আত্মসচেতনতা লাভ করে; কিন্তু এই অবগতি ও আত্মসচেতনতা অসাধারণ বা অতিশয় উত্তেজনাপূর্ণ ভক্তি প্রদর্শনের দিকে নয়, যিশুর পুনরাগমনের উন্মাদ প্রতীক্ষার দিকেও নয় বরং গভীর আন্তর ধ্যান ও ভ্রাতৃত্ববোধের দিকে তাকে চালনা করে। এই পর্যায়ে কয়েকটা প্রশ্নের উদয় না হয়ে পারে না, যেমন: কেমন করে যোহনের খ্রিষ্টমণ্ডলী পবিত্র আত্মার চালনা সম্বন্ধে সচেতন? তার পক্ষে পবিত্র আত্মা কি করে প্রথম শিক্ষা ও স্মরণকরণ ভূমিকা অনুশীলন করেন? শুধু যিশুর প্রথম শিষ্যগণ ও বিশেষ পদে নিযুক্ত প্রচারকগণই কি তাঁদের বাণীপ্রচারে

যিশুর প্রকাশিত সত্যের অর্থ উন্মোচন করতে, তাঁর সকল কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এবং ফলত সাধারণ বিশ্বাসীদের কাছে পবিত্র আত্মার সহায়তা ও শিক্ষা হস্তান্তরিত করতে সক্ষম? না কি খ্রিষ্টভক্তদের মধ্যে নবীর মত বিশেষ কোন অনুপ্রাণিত ব্যক্তিও থাকতে পারে যারা নবীনভাবে যিশুর কথা ব্যাখ্যা করতে বা যিশুর নতুন কথাই পর্যন্ত ঘোষণা করতে সক্ষম? অথবা কি পবিত্র আত্মা নিজেই এক একজন বিশ্বাসীকে আন্তর উদ্দীপনা দানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেন? যোহনের প্রথম পত্র থেকে অনুমান করা যায় যে বাণীপ্রচারকদের সাক্ষ্যদান (১ যোহন ১:১-৪) এবং পবিত্র আত্মার প্রত্যক্ষ আন্তর শিক্ষাদান বা তৈলাভিষেক পরস্পর বিরোধী নয় বরং পরিপূরক। বিশ্বাসীগণ প্রচারকদের সাক্ষ্যদানে ঈশ্বরেরই সাক্ষ্যদান গ্রহণ করে, অন্তরে তা ধ্যান করে এবং পবিত্র আত্মাজনিত আন্তর স্বীকৃতির মাধ্যমেও সেই সাক্ষ্যদান সত্য বলে অনুভব করে (১ যোহন ৫:৯-১১)। নতুন নবীগণ যে পবিত্র আত্মার বিশেষ অনুপ্রেরণায় যিশুর নতুন কথা প্রকাশ করে এমন কথা যোহনের লেখায় নেই, বরং জোর দিয়ে বার বার একথা বলা হয় যে, পবিত্র আত্মা যিশুর পরম্পরাগত বাণীই মাত্র (অর্থাৎ বাইবেলে গৃহীত বাণী) স্মরণ করিয়ে দেন এবং তিনি পূর্ণ সত্যের মধ্যে শিষ্যদের চালনা করে নিজে থেকে কিছুই বলেন না, কিন্তু যা যা শুনেছেন তা-ই মাত্র বলেন (১৪:২৬; ১৬:১৩)। আবার, তিনি যে ভবিষ্যতে যা যা ঘটবে তা ব্যক্ত করেন একথার অর্থ এই নয় যে, এমন নবীদের উদয় হবে যারা ভবিষ্যৎ গণনা করবে। অতএব, 'সহায়ক' বচনাদি সেই বাণীপ্রচারকদের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে যারা (যোহনের প্রথম পত্র অনুসারে) তাদের পদাধিকারের বলে নয়, কর্তৃপক্ষের বলেও নয়, কিন্তু প্রাপ্ত পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা গুণেই বাণী-ঐতিহ্য বা বাণী-পরম্পরা এবং খ্রিষ্টবিশ্বাসের নির্ভুল ও বিশুদ্ধ সংজ্ঞা সংরক্ষণের জন্য ব্যাপৃত। এখানে উল্লিখিত বাণীপ্রচারকগণ যে শুধু যিশুর প্রথম শিষ্যগণ এমন নয় বরং তারা সমগ্র খ্রিষ্টমণ্ডলীর সদস্যগণ, যে-মণ্ডলী 'সহায়কের' আগমনের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে; কেবল অবিশ্বাসী জগৎই পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ থেকে বঞ্চিত। সুতরাং, 'সহায়ক' বচনাদির নেপথ্যে এমন খ্রিষ্টমণ্ডলীর ছবি ফুটে ওঠে, যে-মণ্ডলী সমষ্টিগতভাবেই পবিত্র আত্মা দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত, অনুপ্রাণিত ও চালিত। কিন্তু,

বাস্তবিকপক্ষে, সেই মণ্ডলী বিশেষ আহ্বানে আহূত বাণীপ্রচারক ও উপযুক্ত পালকদের দ্বারাই শিক্ষাপ্রাপ্ত।

২। 'সহায়ক' বচনাদি খ্রিষ্টমণ্ডলীর আত্মসচেতনতার ও তার ঐশতত্ত্বের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে, কিন্তু তেমন বিষয়ে এখানে আলোচনা করার স্থান নেই। একথা বলা যথেষ্ট হোক যে, ক। যে যে আন্দোলন পবিত্র আত্মার অসাধারণ বা মরমিয়া অনুভবের উপর স্থাপিত, সেই সকল আন্দোলন যোহনের লেখার উপর নির্ভর করে না ; খ। পবিত্র আত্মার প্রেরণা কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষের জন্যই শুধু নয়, বরং সমগ্র মণ্ডলীই তাঁর উপরোল্লিখিত ভূমিকাসমূহ অনুসারে তাঁকে উপলব্ধি করতে সক্ষম ; গ। তা সত্ত্বেও একথাও অটুট থাকে যে, মণ্ডলীর 'অধিকারী ধর্মগুরু-শ্রেণি' (অর্থাৎ বিশপগণ) বিশ্বাস বিষয়ে পবিত্র আত্মার বিশেষ সহায়তাপ্রাপ্ত।

৩। 'সহায়ক' বচনাদির মুখ্য উদ্দেশ্য হল পবিত্র আত্মা দানের প্রতিশ্রুতির ও তাঁর প্রাপ্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে খ্রিষ্টমণ্ডলীকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও নিরুদ্বিগ্ন করা। বলা বাহুল্য, এই বচনাদির উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় যখন খ্রিষ্টভক্তদের মধ্যে পবিত্র আত্মার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা থাকে, অর্থাৎ তাঁকে গ্রহণ করার জন্য যখন খ্রিষ্টভক্তদের মন প্রস্তুত হয়। যোহনের লেখা থেকে অনুমান করা যায়, তাঁর স্থানীয় মণ্ডলীতে এই ধরনের অভিজ্ঞতা সজীব ছিল। দুঃখের কথা, বর্তমানকালীন খ্রিষ্টমণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার উপস্থিতির সচেতনতা প্রায়ই মুমূর্ষু, বা কিছু যদি থাকে তা সাধারণত মরমিয়া ও উত্তেজনাপূর্বক বিবিধ আন্দোলনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, যে-আন্দোলন কিন্তু পবিত্র আত্মার প্রকৃত 'সহায়ক' ভূমিকার উত্তরাধিকারী নয়। সুতরাং, পবিত্র আত্মার সৃজনশীল উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতনতা পুনর্লাভ করাই আজকালের খ্রিষ্টমণ্ডলীর একান্ত গুরু কর্তব্য। যারা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করে, তারাই মাত্র তাঁর সম্পর্কিত কথা হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ।

যে বিশ্বাসী পবিত্র আত্মাকে তার কাছে শিক্ষা দিতে ও যিশুর সকল কথা স্মরণ করিয়ে দিতে দেয়, সে পবিত্র আত্মা দ্বারা যিশুর সঙ্গে গভীরতর জীবন-সংযোগে চালিত হবে। যে যিশু একদিন জগতে এসেছিলেন, সেই যিশু পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বিশ্বাসীর পক্ষে এখনও নিকটবর্তী ও উপস্থিত ; তাঁর সকল কথা তার পক্ষে হয়ে ওঠে আত্মা ও

জীবন (৬:৬৩, ৬৮), শক্তি, উপদেশ ও সান্ত্বনা। এজন্য সে বর্তমান ও উত্তর কালের ঘটনাদির তাৎপর্য বুঝতে ও সমসাময়িক মানবজাতির আকাঙ্ক্ষা ও তার নিজের জীবনের সমস্যার উত্তরের সন্ধান পেতে সক্ষম। যিশুর হস্তান্তরিত কথার উপর গভীর মূল্যায়ন এবং নীতি ও দায়িত্ব সম্পর্কিত গবেষণা আত্মা দ্বারা প্রতিরোধ পায় না বরং তাঁর দ্বারা প্রগতিত। একথা বাস্তবায়ন করা যত কঠিন হোক না কেন, পবিত্র আত্মা এই দিকেই সকলকে অনুপ্রাণিত করেন, সামর্থ্য দান করেন, নবীন চেতনা ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেন: এটিই খ্রিষ্টমণ্ডলীর বিকাশের ক্রিয়াশীল নিয়ম। এক্ষেত্রে আবার একথা বলা যাক যে, পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিযুক্ত বাণীপ্রচারকদের মাধ্যমে ও প্রতিটি বিশ্বাসীর আন্তর উপলব্ধির মাধ্যমে শিক্ষা দান করেন: মণ্ডলীর 'অধিকারী ধর্মগুরু-শ্রেণি' ও অন্যান্য ভক্তগণ উভয়েই পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত, এমনকি তাঁর দ্বারা পারস্পরিক পরিপূরক সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত।

জগতের সম্মুখীন খ্রিষ্টমণ্ডলী এই সচেতনতায়ই জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য ও সমাধা করবে যে, পবিত্র আত্মা তার মধ্যে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত। যে মণ্ডলী দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে, সেই মণ্ডলীই অবিশ্বাসী জগতের বিপক্ষে অভিযোগকারী সাক্ষী হয়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য যে, খ্রিষ্টভক্তগণ বাপ্তিস্মে যে নবী-ভূমিকা প্রাপ্ত হয়, এই পরিশিষ্টের কথা ঠিক সেই নবী-ভূমিকাই লক্ষ করে, অর্থাৎ নবী-ভূমিকা উপলব্ধির জন্যও পরিশিষ্টটা উপযোগী হতে পারে।

শিষ্যদের আনন্দ (১৬:১৬-৩৩)

১৬ [১৬] 'আর অল্পকাল, পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; আবার অল্পকাল, পরে আমাকে দেখতে পাবে।' [১৭] তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, 'এই যে তিনি আমাদের বলছেন, আর অল্পকাল, পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; আবার অল্পকাল, পরে আমাকে দেখতে পাবে, এবং, আমি পিতার কাছে যাচ্ছি—তাঁর এই সমস্ত কথার অর্থ কী?' [১৮] তাঁরা বলছিলেন, 'অল্পকাল বলতে উনি কী বোঝাতে চান? উনি

যে কী বলতে চাচ্ছেন, তা আমরা জানি না।' [১৯] যিশু জানতেন যে, তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন করতে চান, তাই তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি যে বলেছিলাম: আর অল্পকাল, পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; আবার অল্পকাল, পরে আমাকে দেখতে পাবে, তোমরা এবিষয়ে কী নিজেদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করছ? [২০] আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা কাঁদবে ও বিলাপ করবে, কিন্তু জগৎ আনন্দ করবে। তোমাদের দুঃখ হবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে।

[২১] নারী প্রসবকালে কষ্ট পায়, কারণ তার ক্ষণ এসে গেছে; কিন্তু শিশুকে জন্ম দেওয়ার পর তার যন্ত্রণার কথা আর মনে থাকে না, এই আনন্দে যে, জগতে একটি মানুষ জন্মেছে। [২২] তেমনি তোমরাও এখন মনে কষ্ট পাচ্ছ, কিন্তু আমি তোমাদের আবার দেখব, এবং তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে, আর তোমাদের সেই আনন্দ কেউ তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। [২৩] সেদিন তোমরা আমাকে আর অনুরোধ করবে না।

আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, পিতার কাছে তোমরা যদি কিছু যাচনা কর, তিনি আমার নামে তোমাদের তা-ই দেবেন। [২৪] এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই যাচনা করনি; যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হতে পারে।

[২৫] আমি তোমাদের এই সমস্ত কথা রূপকের মধ্য দিয়েই বললাম; সেই ক্ষণ আসছে, যখন রূপকের মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে আর কথা বলব না, স্পষ্টভাবেই আমি পিতার বিষয় তোমাদের জানাব। [২৬] সেদিন তোমরা আমার নামে যাচনা করবে, আর আমি যে তোমাদের জন্য পিতাকে অনুরোধ করব, একথা তোমাদের বলছি না; [২৭] কেননা পিতা নিজেই তোমাদের ভালবাসেন, যেহেতু তোমরা আমাকে ভালবেসেছ, ও বিশ্বাস করেছ যে, আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি। [২৮] আমি পিতার কাছ থেকে এসেছি এবং জগতের কাছে এসেছি; আবার জগৎকে ত্যাগ করছি এবং পিতার কাছে যাচ্ছি।' [২৯] তাঁর শিষ্যেরা বললেন, 'এই যে এখন আপনি স্পষ্টভাবেই কথা বলছেন, কোন রূপক ব্যবহার করছেন না! [৩০] এখন আমরা জানি যে, আপনি সবই জানেন ও কারও প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকা আপনার দরকার হয় না। এতেই আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন।' [৩১] যিশু তাঁদের উত্তর দিলেন, 'তোমরা কি এখন বিশ্বাস

করছ? [৩২] দেখ, সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এসেই গেছে, যখন তোমরা প্রত্যেকে যে যার পথে ছড়িয়ে পড়বে আর আমাকে একাই রেখে যাবে। আমি কিন্তু একা নই, কারণ পিতা আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।
[৩৩] আমি এই সমস্ত কথা তোমাদের বলেছি, তোমরা যেন আমাতে শান্তি পেতে পার। এই জগতে তোমাদের নানা ক্লেশ আছে, কিন্তু সাহস ধর, আমি জগৎকে জয় করেছি।'

১৬:১৬—আর অল্পকাল, পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না: স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যিশু একদিকে সেই কালের দিকে নির্দেশ করেন যে কালের পরিণাম তাঁর মৃত্যু-কাল, এবং অপর দিকে সেই কালের কথা বলেন যে কাল মৃত্যু থেকে তাঁর পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত যায়, এমনকি যিশুর আনন্দপূর্ণ পুনরুত্থানকাল তাঁর দৃশ্যমান উপস্থিতির কাল অতিক্রম ক'রে যুগ যুগান্তরব্যাপী সদাবর্তমান।

১৬:১৭—এই সমস্ত কথার অর্থ কী? শিষ্যদের বিশ্বাস এখনও পূর্ণ বিশ্বাস নয়, সেজন্য যিশু আরও স্পষ্টভাবে কথা বলেন।

১৬:২০—তোমরা কাঁদবে: উপদেশের এই অংশটির মুখ্য কথা এই বচনেই কেন্দ্রীভূত: নিজের পুনরাগমনে যিশু শিষ্যদের কাছে যে আনন্দদানের কথা প্রতিশ্রুত হন সেই আনন্দ শাশ্বত, চিরকালস্থায়ী ও অতুলনীয়, আর কেউই তাঁদের কাছ থেকে তা কেড়ে নিতে পারবে না। সুতরাং এই আনন্দ পুনরুত্থিত যিশুর একটি দান: তিনি শান্তি (১৪:২৭; ২০:১৯...) ও আনন্দ দাতা। অবিশ্বাসী জগৎ যিশুর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না, কেননা যিশুই পরম বিজয়ী যিনি আপন শিষ্যদেরও নিজের বিজয়লোকে অর্থাৎ মুক্তি, শান্তি ও আনন্দলোকে প্রবেশ করান।

১৬:২৩—সেদিন তোমরা আমাকে আর অনুরোধ করবে না: পুনরুত্থানের দিন থেকে শিষ্যদের মাঝে যিশুর অবিরত উপস্থিতি তাঁদের গভীর আনন্দকে প্রতিষ্ঠা করবে, তাতে তাঁর কাছে আর কোন অনুরোধ বা প্রশ্ন রাখার প্রয়োজন হবে না, কেননা সেই দিন থেকে তাঁরা সরাসরি পিতারই কাছে নিজেদের যাচনা জানাতে পারবেন এবং তাঁরা যিশুর আপনজন হওয়ায় পিতা তাঁদের যাচনা পূরণ করবেন (এখানে বিশ্বাসীর খ্রিষ্টীয় জীবন সংক্রান্ত যাচনার কথা বলা হয়)।

১৬:২৪—এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই যাচনা করনি: যিশুর নামে পিতার কাছে যাচনা করলে শিষ্যেরা পূর্ণ আনন্দ পাবেন। 'এ পর্যন্ত' শিষ্যেরা অপূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের ও দুঃখের কালে জীবনযাপন করলেন, কিন্তু 'আর অল্পকাল, পরে' পূর্ণ আনন্দ ও অভয়ের কাল শুরু হবে। এ সকল কথা থেকে অনুমান করতে পারি আনন্দই খ্রিষ্টীয় জীবনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম: কিন্তু এই আনন্দ জগতের বাহ্যিক ও অনিত্য আনন্দ নয়, বরং এই আনন্দ এমন যা ভ্রাতৃত্ব ও ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ক্রুশ থেকে উদ্গত। ফলত নিজের অন্তরে যিশুর সাধিত পরিত্রাণের নিশ্চয়তায়, জগতের উপর তাঁর বিজয়-স্মরণে এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁর অবিরত উপস্থিতির সচেতনতায় খ্রিষ্টবিশ্বাসীর নির্যাতনকালেও সেই আনন্দ অনুভব করার কথা।

১৬:২৫—সেই ক্ষণ আসছে, যখন রূপকের মধ্য দিয়ে… : পৃথিবীস্থ যিশুর সকল কথা বিশ্বস্ত শিষ্যদের পক্ষেও দুর্জ্ঞেয় হয়েছিল; কেবল আসন্ন পুনরুত্থানকাল পূর্ণ ঐশপ্রকাশ আনবে; তখনই যিশু পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁর প্রথম শিষ্যদের, তাঁদের উত্তরসূরীদের এবং খ্রিষ্টমণ্ডলীর সকল ভক্তদের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। এই পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করে যে, যোহনের স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলী পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণাদায়ী পরিচালনায় ও যিশুর পুনরুত্থানজনিত বিশ্বাসের আলোতে পৃথিবীস্থ যিশুর কথা ও কাজকর্মের উপলব্ধির রূপান্তর আবশ্যক ও অপরিহার্য বিবেচনা করত।

১৬:২৬—সেদিন তোমরা আমার নামে যাচনা করবে: যিশুর সঙ্গে পূর্ণ সংযোগে সংযুক্ত শিষ্যেরা এবিষয়ে অবগত ও নিশ্চিত যে, তাঁরা পিতার ভালবাসার পাত্র। যিশুর নাম না করেও তাঁরা পিতার কাছে যাচনা করবেন; বাস্তবিকই যিশুর নাম জাদুমন্ত্রের মত উচ্চারণ করতে নেই। 'যিশুর নাম' বলতে এধারণাই বোঝায় যে, খ্রিষ্টভক্তগণ যিশুকে ভালবাসে ও তাঁর সঙ্গে পূর্ণ সংযোগে সংযুক্ত, কেননা তারা স্বীকার করে যে তিনি পিতার সেই প্রেরিতজন: আর তাদের যাচনা হল এই ভালবাসা ও মিলনের বহিঃপ্রকাশ।

১৬:২৮—আমি পিতার কাছ থেকে এসেছি: এখানে সংক্ষিপ্তভাবে যিশুর সমস্ত মানবজীবনের কথা বলা হচ্ছে; কিন্তু একটা দিক বিশেষভাবে উল্লিখিত যে, জগৎ ছেড়ে যিশুর চলে যাওয়াটা হল পিতার কাছে গিয়ে পৌঁছানোর জন্য একটা পথ। এইভাবে যিশুর উপদেশ এই অংশের প্রথম পদগুলোতে প্রচারিত কথায় ফিরে আসে (১৬:৫-৭), তথা: যিশুর চলে যাওয়ার সংবাদ শিষ্যগণকে দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, কিন্তু তাঁর এই সকল কথা বলার পর তাঁদের বোঝা উচিত যে তাঁর চলে যাওয়াটা তাঁদের পক্ষে কল্যাণকর। এই পৃথিবীতে, অর্থাৎ ঈশ্বর থেকে দূরবর্তী এই নিম্নলোকে (৩:১৬) তাঁর বাসস্থান অস্থায়ীই মাত্র ছিল। এখন জগতে তাঁর কাজ শেষ হয়েছে বলে তিনি তাঁর প্রকৃত স্থান সেই ঊর্ধ্বলোকে ফিরে যান (১৭:৪…): ঈশ্বরের বাণী নিষ্ফল হয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যায় না, বরং যে কাজের জন্য প্রেরিত হয়েছিল সেই কাজ সম্পন্ন করেই ফিরে যায় (ইশা ৫৫:১০)। ইহলোকে তীর্থযাত্রী মণ্ডলীর কাছে বিদায় উপদেশের এই কথা স্মরণ করায় যে, এই মর্তলোক নয়, স্বর্গলোকই তার প্রকৃত লক্ষ্য।

১৬:২৯—এই যে এখন আপনি স্পষ্টভাবেই কথা বলছেন: শিষ্যদের এই কথায় প্রকাশ পায় যে, তাঁদের বিশ্বাস এখনও পরিপক্ক হয়নি; তাঁরা না-কি মনে করছেন, যিশুর পুনরুত্থানের আগে, পবিত্র আত্মাকে পাবার আগেই যিশুর বাণীর প্রকৃত অর্থ বুঝে ফেলেছেন।

১৬:৩১—তোমরা কি এখন বিশ্বাস করছ? তাঁদের বিশ্বাস যে এখনও অপূর্ণাঙ্গ তা অল্পকাল পর প্রমাণিত হবে যখন তাঁরা যিশুকে প্রত্যাখ্যান করবেন। জগতের উপর যিশুর বিজয়ের পরেই শুধু তাঁরা পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করবেন। সেই সময় পর্যন্ত, যিশুর পাশে পিতা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কেউই নেই।

১৬:৩৩—আমি এই সমস্ত কথা তোমাদের বলেছি… : পিতা যে যিশুর সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এ নিশ্চয়তা তাঁর বিজয় ও গৌরবায়নের দিকে যিশুর মনকে আকর্ষণ করে; একথা থেকে শিষ্যেরাও যেন উৎসাহ লাভ করেন। এতে বিদায় উপদেশের এই অংশের সমাপ্তি, যে-অংশের উদ্দেশ্য দুঃখ ও হতাশাকে জয় করার ব্যাপারে শিষ্যদের সাহায্য করা। জগতের সম্মুখীন শিষ্যেরা অসহায় নন; যিশুতেই তাঁদের নিত্য শান্তি অবস্থিত, অর্থাৎ যিশুর সঙ্গে সংযোগেই, তাঁর সঙ্গে একই জীবন যাপনেই তাঁরা শান্তি ও আনন্দ ভোগ করেন। সুতরাং এখানে শান্তি বলতে নিরুদ্বেগ ও শিথিলতার কথা বোঝায় না; শান্তি হল সেই জীবনলোক যা যিশুর শিষ্যদের জন্য উন্মুক্ত; তেমন শান্তিতেই তাঁরা নিম্নলোক-জগতের নির্যাতন থাকা সত্ত্বেও সংরক্ষিত। তাঁরা জগতের উপর যিশুর পরম বিজয়ের অংশী হবেন, ‘কারণ ঈশ্বর হতে যা জনিত, তা-ই জগৎকে জয় করে। আর যে বিজয় জগৎকে জয় করে, তা এ: আমাদের বিশ্বাস। বস্তুত, কেবা জগৎকে জয় করতে পারে, সে-ই ছাড়া যে বিশ্বাস করে, যিশু ঈশ্বরের পুত্র?’ (১ যোহন ৫:৪-৫)।

পরিশিষ্ট

যাচনা বিষয়ে যোহনের শিক্ষা

যাচনা বিষয়ে যিশুর প্রধান শিক্ষা ১৪, ১৫ ও ১৬ অধ্যায়ে সংগৃহীত। একথা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা আমরা জানি যে উল্লিখিত অধ্যায়গুলোতে যিশু আপনজনদের কাছে উত্তমরূপে ও গভীরতমভাবে আত্মপ্রকাশ করেন; সুতরাং বলা যেতে পারে যে, আমাদের

যাচনায় পিতা ও যিশুর সঙ্গে আমাদের ঐক্য-সম্পর্ক প্রকাশ পাওয়া উচিত। যাচনা বিষয়ে যিশুর বচনগুলো সংখ্যায় চারটি:

১। 'তোমরা আমার নামে যা কিছু যাচনা করবে, আমি তা পূরণ করব, পিতা যেন পুত্রে গৌরবান্বিত হন। তোমরা যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচনা কর, তবে আমিই তা পূরণ করব' (১৪:১৩-১৪)।

২। 'তোমরা যদি আমাতে থাক ও আমার সমস্ত কথা তোমাদের অন্তরে থাকে, তাহলে তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা যাচনা কর, তোমাদের জন্য তা-ই করা হবে' (১৫:৭)।

৩। 'তোমরা পিতার কাছে যা কিছু আমার নামে যাচনা কর, তিনি তা তোমাদের দেবেন' (১৫:১৬)।

৪। 'পিতার কাছে তোমরা যদি কিছু যাচনা কর, তিনি আমার নামে তোমাদের তা-ই দেবেন। এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই যাচনা করনি; যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হতে পারে।… সেদিন তোমরা আমার নামে যাচনা করবে, আর আমি যে তোমাদের জন্য পিতাকে অনুরোধ করব, একথা তোমাদের বলছি না; কেননা পিতা নিজেই তোমাদের ভালবাসেন' (১৬:২৩-২৭)।

এই বচনগুলোর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনটি ধারণা প্রকাশ পায়:

খ্রিষ্ট সম্বন্ধীয় ধারণা (১৪:১৩-১৪; ১৫:১৬; ১৬:২৩-২৭): এখানে 'আমার নামে' কথার উপরেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়; তাতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য যে, যাচনা এমন একটা ক্রিয়াকর্ম যা যিশুর নামে করা উচিত। আদি থেকে খ্রিষ্টমণ্ডলী 'যিশুর নামে'ই সমস্ত যাচনা-প্রার্থনা সমাপ্ত করে ('… আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের নামে')। অবশ্যই, 'যিশুর নাম' একটা জাদুমন্ত্র নয় বরং সেই উক্তি উচ্চারণ করে আমরা যেন যিশুর মধ্যস্থতায় আমাদের আস্থা প্রকাশ করি: যিশুই আমাদের পরিত্রাণের উৎস, তিনিই আমাদের ত্রাণকর্তা, পরিত্রাণ পাবার জন্য আমরা শুধু তাঁর নামেই প্রত্যাশা রাখতে পারি। যিশুর নামে পিতার চরণে আমাদের যাচনা রেখে আমরা স্বীকার করি যে সত্যিই যিশুই পিতার সেই প্রেরিত ত্রাণকর্তা।

চরমকাল সম্বন্ধীয় ধারণা (১৬:২৬): এই বচনের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল যে, যে শিষ্যেরা যিশুর সঙ্গে পূর্ণ সংযোগে সংযুক্ত তাঁরা এবিষয়ে নিশ্চিত আছেন যে, তাঁরা পিতার ভালবাসার পাত্র। যিশুর পুনরুত্থানের পর (অর্থাৎ চরমকালে) তাঁরা তাঁর সঙ্গে ও পিতার সঙ্গে এমন পূর্ণ সংযোগে সংযুক্ত থাকবেন যে, আর কোনও কিছু যাচনা করার প্রয়োজন থাকবে না, বা প্রয়োজন হলে তাঁরা পিতার চরণে যিশুতেই নিজেদের যাচনা রাখবেন, ফলে তাঁদের যাচনা অবশ্যই পূরণ করা হবে। সুতরাং, প্রার্থনা করতে গিয়ে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ দিক স্মরণে রাখতে হয় যাতে আমাদের অন্তরে বসবাসকারী যিশুই আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন ও একাধারে আমাদের প্রার্থনা যেন পিতা দ্বারাই অনুপ্রাণিত প্রার্থনা হয়। এভাবেই আমাদের প্রার্থনা সত্যিই ঈশ্বরেরই মন অনুসারে প্রার্থনা হবে, এবং একথাও প্রমাণিত হবে যে, সত্যিই আমরা যিশু ও পিতার সঙ্গে সংযুক্ত।

ঐক্য সম্বন্ধীয় ধারণা (১৫:৭): যাচনা বা প্রার্থনার সময় কী ঘটে? যিশুর সঙ্গে আমাদের সেই ঐক্যই সিদ্ধি লাভ করে, যে-ঐক্য পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ঐক্যের প্রতিবিম্ব; তেমন ঐক্যগুণেই আমাদের সকল যাচনা পূরণ করা হবে, কেননা আমাদের যাচনা কেমন যেন ঈশ্বর থেকেই উদ্গত, এমনকি আমাদের যাচনায় কেমন যেন ঈশ্বরের ইচ্ছাই প্রকাশিত। অন্য কথায় বলতে পারি যে, যে প্রার্থনা করে সে যিশুর মত বলে, 'আমি সর্বদা তাঁর মনোমত কাজ করে থাকি' (৮:২৯) এবং 'পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ,… আমি তো জানতাম, তুমি সর্বদাই আমার কথা শোন' (১১:৪১-৪২): যেমন যিশু পিতার কথা শোনেন তেমনি পিতা যিশুর কথা শোনেন।

সুতরাং, প্রার্থনা করাই হল পুত্রে বসবাস করা, তাঁর মত পিতার কথা শোনা এবং তাঁর মত নিশ্চিত হওয়া যে, পিতাও আমাদের কথা শোনেন; তাতে প্রার্থনা আনন্দের উৎসে পরিণত হয়, কেননা প্রার্থনায় ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ঐক্য প্রমাণিত হয় এবং ঈশ্বরের উপর সেই প্রত্যয়-মনোভাবও উৎপন্ন হয় যা সম্বন্ধে যোহন লিখেছেন, 'তাঁর কাছে আমাদের যে দৃঢ় প্রত্যয় আছে, তা এ: আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কোন যাচনা করলে তিনি আমাদের কথা শোনেন' (১ যোহন ৫:১৪)।

সহজে অনুমান করা যায়, যাচনা বিষয়ে এই শিক্ষা সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের শিক্ষার চেয়ে গভীর; এ প্রেক্ষিতেও যোহন আদি খ্রিষ্টমণ্ডলীর সাধারণত প্রচলিত শিক্ষার চেয়ে অনেক এগিয়ে যান। কিন্তু, যোহনের এই শিক্ষা যত গভীর হোক না কেন, আমরা যেন মনে না করি যে, কঠিন বলে তা পালন করা অসাধ্য। বস্তুত আমাদের সচেতন হওয়া উচিত যে আমাদের উত্তম ও প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্ষেত্রে আমরা কিছুই যাচনা করি না যা পিতা দ্বারা আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত না হয় এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা জাগরিত না হয়। ঈশ্বর নিজেই যখন আমাদের উত্তম আশা-আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত ও জাগরিত করেন, তখন অনুমান করা যায় তিনি সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণও করতে উৎসুক। সুতরাং, প্রার্থনা করতে গিয়ে আমরা দুর্ভাবনা করব না কেমন যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে বলপ্রয়োগে কিছু আদায় করতে চাই, বরং প্রত্যয়-মনোভাব নিয়ে তাঁর হাতে নিজেদের সঁপে দেব; প্রার্থনার জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করেন বলে অবশ্যই তিনি সেই প্রার্থনা পূরণ করবেন, ঐশজীবন দান করবেন, আমাদের ত্রাণ করবেন।

বিদায় উপদেশ (৪র্থ খন্ড)

(১৭ অধ্যায়)

বিদায় উপদেশের এই চতুর্থ খন্ড সাধারণত ‘মহাযাজক খ্রিষ্টের প্রার্থনা’ বলে পরিচিত; বিদায় উপদেশের অন্যান্য খণ্ডের বৈষম্যে (১৪-১৬ অধ্যায়) এই খন্ড এমন প্রার্থনার আকার ধারণ করে গাম্ভীর্যপূর্ণ যে-প্রার্থনা যিশু সকল শিষ্যের সামনে পিতার চরণে নিবেদন করেন। তবু সেই খন্ডগুলোর সঙ্গে সাধারণ সম্পর্কও রয়েছে, তথা: তার প্রধান আলোচ্য বিষয়ও হল যিশুর গৌরবায়ন, এবং এই প্রার্থনাও জগৎনিবাসী ভাবী খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের লক্ষ করে।

বার বার একথা উত্থাপন করা হয়েছে যে, জায়গা বিশেষে যোহনের সুসমাচার পুরাতন নিয়মের উপর নির্ভর করে; এই অধ্যায় পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রাপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ের সঙ্গেই বিশেষত একটা সম্পর্ক প্রতীয়মান, তথা: মনোনীত জাতির ইতিহাসের পরিচালনার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসাগান করে মোশি ইস্রায়েলের কাছে পূর্বে দেওয়া আজ্ঞা ও চিহ্নকর্মগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। একাধারে, যিশুর এই প্রার্থনায় এমন উপাদান বিদ্যমান যা আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীকালে প্রচলিত ‘দিদাখে’ প্রার্থনাপুস্তকেও বর্তমান, ফলত এই সত্যের উদয় হয় যে, যোহনের স্থানীয় মণ্ডলীতে যিশুর এই প্রার্থনা সম্ভবত উপাসনাকালেই ব্যবহৃত ছিল। আবার, যেমন যোহনের সুসমাচারের অন্যান্য জায়গায় লক্ষ করেছি, তেমনি এই প্রার্থনায়ও বিভিন্ন ঐশতাত্ত্বিক ধারণা একযোগে অনুধাবিত, যেগুলোর মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ যিশুর মাধ্যমে যা আয়ত্ত করেছে তা গভীর ধ্যানে মূল্যায়ন করতে পারে, তথা: ঈশ্বরে ও তাঁর ভালবাসায় স্থিত সেই জীবন যা আন্তর আনন্দে পূর্ণ।

বলা বাহুল্য, আন্তর ধ্যানের প্রতি এবং ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর সঙ্গে ঐক্যের প্রতি এই আহ্বান বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপেই মাত্র নিযুক্তপ্রায় বর্তমানকালের মানুষের পক্ষেও প্রযোজ্য ও উপযোগী। জগতের মধ্যে বাণীপ্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত খ্রিষ্টমণ্ডলীর পক্ষে আন্তর ধ্যান ও ঈশ্বরের সঙ্গে ঐক্যের গভীর উপলব্ধির উপর স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

১৭ [১] এই সমস্ত কথা বলার পর যিশু স্বর্গের দিকে চোখ তুলে বললেন, 'পিতা, সেই ক্ষণ এসেছে: তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারেন, [২] কারণ তুমি তাঁকে যাদের দিয়েছ, তাদের সকলকেই অনন্ত জীবন দান করার জন্য তুমি তাঁকে সমস্ত মর্তমানুষের উপর অধিকার দিয়েছ। [৩] এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশুখ্রিষ্টকে জানবে। [৪] তুমি আমাকে যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলে, তা সম্পন্ন করায় আমি পৃথিবীতে তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি। [৫] পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর।

[৬] জগতের মধ্য থেকে যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই সকল মানুষের কাছে আমি তোমার নাম প্রকাশ করেছি। তারা তোমারই ছিল, তাদের তুমি আমাকেই দিয়েছ, আর তারা তোমার বাণী পালন করেছে। [৭] তারা এখন জানে যে, তুমি আমাকে যা কিছু দিয়েছ, সবই তোমা থেকে এসেছে; [৮] কারণ যে সমস্ত কথা তুমি আমাকে দিয়েছিলে, তা আমি তাদের দিয়েছি, আর তারা তা গ্রহণ করেছে, এবং সত্যি জানে যে, আমি তোমার কাছ থেকে এসেছি, এবং বিশ্বাসও করেছে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ। [৯] আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করছি; জগতের জন্য প্রার্থনা করছি না, কিন্তু যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তাদেরই জন্য প্রার্থনা করছি, কারণ তারা তোমারই। [১০] যা কিছু আমার, তা সমস্তই তোমার; এবং যা তোমার, তা আমার, এবং এইভাবেই আমি তাদের অন্তরে গৌরবান্বিত। [১১] আমি এজগতে আর থাকছি না, তারা কিন্তু এজগতে থাকছে, আর আমি তোমার কাছে আসছি।

পবিত্র পিতা, তোমার যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে তাদের রক্ষা কর: আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনি এক হয়। [১২] যতদিন আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম, তুমি যে নাম আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে আমি তাদের রক্ষা করে এসেছি, তাদের নিরাপদে রেখেছি, এবং সেই বিনাশ-পুত্র ছাড়া, কেউই তাদের মধ্যে বিনষ্ট হয়নি, যেন শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হয়। [১৩] কিন্তু আমি এখন তোমার কাছে আসছি; এবং জগতে থাকতেই এই সমস্ত কথা বলছি যেন তারা আমার আনন্দ পরিপূর্ণভাবে নিজেদের অন্তরে পেতে পারে। [১৪] আমি তাদের তোমার

বাণী দিয়েছি, আর জগৎ তাদের ঘৃণা করল, কেননা তারা জগতের নয়, আমিও যেমন জগতের নই। [১৫] আমি তো এমন প্রার্থনা করছি না, তুমি যেন জগতের মধ্য থেকে তাদের তুলে নাও, কিন্তু তুমি যেন সেই ধূর্তজন থেকে তাদের রক্ষা কর। [১৬] তারা তো জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই।

[১৭] সত্যে তাদের পবিত্রীকৃত কর, তোমার বাণীই সত্যস্বরূপ। [১৮] তুমি যেমন আমাকে জগতের মধ্যে প্রেরণ করেছিলে, আমিও তেমনি তাদের জগতের মধ্যে প্রেরণ করলাম, [১৯] আর তাদেরই খাতিরে আমি নিজেকে পবিত্রীকৃত করছি, তারাও যেন সত্যে পবিত্রীকৃত হতে পারে। [২০] আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, [২১] সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে, যাতে জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছিলে। [২২] তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ, আমি তা তাদের দিয়েছি, তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক: [২৩] আমি তাদের অন্তরে আর তুমি আমাতে, তারা যেন পরিপূর্ণরূপেই এক হয়, যাতে জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ এবং আমাকে যেমন ভালবেসেছ, তেমনি তাদেরও ভালবেসেছ।

[২৪] পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যাতে আমার সেই গৌরব দেখতে পায়, সেই যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছ; কেননা জগৎপত্তনের আগেই তুমি আমাকে ভালবেসেছ। [২৫] হে ধর্মময় পিতা, জগৎ তোমাকে জানেনি, কিন্তু আমি তোমাকে জেনেছি, এরাও জেনেছে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ। [২৬] আমি তোমার নাম তাদের জানিয়েছি আর জানাতে থাকব; যে ভালবাসায় তুমি আমাকে ভালবেসেছ, সেই ভালবাসা যেন তাদের অন্তরে থাকে, এবং আমিও যেন তাদের অন্তরে থাকি।’

১৭:১—স্বর্গের দিকে চোখ তুলে… : যিশু স্বর্গস্থ পিতার প্রতি মন উত্তোলন করেন। এসময়টা গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য পূর্ণ সময়: যে ‘ক্ষণের’ দিকে যিশুর পৃথিবীময় জীবনযাত্রা ধাবিত, সেই ‘ক্রুশ, গৌরব ও স্বর্গারোহণ-ক্ষণ’ এসে গেছে। পুত্র পিতাকে

গৌরবান্বিত করেছেন বিধায় পিতাও পুত্রকে গৌরবান্বিত করবেন। কিন্তু নিজের গৌরব চাওয়াতে পুত্র এই উদ্দেশ্যই মাত্র পূরণ করতে উৎসুক: পিতা যেন এতে গৌরবান্বিত হন। বাস্তবিকই, এই পারস্পরিক গৌরবায়নে যিশু তাঁর নিজের বিশিষ্ট ও স্বকীয় পরিত্রাণদায়ী অধিকার অনুশীলন করেন: পিতা তাঁর হাতে যাদের দিয়েছেন, অর্থাৎ যে বিশ্বাসীমণ্ডলী পিতার উপরে স্থাপিত ও তাঁর দ্বারা পরিচালিত, সেই মণ্ডলীর কাছে ঐশজীবন দান করা।

১৭:৩—এটিই অনন্ত জীবন: বাইবেলের ভাষায় 'ঈশ্বরকে জানা' বলতে তাঁর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা করা বোঝায়; যে-সহভাগিতা বা সংযোগ যোহনের ধারণায় হল খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সংযোগের উদ্দেশে (অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগের উদ্দেশে) পরিচালনাকারী যিশুর মাধ্যমেই অনন্ত জীবন প্রাপ্য।

১৭:৪—আমি পৃথিবীতে তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি: পৃথিবীতে তাঁর প্রেরণকর্ম সম্পন্ন করে যিশু গৌরবপ্রকাশের জন্য প্রস্তুত, অর্থাৎ পিতার কাছে আপন প্রাক্তন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হতে প্রস্তুত। আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর অন্যান্য লেখা অনুসারে (ফিলি ২:৬-১১ প্রভৃতি লেখা দ্রষ্টব্য) পৃথিবীতে যিশুর অপমানপ্রাপ্তির পরবর্তী গৌরবলাভ তাঁর পূর্বাবস্থার চেয়ে উন্নতি বলে অনুধাবন করা হত, অপর দিকে যোহনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিশ্বাসীদের অংশী করার জন্য এর মধ্যেই তিনি সেই গৌরব পুনর্লাভ করেন, যে-গৌরব অনাদিকাল থেকেই তাঁর অধিকার, পুত্র বলেও তাঁরই অধিকার। যে গৌরব 'জগৎ হবার আগে' যিশুর ছিল বলতে একথা বোঝায় যে, ঐশবাণী জগৎসৃষ্টির আগেই বিদ্যমান ছিলেন, এমনকি জগতের মাহাত্ম্যের চেয়ে ঐশপ্রকাশকর্তারূপে তাঁর মাহাত্ম্য অনেক বেশি।

১৭:৬—জগতের মধ্য থেকে যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ… : পিতা যিশুর হাতে যাঁদের দিয়েছেন তাঁরা হলেন যিশুর শিষ্যগণ যাঁরা এই প্রার্থনাকালে উপস্থিত হয়ে তাঁর

বাণী শোনেন ও মেনে চলেন, এবং বিশ্বাস রাখেন যে তিনি পিতার সেই প্রেরিতজন। এই শিষ্যগণই পৃথিবীস্থ যিশুর আত্মপ্রকাশের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী, তবু তাছাড়া তাঁরা ভাবীকালের সকল বিশ্বাসীর প্রতিনিধিও। এভাবে যিশুর কথা সেই ভাবীকালের শিষ্যদেরও লক্ষ করে যারা যিশুকে স্বচক্ষে না দেখলেও তবু তাঁর আত্মপ্রকাশ মেনে চলবে এবং প্রমাণ করবে যে তারা ঈশ্বরের। এদের কাছে যিশু পিতার নাম অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ, পবিত্রতা, ধর্মময়তা ও ভালবাসা প্রকাশ করলেন।

১৭:৭—তারা এখন জানে যে… : যিশুর এই প্রার্থনায় 'বিশ্বাস'এর চেয়ে 'জানা' শব্দই বিশেষত ব্যবহৃত, জানা-ই যেন বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠ পর্যায় : অবিশ্বাসী জগতের বৈষম্যে শিষ্যদের বিশ্বাস গভীর আন্তর জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৭:৮—যে সমস্ত কথা তুমি আমাকে দিয়েছিলে… : যিশুর বাণী গ্রহণ করায়ই এবং পিতার প্রেরিতজনরূপে যিশুকে ও প্রেরণকর্তারূপে পিতাকে গ্রাহ্য করায়ই শিষ্যেরা এই গভীর জ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়ে উঠলেন। এবং তাঁদের এই গভীর জ্ঞানলাভের ফলে তাঁরা যিশুর প্রার্থনার ও পিতার যত্নের পাত্র হবার যোগ্য হলেন।

১৭:৯—আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করছি: অবিশ্বাসী জগৎ ঐশলোক থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছে বিধায় তার সংরক্ষণ ও পবিত্রীকরণের জন্য প্রার্থনা করা নিরর্থক কাজ। তা সত্ত্বেও জগৎ এখনও পরিত্রাণ পেতে পারে; এই ভার খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভার, যে-মণ্ডলী ঐশআদর্শ অনুসারে একাত্ম হলে যিশুর সাক্ষ্য বহন করবে (১০:২৩): মণ্ডলীর পক্ষে জগতের মধ্যে ঈশ্বরের চিহ্নস্বরূপ হওয়া উচিত, তার সকল সদস্য ঈশ্বরের সেই আপনজন বলে নিজেদের মনে করুক যাদের পিতা দ্বারা যিশুর হাতে দেওয়া হয়েছে এবং যিশু দ্বারা পুনরায় পিতার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৭:১০—যা কিছু আমার, তা সমস্তই তোমার: যিশু তাঁর আপনজনদের পিতার হাতে সঁপে দেন; এই ধারণা ১০ অধ্যায়েও নির্দেশিত হয়েছিল: মেষগুলো মেষপালক যিশুরই বটে, কিন্তু একাধারে পিতারই সম্পদ, এবং মেষগুলোর প্রতি যিশুর যত্নে সেই পিতারই নিজের যত্ন দেখা উচিত যাঁর সঙ্গে যিশু এক। সুতরাং, যিশু এজগৎ ছেড়ে যাওয়ার সময়ে, পিতা তাঁর নিজের ও যিশুরও অধিকার এই সকল মানুষকে রক্ষা করবেন।

শিষ্যেরা নিজেদের মধ্যে যিশুর বাণী পিতারই বাণী বলে গ্রহণ করেছেন বিধায় যিশু তাঁদের মধ্যে গৌরবান্বিত। পৃথিবীতে তাঁর প্রেরণকর্মের একটা অংশ ছিল সেই বিশ্বাসীদের সংগ্রহ করা যাদের পিতা তাঁর হাতে দিয়েছিলেন। সেই বিশ্বাসীগণ অর্থাৎ বিশ্বাসীমণ্ডলী যিশুর কাজ সপ্রমাণ করে বিধায় তাঁকে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বাধ্য সম্পাদনকারী বলেও প্রকাশ করে। পিতা যখন এখন যিশুকে গৌরবান্বিত করতে যাচ্ছেন, তখন নিজের সহায়তায় বিশ্বাসীদের গ্রহণ করায়ও যিশুকে গৌরবান্বিত করুন।

১৭:১১ক—আমি এজগতে আর থাকছি না: জগৎ ছেড়ে যাওয়ার সময়ে যিশু জগতের মধ্যে প্রবাসী শিষ্যদের জন্য উদ্বিগ্ন।

১৭:১১খ—পবিত্র পিতা… : পুরাতন নিয়ম অনুসারে ঈশ্বর আপন ঈশ্বরত্ব গুণেই পবিত্র ছিলেন, আবার মানব-জগতের চেয়ে তাঁর অনতিক্রমণীয় ব্যবধানের জন্যও 'পবিত্র' ছিলেন (অর্থাৎ 'আমি ঈশ্বর, মানুষ নয়')। যোহনের মতে পুত্রের মধ্যে নিজের সত্তা প্রকাশ করায়ই পিতার 'পবিত্রতা' পরিস্ফুট, আর সেই সত্তা বিশ্বাসীদেরও দেওয়া হয়, আর সেই সত্তা আবার তাদের পবিত্র অর্থাৎ জগৎ থেকে পৃথক করে তোলে। সুতরাং, এখানে 'পবিত্র' বলতে ব্যবধান নয়, সহায়ক উপস্থিতিই বোঝায়, কেননা যিশুর চলে যাওয়ার সময় পবিত্র পিতাই সেই শিষ্যদের সংরক্ষিত ও বলবান করবেন তারা যেন যিশুর দেওয়া শিক্ষা মেনে চলতে পারে। শিষ্যদের ঐক্য পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ঐক্যের অনুরূপ হওয়া দরকার।

১৭:১২ক—যতদিন আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম… : শিষ্যদের সঙ্গে থাকাকালে যিশুই তাঁদের ঐক্য-বন্ধনস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু, তাঁর চলে যাওয়ার পরও তাঁরা সেই ঐক্য মেনে চলবেন, কেননা ঐক্যই হল ঈশ্বরত্বের অভিব্যক্তি ও তার চিহ্ন: যিশু যে পিতার নামে শিষ্যদের রক্ষা করেন, এতে পরিত্রাণলাভের জন্য যাতে তাঁরা বিশ্বাসে বলবান হয় এই উদ্দেশ্যে যিশুর সংরক্ষণ শুধু নয়, বরং নিম্নলিখিত মহাকাজই প্রকৃতপক্ষে লক্ষ করা হয়: যিশু ঈশ্বরের আন্তর সত্তা বা জীবনে শিষ্যদের অনুপ্রবেশ করান, পিতার সেই ভালবাসা ও আনন্দ তাঁদের দান করেন, যে-ভালবাসা ও আনন্দে তিনি নিজে জীবনযাপন করলেন।

১৭:১২খ—কেউই তাদের মধ্যে বিনষ্ট হয়নি: খ্রিষ্টমণ্ডলী স্মরণ করবে যে ঐশসংযোগ থেকে বিচ্ছিন্নতা মানে পরিত্রাণ থেকেই বিচ্যুতি, জগতের কবলে অধঃপতন এবং সেই ধূর্তজনের আধিপত্যে দাসত্ব (১ যোহন ২:১৮; ৪:৩; ৫:১৯খ)।

১৭:১৩—জগতে থাকতেই এই সমস্ত কথা বলছি: জগতের মধ্যে বিক্ষিপ্ত শিষ্যদের অবস্থা যিশু অবগত আছেন: তিনি চান তাঁরা এই নির্যাতন-অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও তাঁর আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে থাকবেন যাতে জগতের বিরোধিতাকে জয় করতে পারেন (‘পরিপূর্ণ আনন্দ’ বিষয়ে ১৫:১১ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

১৭:১৪—আমি তাদের তোমার বাণী দিয়েছি: যেমন ‘নাম’ প্রকাশে, তেমনি পিতার বাণী প্রকাশেও যিশু শিষ্যদের কাছে পিতার সত্তাকেই দান করেছেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই জগতের ঘৃণাও এসেছে যা ঈশ্বর হতে উদ্গত মানুষকে বিরোধিতা করে।

১৭:১৫—জগতের মধ্য থেকে তাদের তুলে নাও: সেই ধূর্তজন দ্বারা প্রভাবান্বিত জগতের মধ্যে আপন কাজ সম্বন্ধে মণ্ডলীকে সচেতন হতে হয়; স্বয়ং যিশু সেই ধূর্তজনের সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু ক্রুশের মাধ্যমে তাকে পরাজিত করেছেন।

১৭:১৬—সত্যে তাদের পবিত্রীকৃত কর: 'ঈশ্বরের নাম' ও 'সত্য' একই অর্থবহ শব্দ। অতএব এই বচনের তাৎপর্য হল: 'তোমার ঐশসত্তায় তাদের গ্রহণ কর', বা 'তোমার ঐশসত্তায় তাদের ঘিরে রাখ ও সঞ্জীবিত কর'। জগতের মধ্যে তাঁদের কর্মসাধনের জন্য শিষ্যদের ঐশসত্যে পরিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ তাঁরা সচেতন হবেন যে, ঈশ্বরের যে বাণী যিশু তাঁদের দিয়েছেন, তাঁরা সেই বাণীকে বাস্তবতা ও শক্তি বলেই নিজেদের মধ্যে বহন করেন। যিশুর বাণীর সঙ্গে এই বন্ধনই 'পবিত্রতা' বিষয়ে ইহুদী ধারণা থেকে খ্রিষ্টমণ্ডলীকে পৃথক করে; কেননা ইহুদী ঐতিহ্য অনুসারে ঈশ্বরের আজ্ঞাবলি পালনেই সর্বাপেক্ষা সেই পবিত্রতা পাওয়া যায়, অর্থাৎ তাদের মতে ঈশ্বর তাঁর দেওয়া বিধানের মাধ্যমে মানুষকে পবিত্রীকৃত করেন। অপর দিকে যোহনের কথা এ: ঐশবিধানের স্থান যিশুই দখল করেছেন, তিনিই পরিত্রাণদায়ী ও পবিত্রতাদানকারী ভূমিকা-সকল সম্পাদন করেন: যিশুই মানুষকে জীবন দান করেন (৫:৩৮; ৮:৫১), পরিশুদ্ধ (১৫:৩) ও মুক্ত (৮:৩১…) করেন এবং নতুন আজ্ঞাদানে ভালবাসার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন (১৩:৩৪; ১৫:১২)। ফলত, যিশুর বাণীই (যে বাণীতে ঈশ্বরের বাণীই বর্তমান) হল ইহুদী ধর্ম ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যকার ব্যবধানের সীমারেখা।

১৭:১৮—তুমি যেমন আমাকে জগতের মধ্যে প্রেরণ করেছিলে… : পিতা যেন জগৎ থেকে শিষ্যদের তুলে না নেন, যিশু তা-ই মাত্র চান না এমন নয়, যেহেতু তিনি জগতের মধ্যেই পর্যন্ত তাঁদের প্রেরণ করলেন! শিষ্যদের অজাগতিক বৈশিষ্ট্য ও তাঁদের পবিত্রীকরণের ইচ্ছা জগৎ থেকে তাঁদের পলায়নের কারণ নয় বরং এমন একটি আহ্বান তাঁরা যেন জগতের মধ্যে যিশুর শুরু করা কাজ সম্পন্ন করেন। যেমন যিশু পিতা দ্বারা পবিত্রীকৃত হয়েছিলেন (১০:৩৬) এবং জগতের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তেমনি যিশু

আপন শিষ্যদের পবিত্রীকৃত করতে ও জগতের মধ্যে প্রেরণ করতে চান: যিশুর কাজ ও শিষ্যদের কাজ ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ; আর সেই কাজ স্বর্গে নয় জগতেই সম্পন্ন করা চাই, তার মানে: সেই কাজ জগতের অ-ঐশ্বরিক স্বরূপের তাত্ত্বিক একটা বৈপরীত্য নয়, এবং বাণীপ্রচারকর্মও সম্প্রসারণমূলক প্রবল একটা প্রচেষ্টার পর্যায়েও সঙ্কুচিত করা যায় না: সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্যই (১৮:৩৭) এবং পিতার কাছে তিনি যা যা দেখেছেন ও শুনেছেন তা-ই জগতের সামনে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করার জন্যই যিশু এজগতে প্রেরিত হয়েছিলেন, আর তাঁর কণ্ঠস্বর যুগ যুগান্তর ব্যাপী শিষ্যদের মধ্য দিয়েও জগতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। কিন্তু, যেমন যিশুর বেলায় সত্য হতে উদ্গত মানুষই মাত্র তাঁর কথা মেনে চলছে, তেমনি শিষ্যদের বেলায়ও তাই হবে (১৫:২৭)। আদি থেকে যাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন (১৫:২০), তাঁদেরই সাক্ষ্যদান এবং মণ্ডলীরই ঐক্যের আদর্শ জগতের কাছে প্রমাণ করবে যে, পিতা ঈশ্বর যিশুকে প্রেরণ করেছেন এবং মণ্ডলীর কাছে আপন ভালবাসা দান করেছেন (১৭:২৩): যে-সাক্ষ্যদান বিশ্বাসেই যিশুর বাণীকে প্রচার করে আর পারস্পরিক ভালবাসায় এবং ঐক্যে ঈশ্বরের ভালবাসাকে দৃশ্যমান ও বাস্তব করে তোলে, সেই সাক্ষ্যদানেই বাণীপ্রচারজনক অচিন্তনীয় শক্তি ও প্রভাব বিরাজিত।

১৭:১৯—তাদেরই খাতিরে আমি নিজেকে পবিত্রীকৃত করছি: যখন শিষ্যদের যিশুর কাজ সম্পন্ন করতে হয়, তখন তাঁদেরও পবিত্রীকৃত হওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে মধ্যস্থরূপে যিশু উপস্থিত: পবিত্রীকরণটা সাধিত হয় পিতার ইচ্ছার প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ বাধ্যতা গুণে, কেননা সেই বাধ্যতার মাধ্যমে তিনি ক্রুশ-মৃত্যু পর্যন্তই আপন প্রাণ অবিরত অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করেন।

১৭:২০—আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়: এই বচন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে সেই সকল মানুষকে লক্ষ করে যারা শিষ্যদের প্রচারে যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখবে। শিষ্যেরা যিশুর যে বাণী ঈশ্বরেরই বাণী বলে পেয়েছেন (১৭:১৪, ১৭খ) সেই বাণীকে আপন কথা বলেই প্রচার করবেন: বিশ্বাসীমণ্ডলীর পরিপ্রেক্ষিতেই বিশেষত

একথা বলা হয়, মণ্ডলীই সেই খেত যেখানে শিষ্যেরা ও তাঁদের পরবর্তী অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রচারকবৃন্দ আপন কথায়ই যিশুর বাণীর সাক্ষ্য দেন (১ যোহন ১:১-৪)। নিঃসন্দেহে এই বচনে বাণীপ্রচার-সম্প্রসারণসূচক একটা আনুষঙ্গিক তাৎপর্যও সূচিত।

১৭:২১—সকলেই যেন এক হয়: বর্তমানকালে সাধারণত এই বচনের ব্যাখ্যা খ্রিষ্টমণ্ডলীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পুনর্মিলনের দিকে লক্ষ করে, তবু এ ধরনের ব্যাখ্যা সম্ভবত যোহনের ধারণা অনুযায়ী নয়। বস্তুত সেই কালে যে সম্প্রদায় প্রধান মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, তাকে 'খ্রিষ্টীয়' আখ্যা আর দেওয়া হত না (১ যোহন ২:২২; ৪:৩)। সুতরাং, যিশুর প্রার্থনা তাদেরই জন্য মাত্র যারা তাঁর প্রকৃত মণ্ডলীভুক্ত।

খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐক্য এমন হওয়া উচিত যা পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ঐক্যের প্রতিবিম্ব: যেমন পিতা ও পুত্র এক, তেমনি খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণও পিতা ও যিশুর মধ্যকার ঐক্যে প্রবেশ করে এক হবে। এ প্রসঙ্গে ১৩:৩৪-এর সঙ্গে তুলনা করা অতিশয় বাঞ্ছনীয়: প্রথম, মুখ্য ধারণা ব্যক্ত হয় (সেখানে ছিল পারস্পরিক ভালবাসার নতুন আজ্ঞা, এখানে বিশ্বাসীদের ঐক্য); তারপর ধারণাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয় এবং অবশেষে পুনরায় তা জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়। পদ দু'টোর মধ্যকার ভাষাগত মিল থেকে সেগুলোর ধারণাগত মিলও অনুমেয়: খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ঐক্য পারস্পরিক ভালবাসায়ই বাস্তব রূপ পায়; ঐক্য ও পারস্পরিক ভালবাসা একই মুদ্রার দুই পৃষ্ঠার মত অবিচ্ছেদ্য: যিশুর ভালবাসার তুল্য পারস্পরিক ভালবাসার আজ্ঞার অনুরূপে পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিরাজমান ঐক্যের তুল্য বিশ্বাসীদের ঐক্য নির্দেশ করা হয়। পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ঐক্য হল ত্রিত্বের সেই ঐক্যের ভিত্তি যা ঐশভালবাসায় প্রকাশিত ও রূপায়িত। আগেও (১৪:২০-২৩) বলা হয়েছিল যে, শিষ্যেরা পিতা ও যিশুর মধ্যকার ঐক্য ভালবাসায়ই অনুভব করতে সক্ষম হবেন, কেননা তাঁদের নিজেদেরও এই ঐশভালবাসার বন্ধনে গ্রহণ করা হবে। এই বচন অনুসারেও যিশু ও পিতার মধ্যকার ঐক্য বিশ্বাসীদের ঐক্যের আদর্শ মাত্র নয়, বরং তাঁদের ঐক্য বাস্তবায়নের জীবন্ত ভিত্তিস্বরূপ; ঐক্য যে বাহ্যিক শান্তি তা নয় বরং এমন যা ঈশ্বরেই প্রতিষ্ঠিত ও তাঁর

ভালবাসায় সঞ্জীবিত, 'ঊর্ধ্ব থেকে' সঞ্চারিত এবং ফলত পারস্পরিক ভালবাসায় প্রমাণিত।

ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে ও পারস্পরিক ভালবাসা পালনেই খ্রিষ্টমণ্ডলী ঈশ্বর থেকে দূরবর্তী সেই জগতের কাছে সাক্ষীরূপে দাঁড়াতে পারে, কেননা সেই জগৎ হল পিতার ভালবাসার পাত্র (৩:১৬), এবং সেই জগতের জন্য যিশু প্রাণপণে ত্রাণকর্ম সাধন করলেন (৩:১৭; ১৭:২)।

ঈশ্বরের প্রেরিতজনের প্রতি জগৎ বিশ্বাস রাখবে এই আকাঙ্ক্ষায় যোহনের মণ্ডলীর বাণীপ্রচার-সম্প্রসারণমূলক আকর্ষণের অভিব্যক্তি ঘটে।

১৭:২২—তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ… : জগতের মাঝে প্রেরিত শিষ্যদের কাছে যিশু যা যা দান করেছেন তা এই বচনে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত। সুতরাং, এখানে 'গৌরব' বলতে সেই ঐশজীবনকে নির্দেশ করা হয় যে-জীবন ইতিমধ্যে শিষ্যেরা পেয়ে গেছেন কিন্তু ঐশলোকেই শুধু সম্পূর্ণরূপে পেয়ে যাবেন। ঐশভালবাসার প্রভা ও শক্তি রূপে এই ঐশজীবন শিষ্যদের মধ্যে যতখানি বিরাজিত, তাঁদের মধ্যে ঐক্যও ততখানি বিরাজ করবে। এটিই যোহনের 'বর্তমান পরিত্রাণ' তত্ত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়: খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিত্রাণ বর্তমান, এবং এমন অপর্যাপ্ত পরিমাণে তাঁদের দান করা হয় যে, 'পরিত্রাণ' আর নয় 'গৌরব' শব্দই এখন ব্যবহৃত (যোহনের ঐশতাত্ত্বিক ভাষায়, 'গৌরব' হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ)।

১৭:২৩—আমি তাদের অন্তরে আর তুমি আমাতে: যিনি পিতার সঙ্গে এক, সেই যিশুর মাধ্যমেই শিষ্যেরা ঈশ্বরের ঐক্যে বা সংযোগে প্রবেশ-অধিকার পেয়ে গেছেন, এধারণা আগেও আলোচিত হয়েছিল (১০:৩৮; ১৪:১০, ২০, ২৩; ১৫:৪…)। কিন্তু এখানে ধারণাটি অন্য এক দিক অনুধাবন করে: যিশু শিষ্যদের অন্তরে এবং পিতা যিশুতে বিধায়ই শিষ্যেরা পিতার জীবনের অংশী অর্থাৎ ঐশসত্তায় পরিপূর্ণ, এবং ফলত ঐক্য-বন্ধনে সংবদ্ধ। এভাবে মণ্ডলী সূক্ষ্ম ঐক্যে পরিণত হয় এবং একাধারে পারস্পরিক

ভালবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ঐক্যে প্রবেশ করতে আহূত; এতেই জগৎ স্বীকার করবে যে, যিনি খ্রিষ্টমণ্ডলীকে ঐশসত্তার মূর্ত অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত করেন, সেই যিশুই ঈশ্বরের সেই প্রেরিতজন। যে জনমণ্ডলী ঐক্য ও ভালবাসা ব্যক্ত করতে পারে, সেই মণ্ডলীই প্রকৃতপক্ষে ঐশভালবাসার দিব্য ও অলৌকিক একটা চিহ্ন। যিশুর মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর নিজের ভালবাসার মধ্যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সংগ্রহ করলেন (১৬:২৭) এবং তাঁর ভালবাসার শক্তিতে তাদের পরিপ্লুত করলেন। সুতরাং, 'ঐক্য' সম্বন্ধীয় এ সকল বচনের লক্ষ্য এই, যাতে খ্রিষ্টমণ্ডলী সর্বদা এবিষয়ে আত্মসচেতন হয় যে, সে ঈশ্বরেই প্রতিষ্ঠিত, এবং এই আত্মসচেতনতা থেকে সে যেন জগতের সামনে ঈশ্বরের প্রেরিতজন সেই যিশুর সাক্ষ্যদান করার জন্য শক্তি ও প্রেরণা পায়: মণ্ডলীর পক্ষে ঐক্য মহামূল্যবান দিব্য একটি উপহার, তার ঐশমনোনয়নের (১১:৫২) ও ঈশ্বরের সত্যকার জনগণ বলে তার স্বরূপেরও প্রমাণ (১০:১৬)।

১৭:২৪—পিতা, আমি ইচ্ছা করি… : প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ আবার উল্লেখ করে যিশুর প্রার্থনা পরিণামের দিকে এগিয়ে যায়। যেহেতু যিশু জানেন তাঁর নিজের ইচ্ছা ও পিতার ইচ্ছা এক, সেজন্য তিনি আর প্রার্থনা করেন না, বরং নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন: শিষ্যেরা পরমার্থ লাভ করুন, তাঁরা স্বর্গলোকে তাঁর গৌরব দর্শনে তাঁর সঙ্গে এক হোন। যে গৌরব তিনি তাঁদের দিয়েছিলেন তা এমন সাময়িকই উপহার মাত্র, বা সেই পরিপূর্ণ গৌরবের পূর্বাভাস ও পূর্বাস্বাদ যা তাঁর প্রকাশ্য গৌরবে পূর্ণ সংযোগেই তাঁরা পরিপূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করবেন। যিশু স্পষ্ট বলেন, 'আমার গৌরব': পুত্র বলেই তিনি সেই গৌরবলাভের অধিকারপ্রাপ্ত (১:১৪), যে-গৌরবে তিনি অতীতকাল থেকে, জগৎপত্তনের আগেই, পিতার ভালবাসায়ই ভূষিত। তাঁর জীবনকালে তিনি সেই গৌরবের একটা আভাস মাত্র ব্যক্ত করেছিলেন, শিষ্যেরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন (১:১৪), কিন্তু শুধু বিশ্বাসের চোখেই (২:১১; ১১:৪০) তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই প্রার্থনায় যিশু বলেন, শিষ্যেরা তাঁর গৌরব দেখতে পাবে, এতে আমরা বুঝি যে এই দেখাটা তখনই ঘটবে যখন তাঁরা তাঁর কাছে থাকবেন, অর্থাৎ মৃত্যুর পরে। যিশুর সঙ্গে অবিরত থাকা এবং

তাঁর গৌরব দেখা, এই হল খ্রিষ্টমণ্ডলীর আন্তর আশা, যদিও এর মধ্যেই সে পিতার ভালবাসার প্রকাশ অনুভব করে।

১৭:২৫—হে ধর্মময় পিতা… : উত্তরকালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার পর যিশু আবার শিষ্যদের বর্তমান অবস্থার দিকে মন ফেরান : ঈশ্বরের প্রেরিতজনের প্রতি বিশ্বাস রাখায় তাঁরা সেই ধর্মময় পিতার ভালবাসার যোগ্য পাত্র হয়ে ওঠেন যিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রতি সর্বদা অনুকূল ও করুণানিধান (১ যোহন ১:৯)।

১৭:২৬—আমি তোমার নাম তাদের জানিয়েছি: পরিত্রাণের সিদ্ধিলাভের অভিমুখে তীর্থযাত্রী মণ্ডলী সেই ঈশ্বরের নামকে অর্থাৎ তাঁর সত্তাকে সদা গভীরতর প্রকাশ অনুযায়ী ও তাঁর সঙ্গে সদা ঘনিষ্ঠতর সংযোগপ্রাপ্তি অনুযায়ী অনুধাবন করবে, যে-ঈশ্বর ভালবাসার সঙ্গে তার কাছে আত্মপ্রকাশ করেন ও আপন ভালবাসার সদা আন্তরতর স্থলে তাকে গ্রহণ করেন। স্বর্গের লক্ষ্য (১৭:২৪) পৃথিবীস্থ বিশ্বাসীদের আন্তর বিকাশ অস্বীকার করে না, বরং তারা এ জীবনকাল থেকেই সেই লক্ষ্যের দিকে ক্রমবর্ধমানভাবেই ছুটে চলবে, স্বয়ং যিশু পিতার সত্তা জানাতে থাকবেন—অবশ্যই পবিত্র আত্মার মাধ্যমে, যাঁর মধ্য দিয়ে তিনি আপনজনদের কাছে সদা বর্তমান। মণ্ডলীর কাছে পুনরুত্থিত যিশুর উপস্থিতির ফলে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের ‘নাম’ বিষয়ে অধিকতরভাবে সচেতন হয়ে ওঠে এবং তাঁর ভালবাসাকে আরও প্রচুর পরিমাণে লাভ করে। ঈশ্বরের ‘নাম’ ও ‘ভালবাসা’ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরিপূরক : যেমন বলা হয়েছে, ঈশ্বরের ‘নাম’ হল পিতার সেই পবিত্র ও প্রসন্নতাপূর্ণ সত্তা যা যিশুর ঐশপ্রকাশ দ্বারা এবং বিশ্বাসীদের বিশ্বাস দ্বারা খ্রিষ্টভক্তদের অন্তরে সঞ্চারিত যার ফলে যে ভালবাসায় পিতা পুত্রকে ভালবাসেন সেই ভালবাসাই তাঁদের অন্তরে বিরাজমান, চিরস্থায়ী ও ফলপ্রদ হয়ে ওঠে। যে ভালবাসা ঈশ্বরের নিজের ঐশসত্তা হতে উদ্গত, তা হল সেই বন্ধন যা পিতা ও পুত্রকে পরস্পরের মধ্যে শুধু নয়, বিশ্বাসীদের সঙ্গে তাঁদের আবদ্ধ করে (পরবর্তীকালীন ঐশতত্ত্ব অনুসারে ঐশভালবাসাই স্বয়ং পবিত্র আত্মার নামান্তর)।

যিশুর প্রার্থনার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে এই শেষ পদের শেষ বচন গুরুত্বপূর্ণ: ‘আমিও যেন তাদের অন্তরে থাকি’। বিদায় উপদেশের পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোর মত এই প্রার্থনায় জোর দিয়ে ঘোষিত হয় যে, গৌরবান্বিত যিশু মণ্ডলীর মধ্যে চিরকাল ধরেই বিরাজমান থাকবেন। তিনি যে মণ্ডলীর কাছে ঈশ্বরের ভালবাসা বিতরণ করেন বা ঈশ্বরের সঙ্গে তার সংযোগ সৃষ্টি করেন শুধু তা নয়, তিনি নিজেই মণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বরের নিত্য উপস্থিতিস্বরূপ। যোহনের প্রথম পত্র-শেষে একথা লেখা আছে: ‘তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন’ (১ যোহন ৫:২০)। আপন বাণী, আত্মা ও ভালবাসা নিয়ে মণ্ডলীর মধ্যে বসবাস করায় যিশু ভাবীকালের বিশ্বাসীদের কাছে অনন্ত জীবন দান করার অধিকার (যে অধিকার গৌরবান্বিত হয়েই তিনি পেলেন) অনুশীলন করেন। এভাবে তিনি মণ্ডলীকে পূর্বোল্লিখিত সেই সিদ্ধিলাভের দিকে চালনা করেন, যে সিদ্ধিলাভ হল স্বর্গলোকে তাঁর গৌরব দর্শন করা।

যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু

(১৮—১৯ অধ্যায়)

১৩ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলা হয়েছিল যে, সেইখানে যোহনের সুসমাচারের দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হয়, যে খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত ১৩—১৭ অধ্যায় হল যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু কাহিনীর প্রত্যক্ষ সূচনা, যে কাহিনী নিঃসন্দেহে গোটা সুসমাচারের অনুধাবিত গন্তব্যস্থান। বস্তুত এই কাহিনীতে যোহনের স্বকীয় ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ও তাঁর সৃজনশীল শিল্প-নৈপুণ্য অতিস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ

ঐশতাত্ত্বিক দিক দিয়ে 'যন্ত্রণাভোগ' কাহিনী যিশুর 'উত্তোলন-উন্নয়ন' ধারণার বিকাশ (৩:১৪; ৮:২৮; ১২:৩২ ইত্যাদি)। তাঁর রাজকীয় ও ঐশ্বরিক মর্যাদা ঠিক সেই ঘটনায় ব্যক্ত, যে-ঘটনা যোহনের আগেকার তত্ত্ববিদগণ ও সুসমাচার-লেখকদের পক্ষে যিশুর অধঃপতনের নিম্নতম পর্যায় বলে পরিগণিত হয়েছিল। প্রথম থেকেই আদিখ্রিষ্টমণ্ডলী যিশুর অপমানজনক মৃত্যু গভীরতরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁর রহস্যময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন যন্ত্রণা-ঘটনার উপরেই আলোকপাত করতে প্রয়াসী হয়েছিল। এই নিষ্ঠুর ও অচিন্তনীয় ঘটনা ঐশতাত্ত্বিকভাবে সমাধা করার জন্য তাঁরা পুরাতন নিয়মের কয়েকটা ধারণা-বিশেষের উপর নির্ভর করেছিলেন, যথা: ধর্মাত্মার যন্ত্রণাভোগ, ঈশ্বরের কষ্টভোগী দাস, এবং সেই ক্রুশ-মূর্খতা যেখানে নিহিত রয়েছে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। এই সকল ব্যাখ্যা অনুসারে যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু ছিল প্রয়োজনীয়ই এমন ঘটনা ঈশ্বর যেন তাঁকে পুনরুত্থিত করেন; অর্থাৎ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মন যিশুর পরবর্তীই ধর্মময়তালাভ, পুনরুত্থান, গৌরবময় পুনরাগমন ও ঐশঅধিকারপ্রাপ্তির প্রতি আকর্ষণ করা হত। নূতন নিয়মের কোন লেখক তখনও এমন ধারণায় উপনীত হননি যা অনুসারে যিশুর গৌরব ঠিক তাঁর অপমানজনক বিচার, যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশ-মৃত্যুতেই জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। এই অচিন্তনীয় ধারণা যোহনেরই হল; তিনি এতে এসে পৌঁছেছেন তাঁর

স্বকীয় ও বিশিষ্ট ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের মধ্য দিয়ে যা অনুসারে সবকিছুর ভিত্তি হল যিশুর চিরবর্তমান উপস্থিতি। তাঁর দৃষ্টিকোণের এই অপরিহার্য দিক তাঁর রচিত 'যন্ত্রণাভোগ' কাহিনীকে অপরূপ আলোতে আলোকিত করে।

১। যিশুর যন্ত্রণাভোগ হল তাঁর বাণীপ্রচারের প্রতি জগতের প্রতিক্রিয়া, তথা: অস্বীকার। কিন্তু, একাধারে তা হল জগতের মায়াচ্ছন্ন অভিসন্ধির মুখোশ-উন্মোচন: যাঁকে জগৎ অস্বীকার করে তিনিই বিজয়ী। অবশেষে তাতে জগতের অস্বীকারে ঈশ্বরের সাড়া ব্যক্ত, এমন প্রেমপূর্ণ সাড়া যা ঠিক সেই অস্বীকারের সামনেই ঈশ্বরের গভীর বিশ্বস্ততা প্রকাশ করে।

২। জগতের অক্ষমতা, অর্থাৎ যিশুই যে সকল ঘটনার সত্যকার নিয়ন্তা, তা বিভিন্ন পূর্ববর্ণনায়ও যোহন দ্বারা নির্দেশিত হয়েছিল: তাঁর 'ক্ষণ' না আসা পর্যন্ত কেউই কখনও তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি (৭:৩০, ৪৪; ৮:২০, ৫৯; ১০:৩৯)। 'যন্ত্রণাভোগ' কাহিনীতে যোহন বার বার একথা বলেন যে যিশু স্বেচ্ছায়ই ক্রুশের দিকে যান: সত্যকার উত্তম মেষপালকরূপে তিনি মেষপালের জন্য স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দেন (১০:১৭-১৮); 'তবে ওঠ, এখান থেকে চলে যাই' (১৪:৩১) তিনি শুধু একথা বলার পর সেই সময় উপস্থিত হয় যখন সৈন্যেরা তাঁকে ধরতে পারবে। লোকে, অর্থাৎ যারা তাঁকে পরাভূত করেছে বলে মনে করে, তারা নয়, যিশুই সব ঘটনার প্রকৃত নায়ক ও প্রধান চরিত্র। তিনি কষ্টভোগী বটে, অথচ গৌরব ও মর্যাদায় পূর্ণ শোভায় সর্বদা শোভিত। তেমন রাজকীয় মর্যাদার আভাস যন্ত্রণাভোগ কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান: বিচারের সময়ে, এমনকি তাঁর নীরবতার সময়েও, শেষ ও চরম ঐশপ্রকাশকর্তা যিনি তাঁরই কণ্ঠস্বর সমস্তই ব্যাখ্যা করে, আলোকিত করে, প্রতিটি কথা ও কাজের গভীর বা প্রচ্ছন্ন অর্থ উদ্ঘাটন করে এবং আসল মুহূর্তে অর্থাৎ সেই ক্রুশ-ক্ষণে তিনি শান্তি ও গাম্ভীর্যে পূর্ণ কথা উচ্চারণ করেন: 'সিদ্ধি হয়েছে' (১৯:৩০)।

৩। বিচারের বিস্তারিত বর্ণনায় (১৮:৩৩…) যিশু মানুষ দ্বারা বিচারিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই আপন জনগণকে বিচার করেন; তাঁর সপক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়াতে তাদের বাধ্য করেন। যোহনের ভাষায় 'ক্রুশ-ক্ষণেই' শেষ বিচার ঘটে, তথা:

বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ ও জগতের দণ্ডাজ্ঞা। আর এই শেষ বিচারের শুধু খ্রিষ্টসম্বন্ধীয় একটা দিক নয়, মণ্ডলীগত একটা দিকও রয়েছে: যিশুর গোটা জীবনের নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ যা অনুসারে অভিযুক্ত যিশু আপন অভিযোক্তাদের অভিযোক্তা ও বিচারকর্তা হয়ে ওঠেন, প্রতিটি খ্রিষ্টবিশ্বাসীর নাটকীয় জীবনযাত্রার প্রতীক, কেননা খ্রিষ্টবিশ্বাসীও যখন জগৎ দ্বারা অভিযুক্ত হয় তখন অভিযোক্তাই হয়ে জগতের পাপ ব্যক্ত করে (৮:১৪-১৭, ৪৬; ১৬:৮-১১)।

৪। ক্রুশ-ই সমস্ত প্রতিশ্রুতির সিদ্ধিস্বরূপ। যন্ত্রণাভোগ কাহিনী পুরাতন নিয়মের সঙ্কেতে পূর্ণ এবং ক্রুশের দৃশ্য 'সিদ্ধি হয়েছে' বচনে কেন্দ্রীভূত (১৯:২৮, ৩০)। এতে যোহন ঘোষণা করেন ক্রুশ-মৃত্যুই সেই ঘটনা যা অন্যান্য ঘটনার চেয়ে সম্পূর্ণরূপেই সেই পরম লক্ষ্য ব্যক্ত করে যা প্রাক্তন সন্ধি দ্বারা নির্দেশিত হয়েছিল ও যা থেকে নব সন্ধির উদ্ভব: প্রাক্তন সন্ধিকালে সাধিত সকল ঘটনা ছিল ক্রুশ-ঘটনায়ই অভিব্যক্ত ভালবাসার পূর্বচিহ্ন, এবং ভাবীকালের ঘটনাসকল ক্রুশ-ঘটনায় নতুন কিছু যোগ দিতে পারে না, সেই মহামূল্যবান পরম ঘটনাকে কেবল ব্যাখ্যাই করতে পারে।

৫। তাই একথা থেকে যিশুর যন্ত্রণাভোগের দ্বিবিধ তাৎপর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়: পরিত্রাণদায়ী তাৎপর্য (তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যু দ্বারা খ্রিষ্টমণ্ডলী গড়ে উঠেছে) এবং প্রকাশমূলক তাৎপর্য (যন্ত্রণাভোগই সেই বিশেষে 'স্থান' যেখানে ঈশ্বরের ঐশস্বরূপ অর্থাৎ তাঁর ভালবাসা সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে: ঈশ্বর হলেন আমাদের জন্যই ঈশ্বর। যন্ত্রণাভোগে আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় কোন্ পরিমাপ পর্যন্ত ঈশ্বর পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আত্মদান করেছেন এবং কোন্ পরিমাপ পর্যন্ত পিতা পুত্রতে আমাদের ভালবাসেন)।

৬। যন্ত্রণাভোগ কাহিনীতে গোটা সুসমাচারের প্রধান প্রধান প্রসঙ্গ বা ধারণা যেন একীভূত: যিশুর 'ক্ষণ', মানবপুত্রকে উত্তোলন, শেষ বিচারের গূর্বঘটন, বিক্ষিপ্ত জনগণকে পুনর্মিলন। যিশুর কথা ও ক্রিয়াকলাপ যা যা আভাসরূপে দেখিয়েছিল তা এখন সিদ্ধিলাভ করেছে।

৭। যন্ত্রণাভোগ কাহিনীতে অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গও অনুধাবিত (যথা: ইহুদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের বিপক্ষে অভিযোগ, জগৎ ও বিধর্মীদের প্রতিনিধি পিলাত ও যিশুর মধ্যকার তুলনা, পাস্কাসূচক প্রতীকত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গ), কিন্তু এই সবকিছু সেই মুখ্য উদ্দেশ্যসাপেক্ষ যা হল বিশ্বাসের চোখের সামনে ক্রুশের উপরে যিশুর প্রচ্ছন্ন রাজাসনপ্রাপ্তি, ক্রুশের উপর তাঁর উত্তোলন-উন্নয়ন, জগতের অধিপতির উপর তাঁর গূঢ় বিজয় প্রকাশ করা। যথার্থই, যিশুর মৃত্যু পরাজয় নয় বরং পূর্ণ ও পরম বিজয়: তিনি বাহ্যত ক্রুশের উপর উত্তোলিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐশগৌরবেই উন্নীত: সেই উত্তোলন হল তাঁর গৌরবায়ন। ঐশগৌরব পুনরায় লাভ করার জন্য (১০:১৭-১৮) আর তা যেন আপন ও সকল বিশ্বাসীর পুনরুত্থানে রূপান্তরিত হয় (১১:২৫) এই উদ্দেশ্যেই যিশু নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন। তিনি বাহ্যত ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পিতা তাঁকে কখনও ত্যাগ করেননি (৮:৩১; ১৬:৩২), এমনকি তাঁর জীবনের সেই আসল ‘ক্ষণে’ যখন তিনি পিতার কাজ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করেন তখনই বিশেষত পিতা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছেন। বাস্তবিকই, তাঁর মৃত্যু হল পিতার কাছে ফিরে যাওয়া (১৩:১-৩ ইত্যাদি), তাঁর মৃত্যুতে পিতার উপস্থিতিই ব্যক্ত (১৪:৭)। তাঁর মৃত্যু হল অন্ধকারের অধিপতির উপর পরম বিজয় (১২:৩১; ১৬:১১), কেননা ক্রুশের মধ্য দিয়েই তিনি জগৎকে জয় করেছেন। ক্রুশ হল যিশুর রাজাসন (১৯:১৪, ১৯), আবার মৃত্যু হল তাঁর প্রেরণকর্মের সিদ্ধি (১৯:৩০): ক্রুশের উপর থেকেই, সেই রাজাসন ও বিচারাসনের উপর থেকেই যিশু এই জগতের বিচারকর্তারূপে রাজত্ব করেন: যিশু রাজা (১৮:৩৭), তবু ইহুদীদের অভিযোগে ভুল পথে চালিত পিলাতের ধারণা অনুযায়ী রাজা নন। যদিও তিনি রাজা ও মশীহ নাম গ্রহণ করেন, তা সত্ত্বেও তিনি ইহুদীদের প্রত্যাশা শুদ্ধ করেন: তিনি শান্তিরাজের উপযুক্ত বাহকের পিঠে চড়লেন এবং যে রাজাসনের দিকে সেই গাধা তাঁকে বহন করল সেই রাজাসন হল ক্রুশ। তবু শিষ্যেরা যেন সেই ক্রুশ একটা রাজাসন বলে দেখতে পান, সেজন্য পবিত্র আত্মার প্রয়োজন হল: তিনি তাঁদের সমস্তই স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং পূর্ণ সত্যের মধ্যে চালনা করলেন (১৫:২৬; ১৬:৮-১১)।

যোহনের ও সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের বর্ণনা।

আমরা লক্ষ করেছি যে ১৭ অধ্যায় পর্যন্ত যিশুর জীবনীর জন্য যোহন সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের উপর অধিক নির্ভর করেননি। এখন কিন্তু, যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু-কাহিনী ক্ষেত্রে, তাঁর ও সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের সঙ্গে যথেষ্ট মিল বিদ্যমান। এর কারণ এই যে, যিশুর মৃত্যু-পুনরুত্থান হল খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের মুখ্য ঘটনা যা আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রথম লগ্ন থেকে একইপ্রায় বর্ণনায় হস্তান্তরিত হল। কিন্তু, এই মিল থাকা সত্ত্বেও বড় পার্থক্যও বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় গেথসেমানি বাগানে যিশুর প্রার্থনা, তাঁর উৎপীড়ন সংক্রান্ত কয়েকটা দৃশ্য, ইহুদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের অনুষ্ঠিত বিচার, মরণমুখ যিশুর আর্তনাদ প্রভৃতি ঘটনা যা বিষয়ে যোহন কিছুই বলেন না। কিন্তু একথা থেকে আমরা এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না যে যোহন সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের ঐতিহ্য অপেক্ষা অন্য কোন ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করলেন, বরং এতেও আগে বারবার উল্লিখিত সেই কথা স্মরণযোগ্য যে, যোহনের গোটা সুসমাচার বাহ্যিক ঐতিহাসিক একটা বিবরণ নয়, প্রকৃতপক্ষে তা হল পবিত্র আত্মার আলোতে সাধারণ ঐতিহ্যের গভীর ও স্বকীয় অনুধ্যান। অন্য কথায়, যোহন শুধু ইতিহাস নয়, তার ব্যাখ্যাও আমাদের কাছে উপস্থাপন করতে চান।

যোহনের বর্ণনা-পাঠের পথ-নির্দেশ

যোহনের উপস্থাপিত ব্যাখ্যা নির্ণয় করার জন্য দু'টো পথ রয়েছে। প্রথম পথ স্বয়ং বর্ণনা দ্বারা নির্দেশিত; সুতরাং সেই দৃশ্য দু'টোর প্রতি বিশেষত মনোনিবেশ করব যা যোহনের বর্ণনার কাঠামোতে প্রধান স্থান দখল করে, তথা: রোমীয় বিচার (অর্থাৎ অবিশ্বাসী জগতের সঙ্গে যিশুর একমাত্র মহাবিচার) এবং ক্রুশারোপণ (এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে, যোহন ইচ্ছাকৃতভাবেই ইহুদী বিচার বিষয়ে কোন কথা বলেন না, যেহেতু ৫–১২ অধ্যায়গুলোতেই ইহুদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যিশুর অপরাপর তর্ক-বিতর্ক বর্ণনা করেছিলেন)।

দ্বিতীয় পথ এই ভিত্তির উপর দাঁড়ায় যে, যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর মূল ব্যাখ্যা আগেই, বিশেষভাবে বিদায় উপদেশেই সূচিত। সুতরাং আমাদের ব্যাখ্যাও বিদায় উপদেশের দিকে, এমনকি গোটা সুসমাচারের দিকে বিশেষ লক্ষ রাখবে; যন্ত্রণাভোগ কাহিনীতে নিহিত ব্যাখ্যামূলক যাবতীয় ইঙ্গিত (যথা ১৮:১৯, ৩২, ৩৭; ১৯:৩০ ইত্যাদি ইঙ্গিত) হল সুসমাচারের পূর্বোল্লিখিত বিবিধ কথার অনুস্মারক সঙ্কেত, কেমন যেন লেখক আমাদের কাছে জানা কথা স্মরণ করাতে চান যার আলোতে যন্ত্রণাভোগ কাহিনীর তাৎপর্য বিশদভাবে অনুভব করতে পারি। কিন্তু একথা থেকে আমরা যেন মনে না করি যে ক্রুশ-ঘটনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও আসলে যিশুর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার অন্যতম। ক্রুশ-ঘটনার সামনে আমরা ঐতিহাসিক একটা ঘটনার সামনে বটে, অথচ সেই ঘটনা এক দিকে ইতিহাস ও সময়সাপেক্ষ হলেও অন্য দিকে, এমনকি সর্বাপেক্ষা চিরকালীন বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। যতই আমরা এর মহামূল্য অনুভব করতে সক্ষম বা অক্ষম হই না কেন, ক্রুশ-ঘটনা নব রূপেই মানবেতিহাস রূপান্তরিত করেছে; মানবজীবন সম্পূর্ণ আলাদা ও নবীন রূপ পেয়েছে; ক্রুশ-ঘটনায় অতীতকাল অস্তগত হয়েছে।

কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই সেই বিশ্বাস-মনোভাব যে-মনোভাবেই গোটা সুসমাচার পাঠ করা প্রয়োজন: বিশ্বাস না থাকলে যোহনের লেখার যে বাহ্যিক অর্থ, বিশ্বাসের মাধ্যমে সেই অর্থ নবীন রূপ অর্জন করে: বাহ্যত যিশুর যন্ত্রণাভোগ হল সেই সময় যখন ইস্রায়েল জাতি তার মশীহকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থাৎ বিশ্বাসের চোখে যিশুই ইস্রায়েল জাতিকে বিচার করেন; যিশুর যন্ত্রণাভোগে তাঁর উপর জগতের জয় শুরু হয়, কিন্তু আসলে সেই ঘটনায়ই যিশুই জগৎকে পরাভূত করেন। মানুষের ধারণায় ক্রুশ-ঘটনায় যিশুর সবকিছু বিলীন হয়ে গেছে, ক্রুশবিদ্ধ যিশু নিরুপায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্রুশ-মৃত্যু হল পিতার অভিমুখে যিশুর বিজয়পূর্ণ যাত্রায় পদার্পণ।

যন্ত্রণাভোগ কাহিনীর কাঠামো

যন্ত্রণাভোগ কাহিনী প্রধান প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

১। **সূচনা** (১৮:১-২৭)

– যিশুকে গ্রেপ্তার (১৮:১-১১)

– আন্নার বিচার (১৮:১২-২৭)

২। **পিলাতের বিচার** (১৮:২৮–১৯:১৬)

– যিশুকে পিলাতের হাতে সমর্পণ (১৮:২৮-৩২)

– বিচারের প্রথম পর্ব (১৮:৩৩-৩৮ক)

– যিশুর নির্দোষিতা ঘোষণা (১৮:৩৮খ-৪০)

– যিশুকে উৎপীড়ন (১৯:১-৩)

– রাজারূপে যিশুকে প্রদর্শন (১৯:৪-৭)

– বিচারের দ্বিতীয় পর্ব (১৯:৮-১২)

– যিশুর মৃত্যুদন্ড (১৯:১৩-১৬ক)

৩। **যিশুর ক্রুশারোপণ ও মৃত্যু** (১৯:১৬খ-৪২)

– ক্রুশের উপর যিশুকে উত্তোলন (১৯:১৬খ-২২)

– যিশুর বস্ত্র ভাগকরণ (১৯:২৩-২৪খ)

– ক্রুশের ধারে নারীগণ (১৯:২৪গ-২৭)

– যিশুর মৃত্যু (১৯:২৮-৩০)

– বর্শাঘাত (১৯:৩১-৩৭)

– যিশুকে সমাধিদান (১৯:৩৮-৪২)

যিশুর যন্ত্রণাভোগ : সূচনা (১৮:১-২৭)

যিশুকে গ্রেপ্তার (১৮:১-১১)

যোহন অনুসারে যন্ত্রণাভোগ কাহিনী সরাসরি যিশুকে গ্রেপ্তার বর্ণনায় শুরু হয়; সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের বর্ণিত ‘গেথসেমানি বাগানে যিশুর প্রার্থনা ও মর্মবেদনা’ বৃত্তান্ত এখানে উল্লিখিত নয়। যোহন সেই দৃশ্য দু’টো সুসমাচারের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে উল্লেখ ও

রূপান্তরিত করেছিলেন। গ্রেপ্তার দৃশ্যে প্রকাশ পায় যিশুর অধিকার, তাঁর ঐশমর্যাদা, ও তাঁর রাজকীয় স্বাধীনতা যার মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত ঘটনার সম্মুখীন হয়ে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর যন্ত্রণাভোগ হল গৌরবায়নের দিকে একটা যাত্রা।

১৮ [১] এই সমস্ত কথা বলার পর যিশু নিজের শিষ্যদের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে কিদ্রোন খরস্রোতের ওপারে গেলেন; সেখানে একটা বাগান ছিল; তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা সেই বাগানে প্রবেশ করলেন। [২] জায়গাটা বিশ্বাসঘাতক সেই যুদারও পরিচিত ছিল, কারণ যিশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে প্রায়ই সেখানে মিলিত হতেন। [৩] যুদা সৈন্যদলকে এবং প্রধান যাজকদের ও ফরিশীদের কাছ থেকে জড় করা অনুচারীদের সঙ্গে ক'রে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন; তাদের হাতে ছিল লণ্ঠন, মশাল আর নানা অস্ত্র। [৪] নিজের কী কী ঘটবে, সে সমস্তই জেনে যিশু এগিয়ে এলেন ও তাদের বললেন, 'তোমরা কাকে খুঁজছ?' [৫] তারা তাঁকে উত্তর দিল, 'নাজারেথীয় যিশুকে।' যিশু তাদের বললেন, 'আমিই সে।' বিশ্বাসঘাতক যুদাও তাদের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। [৬] 'আমিই সে', তিনি তাদের এই কথা বলামাত্র তারা পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। [৭] তিনি তাদের আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কাকে খুঁজছ?' তারা বলল, 'নাজারেথীয় যিশুকে।' [৮] যিশু উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাদের বললাম যে, আমিই সে। তোমরা যদি আমাকেই খুঁজছ, তবে এদের যেতে দাও।' [৯] এমনটি ঘটল, যিশু যে কথা বলেছিলেন তা যেন পূর্ণ হয়: 'যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তাদের মধ্যে একজনকেও হারাইনি।' [১০] শিমোন পিতরের একটা খড়্গ ছিল, তা বের করে তিনি তখন মহাযাজকের চাকরকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন—চাকরের নাম ছিল মাল্কস। [১১] যিশু পিতরকে বললেন, 'তোমার খড়্গ কোষে রেখে দাও; এই যে পাত্র পিতা আমাকে দিয়েছেন, আমি কি তা পান করব না?'

১৮:৪—নিজের কী কী ঘটবে, সে সমস্তই জেনে… : প্রথমে মনে হয় কেমন যেন যুদাই যিশুকে গ্রেপ্তার কাজ চালনা করে। কিন্তু যিশুর অজানতে কিছুই ঘটে না। যিশু নিজেই তাঁর কাজ শেষ করে ফেলার জন্য যুদাকে আহ্বান করেছিলেন (১৩:২৭) এবং এখনও স্বেচ্ছায়ই তিনি সৈন্যদের দিকে এগিয়ে যান। যেমন আগেও তিনি পিতার

নির্ধারিত ‘ক্ষণ’ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন ছিলেন (১৩:১), তেমনি এখন নিজের কী কী ঘটবে সে সমস্তই তিনি অবগত। অন্যত্রও যিশুর দিব্য জ্ঞান উল্লিখিত হয়েছিল (১:৪৭; ২:২৪; ৪:১৭; ৬:৬ ইত্যাদি)। যন্ত্রণাভোগ শুরুতে যেমন তিনি পূর্বজ্ঞানসম্পন্ন, তেমনি যন্ত্রণাভোগ শেষেও তিনি অবগত যে, সমস্ত কিছুর ‘সিদ্ধি হয়েছে’ (১৯:২৮)। যা ঘটতে যাচ্ছে তা মায়াচ্ছন্ন নিয়তির ফল নয়, বরং তা হল পিতা দ্বারা সব দিক দিয়েই পূর্বনির্দিষ্ট যন্ত্রণাভোগ (১৯:১১খ)।

আবার, প্রথমে বোধ হয় কেমন যেন যুদাই যিশুর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি, কিন্তু বিদায় উপদেশের আলোতে আবিষ্কার করি যে জগতের অধিপতিই এখন যিশুর সম্মুখীন। যুদা দিয়াবলের হাতে পুতুল মাত্র (১৩:১, ২৭): দিয়াবল যিশুকে গ্রাস করতে চায় কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না (১৪:৩০; ১৬:১১)।

১৮:৫ক—আমিই সে: এই উত্তরে যিশু আত্মপরিচয় দেন, তিনিই সৈন্যদের অনুসন্ধিত ব্যক্তি, কিন্তু সুসমাচারের লেখকের পক্ষে এই উত্তরে সেই ঐশমর্যাদাপূর্ণ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত যা ‘আমি আছি’ বচনে যুক্ত: যাঁকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চলছে তিনি নিরুপায় সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি ইতিহাসের ঘটনাসমূহের নিয়ন্তা, কেউই তাঁকে স্পর্শ করতেও সক্ষম নয় যদি না তিনি নিজে নিজেকে সঁপে দেন।

১৮:৫খ—বিশ্বাসঘাতক যুদাও তাদের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন: এটিই সেই মুহূর্ত যখন যে যিশুর সঙ্গে রুটি খায় সে তাঁকে পদাঘাত করে (১৩:১৮); তা যখন ঘটে তখনই শিষ্যেরা যেন বিশ্বাস করেন যে যিশু সত্যিই সেই ‘আমি আছি’ (১৩:১৯)।

১৮:৬—মাটিতে পড়ে গেল: এই ভূপতন আশ্চর্য কাজের মত বিবেচনাযোগ্য শুধু নয়, বরং সেটা হল যোহনের ব্যবহৃত একটা রচনা-পদ্ধতি যা ইহুদী ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে। ২ রাজাবলি ১:৯-১৪-এ বলা হয় যে, যে সৈন্যেরা নবী এলিয়কে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল দিব্য আগুন তাদের গ্রাস করেছিল; আদিপুস্তক সম্বন্ধীয় সেকালের

একটা ব্যাখ্যা অনুসারে, সত্তরজন মিশরীয় শিমেয়োনকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হচ্ছিল কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা মাত্র মাটিতে পড়ে গেছিল এবং দাঁতে দাঁত ঘষছিল। ইশাইয়ার পুস্তকে একথা লেখা আছে: 'তিনি নিজ মুখের লাঠি দ্বারা দেশ আঘাত করবেন, নিজ ওষ্ঠের ফুৎকারে দুর্জনকে বধ করবেন' (ইশা ১১:৪); আবার সামসঙ্গীতমালায় লেখা আছে, 'আমার বিপক্ষ ও শত্রু যারা তারাই হোঁচট খেয়ে লুটিয়ে পড়ে' (সাম ২৭:২), এবং 'যারা আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে, তারা লজ্জিত হয়ে অপমানিত হোক; যারা আমার অনিষ্ট ভাবে, তারা নতমুখ হয়ে পিছু হটে যাক' (সাম ৩৫:৪)।

যোহনের সুসমাচারেও একই ধারণা উপস্থাপিত হয়েছিল যখন প্রধান যাজকদের প্রহরীরা যিশুকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি (৭:৩২), কেননা তাঁর কথা তাদের অতিবিস্মিত করেছিল (৭:৪৬)। যেহেতু 'তাঁর ক্ষণ তখনও উপস্থিত হয়নি' (৭:৩০; ৮:২০) বিধায় ইহুদীরা আগে যিশুকে গ্রেপ্তার করায় অকৃতকার্য হয়েছিল, সেজন্য এখন যে সেই 'ক্ষণ' উপস্থিত হয়েছে এবং যিশু নিজে থেকে সৈন্যদের হাতে নিজেকে সঁপে দেন, তারা মাটিতে পড়ে যাওয়ায় পুনরায় যিশুর অজেয় প্রভুত্ব ব্যক্ত হয়। এধারণা আরও প্রমাণিত হয় যেহেতু যিশু আর একবার তাদের জিজ্ঞাসা করেন তারা কাকে চায় এবং শেষে তাদের হাতে নিজেকে ধরা দেন। একথাও লক্ষণীয় যে, যিশুর চিন্তাই তাঁর শিষ্যদের যেন কোন অনিষ্ট না ঘটে।

১৮:৯—এমনটি ঘটল, যিশু যে কথা বলেছিলেন… : এই পদ যিশুকে উত্তম মেষপালকরূপে বর্ণনা করে যিনি আপন মেষগুলোর প্রাণ রক্ষা করার জন্য স্বেচ্ছায়ই মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দেন। আরও নির্দিষ্টভাবে এই বিষয়ে সুসমাচারের নিম্নলিখিত পদগুলো স্মরণযোগ্য: 'যতদিন আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম, তুমি যে নাম আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে আমি তাদের রক্ষা করে এসেছি, তাদের নিরাপদে রেখেছি, এবং সেই বিনাশ-পুত্র ছাড়া, কেউই তাদের মধ্যে বিনষ্ট হয়নি, যেন শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হয়' (১৭:১২); 'আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি: তাদের কখনও বিনাশ হবে না, আমার হাত থেকেও কেউ তাদের ছিনিয়ে নেবে না। আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে মহান, আর কেউ আমার পিতার হাত থেকে

তাদের ছিনিয়ে নিতে পারে না' (১০:২৮-২৯); 'মেষগুলির জন্য আমার নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই' (১০:১৫); 'কেউই আমার কাছ থেকে তা [প্রাণ] কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই। তা বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে: তেমন আজ্ঞা আমি আমার পিতা থেকেই পেয়েছি' (১০:১৮); 'তাঁর [আমার পিতার] ইচ্ছা এ: তিনি যা কিছু আমাকে দিয়েছেন, আমি তার কিছুই না হারিয়ে বরং সমস্তই যেন শেষ দিনে পুনরুত্থিত করি' (৬:৩৯)।

১৮:১০—শিমোন পিতরের একটা খড়্গা ছিল: পিতরের এই কাজে পুনরায় প্রকাশিত হয় তিনি (এবং অন্যান্য শিষ্যেরা) যিশুর মশীহ-পথ এক বিন্দুও অনুভব করতে পারেননি, কেননা সেই পথ জাগতিক ক্ষমতা অনুসরণ করে না যেহেতু সেই পথ স্বেচ্ছাকৃত আত্মদানের পথ।

১৮:১১ক—তোমার খড়্গা কোষে রেখে দাও: যিশুর এ কথায়ও সেই ঐশতাত্ত্বিক ধারণা ব্যক্ত যে, তিনি অবিলম্বে এবং পূর্ণ সচেতন হয়ে পিতার নির্ধারিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে সম্মত।

১৮:১১খ—এই যে পাত্র পিতা আমাকে দিয়েছেন: পাত্র বিষয়ক বচন সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের বর্ণনা অনুসারে গেথসেমানি বাগানেই উচ্চারিত হল। যোহন তা সঙ্কুচিত করে পূর্ববর্তী পদে উল্লেখ করেছিলেন (১২:২৭)। যিশুর একথায়ও প্রমাণিত হয়ে যে পিতার ইচ্ছা পালনই তাঁর সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা।

আন্নার বিচার (১৮:১২-২৭)

যিশুকে গ্রেপ্তার করলে পর তারা তাঁকে প্রথমে আন্নার প্রাসাদে নিয়ে যায়। এখানে যে বিচার সম্পাদিত হয় তা আনুষ্ঠানিক ও সরকারী নয়। শুধু পরদিন ভোরেই পিলাত,

মহাযাজক কাইয়াফা ও ইহুদী মহাসভার সদস্যদের দ্বারা আনুষ্ঠানিক ও সরকারী বিচার অনুষ্ঠিত হবে (১৮:২৪)।

সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের মত যোহন অনুসারেও আন্নার বিচারের বিষয়বস্তু হল যিশুর দাবি করা কাজ: বিচার রাজনৈতিক নয়, ধর্মীয় ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত, অর্থাৎ যিশুর দেওয়া শিক্ষা, ধর্মীয় ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কা এবং নতুন ধর্মীয় আন্দোলন উদ্ভবের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুসমাচারত্রয়ের বৈষম্যে যোহন কাইয়াফা ও মহাসভার সদস্যদের প্রকৃত বিচারের বিস্তারিত কৈফিয়ত দেন না। যেমন বলা হয়েছে, এর কারণ এই যে, ইহুদী-বিচার গোটা সুসমাচার ব্যাপী ব্যক্ত: বাপ্তিস্মদাতা যোহন সম্বন্ধে ইহুদীদের তদন্ত থেকে (১:১৯) যিশুকে বধ করার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত (১১:৪৯-৫৩) যোহনের বর্ণনা একটা বিচার বলে প্রবাহিত হল। বিশদভাবে বলতে হলে, যিশু সম্বন্ধে তদন্ত, ঈশ্বরনিন্দা অভিযোগ এবং আপন পরিচয় বিষয়ে যিশুর প্রকাশ্য ঘোষণা (সদৃশ সুসমাচারত্রয় অনুসারে এগুলোই ইহুদী বিচারের বিষয়বস্তু) ১০:৩০-৩৯-এ বিবৃত হয়েছিল।

১৮ [১২] তাই সৈন্যদল ও তাদের সহস্রপতি এবং ইহুদীদের অনুচারীরা যিশুকে ধরে তাঁকে বেঁধে ফেলল এবং [১৩] প্রথমে তাঁকে আন্নার কাছে নিয়ে গেল, কারণ তিনি ছিলেন ওই বছরের মহাযাজক কাইয়াফার শ্বশুর। [১৪] এই কাইয়াফাই ইহুদীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, জনগণের জন্য মাত্র একটি মানুষের মৃত্যু হওয়াই সুবিধাজনক।

[১৫] এদিকে শিমোন পিতর আর অন্য এক শিষ্য যিশুর অনুসরণ করেছিলেন; এই শিষ্য মহাযাজকের পরিচিত ছিলেন বলে যিশুর সঙ্গে মহাযাজকের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন। [১৬] পিতর কিন্তু বাইরে থেকে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাই মহাযাজকের পরিচিত ওই শিষ্য বেরিয়ে এসে দ্বাররক্ষিকাকে বলে পিতরকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। [১৭] দ্বাররক্ষিকা দাসীটি পিতরকে বলল, 'তুমিও কি ওই লোকটার শিষ্যদের একজন নও?' তিনি বললেন, 'না, আমি তো নই।' [১৮] চাকরেরা আর অনুচারীরা শীতের জন্য কাঠকয়লার আগুন জ্বালিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে তাপ পোহাচ্ছিল। পিতরও দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে আগুন পোহাচ্ছিলেন।

[১৯] তখন মহাযাজক যিশুকে তাঁর শিষ্যদের বিষয় এবং তাঁর শিক্ষা বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। [২০] যিশু তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আমি জগতের কাছে প্রকাশ্যেই কথা বলেছি, সবসময়ই সমাজগৃহে ও মন্দিরে শিক্ষা দিয়েছি, যেখানে সকল ইহুদী সম্মিলিত হয়। গোপনে তো আমি কিছুই বলিনি। [২১] আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? যারা আমার কথা শুনেছে, তাদেরই জিজ্ঞাসা করুন; আমি তাদের কী কী বলেছি, তারা তা জানে।' [২২] তিনি একথা বললে সেখানে উপস্থিত প্রহরীদের একজন যিশুকে চড় মেরে বলল, 'মহাযাজককে এইভাবে উত্তর দিচ্ছ?' [২৩] যিশু তাকে উত্তর দিলেন, 'অন্যায় যদি বলে থাকি, তবে অন্যায় কোথায়, তার সাক্ষ্য দাও; কিন্তু যদি ন্যায্য কথা বলে থাকি, তবে আমাকে কেন মারছ?' [২৪] আন্না তখন মহাযাজক কাইয়াফার কাছে তাঁকে বাঁধা অবস্থায় পাঠিয়ে দিলেন।

[২৫] সেসময়ে শিমোন পিতর এমনি দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন। লোকে তাঁকে বলল, 'তুমিও কি ওর শিষ্যদের একজন নও?' তিনি এই বলে তা অস্বীকার করলেন, 'আমি নই।' [২৬] মহাযাজকের চাকরদের একজন—পিতর যার কান কেটে ফেলেছিলেন তারই এক আত্মীয়—তখন জিজ্ঞাসা করল, 'ওই বাগানে আমি কি তোমাকে ওর সঙ্গে দেখিনি?' [২৭] পিতর আবার তা অস্বীকার করলেন, আর তখনই মোরগ ডেকে উঠল।

পাঠকের সুবিধার জন্য এই অংশ চারটি ভাগে ভাগ করা হোক: ক। ১৮:১৪-এ যোহনের মন্তব্য; খ। পিতরের প্রথম অস্বীকৃতি; গ। আন্নার বিচার; ঘ। পিতরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অস্বীকৃতি।

ক। ১৮:১৪—এই কাইয়াফাই ইহুদীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন… : কাইয়াফা যে সুসমাচারের পূর্ববর্ণনায় (১১:৫১-৫২) অজানতেই একটা ভাববাণী দিয়েছিলেন একথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য যোহন খুব ব্যস্ত; কেননা কাইয়াফার সেই পরামর্শকে ('গোটা জাতির বিনাশ ঘটবার চেয়ে জনগণের জন্য মাত্র একজন মানুষের মৃত্যু হওয়াই আপনাদের পক্ষে সুবিধাজনক') যোহন দ্বারা যিশুর যন্ত্রণাভোগের প্রকৃত

অর্থের একটা ভাববাণী বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল: ‘যিশুর মৃত্যু হবে জাতির জন্য, আর কেবল জাতির জন্য নয়, চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের সকল সন্তানকে একত্রে জড় করার জন্য’। বাস্তবিকই, ওই বছরের মহাযাজক হয়ে কাইয়াফা সেই ভাববাণীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন। এখন সেই ভাববাণী সিদ্ধি লাভ করছে: এখনই সেই ‘ক্ষণ’ সন্নিকট যে ক্ষণে উত্তোলিত যিশু চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের সকল সন্তানকে নিজের কাছে আকর্ষণ করবেন এবং তাঁর মৃত্যু হবে গোটা জাতির পরিত্রাণের জন্য। যিশুর বিরুদ্ধে ঈর্ষান্বিত ইহুদী নেতাগণ ঈশ্বরের অভিপ্রায় কার্যকর করা ছাড়া অন্য কিছুই করছে না!

খ। ১৮:১৭—তুমিও কি ওই লোকটার শিষ্যদের একজন নও? যিশুর বিচার-দৃশ্য পিতরের অস্বীকৃতি-দৃশ্য দু’টোর মাঝখানেই বর্ণিত। এই তুলনা অর্থপূর্ণ: এক দিকে যিশুর ভালবাসা ও আত্মদান, অপর দিকে শিষ্যের অবিশ্বস্ততা; এক দিকে আপন কাজের সাক্ষ্যদানে যিশুর অভয়, অপর দিকে শিষ্যের দুর্বলতা; যিশু আপন শিষ্যদের রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট (১৮:৮), কিন্তু তাঁদের প্রধান যিনি সেই পিতর তাঁর আপনজন হতে সম্মত নন।

গ। ১৮:২০—আমি জগতের কাছে প্রকাশ্যেই কথা বলেছি: যিশুর এই উত্তরের মাধ্যমে যোহন তাঁর লেখার প্রথম অংশে বর্ণিত যিশুর ঐশপ্রকাশকর্ম এবং ইহুদীদের সঙ্গে তাঁর যাবতীয় তর্ক-বিতর্ক স্মরণ করান। স্মারক কথা বহু; আমরা শুধু ১০:২৪-২৬-এর ঘটনার দিকে মন ফেরাব: মন্দিরের উৎসর্গ-পর্বে ইহুদীরা মন্দিরের মধ্যে শলোমন-অলিন্দে বিচরণকারী যিশুকে জিজ্ঞাসা করেছিল: আপনি যদি খ্রিষ্টই হন তবে আমাদের স্পষ্ট করে বলুন’। যিশু উত্তরে বলেছিলেন: ‘আমি তো আপনাদের বলেছি, আপনারাই বিশ্বাস করছেন না’। সুতরাং যিশু অপর্যাপ্তভাবেই ‘প্রকাশ্যে’ ও ‘স্পষ্ট’ ভাবে কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর কথা এমন ছিল যে, বিশ্বাস না থাকায় তা অস্পষ্ট ও অবোধ্যই ছিল। উপসংহারে বলতে পারি যে, আন্নার বিচারের যে সমস্যা তা

আগেকার একই সমস্যা, তথা: যিশুর আত্মপ্রকাশ। এখন কিন্তু জগতের কাছে ঐশপ্রকাশকাল শেষ হয়ে গেছে (১২:৩৬খ) আর যিশু মহাযাজকের প্রশ্নে আর কোন উত্তর দেবেন না, কারণ যা যা বক্তব্য বিষয় ছিল তা আগেই সম্পূর্ণরূপে বলা হয়েছিল।

১৮:২১—যারা আমার কথা শুনেছে… : যোহনের উদ্দেশ্য যিশুর বিচারের দিন অতিক্রম করে উত্তরকালের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে: যারা যিশুর কথা শুনেছে (১ যোহন ১:১-৩), খ্রিষ্টমণ্ডলীর সেই বাণীপ্রচারকদের কথা শুনবার জন্যই যোহন ভাবীকালের ইহুদীদের আহ্বান করেন। সেই বাণীপ্রচারকগণই জানেন যিশুর কথার অর্থ কি। জগতে যিশুর কথা যা একদিন অগ্রাহ্য হয়েছিল (১২:৩৬), তাঁদেরই প্রচারে প্রতিধ্বনিত হতে চলছে যাঁরা আদি থেকে যিশুর সঙ্গে ছিলেন, এমনকি সেই কথা শুধু তাঁদের সাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়েই সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়ে ওঠে (১৫:২৭)।

১৮:২২—তিনি একথা বললে… : যিশুর ঐশপ্রকাশের পর প্রহরীর চপেটাঘাতে কেমন যেন এই ঐশপ্রকাশে ইহুদী ও জগতের নিষ্ঠুর সাড়া।

১৮:২৩—অন্যায় যদি বলে থাকি… : গোটা বিচারব্যাপী যিশু সর্বদা মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার দেখান। যন্ত্রণাকালেও তিনি সেই ঐশপ্রকাশকর্তা যিনি নিজ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন ও একাধারে বিপক্ষদের অপরাধ ব্যক্ত করেন। যে প্রহরী মহাযাজকের সপক্ষে যিশুকে দোষী করে, সে যিশুর উত্তর না শুনে পারবে না যে, ন্যায় যিশুরই পক্ষে; তিনি নির্দোষী, এমনকি সকলের চেয়ে মহান।

ঘ। ১৮:২৫—শিমোন পিতর এমনি দাঁড়িয়ে… : দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের মত পিতর যিশুকে অস্বীকার করেন। তাঁর এই অস্বীকৃতির কথা যিশু নিজেই আগে উল্লেখ করেছিলেন (১৩:৩৮)। পিতরের ব্যবহার থেকে যিশু আরও উজ্জ্বলভাবে আলোকিত

হয়ে ওঠেন: তিনি পিতার ইচ্ছার প্রতি বাধ্য (১৮:১১), এমনকি তাঁর দৃঢ়তা পিতার ঐক্যেই স্থাপিত (১৬:৩২); অপর দিকে শিষ্যের দুর্বলতা আত্মগর্ব বা অন্যায়-আত্ম-আস্থাজনিত।

পিলাতের বিচার (১৮:২৮—১৯:১৬)

নাটকীয় গভীর আবেগের জন্য ও ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের সূক্ষ্মতার জন্য এই বিবরণ যোহনের সুসমাচারের শ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিবেচনাযোগ্য।

ক। নাটকীয় দিক: এই দিক সুস্পষ্ট। আইনগত শুচিতা বজায় না রাখলে ইহুদীরা পাস্কাভোজে যোগ দিতে পারে না বিধায় তারা বিধর্মী ও বিজাতীয় পিলাতের শাসক-ভবনে প্রবেশ করে না (১৮:২৮)। কিন্তু বিচার করতে গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারকর্তার সামনে দাঁড় করানো চাই, সুতরাং যিশুকে পিলাতের শাসক-ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থাটা একটু অস্বাভাবিক বটে: অভিযুক্ত ব্যক্তি ও বিচারকর্তা এক স্থানে, এবং অভিযোক্তারা অন্যত্র। কি করে অভিযোগ পেশ করা হবে? এই সমস্যা সমাধানের জন্য পিলাত বারবার শাসক-ভবনের ভিতর থেকে বাইরে, এবং বাইরে থেকে আবার ভিতরে আসতে বাধ্য। তাঁর এই অবিরত যাওয়া-আসাটা গোটা অংশটি সাতটা দৃশ্যে ভাগ করে: 'বাইরের' দৃশ্যগুলো পিলাত ও ইহুদীদের মধ্যকার আলাপ বর্ণনা করে, 'ভিতরের' দৃশ্যগুলোতে পিলাত ও যিশুর মধ্যকার আলাপ বর্ণিত। ইহুদীদের ও যিশুর মধ্যকার কোন প্রত্যক্ষ আলাপ নেই। এই 'আলাপ' দৃশ্যগুলোর মাঝখানে (অর্থাৎ চতুর্থ দৃশ্যে) যিশুর অপমানজনক ও ঠাট্টাপূর্ণ উৎপীড়নের দৃশ্য বিবৃত।

খ। নানা চরিত্রের ভূমিকা: যিশুর সম্মুখে পিলাত ও ইহুদীরা দাঁড়ানো। তাদের কি কোন বিশেষ ভূমিকা আছে? নিঃসন্দেহে যোহন বাস্তব একটা ঘটনা বর্ণনা করছেন, তাঁর চোখের সামনে চরিত্র সকলও বাস্তব; তবু একথাও সত্য যে, তাঁর দৃষ্টিকোণ অনুসারে সেই দিনের ঘটনা কেমন যেন বিস্তার লাভ করে ও তার গভীর অর্থ ভেসে ওঠে: ইহুদীদের উপর অবিশ্বাসী জগতের প্রতিনিধিত্ব আরোপ করা হয়, তারা সেই অবিশ্বাসেরই প্রথম চিহ্ন ও প্রতীক যে-অবিশ্বাস এখনও এজগতে দৃষ্টিগোচর। বিদায়

উপদেশে যাকে ‘জগৎ’ বলা হয়েছিল, এখানে তাকে ‘ইহুদী’ বলা হয়; অর্থাৎ সেই ইহুদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ সর্বকালের জন্য যিশুর বিরোধী আধিপত্যের প্রতিনিধি।

পিলাতেরও প্রতীকমূলক ভূমিকা রয়েছে: তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতীক। ইহুদীরা রোম সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক প্রতিনিধির হাতে যিশুকে সঁপে দেওয়ায় যিশুর বিরুদ্ধে জগতের বিচার আনুষ্ঠানিক, সরকারী ও প্রকাশ্য একটা বিচার বলে বিবেচনাযোগ্য। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ইহুদীরা ও পিলাত উভয়ে নিজেদের আত্মমর্যাদা পর্যন্তই ত্যাগ করেন।

গ। ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ: ‘পিলাতের বিচার’ দৃশ্যটা একাধারে পৃথক দু’টো পর্যায় অনুসারে লক্ষণীয়: ঐতিহাসিক ও আত্মিক পর্যায়। ঐতিহাসিক পর্যায় হল আত্মিক পর্যায়ের বাহ্যিক চিহ্ন এবং তার প্রতীকস্বরূপ। এই উদ্দেশ্যে যোহন বিশেষ একটা রচনা-শৈলী বা উপায় অবলম্বন করেন যাকে আমরা ‘যোহনের বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গি’ বলতে পারি; এই ভঙ্গি অনুসারে চরিত্রদের ভূমিকা পরস্পরের মধ্যে পরিবর্তিত হয়: বাহ্যত ইহুদীরা অভিযোক্তা, যিশু অভিযুক্ত ও পিলাত বিচারকর্তা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যিশুই অভিযোক্তা ও বিচারকর্তা। আবার এই ভঙ্গির মধ্য দিয়ে যোহন সত্যকে অসচেতন বিরোধী ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করেন, এমনকি সেই ব্যক্তি নিজের কাছে অজানা সত্যকে বা অসমর্থন-করা সত্যকে পর্যন্তই ঘোষণা করে। এভাবে, আমাদের মন অপমানজনক তামাশা থেকে গভীরতম ও মর্মস্পর্শী বাস্তবতার দিকে অবিরতই ফেরে: সৈন্যদের তামাশায় ও পিলাতের ঠাট্টামূলক ঘোষণায় আমাদের বিশ্বাস যিশুর বাস্তব রাজমর্যাদা প্রত্যক্ষ করতে আহূত।

এই অংশের মুখ্য প্রসঙ্গ দু’টোই: যিশুরাজ ও যিশু জগতের বিচারকর্তা।

যিশুরাজ: পিলাতের সঙ্গে প্রথম আলোচনায় (১৮:৩৩-৩৮) যিশু ঘোষণা করেন তিনি রাজা এবং এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। উৎপীড়নের দৃশ্যে (১৯:২-৩) যোহন যিশুর রাজকীয় উপাদানের উপর আমাদের মন আকর্ষণ করেন: কাঁটার মুকুট, বেগুনি রঙের চাদর ও সৈন্যদের সম্বোধন ও উপহার। যখন যিশুকে ইহুদীদের সামনে আনা হয় (১৯:৪-৭) তখনও রাজকীয় সেই চিহ্নগুলিতে পরিবৃত অবস্থায় তাঁকে প্রদর্শন করা হয়।

অবশেষে (১৯:১২-১৪) আসে সেই গভীর ঘোষণা, 'এই যে তোমাদের রাজা'। এভাবে যিশু যে রাজা তা রোম-সম্রাটের প্রতিনিধি দ্বারা আনুষ্ঠানিক ও সরকারী ভাবে স্বীকৃত ও ঘোষিত। বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যের বস্তু হওয়া সত্ত্বেও যিশু ঐশ্বরিক ও রাজকীয় মর্যাদায় ভূষিত। এতে যোহন একটা 'ক্রুশ' তত্ত্বও উপস্থাপন করেন: যিশুর ঐশরাজকীয় স্বরূপ ক্রুশ-মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বাস্তবায়িত হল (১২:৩২); যন্ত্রণাভোগ থাকা সত্ত্বেও যিশু রাজা হয়ে ওঠেন এমন নয়, যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে এমনকি যন্ত্রণাভোগেই যিশু রাজকীয় স্বরূপপ্রাপ্ত।

যিশু জগতের বিচারকর্তা: যিশুর বিরুদ্ধে বিচারটা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনায় পূর্ণ। অপর দিকে অভিযোক্তাদের বিরুদ্ধে যিশুর বিচার হল আলোরই বিচার, যে আলো অন্ধকারকে আত্মপ্রকাশ করিয়ে দেয়। ইহুদীদের ইচ্ছা ছিল তারা যিশুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবে, কিন্তু এর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করবে না; পিলাতও এই বিচারে কোন দায়িত্ব না নেওয়াতে খুব খুশি হতেন! কিন্তু যিশুর সামনে তেমনটি অসম্ভব: স্বয়ং সত্য যিনি, তিনি যে-কোন ধরনের মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার মুখোশ উন্মোচন করেন ও তাঁর সম্মুখীন হয়ে মানুষ পরিষ্কার একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য: হয় যিশু, না হয় বারাব্বাস; হয় যিশু, না হয় কায়েসার; হয় যিশু, না হয় জগৎ।

যিশুকে পিলাতের কাছে সমর্পণ (১৮:২৮-৩২)

১৮ [২৮] পরে তাঁরা যিশুকে কাইয়াফার কাছ থেকে শাসক-ভবনে নিয়ে গেলেন। তখন ভোর হয়েছে। তাঁরা নিজেরা শাসক-ভবনে প্রবেশ করলেন না, পাছে অশুচি হন, কিন্তু পাস্কাভোজে যেন বসতে পারেন। [২৯] তাই পিলাত তাঁদের কাছে বেরিয়ে গিয়ে বললেন, 'এই লোকের বিরুদ্ধে আপনাদের কী অভিযোগ?' [৩০] তাঁরা তাঁকে উত্তর দিলেন, 'অপকর্মা না হলে ওকে আপনার হাতে তুলে দিতাম না।' [৩১] পিলাত তাঁদের বললেন, 'আপনারাই ওকে নিয়ে যান ও আপনাদের বিধানমতে ওর বিচার করুন।' ইহুদীরা তাঁকে বললেন, 'আমাদের পক্ষে কারও প্রাণদণ্ড দেওয়া বিধেয় নয়।' [৩২] এমনটি ঘটল, নিজের

যে কীভাবে মৃত্যু হবে, সেবিষয়ে যিশু যা বলেছিলেন, তাঁর সেই কথা যেন পূর্ণ হতে পারে।

১৮:২৮—তাঁরা নিজেরা শাসক-ভবনে প্রবেশ করলেন না: ইহুদীরা বিধানপরায়ণ; কিন্তু যদি আগে তাদের এই বিধানপরায়ণতা অকৃত্রিম মনে হচ্ছিল, এখন তার কপটতা ও ভণ্ডামি পূর্ণ প্রকাশ পায়। পিলাতের শাসক-ভবনে প্রবেশ না করায় তারা যে যিশুর পরবর্তী ঐশপ্রকাশ থেকে আত্মবঞ্চিত করে শুধু নয়, বরং পাস্কা-মেষশাবক খাবার লক্ষ্যে নিজেদের শুচিতা অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য এত ব্যস্ত যে সত্যকার পাস্কা-মেষশাবক সেই যিশু থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে। তাদের সঙ্কীর্ণ নির্বুদ্ধিতায় তারা যিশুর মৃত্যু ঘটায়, যে মৃত্যু তাদের পাস্কাপর্ব-অনুষ্ঠানের সিদ্ধিস্বরূপ হয়ে উঠবে।

১৮:৩০—অপকর্মা না হলে… : ইহুদীদের ক্রুদ্ধ উত্তর রোমীয় শাসনকর্তা ও ইহুদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যকার বিরোধিতা শুধু নয়, যিশুর বিরুদ্ধে প্রকৃতই একটা অভিযোগ উত্থাপনের জন্য তাদের অসামর্থ্য ব্যক্ত; বস্তুত, যিশু যে সাধারণ একজন অপকর্মা, তাছাড়া তারা অন্য কিছুই বলতে পারে না। একথা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অল্পকাল পরে তারা নিজেরাই যিশুর 'দোষ' এতে দেখবে যে, তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবি করেছেন (১৯:৭)। তারা অবিশ্বাসের জালে এতই আচ্ছাদিত যে ঈশ্বরের পুত্রকেও সাধারণ একটা অপকর্মা বলে বিবেচনা করে।

১৮:৩১—আপনারাই ওকে নিয়ে যান: প্রথমে বোধ হয় যেন পিলাত, যেহেতু তারা নিজেদের অভিযোগ নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারে না, সেজন্য তাদের আদালতের উপর যিশুর বিচার করার ভার তুলে দেন। কিন্তু পিলাত সম্ভবত প্রধান যাজকদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র অবগত আছেন বা অনুমান করেন, সেইজন্য তাঁর উত্তর এত বিদ্রূপাত্মক: বস্তুত, মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকার ইহুদীদের ছিল না। কথাটা তারা নিজেরাই উচ্চারণ করে: এভাবে প্রধান যাজকেরা নিজেদের দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করতে

বাধ্য, যে দুরভিসন্ধি গুপ্ত একটা অধিবেশনে স্থির করা হয়েছিল (১১:৫০, ৫৩) এবং যা সম্বন্ধে সুসমাচারের পাঠক আগে থেকে অবগত (৫:১৮; ৭:১, ১৯, ২৫ ইত্যাদি): তারা যিশুকে বধ করতে চায় (১৯:৭)। একাধারে তাদের দর্প চূর্ণ হয় (৮:৩৩) এবং তাদের ঈশ্বরতান্ত্রিক দাবি সত্ত্বেও বিধর্মী ও বিজাতীয় আধিপত্যের সঙ্গে তাদের সহভাগিতাও প্রকাশিত (১১:৪৮)। উপরন্তু যোহন দেখাতে চান যে যিশুর মৃত্যুর ব্যাপারে পিলাতের চেয়ে ইহুদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষেরই দোষ গুরুতর (১৯:১১খ)।

১৯:৩২—নিজের যে কীভাবে মৃত্যু হবে…: যোহনের এই মন্তব্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে একথা স্মরণীয় যে, ইহুদী মৃত্যুদণ্ডের প্রথা ছিল পাথর ছুড়ে মারা এবং রোমীয় মৃত্যুদণ্ড ছিল ক্রুশারোপণ। যদি যিশু ইহুদী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতেন তাহলে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেওয়া হত অর্থাৎ তিনি যেন স্বর্গ থেকে ভূপাতিত হতেন; কিন্তু ক্রুশারোপণের মধ্য দিয়ে তিনি মাটি থেকে স্বর্গের দিকে উত্তোলিত হলেন, অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু হল একটা উত্তোলন যাতে দৃশ্যমান ও নির্দেশিত হয় যে যিশুর মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে পিতার কাছে আরোহণ ও ঐশগৌরবেই উত্তোলন-উন্নয়ন (৩:১৪; ৮:২৮; ১২:৩২)। এইভাবে ইহুদীরা হল ঐশপ্রকাশ বাস্তবায়নের জন্য সহযোগী বস্তুস্বরূপ এবং তাদের মাধ্যমে যিশুর মৃত্যু রহস্যময় একটা তাৎপর্য প্রকট করে যা তাদের ষড়যন্ত্র-সকল অস্বীকার করে। এবারও ইহুদীরা নিজেদেরই প্রধান চরিত্র মনে করে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে যিশু যা পূর্বঘোষণা করেছিলেন তারা তা-ই সাধন না করে পারে না।

বিচারের প্রথম পর্ব (১৮:৩৩-৩৮ক)

যিশুর বিচার অপরাপর সুসমাচারত্রয় অনুসারে পিলাতের জিজ্ঞাসা নিয়ে শুরু হয়, ‘তুমি কি ইহুদীদের রাজা?’ এবং যিশুর আত্মস্বীকারোক্তিতে সমাপ্ত হয়: তিনি রাজা, কিন্তু তাঁর রাজ্য পার্থিব নয়। যিশু নিজের রাজ্য বিষয়টা ব্যাখ্যা করেন: তিনি সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন এবং যারা সত্যে সংস্থিত তাদের নিজের কাছে আহ্বান করেন। কিন্তু পিলাত সংশয়াচ্ছন্ন (‘সত্য! তা আবার কি?’) বলে যিশুর আহ্বানে সাড়া দিতে অক্ষম।

যেহেতু যিশু পরিত্রাণদায়ী সত্যের ঐশপ্রকাশকর্তা, সেজন্য বিধর্মীদের প্রতিনিধির সম্মুখীন হলেও নীরব থাকতে পারেন না। রোমীয় বিচারকর্তাকে উত্তর দেওয়ায় ও নিজের রাজ্যের কথা ব্যাখ্যা করায় তিনি আপন 'ঐশপ্রকাশকর্তা' ভূমিকা অনুশীলন করেন, যে-প্রকাশকর্তা সকলকে, এমনকি এই জগতের ক্ষমতাশালীদেরও নিজের সপক্ষে বা বিপক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেন। কিন্তু পিলাতের মনোবল নেই বিধায় বিচারের কি পরিণাম হবে তা আগে থেকে অনুমান করা যায়। যোহনের মতে পিলাতের মনোবলের অভাব থেকেই সবকিছু ফলেছে: যিশুরাজের স্থানে একটা দস্যুকে মনোনয়ন (১৮:৩৮খ-৪০), তাঁর রাজকীয় মর্যাদার বিদ্রূপ (১৯:১-৩), অপমানের উদ্দেশ্যে তাঁকে জনগণের সামনে প্রদর্শন (১৯:৪-৬) এবং অবশেষে ক্রুশ-মৃত্যুদণ্ড (১৯:১৯)।

এইভাবে যিশুরাজ প্রসঙ্গটা যন্ত্রণাভোগ কাহিনীর সংযোজক সূত্র হয়ে দাঁড়ায়। পিলাতের বিচারের এই প্রথম পর্বে সূচিত যিশুর আত্মপ্রকাশ (যা বিচারের দ্বিতীয় পর্বে অধিক গভীরতরভাবে আলোচিত হবে, ১৯:৮-১১) হল বিচারের প্রধান বিষয়বস্তু ও যোহনের ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ অনুভবের জন্য অপরিহার্য চাবিকাঠি।

১৮ [৩৩] তখন পিলাত আবার শাসক-ভবনে প্রবেশ করে যিশুকে কাছে ডেকে বললেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' [৩৪] যিশু উত্তর দিলেন, 'আপনি কি নিজে থেকেই একথা বলছেন, না অন্যেরা আমার বিষয়ে আপনাকে বলেছে?' [৩৫] পিলাত উত্তর দিলেন, 'আমি কি ইহুদী? তোমার স্বজাতিরা ও প্রধান যাজকেরাই তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন—তুমি কী করেছ?' [৩৬] যিশু উত্তর দিলেন, 'আমার রাজ্য ইহলোকের নয়। যদি আমার রাজ্য ইহলোকের হত, তাহলে ইহুদীদের হাতে আমাকে যেন তুলে দেওয়া না হয়, তার জন্য আমার লোকজন লড়াই করত; কিন্তু, না, আমার রাজ্য ইহলোকের নয়।' [৩৭] পিলাত তাঁকে বললেন, 'তাহলে তুমি কি একজন রাজা?' যিশু উত্তর দিলেন, 'আপনিই তো বলছেন, আমি রাজা। সত্যের বিষয়ে যেন সাক্ষ্য দিতে পারি, এজন্যই আমি জন্মেছি, এজন্যই জগতে এসেছি। যে কেউ সত্যের মানুষ, সে আমার কথায় কান দেয়।' [৩৮] পিলাত তাঁকে বললেন, 'সত্য! তা আবার কী?'

১৮:৩৪—আপনি কি নিজে থেকেই একথা বলছেন? যোহন গুরুত্বপূর্ণ একটা দিকের প্রতি আমাদের মন আকর্ষণ করতে চান। পিলাতের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যিশু নিজেই একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেন; এতে পাঠকের কাছে আর একবার প্রমাণিত হয় যে, পিলাত নয়, প্রকৃতপক্ষে যিশুই বিচারটা পরিচালনা করেন।

১৮:৩৫—আমি কি ইহুদী? সকল রোমীয়দের মত পিলাতও ইহুদীদের হেয়জ্ঞান করতেন, তাঁর মতে, যিশুর বিচারের জন্য দায়ী ও দোষী হল ইহুদীরা, বিশেষত ইহুদী মহাসভার সদস্যরা ও প্রধান যাজকেরা। তাতে জাতি হিসাবে ইহুদী জাতি দায়ীও নয়, দোষীও নয়।

১৮:৩৬—আমার রাজ্য ইহলোকের নয়: 'যিশুর রাজ্য' সদৃশ সুসমাচারত্রয় অনুযায়ী 'ঐশরাজ্য' বা 'স্বর্গরাজ্য' অনুসারে বিবেচনাযোগ্য নয়। যোহনের ধারণায় 'যিশুর রাজ্য' যিশুর রাজমর্যাদাই লক্ষ করে যা এই জগতে সাধিত তাঁর পরিত্রাণদায়ী ঐশপ্রকাশ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। যিশুর রাজ-অধিকার ইহলোকের নয় ঠিকই, অথচ ইহলোকের বাইরেও নয়: যেখানে তাঁর কথা শোনা যায় ইহলোকের সেই সকল স্থানেও সেই রাজ-অধিকার ব্যক্ত। ইহলোকের রাজমর্যাদা বা রাজ-অধিকার বাহ্যিক ক্ষমতা, আধিপত্য, স্বার্থপরতা ও অত্যাচারে ব্যক্ত, অপর দিকে যিশুর ঐশপ্রকাশ অনুসারে তাঁর রাজ-অধিকার আত্মদান, ভালবাসা, সত্যনিষ্ঠা ও বাহ্যিক ক্ষমতা-অসমর্থনে, এক কথায় তাঁর যন্ত্রণাভোগেই সূক্ষ্মরূপে অভিব্যক্তি লাভ করে।

১৮:৩৭—আপনিই তো বলছেন… : পিলাতের প্রশ্নের উত্তরে যিশু আপন রাজ-অধিকার ব্যাখ্যা করেন। তাঁর আত্মপরিচয়দান অতিশয় স্পষ্টভাবে প্রকট করে যে তিনি অন্য এক 'লোক' থেকে আসেন এবং ইহলোকে তাঁর অদ্বিতীয় কাজ হল সেই অন্য 'লোক' বিষয়ে অর্থাৎ ঐশলোকের বাস্তবতা বিষয়ে সাক্ষ্যদান করা। এই বচনে ঐশবাণীর পূর্বাস্তিত্ব ও মাংসে ঐশবাণীর আগমন ধারণা দু'টো সূচিত বটে, কিন্তু বচনের প্রত্যক্ষ

অর্থ এই যে, যিশু সম্পূর্ণরূপে সচেতন তিনিই ঈশ্বরের সেই অনন্য, সত্যকার ও চরম প্রেরিতজন যিনি পরিত্রাণদায়ী সত্যের প্রকাশকর্তা। এটিই যোহনের ‘মূল ঘোষণা’ (গ্রীক ভাষায় ‘কেরিগ্‌মা’) যা অধিক যথাযথ বাক্যে ৩:৩১-৩৬-এ লিপিবদ্ধ। এই পদ গুরুত্বপূর্ণ বলে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। পদটি তিনটি কথার উপর বিশেষ জোর দেয়, তথা: সাক্ষ্য, সত্য ও রাজ্য।

সাক্ষ্য: প্রকৃতপক্ষে যিশু সেই ঐশলোকের সাক্ষী যিনি ‘পিতার কাছে যা শুনেছেন ও দেখেছেন’ (৩:৩২; ৮:২৬) তা মানুষের পক্ষে পরিত্রাণদায়ী সত্য বলে (৮:৩২ এবং ‘সত্য’ বিষয়ে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) প্রাণপণে এই জগতে প্রকাশ করেন। তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ঈশ্বরেরই বিষয়ে একটি সাক্ষ্য যিনি ভালবাসার খাতিরে জগতের পরিত্রাণ করতে ইচ্ছা করেন (৩:১৬…)। কিন্তু একাধারে এই সাক্ষ্য পিলাতের সামনে আইনগত অর্থও ধারণ করে: অভিযুক্ত হয়েও সত্যের ও ঈশ্বরের সেই সাক্ষী পুনরায় ঐশসত্যকে প্রকাশ করতে সক্ষম, এমনকি এই সাক্ষ্য জগতের আনুষ্ঠানিক ও সরকারী আদালতে দান করা হয় বিধায় তা তাঁর চরম সাক্ষ্যদান বলে পূর্ণতা লাভ করে।

সত্য: ‘যে কেউ সত্যের মানুষ, সে আমার কথায় কান দেয়’ বচনটি ইহুদীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক (৮ অধ্যায়) এবং উত্তম মেষপালক উপদেশের কথা (১০ অধ্যায়) স্মরণ করায়। অবিশ্বাসী ইহুদীদের কাছে যিশু প্রতিবাদ করে বলেছিলেন তিনি তাদের কাছে সত্য প্রচার করেন (৮:৪০, ৪৫) কিন্তু তারা ‘ঈশ্বর হতে উদ্গত নয়’ বলে (৮:৪৭) সেই সত্যকে অগ্রাহ্য করে। সুতরাং পিলাত যদি ‘সত্যের মানুষ’ অর্থাৎ ‘ঈশ্বর হতে উদ্গত মানুষ’ হতে চান তাহলে যিশুর কথা শুনুন, এটি হল পিলাতের কাছে যিশুর আহ্বান। ইহুদীদের বিপরীতে রয়েছে বিশ্বাসীগণ: এরাই নিজেদের পালকের কণ্ঠস্বর শোনে (১০:৩, ১৬, ২৭) এবং নিজ কাজ তাঁর প্রকাশিত সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে (৩:২১) সেই সত্যের পথে ঈশ্বর ও তাঁর আত্মপ্রকাশ অভিমুখে চলে (৮:৪৭)। পিলাত এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সম্মুখীন: হয় অবিশ্বাসী ইহুদীদের পক্ষে দাঁড়াবেন, না হয় সেই বিশ্বাসীদের পক্ষ গ্রহণ করবেন যারা যিশুর ঐশপ্রকাশ গ্রহণ করায়ই তাঁর রাজ্য গ্রহণ করে।

রাজ্য : যিশুর রাজ্য যে ঐশলোকে বা ভাবীকালে সীমাবদ্ধ এমন নয়, তা এই জগতে প্রতিষ্ঠিত ও ইতিমধ্যেই বিদ্যমান; তারাই এই রাজ্যের অংশী যারা যিশুর কথা শুনে তা পবিত্র জীবনযাপনে মেনে চলে।

১৮:৩৮—সত্য! তা আবার কী: পিলাত দার্শনিক নন, সত্যান্বেষীও নন। এই উক্তিতে তিনি যিশুর সাক্ষ্য এড়াতে ও অগ্রাহ্য করতে চান। যিশু ঐশসত্য পিলাতকে দিতে প্রস্তুত ছিলেন, এমনকি তিনি নিজে তাঁর সম্মুখে সত্যের স্বয়ং কণ্ঠস্বর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু পিলাত সেই কণ্ঠ শুনতে পান না, চানও না, ফলত সেই ইহুদীদের পক্ষ গ্রহণ করেন যারা যিশুর কথা বোঝে না (৮:৪৩) এবং সেই সকলের একজন হন যারা 'সত্য হতে উদ্গত' নয়। সুতরাং পিলাতের এই উক্তিতে যিশুর বিরুদ্ধে রায় নেওয়া হয়ে গেছে; পরবর্তী ঘটনাগুলো এই কথা সত্য বলে প্রমাণিত করবে। যোহনের যে সকল দৃশ্যবিবরণী ও নাটকীয় বৈশিষ্ট্য ৮ অধ্যায়ে অবিশ্বাসী ইহুদীদের বেলায় ও এখানে পিলাতের বেলায় প্রযুক্ত, সেগুলোর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, যিশুতে বিদ্যমান ঐশপ্রকাশ মানুষকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে, এমনকি অগ্নিপরীক্ষার দিকে মানুষকে চালিত করে (৩:১৮…)।

এই কথাও লক্ষণীয় যে, পিলাতের এই সংশয়পূর্ণ প্রশ্নে যিশু কোনও উত্তর দেন না। এই নীরবতার অর্থ এই যে, যিশু সেই প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছিলেন; তাঁর সমস্ত জীবনযাত্রাই ও তাঁর সকল বাণীই সেই প্রশ্নের উত্তর।

যিশুর নির্দোষিতা ঘোষণা (১৮:৩৮খ-৪০)

১৮ [৩৮খ] একথা বলার পর তিনি আবার ইহুদীদের কাছে বেরিয়ে গিয়ে বললেন, 'ওর মধ্যে কোন অপরাধ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। [৩৯] আপনাদের জন্য কিন্তু একটা প্রথা আছে যে, পাস্কা উপলক্ষে আমি আপনাদের জন্য একজনকে মুক্ত করে দিই। তবে আপনারা কি চান যে, আমি ইহুদীদের রাজাকে আপনাদের জন্য

মুক্ত করে দিই?' [৪০] তাঁরা আবার চিৎকার করে বললেন, 'একে নয়, বারাব্বাসকে।'—বারাব্বাস ছিল এক দস্যু!

যিশুর নির্দোষিতা ঘোষণায় অবিশ্বাসী ইহুদীদের অন্ধতা ব্যক্ত: আলো যে যথেষ্ট তেজময় নয় এজন্য নয়, বরং তাদের অসৎ কাজের প্রকৃত রূপ যেন উদ্ঘাটিত না হয় (৩:১৬…) বা ঈশ্বরের গৌরবের চেয়ে মানব গৌরব বেশি ভালবাসে বলেই (১২:৪৩) তারা আলোর সামনে চোখ বুজে থাকে। তাদের অন্ধতা ও অবিশ্বাস এমন যে, যিশুর চেয়ে প্রকৃত একজন দস্যুকে পছন্দ করে।

যিশুকে উৎপীড়ন (১৯:১-৩)

যিশুর নির্দোষিতা ঘোষণা করা সত্ত্বেও পিলাত ইহুদীদের দাবি ফিরিয়ে দিতে অক্ষম, এজন্য যিশুকে কশাঘাত করতে আদেশ দেন। তাঁর এই প্রথম পতন থেকে অন্য পতনগুলোর ধারা শুরু হয়, যিশুকে ক্রুশে দেওয়ার আদেশ পর্যন্ত। পিলাতের মত যারা ঈশ্বরের প্রেরিতজনের আহ্বানে সাড়া দেয় না (১৮:৩৭…) তারাও বাহ্যিক আধিপত্যপ্রাপ্ত হলেও মানুষের ষড়যন্ত্রের অধীন হয়।

১৯ [১] তখন পিলাত যিশুকে নিয়ে গিয়ে কশাঘাত করালেন। [২] এবং সৈন্যেরা কাঁটা দিয়ে একটা মুকুট গেঁথে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল, ও তাঁর গায়ে বেগুনি রঙের একটা চাদর দিল; [৩] তাঁর সামনে এসে তারা বলছিল, 'মঙ্গল হোক, ইহুদীরাজ!' আর তাঁকে চড় দিতে লাগল।

কশাঘাত-দণ্ড সেইকালে রোমীয় এমন দণ্ড ছিল যা দিয়ে সাধারণত শুধু ক্রীতদাস বা দোষী সৈন্যেরা দণ্ডিত হত। সুতরাং, এতে যোহন দেখাতে চান যে, যিশু সত্যিই উৎপীড়িত হলেন; উপরন্তু কাঁটার মুকুটের কথার মধ্য দিয়েও যিশুকে অপমানিত ব্যক্তি ও তাচ্ছিল্যের রাজা রূপে উপস্থাপন করেন। যিশুর প্রচ্ছন্ন রাজমর্যাদা অধিক প্রকাশ্যকর হতে চলছে, এমনকি অন্যান্য রাজার চেয়ে তিনি এতেই অন্যরকম যে, লোকে তাঁকে

তাচ্ছিল্যের রাজা মনে করে, ফলত তাঁকে বিদ্রূপ ও অগ্রাহ্য করে। যিশুর জন্মকালে তিন পণ্ডিত রাজ-উপযুক্ত সমাদর ও উপহার স্বরূপ সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস তাঁকে দান করেছিলেন (মথি ২:১১); জীবনশেষেও রাজা বলে যিশুর উপহার গ্রহণ করার কথা: দুঃখের বিষয়, মানবজাতির হয়ে সৈন্যেরা চড় ছাড়া যিশুরাজকে অন্য কোন উপহার দিতে পারল না। কিন্তু, যোহনের সেই বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গি অনুসারে আমরা বুঝি যে, সৈন্যেরা যিশুকে তামাশা করে অসচেতন হয়ে তাঁর রাজ-অধিকার ঘোষণা করে; ঈশ্বরের অভিপ্রায় অক্ষুণ্ণই থাকে: যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে, এমনকি যন্ত্রণায়ই যিশু রাজা হয়ে ওঠেন।

রাজারূপে যিশুকে প্রদর্শন (১৯:৪-৭)

১৯ [৪] পিলাত আবার বেরিয়ে গিয়ে তাদের বললেন, 'দেখ, ওকে তোমাদের কাছে বের করে আনছি, তোমরা যেন জানতে পার যে, আমি ওর মধ্যে কোনও অপরাধ খুঁজে পাচ্ছি না।' [৫] তাই যিশু বেরিয়ে এলেন—সেই কাঁটার মুকুট আর বেগুনি রঙের চাদর পরিবৃত হয়ে। পিলাত তাদের বললেন, 'এই সেই মানুষটি!' [৬] প্রধান যাজকেরা ও প্রহরীরা তাঁকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলল, 'ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও!' পিলাত তাদের বললেন, 'তোমরা নিজেরা ওকে নিয়ে যাও ও ক্রুশে দাও, কেননা আমি ওর মধ্যে কোন অপরাধ খুঁজে পাচ্ছি না।' [৭] ইহুদীরা তাঁকে উত্তর দিল, 'আমাদের এক বিধান আছে, আর সেই বিধান অনুসারে ওর মৃত্যু হওয়া উচিত, কেননা সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র করে তুলেছে।'

১৯:৪—দেখ, ওকে তোমাদের কাছে বের করে আনছি: পিলাত এবিষয়ে পূর্ণ সচেতন যে যিশু নিরপরাধী; এজন্য ইহুদীদের বুঝিয়ে দিতে চান যে তাদের অভিযোগ (যিশু নিজেকে ইহুদীদের রাজা বলে দাবি করেছিলেন) ভিত্তিহীন।

১৯:৫ক—যিশু বেরিয়ে এলেন : ইহুদীরা যেন বুঝতে পারে যে বস্তুতই যিশুর কোন রাজমর্যাদা ও রাজ-অধিকার নেই এবং ফলত তাদের অভিযোগ মিথ্যা, সেজন্যই পিলাত যিশুকে তাচ্ছিল্যের রাজারূপে তাদের কাছে প্রদর্শন করতে অভিপ্রেত।

কিন্তু যোহনের অভিপ্রায় শুধু বিশ্বাসের চোখেই উন্মুক্ত হয়; পিলাত দ্বারা তাচ্ছিল্যের রাজারূপে প্রদর্শিত হয়েও যিশু সত্যকার রাজা যিনি সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। তাচ্ছিল্যের পাত্র হওয়া সত্ত্বেও এই উৎপীড়িত যিশু এমন মর্যাদায় ভূষিত যা কিছুক্ষণ পরে 'ঈশ্বরের পুত্র' মহাযাজকের এই উক্তিতে ব্যক্ত হবে।

১৯:৫খ—এই সেই মানুষটি : এই বচনেও যোহন পৃথিবীস্থ যিশুর প্রচ্ছন্ন ঈশ্বরত্ব দেখাতে চান এবং এই রহস্যময় সত্যও দেখাতে চান যে, বাহ্যত ক্রুশের উপরে যাঁর অবনমিত হওয়ার কথা, তিনি প্রকৃতপক্ষে উন্নীত এমনকি পরম গৌরবান্বিত।

১৯:৬—তোমরা নিজেরা ওকে নিয়ে যাও : এই বাক্যের মাধ্যমেও পিলাত যিশুকে ইহুদী বিচারকদের হাতে তুলে দিতে সঙ্কল্পবদ্ধ, কিন্তু যে কথা ইহুদীদের উদ্দেশ করে উচ্চারণ করেন, সেই কথা প্ররোচনাসূচক : তিনি ভালই করে জানেন তারা কাউকেই ক্রুশে দিতে পারে না (১৮:৩১খ)।

১৯:৭—আমাদের এক বিধান আছে : আগেও ইহুদীরা যিশুকে ঈশ্বরনিন্দার দায়ে অভিযুক্ত করেছিল (৫:১৮; ৮:৫৯; ১০:৩৩)। এখন কিন্তু যোহন যিশুর বিচার বিষয়ে নতুন কয়েকটা দিক দেখাতে চান :

১। প্রধান যাজকদের মুখোশ উদ্ঘাটিত হয় : যিশুর বিরুদ্ধে তাদের প্রথম অভিযোগ রাজনৈতিক অভিযোগ হওয়াতে তা মিথ্যা অভিযোগ ছিল। এখন তাদের অস্বীকার করতে হবে যে, অন্য একটা দায়ে তারা যিশুর মৃত্যু চায় (১৮:৩০…)।

২। যিশুর প্রতি তাদের ঘৃণা তাঁরই প্রতি তাদের অবিশ্বাসে রোপিত যিনি ঈশ্বরের প্রেরিতজন বলে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে দাবি করেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত তাদের এই অবিশ্বাসকে রোমীয় আদালতের সামনে অর্থাৎ জগতের সামনেই এখন উদ্ঘাটিত হতে হয়।

৩। এই বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তি যিনি, সেই ইহুদীদের রাজার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়, এমনকি স্বয়ং প্রধান যাজকেরাই যথার্থভাবে তাঁর রাজ-স্বরূপ ব্যাখ্যা করে ('ঈশ্বরের পুত্র')। বাস্তবিকপক্ষে, যখন পিলাত যিশুর রাজ-স্বরূপ জাগতিকও নয় রাজনৈতিকও নয় বলে স্বীকার করেন ও প্রমাণ করেন যে তেমন অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও 'ইহুদীদের রাজা' ইহুদীদের এই নতুন অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন, তখন যিশুর রাজ্য সেটাই মাত্র হতে পারে যা প্রধান যাজকদের কথায় ব্যক্ত, অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্রেরই রাজ্য যে-রাজ্য কিন্তু তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। এটিই হল আপন রাজ্য বিষয়ে যিশুর উপস্থাপিত ব্যাখ্যার প্রমাণ (১৮:৩৭)।

৪। পিলাত প্রধান যাজকদের নতুন অভিযোগ অগ্রাহ্য করেন না, বরং এতে এত বিচলিত হয়ে ওঠেন যে 'আরও ভীত হলেন' (১৯:৮)। বিনা আপত্তিতে নতুন অভিযোগটা গ্রহণ করায় তিনি স্বীকার করেন যে, যিশুর আন্তর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা তিনি অনুভব করেছেন বলেই তাঁকে প্রত্যাহার করতে উৎসুক।

এইভাবে যিশুর বিদ্রূপের অবমাননাত্মক দৃশ্য তাঁর প্রচ্ছন্ন গৌরবপ্রকাশে শেষ হয়। পিলাতের অবমাননাজনকভাবে প্রদর্শিত সেই 'মানুষ', ঠিক ইহুদীদের বিরোধিতায়ই নিজেকে 'ঈশ্বরের পুত্র' রূপে প্রমাণিত করেন।

বিচারের দ্বিতীয় পর্ব (১৯:৮-১২)

বিচারের এই দ্বিতীয় পর্ব প্রথম পর্বের সঙ্গে (১৮:৩৩-৩৮) স্পষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিচারের পর্ব দু'টোতে ইহুদীদের অভিযোগ অনুযায়ী একটা প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। প্রথম পর্বে যিশু রাজা-দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং পিলাত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' এখন তিনি 'ঈশ্বরের পুত্র'-দায়ে অভিযুক্ত এবং পিলাতের প্রশ্ন হল,

‘তুমি কোথাকার মানুষ?’ এটি হল তারই প্রশ্ন যে যিশু দ্বারা আহূত হয়েও ‘বিশ্বাস’ সিদ্ধান্ত এড়াতে চায় (৭:২৭; ৮:১৪; ৯:২৯)। এখন কিন্তু বিচারটা যিশুর রাজ্যকে নয়, তাঁর নিজের স্বরূপ বা তাঁর পুত্রত্বকে লক্ষ করে। ‘রাজা’ ও ‘পুত্র’ অধিকার দু’টো নাথানায়েলের স্বীকৃতি (১:৪৯; কিন্তু সেই নাথানায়েল এখন কোথায়?) ও পুরাতন নিয়মের ঐতিহ্য (২ শামু ৭:১২-১৬; সাম ৮৯:২) স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯ [৮] একথা শুনে পিলাত আরও ভীত হলেন। [৯] শাসক-ভবনে আবার প্রবেশ করে তিনি যিশুকে বললেন, ‘তুমি কোথাকার মানুষ?’ কিন্তু যিশু তাঁকে কোনও উত্তর দিলেন না। [১০] তাই পিলাত তাঁকে বললেন, ‘আমার সঙ্গে কথা বলছ না? তুমি কি জান না, তোমাকে মুক্তি দেওয়ার অধিকার আমার আছে, আবার তোমাকে ক্রুশে দেওয়ার অধিকারও আমার আছে?’ [১১] যিশু উত্তর দিলেন, ‘আমার উপর আপনার কোনও অধিকারই থাকত না, ঊর্ধ্বলোক থেকে যদি না আপনাকে দেওয়া হত। তাই আমাকে যে আপনার হাতে তুলে দিয়েছে, তারই পাপ আরও গুরুতর।’ [১২] ফলত পিলাত তাঁকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু ইহুদীরা চিৎকার করে বললেন, ‘ওকে যদি মুক্তি দেন, তাহলে আপনি কায়েসারের বন্ধু নন। যে কেউ নিজেকে রাজা করে তোলে, সে কায়েসারের বিরোধিতা করে।’

১৯:৮—পিলাত আরও ভীত হলেন: পিলাত ইহুদীদের নয় যিশুকেই ভয় করেন: তিনি তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক কিছু অনুভব করতে পেরেছেন, তিনি ‘আরও’ ভীত হওয়ায় অনুমান করা যায় তিনি বিচারের প্রথম পর্বেও ভয়ে অভিভূত ছিলেন, যে-ভয় ‘সত্য! তা আবার কি’ প্রশ্নের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল। মথির সুসমাচার অনুসারে (মথি ২:৩) হেরোদ রাজাও শিশু যিশুর জন্মের কথায় ভীত হয়ে পড়েছিলেন; এখন, তাঁর শাসনকর্তার হয়ে রোমীয় সাম্রাজ্যই অভিযুক্ত ও নিরুপায় যিশুর সম্মুখীন হয়ে মহাতঙ্কে আতঙ্কিত। এতে যোহনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত, যাতে পাঠক বিচারকর্তা পিলাত ও অভিযুক্ত যিশুর মধ্যে ভূমিকা-বিনিময় লক্ষ করেন: এখন থেকে যিশু মহাত্মারূপে দাঁড়িয়ে আছেন, রাজার মত বিচারটি পরিচালনা করেন, তিনিই বিচারকর্তা (১৯:১২)।

১৯:৯—তুমি কোথাকার মানুষ? এই প্রশ্ন অবিশ্বাসী ইহুদীদের সঙ্গে যিশুর তর্ক-বিতর্কের বেলায়ও বারংবার ধ্বনিত হয়েছিল (৭:২৭; ৮:১৪; ৯:২৯); যিশুর স্বর্গীয় উদ্ভব হল তাঁর সাক্ষ্যের গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক একটা দিক। কিন্তু, পিলাতের মুখে প্রশ্নটা তাঁর আন্তর সত্যানুসন্ধানের ইচ্ছা নয়, শুধু তাঁর আতঙ্ক ও সংশয়পূর্ণ স্বভাবই প্রকাশ করে। পিলাতের অবিশ্বাসের মনোভাব জানেন বলে যিশু নীরব থাকেন। যে জগতের মায়ায় আচ্ছন্ন তাকে যিশু কোন উত্তর দেন না; দিলেও সে বুঝত না (৮:২৫)।

১৯:১০—তুমি কি জান না… : আপতদৃষ্টিতে পিলাতের কথা যুক্তিসঙ্গত মনে হতেও পারে, শাসনকর্তারূপে তাঁর অধিকার আছে বৈকি। কিন্তু যোহনের ধারণা খুবই গভীর: বাহ্যিক অধিকারপ্রাপ্ত বলে মানুষ ঈশ্বরের দাবি এড়াতে পাবে বলে মনে করে। যে অধিকার বিষয়ে পিলাত গর্ব করেন তা কেবল মায়াই তিনি যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে সেই অধিকার অনুশীলন না করেন। যে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিরুপায় অবস্থায় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই যিশু ভিন্ন এমন একটা অধিকারের অধিকারী যা পিলাত ভয় করেন।

১৯:১১ক—আমার উপর আপনার কোনও অধিকারই থাকত না: পিলাতের ভয়ে নয় বরং অধিকার বিষয়ে তাঁর একটা বক্তব্য আছে বলে যিশু এবার কথা বলেন। শাসনকর্তারূপে পিলাত একজন অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি বটে, অথচ তাঁর সেই যথার্থ অধিকার নেই, যে-অধিকার এমন যা সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে (৩:২৭; ৬:৬৫)। কায়েসারের দেওয়া অধিকার তাঁর আছে ঠিকই, কিন্তু যিশু ক্ষেত্রে তিনি তাঁকে মুক্ত বা ক্রুশবিদ্ধ করতে সক্ষম এই কারণে যে, ঈশ্বরই তাঁকে এ কাজ করতে দিচ্ছেন। পিলাত নয়, যিশুই সেই 'অধিকারের' মত 'উর্ধ্বলোক থেকে' অর্থাৎ ঐশলোক থেকে উদ্গত; ফলে তিনি সকল অধিকারের অধিকারী এবং এজন্য তিনি 'ভূলোক থেকে' বা 'নিম্নলোক থেকে' উদ্গত যারা তাদের চেয়ে মহান (৩:৩১)। যিশু সচেতন তিনি সর্বদাই সেই পিতার সঙ্গে সংযুক্ত যিনি পিলাতকে এ কাজ করতে দেন (১০:১৭; ১৪:৩১)। যিশুর এই বচনের ফলে, যিনি আপন অনিত্য অধিকারের অধীনে যিশুকে বশীভূত

করতে চান সেই পিলাতই বশীভূত হন, আর যিনি বাহ্যত নিরুপায়, সেই যিশুই স্বাধীন, মুক্ত ও অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ান।

১৯:১১খ—তাই আমাকে যে আপনার হাতে তুলে দিয়েছে… : যিনি শুধু ঈশ্বরেরই ইচ্ছার প্রতি বাধ্য এবং ঈশ্বরের দেওয়া অধিকারবলে সবকিছু বিচার করেন, সেই অধিকার গুণেই যিশু যারা তাঁকে বিচার করতে উদ্যত হচ্ছে তাদের উপর নিজের রায় উচ্চারণ করেন। তাঁর দোষের জন্য পিলাতও দণ্ডনীয়, কিন্তু গুরুতর পাপ প্রধান যাজকদেরই।

১৯:১২—ফলত পিলাত তাঁকে মুক্তি দিতে… : যিশু যে ঐশলোক থেকে উদ্গত তা শুনে পিলাত বিচলিত, আর সম্ভবত এতই ভীতও হন যে যিশুকে মুক্তি দেবেন বলে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। কিন্তু তাঁর অস্থির স্বভাবের কারণে ইহুদীদের উসকানিতে কান দেন। যোহনের 'বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গি' লক্ষণীয়: নিজের অধিকার নিয়ে গর্ব করতে না করতেই তিনি ইহুদীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ায় প্রমাণ করেন তাঁর অধিকার যে কতই না তাচ্ছিল্যের বস্তু; বাস্তবিকপক্ষে তিনি ইহুদীদের সেই প্রথম অভিযোগ অনুসারে যিশুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে সম্মত, যে-অভিযোগ অল্পকাল আগে তিনি নিজেই স্পষ্টভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছিলেন।

যিশুর মৃত্যুদণ্ড (১৯:১৩-১৬ক)

যিশুর সপক্ষে পিলাতের সমর্থন বিলীন হয়ে গেল; যিশুকে মৃত্যুদণ্ড, ক্রুশ-মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া ইহুদীদের পরিকল্পিত এই অভিপ্রায় পূর্ণ হল। প্রধান যাজকদের অমত থাকা সত্ত্বেও যিশু 'ইহুদীদের রাজা' বলেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। কিন্তু তাদের সচেতনতার চেয়ে অধিক গভীরতরভাবেই যিশু তাদের রাজা, কারণ তিনি ক্রুশের উপরে উত্তোলিত-উন্নীতই হবেন। অবিশ্বাসী জগৎ ঈশ্বরের প্রেরিতজনকে বিচার করে এবং একাধারে

সে-ই তাঁর দ্বারা বিচারিত। এইভাবে যিশুর বিচারের সমাপ্তি: চরম অবমাননা অথচ মহাগৌরবের ঘটনা।

১৯ [১৩] একথা শুনে পিলাত যিশুকে বাইরে নিয়ে এলেন আর শাণের চাতাল—হিব্রু ভাষায় গাব্বাথা—নামে স্থানে এক মঞ্চে আসন নিলেন। [১৪] সে দিনটি ছিল পাস্কার প্রস্তুতি-দিবস, সময় প্রায় দুপুর বারোটা। তিনি ইহুদীদের বললেন, 'এই যে তোমাদের রাজা!' [১৫] তারা চিৎকার করে বলল, 'দূর কর, দূর কর, ওকে ক্রুশে দাও!' পিলাত তাদের বললেন, 'আমি কি তোমাদের রাজাকে ক্রুশে দেব?' প্রধান যাজকেরা উত্তর দিলেন, 'কায়েসার ছাড়া আমাদের কোনও রাজা নেই।' [১৬] তিনি তখন ক্রুশে দেওয়ার জন্য তাঁকে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন।

১৯:১৩—পিলাত যিশুকে বাইরে নিয়ে এলেন: কোনও কথা উচ্চারণ না করে পিলাত যিশুকে পুনরায় বাইরে নিয়ে আসেন। এই দৃশ্য 'যিশুকে প্রথম প্রদর্শনের' দৃশ্যের সঙ্গে (১৯:৪-৭) সম্পর্কযুক্ত এবং সেই দৃশ্যের পরিণাম ও পূর্ণতা। পিলাত বিচারাসনে আসীন আছেন 'শাণের চাতাল' স্থানের এক মঞ্চে, অর্থাৎ যে-স্থানে তিনি আনুষ্ঠানিক ও সরকারীভাবে বিচারদণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করেন; ফলত যিশুর মৃত্যুদণ্ড আনুষ্ঠানিক ও সরকারীভাবেই জগতের সামনে জারীকৃত: তাঁকে রোমীয় প্রথা অনুসারে ক্রুশের উপরে উত্তোলিত হতে হবে সকলেই যেন তাঁকে দেখতে পায় (৩:১৪; ১২:৩২; ১৯:৩৭)।

১৯:১৪—সময় প্রায় দুপুর বারোটা: যোহন সূক্ষ্মভাবেই যিশুরাজের মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণার নির্দিষ্ট দিন ও সময় লিপিবদ্ধ করেন। পাস্কাপর্বের কথা উল্লেখে ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছাড়া প্রতীকমূলক একটা গভীর তাৎপর্যও বর্তমান: যিশুই নব সন্ধির পাস্কা-মেষশাবক যাঁর কোন হাড্ড ভগ্ন হয়নি (১৯:৩৬); আর শুধু তা নয়, 'দুপুর বারোটা' সেই সময়ই ছিল যখন মন্দিরে পাস্কা-বলি সেই মেষশাবকগুলো জবাই করা হত।

আর ঠিক সেই সময়ই পিলাত 'এই যে তোমাদের রাজা' উক্তি উচ্চারণ করে শেষ বারের মত ইহুদীদের মন ফেরাতে চেষ্টা করেন তারা যেন নিজেকে রাজারূপে যিশুর

দাবি সম্বন্ধীয় অভিযোগ বাতিল করে দেয় ও তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার অভিপ্রায়ও ছেড়ে দেয়। কিন্তু প্রথম দৃশ্যের মত এবারও ইহুদীরা তীব্র উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে 'ওকে ক্রুশে দাও'। প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে এখন শুধু একটা পার্থক্য লক্ষণীয়, তথা: আগে পিলাত বিদ্রূপসূত্রেই যিশুকে 'মানুষ' বলে প্রদর্শন করেছিলেন, এখন তাঁর কথায় বিদ্রূপের মত কোন ইঙ্গিত নেই; তা সত্ত্বেও এবারও লজ্জাকরভাবে অকৃতকার্য হন।

১৯:১৫—ওকে ক্রুশে দাও: উত্তেজিত ইহুদীদের চিৎকারের ফলে পিলাত এবং প্রধান যাজকদের মধ্যে একটা তর্ক বাঁধে: তর্কের বিষয় এবারও যিশুর রাজ্যে কেন্দ্রীভূত। দৃশ্যের নাটকীয় প্রভাব প্রবল: বিজাতীয় হয়েও পিলাত এই রাজাকে ক্রুশে দিকে অসম্মত, অপর দিকে ইহুদী ধর্মীয় নেতাগণ তাঁকে রাজা বলে অস্বীকার করে ও তাঁর বিনিময় সেই রোমীয়দের আধিপত্য স্বীকার করে ধর্মীয় কারণের ভিত্তিতে যাকে ঘৃণাই করে। লক্ষণীয় যে এই পদে যোহন প্রধান যাজকদের কথাই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন: বাহ্যিক মর্যাদা রক্ষার জন্য তারা তাদের ধর্মবিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে (১১:৪৮, ৫০)। যারা ঈশ্বরকে নিজেদের একমাত্র ও সত্যকার রাজারূপে বিশ্বাস করত, তারা কি করে সেই কথা উচ্চারণ করতে পারল? এমন কি, দৈনন্দিন একটা প্রার্থনায় তারা ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বলত: 'একমাত্র তুমি, তুমিই আমাদের রাজা হও' ('শেমোন-এজরে' প্রার্থনা)। অবশ্যই সেই চিৎকারে ইস্রায়েলের উপর ঈশ্বরের রাজ-অধিকার তারা অস্বীকার করতে অভিপ্রেত ছিল না, কিন্তু সেই চিৎকারে তারা তাদের সেই অপেক্ষিত তৈলাভিষিক্তজনকে অস্বীকার করল যিনি ঈশ্বরের ন্যায়-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন। যে মুহূর্তে ইহুদী প্রধান যাজকগণ যিশুকে মশীহ ও ইস্রায়েলের রাজা বলে (১২:১৩) অস্বীকার ক'রে রোমীয় সম্রাটের আধিপত্যই মাত্র স্বীকার করে, সেই মুহূর্তে মশীহের উপর তাদের আশাকেও তারা প্রত্যাখ্যান করে; যিশুকে অস্বীকার করায় ঈশ্বরের মনোনীত জাতি আপন মনোনয়ন ও অস্তিত্বের মূল কারণও অস্বীকার করল এবং ফলত রোমীয় সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ক্ষুদ্র একটা ভৌগলিক অঙ্গে পর্যবসিত হল।

১৯:১৬ক—তিনি তখন ক্রুশে দেওয়ার জন্য তাঁকে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন: কায়েসারের ভয়তে পিলাত নিজের মত বিসর্জন দেন; নিজের স্বার্থ, আত্মগর্ব ও পদমর্যাদার জন্য তাঁর নিজেরই মুখে নির্দোষী বলে ঘোষিত যিশুকে ইহুদীদের হাতে তুলে দেন। তারা তাদের অভিপ্রায় পূর্ণ করতে কৃতকার্য হয়েছে এবং ক্রুশ-মৃত্যুতে দণ্ডিত যিশুকে সানন্দে নিজেদের হাতে গ্রহণ করে।

যিশুর বিচার শেষ হয়েছে, ইহুদীদের রাজার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা জারীকৃত হয়েছে: জগৎ ঈশ্বরের পুত্রকে দণ্ডিত করতে যাচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসী জগৎ আর তার অধিপতিই ঈশ্বর দ্বারা বিচারিত হচ্ছে (১২:৩১; ১৪:৩০; ১৬:১১)।

ক্রুশে উত্তোলিত যিশু - যিশুর মৃত্যু (১৯:১৬খ-৪২)

সমস্ত সুসমাচার-বর্ণনাব্যাপী ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুসারে যোহন যিশুর ক্রুশারোপণ ও মৃত্যুর কথা বর্ণনাই শুধু নয়, ব্যাখ্যাও করেন। পিলাতের বিচার ক্ষেত্রে যে প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছিল, ‘যিশুর রাজ্য’ সেই প্রসঙ্গ এখন শেষ মাত্রায় গিয়ে পৌঁছয়। অন্য দু’জনের সঙ্গে, কিন্তু তাদের মাঝখানেই যিশু রাজাসনের মতই ক্রুশের উপরে উত্তোলিত: যে ক্রুশ মানুষের চোখে ছিল নিম্নতম অবমাননার চিহ্ন, তা হল ঈশ্বরের দ্বারা যিশুর গৌরবপ্রকাশ। ক্রুশের উপরে টাঙানো সেই যে দোষনামা প্রধান যাজকেরা অগ্রাহ্য করে, পিলাত পুনরায় জারীকৃত করেন এবং খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণই মাত্র তার পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি করে (১২:১৬), সেই দোষনামা সারা জগৎকে ঘোষণা করে যে, যিশুই রাজা। এইভাবে ‘যিশুর রাজ্য’ প্রসঙ্গের সমাপ্তি (১৯:২২); কিন্তু তাছাড়া যোহন অপরাপর দৃশ্যও উপস্থাপন করেন যেগুলো তাঁর ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ উপলব্ধি করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যথা: ক্রুশের ধারে ব্যক্তিগণ, সির্কা পানকরণ ও যিশুর শেষ বচনগুলো। ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছাড়া এ দৃশ্যগুলোর প্রতীকমূলক ভূমিকাও বিদ্যমান, যে ভূমিকা প্রকটভাবে অনুভব করতে হলে পুরাতন নিয়ম ও সুসমাচারের কয়েকটা বাক্যবিশেষের দিকে মন আকর্ষণ করা অপরিহার্য। একথা বলা চলে যে, যোহনের ধারণায় যিশুর ক্রুশ-মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের নির্ধারিত এবং পুরাতন নিয়মের সকল প্রত্যাশার সিদ্ধিস্বরূপ, আর ফলত ঐশপ্রকাশকর্মের শীর্ষ ক্ষণ।

ক্রুশে উত্তোলিত যিশু (১৯:১৬খ-২২)

১৯ [১৬খ] তাই তাঁরা যিশুকে নিলেন, [১৭] আর তিনি নিজের ক্রুশ নিজে বহন করে বেরিয়ে পড়লেন খুলিতলা নামে স্থানে—হিব্রু ভাষায় যার নাম গলগথা। [১৮] সেখানে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল, আর তাঁর সঙ্গে অন্য দু'জনকে—দু'জনকে দু'পাশে, কিন্তু যিশুকেই মাঝখানে। [১৯] পিলাত একটা দোষনামাও লিখিয়ে রেখেছিলেন, তারা তা ক্রুশের উপরে লাগিয়ে দিল; তাতে লেখা ছিল, 'যিশু - নাজারেথীয় - ইহুদীদের রাজা।' [২০] বহু ইহুদী ওই দোষনামাটা পড়ল, যেহেতু যেখানে যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, স্থানটি ছিল শহরের কাছাকাছি, আর কথাগুলো হিব্রু, লাতিন ও গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল। [২১] তখন ইহুদীদের প্রধান যাজকেরা পিলাতকে বললেন, 'আপনি ইহুদীদের রাজা লিখবেন না, বরং লিখুন, লোকটা বলেছে, আমি ইহুদীদের রাজা।' [২২] পিলাত উত্তর দিলেন, 'যা লিখেছি, লিখেছি।'

১৯:১৭—নিজের ক্রুশ নিজে বহন করে··· : যেমন গ্রেপ্তারের সময় যিশু স্বেচ্ছায় ও রাজযোগ্য মর্যাদা-সহ সৈন্যদের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন (১৮:৪-৮), তেমনি এখনও তিনি নিজেই নিজের ক্রুশ তুলে বহন করে মৃত্যুদণ্ডের স্থান অভিমুখে বেরিয়ে পড়েন; কেউই তাঁকে সাহায্য করে না, কেউই তাঁর কাঁধে জোর করে ক্রুশটা চাপিয়ে দেয় না, কেউই গলগথার দিকে তাঁকে চালিত করে না: সবসময়ের মত নিজের ভার যিশু নিজেই বহন করেন। এক্ষেত্রে মনে পড়ে আদিপুস্তকের ইসহাককে বলিদানের কথা এবং এবিষয়ে সেকালের ইহুদী ব্যাখ্যা: '···এবং যেমন একজন নিজ কাঁধে ক্রুশ বহন করে তেমনি আব্রাহাম বলিদানের কাঠ বহন করতেন··· এবং দু'জনে একসঙ্গে যেতেন, একজন আবদ্ধ করতে, অপর একজন আবদ্ধ হতে; একজন বলি দিতে, অপর একজন বলীকৃত হতে···'। আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর লেখক তের্তুল্লিয়ানুস এবিষয়ে লিখেছিলেন: কাঠবহনকারী ইসহাক যিশুর মৃত্যুর প্রতীক যিনি নিজের মৃত্যুদণ্ডের কাঠ [অর্থাৎ ক্রুশ] বহন করলেন'।

যোহন নির্দিষ্টভাবে ক্রুশারোপণের স্থান লিপিবদ্ধ করেন, কেননা ক্রুশ-ঘটনা ঐতিহাসিক একটা ঘটনা: স্থান ও কাল দু'টোই নির্দিষ্ট এবং জগতের সামনে প্রমাণিত। প্রমাণের কথা তিন ভাষায় লিখিত দোষনামায় ব্যক্ত।

১৯:১৮—**কিন্তু যিশুকেই মাঝখানে:** ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায়ও, এমনকি ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায়ই যিশু রাজা, তিনিই রাজ-মর্যাদার উপযুক্ত স্থানের ('মাঝখানেই') প্রকৃত অধিকারী।

১৯:১৯—**পিলাত একটা দোষনামাও···:** রোমীয় আইন অনুসারে একটা দোষনামা দণ্ডিত ব্যক্তির সামনে নেওয়া হত কিংবা তার গলায় ঝুলিয়ে রাখা হত, তারপর তা ক্রুশের উপরে টাঙানো হত। পিলাতের কথা উল্লেখ করে যোহন বলতে চান যে ইহুদীদের পক্ষে অপমানজনক এই দোষনামার মাধ্যমে পিলাত 'ইহুদীদের রাজাকে' অনিচ্ছাপূর্বক ক্রুশে দেওয়ার জন্য প্রতিশোধ নেন। এইভাবে তিনি যিশুর রাজ-অধিকারের সাক্ষী, এবং দোষনামাটা মর্যাদাপূর্ণ সম্বোধন হয়ে ওঠে, যেহেতু লাতিন (রোমীয়) ভাষায় 'দোষনামা' শব্দটির আর এক অর্থ হল সম্মানসূচক বা মর্যাদাপূর্ণ সম্বোধন। যেহেতু দোষনামাটা তিন ভাষায় লেখা (জাতীয় ভাষা হিব্রু, সাম্রাজ্যের সরকারী ভাষা লাতিন ও বাণিজ্যিক ভাষা গ্রীক) সেজন্য বিশ্বজগতের সামনে ঘোষণা করা হয় যে যিশু রাজা।

১৯:২২—**যা লিখেছি, লিখেছি:** ইহুদীদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও পিলাত মন ফেরান না, এমনকি তাঁর এই বচনে দোষনামার কথা দ্বিতীয় বারের মতই সরকারী ও মূল্যবান অনুমোদন লাভ করে: যিশু ক্রুশ থেকেই রাজত্বকারী রাজা।

যিশুর বস্ত্র ভাগকরণ (১৯:২৩-২৪খ)

১৯ [২৩] যিশুকে ক্রুশে দেবার পর সৈন্যেরা তাঁর জামাকাপড় নিয়ে চার ভাগ করল, প্রত্যেক সৈন্যের জন্য এক একটা ভাগ; ভিতরের জামাটাও তারা নিল, কিন্তু জামায় কোন সেলাই ছিল না, উপর থেকে সমস্তই একটানা বোনা ছিল। [২৪] তাই তারা একে অন্যকে বলল, 'এটা ছিঁড়ব না; এসো, গুলিবাঁট করে দেখি, কার্ ভাগে পড়ে।' এমনটি ঘটল যেন শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হয়,

ওরা নিজেদের মধ্যে আমার জামাকাপড় ভাগ করে নিল,
আমার পোশাক নিয়ে গুলিবাঁট করল।

যিশুকে বিবস্ত্র করা হয়: এতে যোহন এই তাৎপর্য ব্যক্ত করতে চান যে, এই জগতে যিশুর যা আছে, বিশেষত তাঁর নিজের প্রাণ, তা তিনি ত্যাগ করেন (স্মরণযোগ্য যে পাদপ্রক্ষালনের সময় স্বয়ং যিশু জামাটা খুলে দিয়েছিলেন, ১৩:৪)। মানুষকে বিবস্ত্র করা মানুষের পক্ষে সবচেয়ে লজ্জাকর অপমান, তবু জামাটা না ছিঁড়ে ফেলায় যিশুর প্রতি ঈশ্বরের সহায়তা প্রকাশিত। আরও, অক্ষুণ্ণ জামাটা সেই খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐক্যের প্রতীক, যে-মণ্ডলী ক্রুশের ফল (১১:৫২)।

ক্রুশের ধারে নারীগণ (১৯:২৪গ-২৭)

১৯ [২৪গ] তাই সৈন্যেরা সেইমত করল; [২৫] কিন্তু ক্রুশের ধারে দাঁড়িয়ে যিশুর মা এবং তাঁর মায়ের বোন, ক্লোপাসের স্ত্রী মারীয়া আর মাগ্দালার মারীয়া ছিলেন। [২৬] নিজের মাকে ও তাঁর পাশে যে শিষ্যকে তিনি ভালবাসতেন তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যিশু মাকে বললেন, 'নারী, ওই দেখ, তোমার ছেলে।' [২৭] তারপর তিনি শিষ্যটিকে বললেন, 'ওই দেখ, তোমার মা।' আর সেই ক্ষণ থেকে শিষ্যটি তাঁকে নিজের ঘরে গ্রহণ করে নিলেন।

এই দৃশ্য ব্যাখ্যা করতে হলে সুসমাচারে মা মারীয়া ও ‘যাঁকে যিশু ভালবাসতেন’ সেই প্রিয় শিষ্যের পূর্ব-উপস্থাপনা লক্ষ করা আবশ্যক: মারীয়ার কথা কানা গ্রামে বিবাহোৎসবের সময়ে (২:১-৫) এবং প্রিয় শিষ্যের কথা বিদায় ভোজের সময়ে (১৩:২৩-২৫) উল্লিখিত। উপরন্তু, এই দৃশ্যে সংশ্লিষ্ট একথাও গুরুত্বপূর্ণ: ‘সমস্তই এখন সিদ্ধিলাভ করেছে জেনে…’ (১৯:২৮): মারীয়া ও প্রিয় শিষ্যের কাছে যিশুর উচ্চারিত কথা তাঁর কর্মসিদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেই কথার অর্থ কি? নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা উত্তর দিতে চেষ্টা করবে।

কানা গ্রামে বিবাহের সময়ে মারীয়ার আচরণ বিষয়ে যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছিল, সেই ব্যাখ্যা অনুসারে মারীয়া যিশুকে আপন প্রভু ও গুরুরূপে গ্রহণ করে তাঁর বিশ্বস্তা শিষ্যা বলে ও প্রভুর প্রকৃত দাসী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন আর সেইমত ব্যবহারও করেছিলে (‘উনি তোমাদের যা কিছু বলেন, তোমরা তা-ই কর’)। সুতরাং, ক্রুশের ধারে বিশ্বস্তা শিষ্যা ও প্রিয় শিষ্যকে দেখে যিশু তাঁদেরই উদ্দেশ্য করে শেষ বাণী দেন। এতে সর্বকালের মানুষ সেই মারীয়া ও প্রিয় শিষ্যের আদর্শ পালন করতে আহূত যাঁরা শুরু থেকে যিশুকে একমাত্র গুরুরূপে মান্য করেছিলেন ও নিজ আচরণে তাঁর প্রিয় হবার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। আর শুধু তা নয়, যে মাতৃ-অধিকার মারীয়া কানা গ্রামে ‘হারিয়েছিলেন’, সেই মাতৃ-অধিকার সার্বজনীন আকারেই ক্রুশের ধারে ফিরে পান।

উপরন্তু, কানা গ্রামে মারীয়া সেই সকলেরই প্রতীকও হয়ে উঠেছিলেন যারা যিশু থেকে পরিত্রাণ প্রত্যাশা করে। সেইসময় তাঁর অনুরোধ এমনভাবে পূর্ণতা লাভ করেছিল যে, আশ্চর্যভাবে দান-কারা-আঙুররস প্রতীকমূলকভাবে উত্তরকালের কথা নির্দেশ করত, এখন তাঁকেই সেই প্রতীকের চিরন্তন সিদ্ধি দান করা হয়। যে শিষ্যকে যিশু বিশেষ স্নেহে ভালবাসতেন তিনি তাঁকে সন্তানরূপে গ্রহণ করবেন: মারীয়া যা জানতে ইচ্ছা করবেন, সেই প্রিয় শিষ্য তা তাঁকে জানাবেন; যিশু যা বলে গিয়েছিলেন, সেই শিষ্যটি মারীয়াকে তা ব্যাখ্যা করবেন।

উপরন্তু মারীয়া বিশেষত ইস্রায়েল জাতির সেই অবশিষ্টাংশের প্রতীক যারা মশীহের দেওয়া পরিত্রাণ পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষী। কানা গ্রামে বিবাহের আগে সুসমাচারের দৃষ্টি মশীহের আকাঙ্ক্ষী ইস্রায়েলের দিকে নিক্ষেপ করা হত (১:৩১, ৪১, ৪৫, ৪৯), এবং

মশীহ-রাজের অপেক্ষায় যারা ছিল সেই ইস্রায়েলীয়দের একই ধারণা 'যেরুশালেমে যিশুর প্রবেশ' বিবরণীতেও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল (১২:১৩)। অবিশ্বাসী ইহুদীদের প্রতিনিধির বৈষম্যে (১৯:২১) যিশুর মা সেই ইহুদী জাতির প্রতীক যারা যিশুকে ইস্রায়েলীয়দের রাজারূপে গ্রহণ করতে উৎসুক। কিন্তু একথাও স্মরণযোগ্য যে, যিশু তাঁর মাকে প্রিয় শিষ্যের হাতে সঁপে দেওয়ার পর শিষ্যটিকেও মারীয়ার হাতে মায়েরই হাতে যেন সঁপে দেন। সম্ভবত এতে বিশ্বাসীদের কাছে সেই ঈশ্বরজননীকে স্মরণ করানো হত যাঁ থেকে যিশু এবং খ্রিষ্টমণ্ডলী জন্ম নিয়েছেন। খ্রিষ্টমণ্ডলী মারীয়ায় যিশুর মাকে দেখবে এবং তাদেরও দেখবে যারা পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষী। মারীয়া যে তাদেরও প্রতীক যারা পরিত্রাণের অন্বেষী, এ ব্যাখ্যা প্রিয় শিষ্যের ভূমিকা দ্বারাও সমর্থন লাভ করে। প্রিয় শিষ্যটি হলেন যিশুর ঘনিষ্ঠতম শিষ্য যাঁকে যিশু আপন অন্তরের কথা প্রকাশ করেন (১৩:২৩-২৬), যিনি বিশ্বাস করেন (২০:৮) এবং বিশ্বাস গুণে যিশুকে চেনেন (২১:৭) আর ফলত যিনি যিশুর ঐশপ্রকাশ ব্যাখ্যা করতে আহূত। মারীয়ার ভূমিকার উল্লিখিত ব্যাখ্যার আলোতে, প্রিয় শিষ্য যে যিশুর মাকে আপন আশ্রয়ে নিতে আহূত তাতে বুঝতে পারি যে, তিনি নিজের আশ্রয়ে তাদেরও নেবেন, তাদেরও তত্ত্বাবধান করবেন যারা পরিত্রাণ অনুসন্ধান করে: এক্ষেত্রে, 'সমাপ্তি' অধ্যায়ের এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, এই শিষ্যটি যিশু না আসা পর্যন্তই থাকবেন (২১:২২)। অবশেষে, একটা প্রশ্ন উঠতে পারে: কেন যিশু এই শেষ আদেশ দিয়েই পৃথিবীতে নিজের কর্ম সিদ্ধ করেন? এর উত্তর হল এই যে, তিনি চান তাঁর আত্মপ্রকাশ যুগ যুগান্তরব্যাপী হস্তান্তরিত ও ফলপ্রসূ হোক। যিনি আপন আশ্রয়ে মারীয়াকে ও সকল পরিত্রাণ-অন্বেষীদের গ্রহণ করেন, সেই প্রিয় শিষ্যেরই ভার যেন যিশুর বাণী উত্তরকালেও ঘোষিত হতে থাকে, সেই বাণী যেন কখনও বিলীন না হয় এবং যিশুর চিহ্নকর্মগুলোকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। সম্ভবত, 'সেই ক্ষণে' বাক্যেও (১৯:২৭) সেই গভীর তাৎপর্য সূচিত, যে তাৎপর্য সুসমাচারের অন্যত্রও ব্যক্ত: এই ক্ষণেই যিশু এজগৎ ছেড়ে পিতার কাছে ফিরে যান (১৩:১), এই ক্ষণেই তিনি উত্তোলিত ও গৌরবান্বিত (১২:২৩, ২৭, ৩২), এই ক্ষণই পূর্বঘোষিত হয়েছিল কানা গ্রামে যিশুর পরিত্রাণ ও ঐশপ্রকাশকর্মের সূচনায়।

এই ব্যাখ্যার উপসংহারস্বরূপ একথা পুনরায় বলা হোক যে, এই হল সেই ‘ক্ষণ’ যখন যিশু পৃথিবীতে আপন প্রেরণকর্ম ‘সিদ্ধ করেন’ এবং একাধারে পবিত্র আত্মার পরিচালিত অন্যান্য ব্যক্তির মাধ্যমে সেই কর্ম চিরকালের মত চালিয়ে যান; প্রিয় শিষ্যটি যিশুর উত্তরাধিকার রক্ষা করবেন ও মেনে চলবেন। এইভাবে ক্রুশ থেকে উচ্চারিত যিশুর শেষ আদেশে সেই ‘সুসমাচার’ লেখাটা সত্য বলে প্রমাণিত হয়, যে-লেখার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন স্বয়ং প্রিয় শিষ্য।

যিশুর মৃত্যু (১৯:২৮-৩০)

১৯ [২৮] তারপর যিশু, সমস্তই এখন সিদ্ধিলাভ করেছে জেনে, শাস্ত্রবাণী যেন সিদ্ধিলাভ করে এজন্য বললেন, ‘আমার তেষ্টা পেয়েছে।’ [২৯] সেখানে সির্কায় ভরা একটা পাত্র ছিল; তাই তারা সির্কায় ভেজানো একটা স্পঞ্জ একটা হিসোপ-ডাঁটার আগায় লাগিয়ে তাঁর মুখের কাছে ধরল। [৩০] সির্কা গ্রহণ করে যিশু বললেন, ‘সিদ্ধি হয়েছে’ এবং মাথা নত করে আত্মা সঁপে দিলেন।

১৯:২৮ক—সমস্তই এখন সিদ্ধিলাভ করেছে জেনে… : ‘সিদ্ধি’ সম্বন্ধীয় ধারণাই যিশুর মৃত্যুর বর্ণনাকে চিহ্নিত করে। ‘সিদ্ধি’ শব্দটা এই তিন পদে তিন বার করেই উল্লিখিত। আপন কাজ পূর্ণ মাত্রায় সিদ্ধ করলেন তেমন সচেতনতায় যিশু মৃত্যুবরণ করেন। যিশুর যে দিব্য জ্ঞান সুসমাচারে একাধিক বার নির্দেশিত হয়েছিল (১:৪৭… ; ২:২৫; ৬:৬১ ইত্যাদি পদ) তা ‘যন্ত্রণাভোগ’ ঘটনায় উত্তমরূপে প্রকাশ পায়। সুসমাচারের দ্বিতীয় অংশের শুরুতে (১৩:১) যিশু অবগত, তাঁর এজগৎ ছেড়ে পিতার কাছে চলে যাওয়ার ‘ক্ষণ’ উপস্থিত, এবং তাঁকে গ্রেপ্তার সময়েও (১৮:৪) ‘নিজের কী কী ঘটবে সেই সমস্ত’ জানেন: নিঃসন্দেহে আমাদের আলোচনার বচন প্রত্যক্ষভাবে ‘যন্ত্রণাভোগ’ কাহিনীর সূচনায় উপরোল্লিখিত মন্তব্য লক্ষ করে: সেই ‘সমস্ত’ই সিদ্ধ হয়েছে, তখনকার নির্দেশিত যিশুর দিব্য জ্ঞান সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। অধিকন্তু

একথাও লক্ষণীয় যে, যিশু আপন মাকে এবং প্রিয় শিষ্যকে যে আদেশ দিয়েছেন, এই বচনের মধ্য দিয়ে সেটার উপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করতে চান।

১৯:২৮খ—শাস্ত্রবাণী যেন সিদ্ধিলাভ করে⋯ : যোহনের এই বাক্য অস্বাভাবিক, বস্তুতই তিনি সমগ্র ‘সুসমাচার’ লেখাব্যাপী ‘সিদ্ধ’ স্থানে সর্বদা ‘পূর্ণ’ শব্দই প্রয়োগ করে এসেছেন (১২:৩৮; ১৩:৩৮; ১৫:২৫; ১৭:১২; ১৮:৯, ৩২; ১৯:২৪, ৩৬)। ‘পূর্ণ’ শব্দের অনুধাবিত অর্থ অনুসারে ভাববাণী যেন এমন একটা শূন্য বস্তু যা ভরাট করা দরকার বা এমন একটা দর্শন যা বাস্তবায়নের অপেক্ষায় আছে। অপর দিকে ‘সিদ্ধ’ শব্দটা এমন এক বৃদ্ধিশীল, গতিশীল ও সক্রিয় ধারণার দিকে অগ্রসর হয় যা পরিকল্পিত গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছেছে। এই ব্যাখ্যা দ্বারা যোহনের মর্মকথা অনুমান করা যায় : ক্রুশ-ঘটনা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অন্যতম নয়, পবিত্র শাস্ত্রের একটা ভাববাণীর পূর্ণতাও নয়, বরং সেই একমাত্র লক্ষ্য যা অভিমুখে সমস্ত শাস্ত্র এগিয়ে যায় বা, অন্য কথায়, ক্রুশ-ক্ষণেই যিশুর জীবনের সমস্ত ‘ক্ষণ’ নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছয়।

১৯:২৮গ—আমার তেষ্টা পেয়েছে: ক্রুশে বিদ্ধ যারা, তাদের তীব্রতম যন্ত্রণাই পিপাসা। এতে কিন্তু যোহন গভীর একটা তাৎপর্য উদ্ঘাটন করতে সঙ্কল্পিত। যদি ‘আমার তেষ্টা পেয়েছে’ বচনটি যিশুর শেষ উক্তি ‘সিদ্ধি হয়েছে’-এর সঙ্গে মিলিয়ে দিই, তাহলে অন্য পদ দু’টোর মাধ্যমে যোহনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। যে শিষ্যেরা একদিন তাঁকে কিছু খেতে দিতে চেয়েছিলেন তাঁদের যিশু বলেছিলেন, ‘যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করা ও তাঁর কাজ সম্পন্ন করাই আমার খাদ্য’ (৪:৩৪), এবং গ্রেপ্তার সময়ে পিতরকে বলেছিলেন, ‘এই যে পাত্র পিতা আমাকে দিয়েছেন, আমি কি তা পান করব না?’ (১৮:১১)। ক্ষুধা ও পিপাসা হল যিশুর সেই বাসনার প্রতীক যে-বাসনায় তিনি পিতার ইচ্ছা শেষ পর্যন্তই পালন করতে এবং যন্ত্রণা ও মৃত্যুর পাত্র শেষ বিন্দু পর্যন্তই পান করতে প্রবৃত্ত। সুতরাং, যিশু যে সাধারণভাবে সির্কা

‘পান’ করলেন এমন নয়, বরং যন্ত্রণা ও মৃত্যুর প্রতীক সেই তিত পানীয় ইচ্ছাকৃতভাবেই ‘গ্রহণ’ই করেন।

১৯:৩০ক—সিদ্ধি হয়েছে: এর অর্থ এই নয় যেন ‘সব শেষ হয়েছে’, বরং উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা অনুসারে, ‘পিতার ইচ্ছা উত্তমরূপেই সাধিত হয়েছে, মানব-সৃষ্টি নিয়ে শুরু করা ঈশ্বরের প্রেমময় পরিকল্পনা এখানেই এখনই শীর্ষস্থানে গিয়ে পৌঁছেছে’।

১৯:৩০খ—মাথা নত করে আত্মা সঁপে দিলেন: শেষ ক্ষণ পর্যন্ত যিশু নিজেই আপন কাজের উপর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণ করেন: তিনিই মা ও প্রিয় শিষ্যের কাছে সেই ভার ন্যস্ত করেন, তিনিই পান করার জন্য সৈন্যদের আহ্বান করেন এবং বিশেষত তিনিই পিতার কাছে আপন আত্মা সঁপে দেন। এতেই তাঁর এই বাণী পূর্ণতা লাভ করে, তথা: ‘কেউই আমার কাছ থেকে তা [তাঁর প্রাণ] কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই’ (১০:১৮): যিশুর মৃত্যুও একটা আত্মসচেতনতাপূর্ণ কাজ, তার মাধ্যমে তিনি পিতার নির্ধারিত মানবীয় নিয়তি গ্রহণ করেন এবং পিতার কাছে আত্মা সঁপে দেন।

এ বচন ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করা যেতে পারে: নিজের মৃত্যুর ফলস্বরূপ তিনি মণ্ডলীর কাছে পবিত্র আত্মাকেই অর্পণ করেন, যে-আত্মা তাঁর বিদ্ধ পাশ থেকে নিঃসৃত রক্ত ও জলে সৃজনশীলভাবে বিদ্যমান (১৯:৩৪; ১ যোহন ৫:৬-৮) এবং সাক্রামেন্তগুলোর মাধ্যমে মানুষের কাছে নিবেদিত।

যোহন যিশুর মৃত্যু এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তা তাঁর খ্রিষ্টসম্বন্ধীয় দৃষ্টিকোণের উচ্চতম শীর্ষপর্যায় বলে গণ্য করা যায়: যিশুর মৃত্যু হল এই জগতে পিতার কাজ সিদ্ধ করার পর পিতার কাছে প্রত্যাগমনকারী যিশুর প্রচ্ছন্ন ও রহস্যময় জয়োৎসব। এতেই সদৃশ সুসমাচারত্রয় অনুযায়ী বর্ণিত ঈশ্বর দ্বারা যিশুকে পরিত্যাগ জ্যোতির্ময় ব্যাখ্যা লাভ করে এবং যোহনের পূর্বকথিত এই বাণী প্রমাণ পায়, ‘যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; আমাকে একা রেখে যাননি, কেননা আমি সর্বদাই তাঁর মনোমত কাজ করে থাকি’ (৮:২৯)। দৃষ্টিকোণ দু’টো (যোহনের ও সদৃশ

সুসমাচারত্রয়ের দৃষ্টিকোণ) পরস্পর পাশা-পাশি অবস্থান করে, সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরুদ্ধ নয়, বরং পরস্পর সত্যাশ্রয়ী। দৃষ্টিকোণ দু'টোই রহস্যাবৃত যিশুতে একীভূত এবং দু'টোই তাঁর রহস্যময় মৃত্যুর একটা দিক উন্মুক্ত করে।

যোহনের 'যন্ত্রণাভোগ' কাহিনী কিন্তু যিশুর মৃত্যু বর্ণনায় সমাপ্ত নয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঘটনা উপস্থাপন করেন। সেই ঘটনা এমন যা যিশুর কাজের পরিত্রাণদায়ী তাৎপর্য নির্দেশ করে: মৃত যিশুর বিদ্ধ পাশ থেকে জীবন ও পরিত্রাণের ধারা নিঃসৃত।

বর্শাঘাত (১৯:৩১-৩৭)

১৯ [৩১] সেই দিনটি প্রস্তুতি-দিবস ছিল বিধায়, যেন দেহগুলি সাব্বাৎ দিনে
ক্রুশে না থেকে যায়,—সেই সাব্বাৎ তো মহা একটা দিবস ছিল,—ইহুদীরা
পিলাতের কাছে আবেদন জানাল, তিনজনের পা ভেঙে দিয়ে তাদের যেন তুলে
নেওয়া হয়। [৩২] তাই সৈন্যেরা এল, এবং যিশুর সঙ্গে যাদের ক্রুশে দেওয়া
হয়েছিল, প্রথম আর দ্বিতীয়জনের পা ভেঙে দিল। [৩৩] কিন্তু যিশুর কাছে এসে
যখন দেখল, ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তখন তারা তাঁর পা আর ভাঙল না।
[৩৪] কিন্তু সৈন্যদের একজন তাঁর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল আর তখনই
নিঃসৃত হল রক্ত আর জল। [৩৫] এবিষয়ে, স্বচক্ষে যিনি দেখেছেন, তিনিই সাক্ষ্য
দিয়েছেন, আর তাঁর সাক্ষ্য যথার্থ, এবং তিনি জানেন, তাঁর কথা সত্য, যেন
তোমরাও বিশ্বাস করতে পার। [৩৬] কেননা এ সমস্ত ঘটেছিল যেন শাস্ত্রবাণী
পূর্ণতা লাভ করে: তাঁর একটা হাড়ও ভগ্ন হবে না। [৩৭] আর একটি শাস্ত্রবচন
আছে, যাঁকে তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে, তাঁরই দিকে তারা চেয়ে থাকবে!

১৯:৩১—প্রস্তুতি-দিবস ছিল বিধায়…: পুরাতন নিয়মের ঐতিহ্য অনুসারে (দ্বিঃবিঃ ২১:২২-২৩) ক্রুশবিদ্ধ যারা তাদের দেহ যদি রাত্রিকালে ক্রুশে ঝুলিয়ে থাকত তাহলে পবিত্র দেশ (যিশুর দেশ) কলুষিত হত। কিন্তু ইহুদীদের উদ্দেশ্য ভিন্নরূপ, তারা

শীঘ্রই যিশুকে এবং ‘ইহুদীদের রাজা’ দোষনামাটা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করতে অভিপ্রেত। তবু ইহুদীদের ঘৃণ্য অভিপ্রায়কে ঈশ্বর সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ দেন: যিশু ক্রুশে বিদ্ধ থাকবেন এবং যাঁকে তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে তাঁরই দিকে চেয়ে থাকবে (১৯:৩৭)।

১৯:৩৪—তখনই নিঃসৃত হল রক্ত আর জল: সেকালের ধারণা যে, মৃতদেহের ক্ষত থেকে সাধারণত প্রচুর পরিমাণ রঙহীন একটা জলীয় পদার্থ এবং সময় সময় জলও বের হয়। সুতরাং বচনের বাহ্যিক অর্থ এই যে, সত্যিই যিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবু যিশুর মৃত্যুর একথার মধ্য দিয়ে সমগ্র সুসমাচারের মুখ্য ধারণা ব্যক্ত: যিশুর জীবনের ঘটনা ও কাজসকল হল এমন চিহ্ন, যে-চিহ্নগুলোর মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীগণ যিশুর গভীর তাৎপর্য ও জগৎকে তাঁর দেওয়া দানগুলো দেখতে পায়। অন্য কথায়, যোহনের লক্ষ্য বাস্তব ঘটনার দিকে শুধু নয়, প্রকৃতপক্ষে তার অন্তর্নিহিত ঐশপ্রকাশের দিকেই নির্দেশ করে, যে ঐশপ্রকাশ নবী জাখারিয়ার ভাববাণীর নিম্নলিখিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে (‘যাঁকে তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে, তাঁরই দিকে তারা চেয়ে থাকবে’) সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৯:৩৬খ—তাঁর একটা হাড়ও ভগ্ন হবে না: এই কথা পুরাতন নিয়মের দু’টো বচনের সঙ্গে সম্পর্কিত: ক। সাম ৩৪:২১: ঈশ্বর সর্বদা ধার্মিকদের রক্ষা করেন; খ। যাত্রা ১২:৭, ১০, ৪৬ (গণনা ৯:১২): এই বচনে পাস্কাপর্বে বলীকৃত মেষশাবক সম্বন্ধীয় একটা অর্থ সূচিত, যে মেষশাবকের রক্ত ঘরের দরজার দুই বাজুতে ও কপালিতে লেপে দিলে ঈশ্বরের অভিশাপ থেকে ইস্রায়েলীয়দের মুক্তি পাবার কথা। ক্রুশবিদ্ধ যিশুই সত্যকার বলীকৃত পাস্কা-মেষশাবক যিনি ঈশ্বরের বিচার থেকে মানুষকে পরিত্রাণ করেন: তিনিই সত্যকার ‘ঈশ্বরের মেষশাবক’ যিনি জগতের পাপ হরণ করেন (১:২৯)। এবিষয়ে ১৮:২৮ এবং ১৯:১৪-এ উপস্থাপিত ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য।

১৯:৩৭খ—যাঁকে তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে… : এই পদ নবী জাখারিয়ার একটা বচনের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে (জাখা ১২:১০); কিন্তু তার অতিগভীর তাৎপর্য

সূক্ষ্মভাবে অনুভব করতে হলে জাখারিয়ার পুস্তকের ৯ অধ্যায় থেকে ১২ অধ্যায় পর্যন্ত যে বর্ণনা, তা পাঠ করা অপরিহার্য। ঈশ্বর একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন যাঁর দ্বারা মশীহের প্রত্যাশা পূর্ণতা লাভ করার কথা। কিন্তু জনগণ তাঁকে পরিত্যাগ ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। তাঁর মৃত্যুর জন্য ইস্রায়েল জাতি বিলাপ করে; এই বিলাপ মনপরিবর্তনে পরিণত হয় আর যেরুশালেমবাসীদের জন্য ঐশআশীর্বাদে পরিপূর্ণ: ঈশ্বর তাদের উপর 'অনুগ্রহের ও মিনতির আত্মা' বর্ষণ করবেন। অবশেষে 'প্রবাহমান ঝরনার' একটি কথাও উল্লিখিত আছে, যে ঝরনা দ্বারা পাপকর্ম ও অশুচিতা মোচন করা হবে।

এই বচন উল্লেখ করে যোহন কী বলতে চান? সর্বপ্রথমে এই দিক লক্ষণীয় যে, যারা বিদ্ধজনের দিকে চেয়ে থাকবে সেই উভয়েরই কথা বোঝায় যারা যিশুর মৃত্যু ঘটিয়েছে এবং যে বিশ্বাসীগণ এখন সেই ক্রুশবিদ্ধজনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। নবী জাখারিয়ার কথা অনুসারে সেই বিদ্ধজনের প্রতি তাকানোর ফল হল পরিত্রাণ (অর্থাৎ মনপরিবর্তন ও অনুগ্রহ)। যোহন অনুসারেও এ 'পরিত্রাণ' দিকটা ব্যক্ত, বিশেষভাবে যদি নিম্নলিখিত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ গ্রহণ করা হয়:

– 'চেয়ে থাকবে': এতে যোহন 'বিদ্ধজনের দিকে' শুধু নয়, বরং যিশুর বিদ্ধ পাশ থেকে নিঃসৃত জল ও রক্তের দিকেও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন; তাঁর মতে সেই রক্ত ও জলের ধারা হল অনুগ্রহের ও পরিত্রাণের ধারা।

– আবার, 'চেয়ে থাকবার' কথা ৩:১৪-র কথা স্মরণ করায়: মরুপ্রান্তরে সাপকে উত্তোলন মানবপুত্রকে উত্তোলনের প্রতীক-চিহ্ন। যারা উত্তোলিত সাপের দিকে চেয়ে থাকত তাদেরই জীবন রক্ষা পেত।

– ৮:২৮-এ বলা হয়েছিল যে, মানবপুত্রকে উত্তোলিত করার পর ইহুদীরা যিশুর সত্যকার স্বরূপ ('আমিই আছি') এবং সেটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে।

– ১২:৩২ অনুসারে ভূমি থেকে উত্তোলিত হয়ে যিশু সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করবেন এবং তখনই যে গমের দানা মরে গেছে তা প্রচুর ফলে ফলবান হবে।

– যে রক্ত ও জল যিশুর পাশ থেকে নিঃসৃত, তা 'জীবনময় জলের ধারার' কথার সঙ্গে (৭:৩৮) নিঃসন্দেহে সম্পর্কযুক্ত। যিশুর সেই প্রতিশ্রুতি এখন পূর্ণতা লাভ করেছে: যিশুর দেহ থেকে রক্ত ও জলের ধারা নিঃসৃত, সেই ধারা এমন যা জীবনদায়ী। যোহন নিজে এই কথা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, সেই 'ধারা' সেই পবিত্র আত্মাকে লক্ষ করে যে আত্মাকে খ্রিষ্টবিশ্বাসী যিশুর গৌরবায়নের পরেই পাবে (৭:৩৯)।

সুতরাং, যে বিশ্বাসীগণ সেই বিদ্ধজনের দিকে চেয়ে থাকবে তাদের পক্ষে তিনি হলেন পরিত্রাণের উৎস, অবিশ্বাসী ইহুদীদের পক্ষে তিনি হলেন তাদের বিচারের কারণ: যাঁর বিদ্ধ পাশ থেকে রক্ত ও জল নিঃসৃত, সেই উত্তোলিত-গৌরবান্বিতজনকে মানুষ না দেখে পারে না। যাঁর পাশ তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে তাঁর দিকে তারা চেয়ে থাকবে, এমনকি পরিত্রাণ পাবার জন্য হোক বা বিচারিত হবার জন্য হোক, তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য।

এই বিশ্লেষণের আলোতে এখন রক্ত ও জল বিষয়ে আলোচনা করা হোক: যোহন অনুসারে যিশুর মৃতদেহ থেকে জীবনের অনন্য একটা ধারা নিঃসৃত। সেই জীবনের ধারা হলেন সেই পবিত্র আত্মা যাঁকে গৌরবান্বিত যিশু বিশ্বাসীকে দান করেন। তবু, রক্ত ও জল কথা দু'টোর উপর একটা প্রতীকমূলক অর্থ আরোপ করতে হলে এই ব্যাখ্যা দেওয়া চলে যে, রক্ত যিশুর পরিত্রাণদায়ী মৃত্যু (১ যোহন ১:৭) এবং জল আত্মা ও জীবনের প্রতীক বলে বিবেচনাযোগ্য (৪:১৪; ৭:৩৮); তবু প্রতীক দু'টো অতিঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ বলেই অনুধাবনযোগ্য। অবশেষে, সাক্রামেন্তের কথাও লক্ষণীয়: পবিত্র সাক্রামেন্ত ও বাপ্তিস্ম যিশুর রক্ত ও জলে নির্দেশিত হয়ে যেতে পারে।

যিশুকে সমাধিদান (১৯:৩৮-৪২)

১৯ [৩৮] এর পরে আরিমাথেয়ার যোসেফ—তিনি যিশুর শিষ্য ছিলেন, কিন্তু ইহুদীদের ভয়ে গোপন শিষ্য—পিলাতের কাছে যিশুর দেহটি নিয়ে যাবার জন্য আবেদন জানালেন। পিলাত অনুমতি দিলেন। তাই তিনি এসে দেহটিকে নিয়ে গেলেন। [৩৯] সেই নিকোদেমও এলেন, যিনি যিশুর কাছে প্রথমে রাতের বেলায় গিয়েছিলেন; তিনি প্রায় তেত্রিশ কিলো গন্ধনির্যাস-মেশানো অগুরু নিয়ে এলেন। [৪০] তাঁরা যিশুর দেহ নিয়ে ইহুদীদের সমাধি-প্রথা অনুসারে সেই গন্ধদ্রব্য-মেশানো ক্ষোম-কাপড়ের ফালি দিয়ে তা জড়িয়ে নিলেন। [৪১] যে স্থানে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ছিল একটা বাগান, আর বাগানের মধ্যে একটা নতুন সমাধিগুহা যেখানে আগে কারও সমাধি দেওয়া হয়নি। [৪২] সেই দিনটি ইহুদীদের পর্বের প্রস্তুতি-দিবস ছিল বিধায় সমাধিগুহাটা কাছাকাছি হওয়ায় তাঁরা যিশুকে সেইখানে শুইয়ে রাখলেন।

যিশুকে সমাধিদান বর্ণনার উদ্দেশ্যই ক্রুশবিদ্ধ যিশুর পাওয়া সমাদরের উপর আলোকপাত করা: ক্রুশে যিশুকে উত্তোলন হল যিশুর গৌরবায়নের সূত্রপাত। এইভাবে যোহন আপন স্বীয় দৃষ্টিকোণ শেষ মাত্রা পর্যন্ত অনুসরণ করেন: যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর অন্ধকারময় ঘটনায়ই যিশুর ঐশপ্রভুত্ব ও গৌরব উত্তমরূপে জাজ্বল্যমান। যে প্রচুর পরিমাণ অগুরু নিকোদেম আনেন, ক্ষোম-কাপড়ের ফালি দিয়ে দেহখানির বাঁধন এবং নতুন সমাধিগুহার উল্লেখ, এ সমস্ত কথা দ্বারাই যোহনের উল্লিখিত মর্ম প্রমাণিত। কিন্তু তাছাড়া, ঘটনাটির এই দিক বিশেষত লক্ষণীয় যে, এই ঘটনায় ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রকাশ পায়: ইহুদীদের প্রস্তুতি-দিবসের জন্য যিশুকে খুব শীঘ্রই সমাহিত করা চাই, এই ত্বরার ফলে যিশু নতুন একটা সমাধিগুহা পেয়ে গেলেন!

যাঁরা পূর্বে ইহুদীদের ভয়ে যিশুর প্রচ্ছন্নই শিষ্য ছিলেন, তাঁরা এখন, যিশুর মৃত্যুর পর, অভয়ে তাঁর দেহের যত্ন নেন, এমনকি প্রকাশ্যেই তা-ই করেন। ইহুদীদের বৈষম্যে তাঁরা যিশুর প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর প্রতিনিধিস্বরূপ, যে মণ্ডলী আপন প্রভুকে সমাদর করে।

এই বর্ণনায় যিশুর ‘যন্ত্রণাভোগ’ কাহিনীর সমাপ্তি, এমন সমাপ্তি যা শান্তিপূর্ণ। পাস্কাপর্বের উষা নবীন ও অপূর্ব এক ঘটনার সঙ্গে উদিত হবে, যে ঘটনা কিন্তু এ যন্ত্রণাভোগ থেকেই এবং তার অন্তর্নিহিত গুপ্ত গৌরব থেকেই উদ্গত।

যিশুর পুনরুত্থান

(২০ অধ্যায়)

আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীকালে যিশুর যন্ত্রণাভোগ কাহিনী সর্বদাই তাঁর পুনরুত্থানের বৃত্তান্তের সঙ্গে অতিঘনিষ্ঠ একক মহাঘটনা বলে বর্ণনা ও বিবেচনা করা হত। এজন্য আপন 'সুসমাচার' পুস্তক শেষাংশে যোহনও যিশুর পুনরুত্থানের পরম্পরাগত কথা উল্লেখ করেন। তবুও তাঁর বর্ণনা সবসময়ের মত এবারও স্বকীয়, স্বতন্ত্র ও তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ অনুসারেই বর্ণিত।

কয়েকটি সমস্যা

সর্বপ্রথমে দু'টো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক যে-প্রশ্নগুলো নিঃসন্দেহে পাঠকের মনে উদয় হয়: ১। যিশুর পুনরুত্থানের কথা চারটি সুসমাচারে ভিন্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে কেন? ২। যিশুর পুনরুত্থান কি করে যোহনের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে খাপ খায়, যে-দৃষ্টিকোণ অনুসারে যিশু সেই একক 'ক্ষণেই' মৃত্যুবরণ করলেন ও গৌরবান্বিত হলেন?

১। নূতন নিয়মে যিশুর পুনরুত্থান-ঘটনা বিবিধ ও বিস্ময়কর রূপ অনুসারে অনুধাবিত। একথা যে শুধু স্বীকার্য এমন নয়, বরং ঠিক এই বিবিধ রূপই (বিশ্বাস-সূত্রমূলক, প্রার্থনামূলক, শিক্ষামূলক ও বর্ণনামূলক রূপ) প্রমাণ করে যে, পুনরুত্থান-ঘটনা খ্রিষ্টমণ্ডলীর জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। আর তা সহজে বোধগম্য হয়ে ওঠে যখন আমরা স্মরণ করি যে যিশুর পুনরুত্থান থেকেই খ্রিষ্টমণ্ডলীর উদ্ভব আর তাঁর পুনরুত্থান থেকেই যিশুর ও নিজের বিষয়ে খ্রিষ্টমণ্ডলীর পূর্ণ চেতনালাভ ঘটেছে। কেননা পুনরুত্থানই খ্রিষ্টমণ্ডলীর সমুদয় বহিঃপ্রকাশ ঘিরে রাখে। পুনরুত্থানে বিশ্বাস যে বিবিধ রূপে ব্যক্ত হয়েছে সেগুলো সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে তবে অনুমান করা যায় যে ইতিহাসের প্রতি মনোযোগও বিবিধ: এমন ঐশতাত্ত্বিক ও বিশ্বাসমূলক লক্ষ্য বর্তমান যা ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত এবং সময় সময় ইতিহাসের চেয়ে মহৎ গুরুত্ব অর্জন করে।

কিন্তু একথার অর্থ এই নয় যে সুসমাচারের লেখকগণ ইতিহাসের কথা তুচ্ছ করেন; বাস্তবিকই বিশ্বাস ঐতিহাসিক ঘটনার উপরেই স্থাপিত। গুরুত্বপূর্ণ হল পুনরুত্থানের পরিত্রাণদায়ী তাৎপর্য, অথচ যিশু যদি সত্যিই পুনরুত্থান করে না থাকেন তাহলে সেই পরিত্রাণদায়ী তাৎপর্য বিলীন হয়ে যায়।

২। যিশুর উত্তোলন-গৌরবায়ন সম্বন্ধীয় ধারণা যা অনুসারে তাঁর মৃত্যু তাঁর পরবর্তীকালীন পুনরুত্থানের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মেলে না একথা স্বীকার্য, এমনকি এ বিভেদ মাগ্দালার মারীয়ার কাছে যিশুর উচ্চারিত কথায়ই স্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করে, 'আমাকে আঁকড়ে ধরো না, কেননা আমি পিতার কাছে এখনও আরোহণ করিনি' (২০:১৭)। সুতরাং, যখন ক্রুশের উপরে উত্তোলিত হওয়ায়ই যিশু গৌরবান্বিত ও নিজের কাছে সকলকে আকর্ষণ করার অধিকারপ্রাপ্ত হলেন (১২:৩২), তখন কেমন করে একথা বলতে পারি যে, যিশুর পুনরুত্থান মৃত্যুর পরেই ঘটল? উত্তরটি সহজ: একথা স্মরণ করা দরকার যে যোহনের ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ইতিহাসকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় না, বরং সেই মহাঘটনাগুলোর গভীর ও অপূর্ব তাৎপর্যকে উদ্ঘাটন করতে অভিপ্রেত। অতএব, যদি এক দিকে একথাই সত্য যে সেই ক্ষণ বিবিধ ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, এমনকি মানবেতিহাসের আসল শুভলগ্ন, তবু অপর দিকে এ কথাও সত্য যে, যিশু ইতিহাসের ধারা অনুসারেই মৃত্যু বরণের পর পুনরুত্থান করলেন ও পিতার কাছে ফিরে গেলেন। কিন্তু, পুনরুত্থানের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো বর্ণনায়ও যোহন আপন ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করেন। এ কথাও বলা বাঞ্ছনীয় যে, যোহনের মনোযোগ শিষ্যদের ও ভাবী খ্রিষ্টমণ্ডলীকে লক্ষ করে: শিষ্যদের যা যা প্রচার করার কথা ও উত্তরকালের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পক্ষে যা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু, তাও এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত। আবার, যোহন আমাদের দেখাতে চান যিশু কি করে শিষ্যদের অর্থাৎ আমাদের সাহায্য করেন আমরা যেন আমাদের হতাশা ও দুর্বল বিশ্বাস অতিক্রম করে তাঁর গৌরবময় ও প্রবল উপস্থিতির লক্ষণ চিনতে পারি। জীবনকালে যিশু বেশ কয়েকবার আপন নিয়তি বিষয়ে শিষ্যদের পূর্বজ্ঞাত করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ দেখে তাঁকে পরাজিতই মনে করেছিলেন, তাঁর উপর তাঁরা যে প্রত্যাশা পোষণ করেছিলেন তাঁর ক্রুশারোপণে তা লুপ্ত হয়েছিল; তাঁরা ক্রুশবিদ্ধ যিশুতে পিতার গৌরব ও ঈশ্বরের

ভালবাসার অভিব্যক্তি না দেখে বরং নিজেদের বাহ্যিক প্রত্যাশাগুলোর প্রলয় দেখেছিলেন। এই অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাগুলোর মাধ্যমে যোহন শিষ্যদের কাছে যিশুর শেষ শিক্ষা প্রচার করেন, তথা: সর্বদাই, এমনকি ক্রুশের মত সবচেয়ে নগণ্য ও হতাশাপূর্ণ দশার মধ্যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের মাঝে উপস্থিত, তিনি আমাদের উদ্ধারকর্তা।

অবশেষে, যিশু যা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তা পুনরুত্থানের এই বর্ণনায় পূর্ণতা লাভ করে: তিনি আপনজনদের মাঝে ফিরে এলেন, তাঁরা তাঁকে দেখতে পেলেন (১৪:৮…) এবং তিনি তাঁদের কাছে পবিত্র আত্মাকে দান করলেন (১৪:১৬…)।

যোহনের উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ের সমষ্টিগত বিশ্লেষণ থেকে অনুমান করা যায় যোহনের উদ্দেশ্য 'বিশ্বাস' বিষয়ে কেন্দ্রীভূত: এই অধ্যায়ের প্রতিটি অংশ একটি 'বিশ্বাস ঘোষণায়' সমাপ্ত হয়। শিমোন পিতর, মাগ্দালার মারীয়া ও থোমাসের বিশ্বাস পরিশুদ্ধ করা হয়, তাঁরা যেন সেই ধরনেরই বিশ্বাস অতিক্রম করেন যা বাহ্যিক প্রমাণ চায় ও পৃথিবীস্থ যিশুর সময়ে বসে থাকবে বলে দাবি করে: প্রকৃত বিশ্বাস যিশুর নবীন অবস্থার প্রতি ও মণ্ডলীর প্রতি (অর্থাৎ পবিত্র শাস্ত্র ও শিষ্যদের সাক্ষ্যদানের প্রতি) উন্মুক্ত হবে।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কতকগুলো উদ্দেশ্য রয়েছে, যেমন বলতে পারি উপাসনাসূচক উদ্দেশ্য: মাগ্দালার মারীয়া ও শিষ্যদের কাছে যিশু রবিবার দিনেই দর্শন দেন; ইহুদী ঐতিহ্য অনুযায়ী শনিবারের স্থানে খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ রবিবারেই পরিত্রাণের মহাঘটনা স্মরণ করে।

আত্মপক্ষ সমর্থনসূচক উদ্দেশ্যও বর্তমান: সেইকালের ইহুদীরা যিশুর পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করার জন্য একথা বলত যে, তাঁর মৃতদেহ শিষ্যদের দ্বারা স্থানান্তরিত হয়েছিল, শিষ্যেরা মরিচিকা দেখেছিলেন বা যিশু স্বদেহে নয় কেবল আত্মায়ই পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। এই সব অভিযোগের প্রতিবাদে যোহন এক দিকে পৃথিবীস্থ যিশুর সঙ্গে পুনরুত্থিত যিশুর প্রমাণিত অভিন্নতা ঘোষণা করেন এবং অপর দিকে তাঁর দেহগত

অবস্থার উপরেও জোর দেন। আর যারা বলত, ‘কিছু না দেখে কি করে বিশ্বাস করব’, তাদের জন্য যোহন ‘দেখা ও বিশ্বাস করার’ মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন।

উপসংহারে একথাও বলতে পারি যে, যোহন যিশুর পুনরুত্থানের সঙ্গে (কি করে যিশু পুনরুত্থান করলেন?) ও পুনরুত্থানের পরিত্রাণদায়ী তাৎপর্য নিয়েই শুধু ব্যস্ত নন, বরং তিনি শিষ্যদের বিশ্বাস বিকাশের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেন: কি করে যিশুর পুনরুত্থান উপলব্ধি করব? সেই বিশ্বাস অর্জনের জন্য কি কি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা অপরিহার্য? যোহনের দৃঢ় ধারণা যে, যেহেতু এখন যিশু পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত অর্থাৎ নব-জীবনে প্রবিষ্ট, সেজন্য এর মধ্যেই খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ তাঁকে প্রভু ও জীবনদায়ী আত্মা রূপে চিনতে ও অনুভব করতে সক্ষম।

সমাধিস্থানে উপস্থিত শিষ্যেরা (২০:১-১০)

২০ [১] সপ্তাহের প্রথম দিন সকালের দিকে, অন্ধকার থাকতেই মাগ্দালার মারীয়া
যিশুর সমাধিগুহায় এলেন। তিনি দেখতে পেলেন, সমাধিগুহা থেকে পাথরখানা
সরানো হয়েছে। [২] তাই তিনি দৌড়ে গেলেন শিমোন পিতর আর সেই অন্য
শিষ্যের কাছে যাঁকে যিশু ভালবাসতেন। তাঁদের তিনি বললেন, ‘তারা প্রভুকে কবর
থেকে নিয়ে গেছে, আর আমরা জানি না, তাঁকে কোথায় রেখেছে।’ [৩] তাই পিতর
ও অন্য শিষ্যটি বেরিয়ে পড়ে সমাধিগুহার দিকে রওনা হলেন। [৪] দু’জনে
একসঙ্গে দৌড়াতে লাগলেন, কিন্তু দ্বিতীয় শিষ্যটি পিতরের চেয়ে দ্রুত ছুটে তাঁকে
ছাড়িয়ে গেলেন আর সমাধিগুহায় আগে পৌঁছলেন; [৫] নিচু হয়ে তিনি ভিতরের
দিকে চেয়ে দেখলেন, ক্ষোম-কাপড়ের সেই ফালিগুলো সেখানে পড়ে রয়েছে, তবুও
তিনি ভিতরে ঢুকলেন না। [৬] তাঁর পিছু পিছু শিমোন পিতরও তখন সেখানে এসে
উপস্থিত হলেন, এবং সমাধিগুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন, ফালিগুলো পড়ে
রয়েছে, [৭] আর যে রুমালটা যিশুর মাথার উপর ছিল, সেটা ফালিগুলির সঙ্গে নয়,
আলাদা ভাবে অন্য এক স্থানে রয়েছে, গোটানো অবস্থায়। [৮] তখন যে অন্য
শিষ্যটি সমাধিগুহায় প্রথম এসেছিলেন, তিনিও ভিতরে গেলেন: তিনি দেখলেন ও
বিশ্বাস করলেন। [৯] কেননা মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে যে পুনরুত্থান করতে হবে,

শাস্ত্রের এই বচনটি তাঁরা তখনও জানতেন না। [১০] পরে শিষ্যেরা ঘরে ফিরে গেলেন।

যিশুর সমাধিগুহা শূন্যই আবিষ্কার করে মাগ্দালার মারীয়া পিতর ও প্রিয় শিষ্যের কাছে সংবাদ দিতে দৌড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য দু'জন যিশুর সমাধিস্থানের দিকে দৌড় দেন। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, লেখক পিতর ও প্রিয় শিষ্যের সাক্ষ্যদানে বিশেষ প্রাধান্য আরোপ করতে চান: যিশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য একটি নারীর দর্শনের উপরে নয় (সেইকালে নারীকে নির্ভরযোগ্য সাক্ষীরূপে বিবেচনা করা হত না), শিষ্য দু'জনের প্রতিপাদনের উপর নির্ভর করে। তাঁরা প্রতিপাদন করতে পারলেন ফালিগুলো ও রুমালটি এলোমেলোভাবে এদিক ওদিক ফেলানো নয় বরং এক জায়গায় গোটানো অবস্থায় রয়েছে: এটিই একটা আভাস যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যিশুর দেহকে তাড়াতাড়ি করে ও গোপনে স্থানান্তরিত করা হয়নি।

কিন্তু আমাদের মনোযোগ এই দিকেই ফেরানো উচিত যে, শিষ্য দু'জনেই সমাধিগুহার মধ্যে প্রবেশ করে এই সবকিছু দেখলেন, অথচ শুধু প্রিয় শিষ্যটিই 'দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন' (২০:৮)। সুতরাং, লেখক জোর দিয়ে দেখাতে চান যিশুর পুনরুত্থান বিষয়ে শিষ্যটির দ্রুত উপলব্ধির নিশ্চয়তা ও ক্ষমতা: তিনিই মাত্র শূন্য সমাধিগুহাতে ও গোটানো ফালিগুলোতে নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। পরবর্তীকালে আর একবার তিনিই সকলের আগে যিশুকে চিনতে পারবেন (২১:৭)। এইভাবে প্রিয় শিষ্যটি বিশ্বাসীর আদর্শ বলে উপস্থাপিত হন যেহেতু সবকিছু দেখে (অর্থাৎ যিশুকে না দেখে) বিশ্বাস করলেন। মাগ্দালার মারীয়া ও পিতরও শূন্য সমাধিগুহা ও সেই গোটানো ফালিগুলো দেখতে পেয়েছিলে, বিশ্বাসের অভাবে তাঁরা যিশুর দেহকে না দেখে কেবল হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে যেভাবে যিশুর প্রকাশ্য জীবনের সময়ে বহু লোক তাঁর চিহ্নকর্মগুলো দেখলেও বিশ্বাস করতে অক্ষম হয়েছিল। বিশ্বাস না থাকায় অর্থাৎ যিশুর সঙ্গে প্রেমপূর্ণ সংযোগ না থাকায় যে কোন ঘটনা বা সাক্ষ্যদান অর্থশূন্য ও ফলহীন।

‘শাস্ত্রের এই বচনটি তাঁরা তখনও জানতেন না’ যোহনের এই মন্তব্য ঠিক পিতর ও মাগ্দালার মারীয়ার দিকে নির্দেশ করে যাঁরা শূন্য সমাধিগুহা দেখা সত্ত্বেও যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখতে পারলেন না।

অবশেষে, লাজারকে পুনরুজ্জীবনদানের সঙ্গে তুলনা করা বাঞ্ছনীয়: সেখানে দুর্গন্ধ, পাথরখানা যা সরিয়ে দিতে হয় ও লাজার যাঁকে ফালিগুলো থেকে মুক্ত করতে হয় এই সমস্ত কথা উল্লিখিত, অপর দিকে এখানে সমাধিগুহার ভিতরে কোনো দুর্গন্ধের উল্লেখ নেই, যিশু স্বশক্তিতেই পুনরুত্থিত হলেন এবং ফালিগুলো খুলে দিয়ে আপন পুনরুত্থানের প্রমাণস্বরূপ সেগুলো গোটানো অবস্থায় রেখে গেলেন।

মাগ্দালার মারীয়াকে যিশুর দর্শনদান (২০:১১-১৮)

২০ [১১] মারীয়া কিন্তু সমাধিগুহার কাছে বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। কাঁদতে
কাঁদতে তিনি নিচু হয়ে সমাধিগুহার ভিতরে তাকিয়ে দেখলেন; [১২] দেখতে
পেলেন, যিশুর দেহ যেখানে শুইয়ে রাখা ছিল, সেখানে সাদা পোশাক-পরা দু'জন
স্বর্গদূত বসে আছেন, একজন মাথার দিকে, আর একজন পায়ের দিকে।
[১৩] তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘নারী, কেন কাঁদছ?’ তিনি তাঁদের বললেন, ‘কারণ
ওরা আমার প্রভুকে তুলে নিয়ে গেছে, আর তাঁকে কোথায় রেখেছে জানি
না।’ [১৪] একথা বলতে বলতে তিনি পিছনের দিকে ফিরলেন, আর দেখতে
পেলেন, যিশু দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু মারীয়া জানতেন না যে, উনিই যিশু।
[১৫] যিশু তাঁকে বললেন, ‘নারী, কেন কাঁদছ? কাকে খুঁজছ?’ তাঁকে বাগানের
মালী মনে করে মারীয়া বললেন, ‘মহাশয়, আপনি যদি তাঁকে অন্য কোথাও নিয়ে
গিয়ে থাকেন, তবে আমাকে বলুন তাঁকে কোথায় রেখেছেন, আর আমি তাঁকে নিয়ে
যাব।’ [১৬] যিশু তাঁকে বললেন, ‘মারীয়া!’ ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁকে হিব্রু ভাষায়
বললেন, ‘রাব্বুনি’, যার অর্থ ‘গুরুজী’। [১৭] যিশু তাঁকে বললেন, ‘আমাকে
আঁকড়ে ধরো না, কেননা আমি পিতার কাছে এখনও আরোহণ করিনি, বরং আমার
ভাইদের গিয়ে বল, আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও
তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর।’ [১৮] মাগ্দালার মারীয়া

শিষ্যদের কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন: 'আমি প্রভুকে দেখেছি!' এবং তাঁদের বললেন যে, তিনি তাঁকে এই সমস্ত কথা বলেছিলেন।

এ বর্ণনা যেন দৃঢ়তার সঙ্গে দেখাতে চায় যে মাগ্দালার মারীয়া শূন্য সমাধিগুহা ও স্বর্গদূতদের উপস্থিতি সত্ত্বেও যিশুর পুনরুত্থান উপলব্ধি করতে অক্ষমা, এমনকি তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের দুশ্চিন্তায় মগ্না। আপন দুঃখে মগ্না হয়ে তিনি যিশুর দেহকে স্থানান্তরের কথায় এখনও নিমজ্জিতা। আর যখন যিশু স্বশরীরে তাঁকে দর্শন দেন তখনও মারীয়ার মন অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে তাঁকে চিনতে পারে না। এই গভীর অন্ধতা থেকে মারীয়া বিশ্বাসের দিকে চালিতা হন: বস্তুতই, পুনরুত্থানের তথ্য প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পেলেও তবুও রহস্যময় ও মানবীয় বোধের অতীত; শুধু ঈশ্বরের সাহায্যে ও আত্মত্যাগের মাধ্যমেই তা বোধগম্য হয়ে ওঠে। বাস্তবিকই, যখন যিশু তাঁকে নাম ধরে ডাকেন তখনই মাত্র মারীয়া তাঁকে চিনতে পারেন; একাধারে একথাও সত্য যে, যিশু মারীয়ার কাছে আত্মপ্রকাশ করেন কারণ মারীয়া সেই ব্যক্তিস্বরূপ যে ভালবাসার খাতিরেই যিশুর অনুসন্ধান করে: তার প্রেমপূর্ণ অনুসন্ধানের ফলে সে বিশ্বাসও করতে পারবে।

২০:১৫—কাকে খুঁজছ? সুসমাচার শেষে যিশুর এই প্রশ্ন ঠিক সেই একই প্রশ্ন, এমনকি সেই একই কথা যা তিনি সুসমাচার আরম্ভে প্রথম শিষ্যদের কাছে রেখেছিলেন (১:৩৮)। এতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যোহনের উদ্দেশ্য: যে পাঠক সুসমাচার ধ্যানের মাধ্যমে যিশুর অনুসন্ধান করেন, যিশু তাঁরও কাছে সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রাখবেন: 'কাকে খুঁজছ?'

২০:১৬—যিশু তাঁকে বললেন, মারীয়া! যারা তাঁর আপনজন যিশু তাদের জানেন ও তাদের নাম ধরে ডাকেন; তারা তাঁর কণ্ঠস্বর চেনে বলে তাঁর অনুসরণ করে (১০:৩-৪)। পুনরুত্থিত যিশু পৃথিবীস্থ যিশু ছাড়া অন্য ব্যক্তি নন, এখন কিন্তু তিনি ভিন্ন রূপেই মারীয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মারীয়া তাঁর দিকে ফিরে চান: এই বাহ্যিক ক্রিয়া

মারীয়ার আন্তর উন্মুক্ততা প্রকাশ করে; তিনি পুনরুত্থিত যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখতে প্রস্তুত, যিশুর ডাকে মারীয়াও পৃথিবীস্থ যিশুর একটা প্রচলিত নাম ধরে তাঁকে উত্তর দেন, যথার্থই, 'রাব্বুনি' নামটা (অর্থাৎ 'গুরুজী') 'রাব্বি' প্রচলিত সেই একই নামের মত, তবু এর মধ্যে ব্যক্তিময় ও গভীরতর সম্পর্কের একটা আভাসও বিদ্যমান। সুতরাং, এই বর্ণনা বাহ্যিক দিক দিয়ে সরল হলেও তবু গভীর অর্থমন্ডিত: যিশুর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ হল যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করা বা পুনরুত্থিত যিশুর সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপন করা।

পুনরুত্থিত যিশু ও পৃথিবীস্থ যিশু একই ব্যক্তি বটে, অথচ একটা গভীর পার্থক্যও বর্তমান: পুনরুত্থিত যিশু মানুষের চোখে 'নব' যিশু রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, এজন্য তাঁকে চিনবার জন্য 'নব' চোখ দরকার। পুনরুত্থিত যিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রাক্তন অভিজ্ঞতায় ফিরে যাওয়া নয়; তাঁর প্রাক্তন মানবরূপী জীবনের ছিন্ন সূত্র পুনরায় ধারণ করবার জন্য যিশু কবর থেকে উত্থিত হলেন এমন নয়, বরং পিতার কাছে আরোহণ করায় তিনি নব অবস্থায় প্রবেশ করেন। যখন মাগ্দালার মারীয়া তাঁকে সরাসরি চিনতে অক্ষমা এবং তাঁকে চিনবার পরেও তাঁকে নিজের কাছে ধরে রাখতে অভিপ্রেতা, তখন এর কারণ এই যে, তিনি যিশুর সঙ্গে 'নব' সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত নব সংযোগ সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করতে এখনও অক্ষমা। তিনি অতীব দুঃখে ভারাক্রান্তা, কিন্তু সেই দুঃখ ত্যাগ করতে আহূতা; তিনি প্রাক্তন সাহচর্য পুনঃস্থাপন করতে চান, কিন্তু সেই সাহচর্য বিসর্জন দেওয়াই দরকার। এখন থেকে তাঁর 'নব' মন অর্জন করা অত্যাবশ্যক তিনি যেন যিশুর সঙ্গে নব সম্পর্কের কথা সঠিকভাবে অনুভব করতে পারেন; আর তাঁর উপর গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্বও ন্যস্ত করা হয়, তথা: তিনি সকল ভাইকে আপন অভিজ্ঞতার সহভাগী করবেন: এটিই প্রকৃত বাণীপ্রচার। নব সম্পর্কেই ও বাণীপ্রচারেই মারীয়া আনন্দ, শান্তি, পবিত্র আত্মাকে ও পাপক্ষমা খুঁজে পাবেন। এই মর্মেই যিশু প্রকাশমূলক একটি কথার মধ্য দিয়ে মারীয়াকে সম্বোধন করেন, 'আমাকে আঁকড়ে ধরো না, কেননা আমি পিতার কাছে এখনও আরোহণ করিনি', যিশুর এই বচনের অর্থ খুবই কঠিন; অবশ্যই যিশু একথা বলতে চান না যে, ভোরে মারীয়ার সঙ্গে এবং সন্ধ্যায় শিষ্যদের সঙ্গে এ সাক্ষাৎকার দু'টোর মাঝামাঝি তিনি পিতার কাছে আরোহণ করে পুনরায় আপনজনদের মধ্যে ফিরে আসবেন। তেমনিভাবে এ সকল প্রশ্নও অপ্রাসঙ্গিক, যথা: মাগ্দালার

মারীয়ার কাছে যিশু কি গৌরবান্বিত যিশু বলেই আত্মপ্রকাশ করলেন? কবর থেকে ওঠা ও পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার মধ্যকার কি কোনো মধ্যবর্তী পর্যায় আছে? পুনরুত্থান, আরোহণ ও গৌরবায়ন কি পৃথক পৃথক ভাবেই বিবেচনাযোগ্য? এসব ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে বলতে হয় যে, এ ধরনের প্রশ্ন বা সমস্যা যোহনকে স্পর্শ করে না; মানবীয় ভাষা ও ধারণা প্রয়োগে তিনি ঐশতাত্ত্বিক ধারণাই উদ্ভেদ করতে অভিপ্রেত, যে ঐশতাত্ত্বিক ধারণাগুলো যিশুর পুনরুত্থান ও পিতার গৃহে তাঁর ফিরে যাওয়া থেকে আয়ত্ত করা হয়। যোহনের উদ্দেশ্য যিশুর সেই একই বচনের দ্বিতীয় অংশে সূচিত, 'আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর'। এই বচনে শিষ্যদের কাছে যিশুর বিদায় উপদেশের কথা প্রতিধ্বনিত, তথা: 'ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখ…': শিষ্যদের বাসস্থান প্রস্তুত করার জন্যই যিশু পিতার গৃহে যাচ্ছেন, এটিই সেই সংবাদ যা মারীয়া শিষ্যদের জানাবেন। বিদায়ের সময়ে যে প্রতিশ্রুতিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, পুনরুত্থিত যিশু এখন সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করছেন। এখন পিতার কাছে আরোহণের সময় উপস্থিত হয়েছে, তাঁর 'ভাইদের' কাছে এর অর্থ এই যে, তিনি পিতার কাছে তাঁদের জন্য একটা বাসস্থান প্রস্তুত করছেন, বা অন্য কথায়, তাঁর বিদায়ের ফল বলে পিতার সঙ্গে যে সংযোগ দেবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, তা-ই এখন দান করতে উদ্যত (১৪:২১, ২৩, ২৮)। এইভাবে যিশুর পুনরুত্থান যোহনের ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে সম্পূর্ণরূপে সন্নিবেশিত, এবং একাধারে বিদায় উপদেশের সমুদয় প্রতিশ্রুতি যিশুর পুনরুত্থানেরই বাস্তব পরিপূর্ণতা লাভ করে।

সুতরাং, 'এখনও আরোহণ করিনি' (২০:১৭ক) এবং 'আরোহণ করছি' (২০:১৭গ) এ উক্তি দু'টোর মধ্যে তীব্র অমিল দেখা নিষ্প্রয়োজন: যোহন বলতে চান, পুনরুত্থিত যিশু এই কাজই সম্পন্ন করেছেন: পিতার কাছে ফিরে যাওয়া ব্যক্তি বলে তিনি শিষ্যদের কাছে পিতার সঙ্গে পূর্ণ সংযোগ দান করেন, যে পূর্ণ সংযোগে সূচিত রয়েছে শিষ্যদের যাচনা পূরণ (১৪:১৩), পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ (১৪:১৬), পিতার ভালবাসা উপলব্ধি (১৪:২৩), এক কথায়, যা যিশুর সাধিত কাজের ফল, সেই সব। পুনরুত্থিত যিশু কিছুক্ষণ পরে পিতার কাছে যাবেন এমন নয়, বরং ইতিমধ্যেই তাঁর কাছে যাচ্ছেন: পিতার কাছে আরোহণটি হল আগে থেকেই শুরু করা একটি 'যাত্রা'।

যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, মানবীয় ভাষা একটি উপায় মাত্র যা দিয়ে ঐশতাত্ত্বিক ধারণার দিকেই আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত।

যিশুর পুনরুত্থান বর্ণনায় সদৃশ সুসমাচারত্রয় ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করে, অর্থাৎ যিশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ পৃথক পৃথক ঘটনা বলে বর্ণনা করে; কিন্তু অন্যত্র আমরা বারবার লক্ষ করলাম যে যোহন একটি ধারণার উপরেই বিশেষভাবে মন ফেরান, তথা: পিতা থেকে যিশুর আগমন এবং পিতার কাছে যিশুর পুনরাগমন, অর্থাৎ যিশুর 'যাত্রার' উদ্বোধনী ও সমাপন পর্যায় (১৬:২৮)। তাঁর বিবেচনায় ক্রুশের উপরে যিশুর উত্তোলন হল তাঁর গৌরবায়নও; যিশুর সেই 'ক্ষণেই' সবকিছু একটিমাত্র ঘটনা বলে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সেই একটিমাত্র ঘটনা মৃত্যু, পুনরুত্থান ও গৌরবায়ন পৃথক পৃথক তিনটি ঘটনা বলে বিবেচনাযোগ্য নয়। যোহন সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের উপরোল্লিখিত ধারণা অতিক্রম করেন কারণ তাঁর মতে সেই ধারণা দ্বারা যিশুর পুনরুত্থানের সেই প্রকৃত তথ্য আচ্ছাদিত হয় যে, যিশু এই মানবীয় নিম্নলোক থেকে ঐশলোকে চলে গেলেন, এবং যেহেতু এই 'চলে যাওয়া' মহাঘটনা এমন একটিমাত্র ঘটনা যা দিব্য বলে মানবীয় ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়, সেজন্য যোহনের বর্ণনার পদ্ধতি স্পষ্ট বোঝাতে চায় যে পুনরুত্থিত যিশুর দর্শনদান প্রকৃতপক্ষে ঐশলোকেই উত্তোলিত-গৌরবান্বিত সেই যিশুর আত্মপ্রকাশ যিনি এই নিম্নলোকের আর নন। যিশুর দর্শনদান বর্ণনার উদ্দেশ্য হল খ্রিষ্টমণ্ডলীর কাছে বিশ্বাস ও জীবনযাপন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দান করা।

অবশেষে এ কথাও লক্ষ করার বিষয় যে, যোহনের সুসমাচারে এখানেই মাত্র যিশু আপন শিষ্যদের 'ভাই' বলে সম্বোধন করেন। যিশুর শিষ্যেরা পিতার দত্তকপুত্র বা যিশুর সহোদর ভাই নন, তাঁরা ঈশ্বরের সত্যকার সন্তান হয়ে উঠেছেন, যিশুর পিতা তাঁদেরও সত্যকার পিতা। এই নবীনত্ব যিশুর পুনরুত্থানের ফল যা যুগ যুগান্তরব্যাপী স্থায়ী থাকবে: সকল বিশ্বাসী যিশুর সঙ্গে পিতার সন্তান এবং সেই একই ঐশজীবন যাপন করে যে-জীবনের যিশুই প্রথম উৎস (১৪:১৯)। এই সন্তানত্ব ঐশঅনুগ্রহ দ্বারা সাধিত বটে, কিন্তু তাই বলে যে অবাস্তব তা নয়। ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকারকে মানুষের লাভ করা

দরকার (১:১২) এবং এই অধিকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার জন্মের মধ্য দিয়েই অর্জনীয় (১:১৩; ৩:১-২)। এই পরম সত্য, এই ঐশপিতৃত্বের চরম সিদ্ধির উপরেই ত যিশুর পুনরুত্থানের সাধিত নবীনত্ব বা নব-সংবাদ প্রতিষ্ঠিত: পিতা ঈশ্বর যেভাবে পুত্রকে ভালবাসেন ঠিক সেইভাবে সকল মানুষকে ভালবাসেন (১৬:২৭); যিশুর সঙ্গে সকল মানুষও ঈশ্বরের পিতৃস্নেহে সংগৃহীত। যিশুর পুত্রত্বই সকল মানুষের সন্তানত্ব সাধন করে কারণ পিতা যিশুতে তাদেরই ভালবাসেন যারা যিশুতে তাঁকে ভালবাসে (১৬:২৭)।

এইভাবে পুনরুত্থানের নব-সংবাদ বিদায় উপদেশের কথা, এমনকি 'তোমরা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর' পুরাতন নিয়মের এই প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ করে। এখনই ঈশ্বর মানুষের পিতা, ঈশ্বরের সন্ধি অতি মাত্রায় সিদ্ধি লাভ করেছে। পুরাতন নিয়ম অনুসারে ঈশ্বরের পিতৃত্ব তাঁর রক্ষাকারী সহায়তা ও উপস্থিতি বলে বিবেচনা করা হত, এখন কিন্তু সেই উপস্থিতি আন্তর, চিরস্থায়ী ও কার্যকর একটি উপস্থিতি হয়ে উঠল। প্রতিশ্রুত 'আমিই আছি'-ঈশ্বর যিশুতেই চরম 'আমিই আছি-তে রূপায়িত হলেন (৮:২৪-২৮)। ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব তাঁর পিতৃত্বে সিদ্ধিলাভ করে বলে ঈশ্বর এখন সত্যিই মানুষের ঈশ্বর। সুতরাং, মারীয়ার কাছে যিশু যে সংবাদ ন্যস্ত করেছেন, তা কেবল সেইকালের শিষ্যদের জন্য নয়, উত্তরকালের সকল বিশ্বাসীর জন্যই নির্দিষ্ট। শিষ্যদের কাছে মারীয়ার উচ্চারিত উক্তিও ('প্রভুকে দেখেছি') গভীর অর্থবহ উক্তি বলে গ্রহণযোগ্য; এতে অনুমান করা যায় মারীয়া অবশেষে যিশুর পুনরুত্থান-মর্মসত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন, তিনি 'দেখেছেন' ও বুঝেছেন যে, যিশু পুনরুত্থানেরই 'প্রভু' ও ক্রুশোত্তোলিত-গৌরবান্বিত মানবপুত্র, তিনি জীবিত, আপনজনদের মাঝে, এমনকি তাদের অন্তরেই জীবিত।

শিষ্যদের কাছে যিশুর দর্শনদান (২০:১৯-২৩)

২০ [১৯] সেই দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যাবেলায়, শিষ্যেরা যেখানে ছিলেন, ইহুদীদের ভয়ে সেখানকার সমস্ত দরজা বন্ধ থাকতেই যিশু এলেন ও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদের শান্তি

হোক!’ [২০] এবং এই কথা বলে তিনি নিজের দু’হাত আর নিজের পাশটি তাঁদের দেখালেন। প্রভুকে দেখে শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। [২১] যিশু তাঁদের আবার বললেন, ‘তোমাদের শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি।’ [২২] এবং একথা বলার পর তিনি তাঁদের উপরে ফুঁ দিলেন, ও তাঁদের বললেন, ‘পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। [২৩] তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা হবে; যদি কারও পাপ ধরে রাখ, তা ধরে রাখা থাকবে।’

মাগ্দালার মারীয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর পুনরুত্থিত যিশু সেই একই দিনে, সন্ধ্যাবেলায়, শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাসের জন্য ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভাবী জীবনের জন্য যিশুর এই দর্শনদান অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। যোহন স্পষ্ট দেখাতে চান যে, যে যিশু শিষ্যদের কাছে দর্শন দিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথোপকথন করেন, সেই যিশু বাস্তব ব্যক্তি ও সেই একই যিশু যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল; এজন্যই ক্রুশারোপণের প্রমাণস্বরূপ তিনি তাঁর হাত দু’টো ও তাঁর পাশটি দেখান। অথচ, আগেকার ও বর্তমান যিশুর মধ্যে গভীর একটা পার্থক্যও রয়েছে, দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের ঘরে প্রবেশ করায় পার্থক্যটা ব্যক্ত। পুনরুত্থিত যিশুর আবির্ভাবের প্রথম ফল এই যে, ভয়ে অভিভূত শিষ্যেরা ভয় থেকে মুক্তি পান। যিশুর শান্তি সম্ভাষণ এবং যিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি যে স্বশরীরেই তাঁদের মাঝে উপস্থিত এই নিশ্চয়তা ভয়কে পরাজিত করে আনন্দকেই আনে। তিনি আবার আসবেন (১৪:২৮), তাঁরা তাঁকে দেখতে পাবেন (১৪:১৯) এবং তাঁদের আনন্দ চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ হবে (১৬:২০, ২২, ২৪), যিশুর এই প্রতিশ্রুতিগুলো এখন পূর্ণতা লাভ করেছে। এখন যিশু অন্য কতগুলো প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে যাচ্ছেন, তথা: শিষ্যদের প্রেরণ ও পবিত্র আত্মাকে দান। এবিষয় দু’টো হল যিশুর এই দর্শনের সর্বোত্তম ফল যা খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভবিষ্যৎ লক্ষ করে।

শিষ্যদের প্রেরণ: সর্বপ্রথমে যিশু শিষ্যদের কাছে পুনরায় শান্তি সম্ভাষণ জানান, এতে আমরা বুঝি এই শান্তি শুধু একটা সম্ভাষণ নয় বরং আত্মিক এমন এক দান যা জীবনযাপনে বাস্তবরূপেই প্রকাশ পাবার কথা। যে শান্তি যিশু ঈশ্বরের কাছ থেকে

শিষ্যদের দান করেন, সেই শান্তি তাঁদের প্রেরণকর্ম ফলপ্রদ করবে ও জগৎকে দেখাবে প্রকৃত শান্তি কি রূপ।

এগিয়ে যাবার আগে বিশেষ দু'টো শব্দের ঐশতাত্ত্বিক অর্থ পরিষ্কার করা হোক: প্রেরিত বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যে ঈশ্বরের কিংবা মণ্ডলীর পূর্ণ দায়িত্ব ও মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়ে একটা বিশেষ কাজ করার জন্য নিযুক্ত হয়েছে; এবং প্রেরণকর্ম বলতে উপরে উল্লিখিত সেই বিশেষ কাজ বোঝায় যে-কাজ সম্পাদন করতে প্রেরিতজন নিযুক্ত হয়েছে। সুতরাং, কাদের কাছে শিষ্যেরা প্রেরিত? প্রকৃতপক্ষে তাঁদের প্রেরণকর্ম কি ধরনের? এক্ষেত্রে যোহন অধিক কথা বলেন না, কেননা তাঁর দৃষ্টিকোণ সরাসরি প্রেরণকর্মের বা বাণীপ্রচারকর্মের মর্মার্থকেই লক্ষ করে: পিতা জগতের পরিত্রাণের জন্য পুত্রকে প্রেরণ করেছিলেন, এখন শিষ্যগণকে যিশুর প্রেরণকর্মের সহভাগী করা হয়, তাঁরা 'সহায়ক' আত্মার প্রেরণায় (১৪:১৬, ২৬; ১৫:২৬…) জগতের পরিত্রাণের জন্য যিশুর সেই প্রেরণকর্ম চালিয়ে যাবেন (১৪:২)। যোহনের বিবেচনায় এই বিষয়ে অন্য কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবু আমরা যিশুর প্রেরণকর্মের উপাদান দু'টো বিশেষভাবে স্মরণ করতে চাই যা শিষ্যদের অর্থাৎ খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রেরণকর্মের বেলায়ও প্রযোজ্য: প্রথম, যিশু পিতার প্রতি উত্তম বাধ্যতায়ই নিজের প্রেরণকর্ম সম্পন্ন করলেন এবং নিজের নয়, পিতারই কথা প্রচার করেন; এমনকি ঠিক এই বাধ্যতা গুণেই তিনি অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরূপে কথা বলতে পারেন: যে তাঁকে শোনে সে পিতাকেই শোনে, যে তাঁকে অগ্রাহ্য করে সে পিতাকেই অগ্রাহ্য করে। দ্বিতীয়, জগতের বিচারের জন্য নয়, তার পরিত্রাণেরই জন্য পিতা পুত্রকে প্রেরণ করেছিলেন; তবু, পুত্রের বাণী অবিশ্বাসীদের জন্য বিচারজনক বাণীতে পরিণত হয়।

এরূপ হওয়া উচিত শিষ্যদের ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রেরণকর্ম: পিতার ইচ্ছায় উত্তম বাধ্যতায় তাঁরাও পরিত্রাণের বাণী প্রচার করবেন, যে বাণী শ্রোতাদের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটাবে, তথা: বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী।

পবিত্র আত্মাকে দান: প্রেরণকর্ম সাধনে প্রেরিতজন উপযুক্ত হতে হলে তার পক্ষে যিশুর মত পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া দরকার: এজন্যই তিনি শিষ্যদের উপর ফুঁ দিলেন

অর্থাৎ ঐশআত্মায় তাঁদের পরিপূর্ণ করলেন। পুরাতন নিয়ম অনুসারে ফুঁ দেওয়া এমন প্রতীকমূলক ক্রিয়াকর্ম যা নবীভূত সৃষ্টির কথা ব্যক্ত করে। তার নাকে ফুঁ দিয়ে ঈশ্বর আদমকে সঞ্জীবিত করেন (আদি ২:৭; প্রজ্ঞা ১৫:১১)। নবী এজেকিয়েলের পুস্তক একটা দর্শনের কথা বর্ণনা করে বলে, মৃতদের একটা সম্প্রদায় (অর্থাৎ ইস্রায়েল জনগণ) ঐশআত্মার প্রভাবে জীবিতদেরই সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়: 'প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে প্রাণবায়ু, চারবায়ু থেকে এসো, এই মৃতদের উপরে ফুৎকার দাও, যেন তারা পুনরুজ্জীবিত হয়' (এজে ৩৭:৯)। শুধু ঈশ্বরের এই ঐশআত্মাই মানুষকে নবীভূত করে তুলতে ও পাপ থেকে মুক্ত করতে সক্ষম (এজে ৩৬:২৬-২৭; সাম ৫১:১২-১৩)। লুকের বর্ণিত পঞ্চাশত্তমী-পর্বের মত (প্রেরিত ২:১-১১) এখানেও পবিত্র আত্মাই প্রেরিতদূতমণ্ডলীকে নবসৃষ্টি করেন ও প্রেরণকর্মের জন্য উপযোগী করে তোলেন; কিন্তু লুকের চেয়ে অধিক সূক্ষ্মভাবে যোহন স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে পবিত্র আত্মা যিশুরই দান: 'পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর'। সুতরাং যিশু আপন প্রাণই হস্তান্তরিত করেন, বিশ্বাসীগণ পুনরুত্থিত যিশুর জীবনের অংশী হয়ে ওঠে ও তাদের পাপের ক্ষমা করা হয়, এমনকি অন্য মানুষের পাপ ক্ষমা করার অধিকারও তারা পায়। যোহন অনুসারে পবিত্র আত্মার ভূমিকা উদার একটি ভূমিকা: তিনিই যিশু ও শিষ্যদের অর্থাৎ খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যে সংযোগস্বরূপ। এখন পূর্ণতা লাভ করে সেই প্রতিশ্রুতি যা যিশু আগে দিয়েছিলেন, 'তোমরা আমাকে দেখতে পাবে কারণ আমি জীবিত আছি, তোমরাও জীবিত থাকবে' (১৪:১৯) এবং যা অনুসারে সকল খ্রিষ্টভক্ত বিশ্বাসী বলেই ঐশআত্মাকে পাবে (৭:৩৯)।

পবিত্র আত্মাকে দানের সঙ্গে পাপ ক্ষমা করার অধিকার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যোহন অধিক স্পষ্টভাবে বলতে চান যে জগতের মধ্যে খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রেরণকর্ম পরিত্রাণদায়ীই কর্ম: যিশুর পাতিত রক্ত গুণেই (১ যোহন ১:৭) ও পবিত্র আত্মার নবীকরণের শক্তিতেই খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যে পাপক্ষমা পাওয়া সম্ভবপর। পাপ ক্ষমা করার যে অধিকার যিশু মণ্ডলীকে হস্তান্তরিত করেন তা হল তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি যা অনুসারে যুগ যুগ ব্যাপী খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যে ও তার মাধ্যমেই পাপক্ষমা লাভ করা হবে। খ্রিষ্টমণ্ডলীই সিদ্ধান্ত নেবে কে কে প্রকৃত মণ্ডলীভুক্ত এবং কে কে অপকর্মের দরুন তা থেকে বিচ্ছিন্ন ও

বিচ্ছেদ্য। স্বয়ং যিশুর মত (৮:২১; ৯:৪১) মণ্ডলীই নির্ণয় করবে কোনো সদস্য অনুতাপী কিনা (১ যোহন ৫:১৬)।

যিশু ও থোমাস (২০:২৪-২৯)

এই অংশ যিশুর পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় শিষ্যদের অভিজ্ঞতার উপর জোর দিয়ে ভাবী খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের শিক্ষা দেয় পূর্ণ বিশ্বাস অর্জনের জন্য পথ কি: না দেখেও বিশ্বাস করতে হয়। প্রথম শিষ্যদের বৈষম্যে ভাবী খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ যিশুর কোনো দর্শন না পাওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস করবে।

উপরন্তু, এখানে উপাসনামূলক একটি উদ্দেশ্যও বর্তমান; যে দিনে খ্রিষ্টমণ্ডলী নিয়মিত একত্র হয়ে এউখারিস্তিয়াতে অংশ নেয়, সেই রবিবার দিনেই থোমাসের কাছে যিশু দর্শন দিয়েছিলেন।

২০ [২৪] যিশু যখন এসেছিলেন, বারোজনের অন্যতম থোমাস—যমজ বলে যিনি পরিচিত—তিনি তখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। [২৫] তাই অন্য শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, ‘আমরা প্রভুকে দেখেছি।’ কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, ‘তাঁর দু’টো হাতে যদি পেরেকের দাগ না দেখি, ও পেরেকের স্থানে যদি আমার আঙুল না রাখি, আর তাঁর বুকের পাশটিতে যদি আমার হাত দিতে না পারি, তবে আমি বিশ্বাস করব না।’
[২৬] আট দিন পর তাঁর শিষ্যেরা আবার ঘরে ছিলেন, থোমাসও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু যিশু এলেন ও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, ‘তোমাদের শান্তি হোক!’ [২৭] পরে থোমাসকে বললেন, ‘তোমার আঙুলটা এখানে রাখ, আর আমার হাত দু’টো দেখ; তোমার হাত বাড়াও, আমার বুকের পাশটিতে তা দাও। অবিশ্বাসী হয়ো না, বিশ্বাসীই হও।’
[২৮] থোমাস তাঁকে উত্তর দিলেন, ‘প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!’ [২৯] যিশু তাঁকে বললেন, ‘আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ। না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী।’

এই অংশে ব্যতীত যোহনের সুসমাচারে প্রেরিতদূত থোমাসের কথা দু' বার উল্লিখিত: বেথানিয়ার দিকে যাত্রাকালে (১১:১৬) এবং বিদায় উপদেশের সময় (১৪:৫)। শক্ত বুদ্ধির মানুষ হয়েও তথাপি তিনি যিশুর প্রতি খুবই বিশ্বস্ত (১৪:৬)। যিশুর মানবীয় নিয়তির দিকেই মাত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন বলে তাঁর প্রকৃত পথ বুঝে উঠতে (১৪:৫) ও তাঁর পুনরুত্থানের কথা বিশ্বাস করতে অক্ষম। কাজেই, তিনি অবিশ্বাসীর নন বরং তারই প্রতীক যে দুর্বলতাবশত বিশ্বাস করতে অসমর্থ ও যিশুর পুনরুত্থানের পর স্বয়ং যিশু দ্বারাই পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করবে। এক দিক দিয়ে থোমাস যিশুর পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা পাবার আগে সেই এগারোজনের প্রতীক; বাস্তবিকই যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করার জন্য তিনি প্রমাণ চাইবেন বলে দাবি করেন। এতে যোহন বুঝিয়ে দিতে চান যে, যে বিশ্বাস ইন্দ্রিয়গোচর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, সেই বিশ্বাস প্রকৃত বিশ্বাস নয়; যে বিশ্বাস যিশুর বাণীর উপরেই মাত্র নির্ভর করে সেটাই উত্তম (১০:৩৮; ১৪:১১); বলা বাহুল্য এই মন্তব্য শুধু থোমাসের বেলায় নয়, ভাবী খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বেলায় প্রযোজ্য। তারা সেই থোমাসের আচার-ব্যবহার অনুসরণ করবে না যিনি অন্যান্য শিষ্যেরা যিশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস করতে সম্মত নন, বরং প্রিয় শিষ্যের আদর্শ মেনে চলবে যিনি সমাধিগুহা শূন্য হলেও ও যিশুর পুনরুত্থানের কথা না জেনেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছিলেন।

কিন্তু যিশু এলেন ও থোমাসের দাবি পূরণ করলেন। ফলত থোমাস সচেতন হলেন যে যিশু তাঁর মনের কথা জানেন, এবং যিশুর দয়াপ্রকাশে লজ্জাবোধ করলেন। 'অবিশ্বাসী হয়ো না, বিশ্বাসী হও' থোমাসের কাছে যিশুর এই উক্তি উত্তরকালের মণ্ডলীকেও লক্ষ করে, যে-মণ্ডলী কিছু না দেখেও বিশ্বাস করতে আহূত।

যিশুর আহ্বানে থোমাসের প্রতিক্রিয়া হল গভীর একটি বিশ্বাস-ঘোষণা: 'প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার'। এই বিশ্বাস-ঘোষণায় থোমাসের ব্যক্তিময় ও আন্তর উদ্দীপনা ব্যক্ত। যিশুর দর্শনে ও কথায় থোমাস আমূল মনপরিবর্তন করেন, অবিশ্বাস থেকে পূর্ণ বিশ্বাসে এসে পৌঁছন: যিশু দ্বিধাগ্রস্ত শিষ্যের মন জয় করলেন। আপন বিশ্বাস ঘোষণায় থোমাস প্রকাশ করেন যে, তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা পুনরুত্থিত যিশুতে তিনি আগে থেকে চেনা পৃথিবীস্থ ও বিদ্ধ যিশুকে চেনেন এবং ঐশগৌরবপ্রাপ্ত যিশুকেও, অর্থাৎ তাঁর

‘প্রভু’ ও ‘ঈশ্বরকেও’ চেনেন। যিশুর জীবনকালে শিষ্যেরা অন্যান্য লোকদের মত সাধারণত যিশুকে প্রভু বলে ডাকতেন (৬:৬৮; ১১:১২ ইত্যাদি), কিন্তু এখন ‘প্রভু’ নামটি পুনরুত্থিত যিশু বিষয়ক একটা বিশ্বাস-ঘোষণায় পরিণত হয়; থোমাস ঘোষণা করেন অপরাপর শিষ্যদের মত তিনিও প্রভুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেন। তবু ‘প্রভু’র পর তিনি ‘ঈশ্বর’ কথাটাও যোগ দেন, যাতে তাঁর বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠতা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়। দ্বিধাগ্রস্ত যিনি, তিনিই প্রথম পুনরুত্থিত যিশুর দর্শনলাভে উপলব্ধি করতে পারলেন সেই পুনরুত্থানের চরম পরিণাম কি, তথা: যিশু ঈশ্বর, যিশুতে মানুষ স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করে; যিশুতে মানুষ পিতার গৌরব, ক্ষমতা ও ভালবাসা প্রত্যক্ষ করে।

একথাও স্মরণ না করিয়ে পারি না যে, পুরাতন নিয়ম অনুসারে মোশি ঈশ্বরের যে নাম জেনেছিলেন, ইস্রায়েলীয়রা (সুতরাং যিশুও) সেই নাম কখনও উচ্চারণ করত না; যখন পুরাতন নিয়ম গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়, তখন নামটি ‘প্রভু’ শব্দবিশেষ প্রয়োগে অনূদিত হয়েছিল; তাই ‘প্রভু’ নাম উচ্চারণ করে থোমাস ঘোষণা করেন যিশুই পুরাতন নিয়মের সেই প্রেমময় পরমেশ্বর প্রভু; এতে পুরাতন নিয়ম যিশুতে কেন্দ্রীভূত।

নিঃসন্দেহে যোহনের ধারণায়, পুস্তক শেষে বর্ণিত থোমাসের বিশ্বাস-ঘোষণা পুস্তক শুরুতে ‘বাণী ছিলেন ঈশ্বর’ বাণী-বন্দনার ঘোষণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (১:১গ)। তাই এই ঘোষণায় যোহন সেই সকল কথা কেন্দ্রীভূত করতে চান যা পিতার সঙ্গে যিশুর সম্পর্ক বিষয়ে বলা হয়েছিল (৫:১৭…; ১০:৩০; ১২:৪৫; ১৪:১৯…; ১৯:৭): যিশু ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র (এবিষয়ে ‘পুত্র’ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) এবং পুত্র বলে তিনি মশীহ (খ্রিষ্ট), ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তা। সুতরাং, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, থোমাসের বিশ্বাস-ঘোষণা হল সমগ্র সুসমাচারব্যাপী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত বিশ্বাস-ঘোষণাধারার শীর্ষপর্যায় ও পরিণাম (১:৪৯; ৪:৪২; ৬:৬৭; ৭:৩৭…; ১১:২৭; ১৬:৩০; ২০:১৬): এইখানে নাজারেথের যিশু ‘প্রভু’ ও ‘ঈশ্বর’ বলে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেন।

২০:১৯—না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী: যিশুর এই উক্তিও শুধু থোমাসকে উদ্দেশ্য ক’রে নয়, ভাবী খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরও উদ্দেশ্য ক’রে উচ্চারিত:

বিশ্বাসের সাধারণ ভিত্তি বাণী শ্রবণের উপর নির্ভর করে। সে-ই বিশ্বাসী, যে প্রমাণের দাবি ছেড়ে প্রত্যক্ষদর্শী শিষ্যদের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য বলে গ্রহণ করে। যিশুর সময়ে দর্শন ও বিশ্বাস দু'টো একাধারেই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এখন অর্থাৎ মণ্ডলীকালে, দর্শন পাওয়ার দাবি করা উচিত নয়, প্রৈরিতিক সাক্ষ্যই যথেষ্ট। বিশ্বাস জাগরণের উদ্দেশ্যে যিশু যে ধরন 'চিহ্নকর্ম' প্রয়োগ করতেন, এখন সেই চিহ্নগুলো অন্য রূপ ধারণ করল: 'চিহ্ন'টি দৃষ্টিগোচর আর নয়, সাক্ষ্যই 'চিহ্নের' নামান্তর। কিন্তু এই কথার অর্থ এই নয় যে, বর্তমানকালে বিশ্বাসীর পক্ষে পুনরুত্থিত যিশুর সঙ্গে ব্যক্তিময় সম্পর্ক স্থাপনের পথ রুদ্ধ, বরং বিশ্বাসী এখন আনন্দ, শান্তি, পাপের ক্ষমা ও পবিত্র আত্মার উপস্থিতির বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে সমর্থ, কিন্তু সে যিশুর 'জীবনী' সাক্ষ্যসূত্রে গ্রহণ করবে। অন্য কথায় বলতে পারি, প্রৈরিতিক অভিজ্ঞতা উপাদান দু'টোতে সূচিত: ঐতিহাসিক দর্শন (যা বর্তমানে পুনর্ঘটতে পারে না) এবং বিশ্বাসসূত্রে প্রভুর সঙ্গে সংযোগ (যা সর্বদাই গ্রহণযোগ্য)। ঐতিহাসিক দর্শন (বা যিশুর জীবনী) সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ স্থিরীকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য স্মৃতি বলে হস্তান্তরিত। অপর দিকে বিশ্বাসসূত্রে প্রভুর সঙ্গে সংযোগ সদাবর্তমান একটি ঘটনা বলে দাঁড়ায় যা সকল প্রকৃত বিশ্বাসী প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং, থোমাসের এই বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ভাবী বিশ্বাসীদের শিক্ষা দেয় কি করে যিশুর প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখতে হয় এবং সেই পুনরুত্থিত যিশুর দিকে বিশ্বাসীদের চালনা করে যিনি যোহন অনুসারে আমাদের মাঝে সদা জীবিত ও চির উপস্থিত। এইজন্যই যোহন যিশুর আর কোন কথা উল্লেখ করেন না, কেননা তাঁর বিবেচনায় বিদায় ভোজের সময়ই পৃথিবীস্থ যিশু আপন চলে যাওয়া, ফিরে আসা ও আপনজনদের সঙ্গে তাঁর সদাবর্তমান সংযোগের কথা পূর্বঘোষণা করে গেছিলেন।

যোহনের সুসমাচারের উপসংহার (২০:৩০-৩১)

যারা পুনরুত্থিত যিশুকে না দেখেও প্রত্যক্ষদর্শী শিষ্যদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে আহূত, সেই ভাবীকালীন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে যোহন উপযুক্ত মন্তব্যের মাধ্যমে (২০:২৯) পুনরুত্থান-কাহিনী সমাপ্ত করেন। এখন তিনি আপন লেখার একটি

উপসংহার উপস্থাপন করে গোটা পুস্তকখানি পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। এই উপসংহারে সুসমাচারের প্রকৃত উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি: ঐতিহাসিক স্মৃতির মাধ্যমে পাঠকের কাছে উপযুক্তভাবে যিশুখ্রিষ্টের অনতিক্রমণীয় ও সদাবর্তমান তাৎপর্য ব্যক্ত করা। যেহেতু স্বয়ং লেখকই আপন লেখার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন, সেজন্য তাঁর এই উপসংহামূলক কথাই তাঁর স্বকীয় সুসমাচারের মূল ধারণা অর্জনের জন্য যেন চাবিকাঠিস্বরূপ: সুতরাং, এখানকার পর্যন্ত উপস্থাপিত ব্যাখ্যা সত্যাশ্রয়ী কিনা তাও এখন প্রমাণিত হবে।

২০ [৩০] যিশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও বহু চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন এই পুস্তকে যেগুলোর উল্লেখ নেই। [৩১] তবে এগুলো লেখা হয়েছে যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে, যিশুই খ্রিষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, এবং বিশ্বাস করে যেন তোমরা তাঁর নামে জীবন পেতে পার।

এই ক্ষুদ্র অংশে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বিদ্যমান; সেগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দেওয়া হোক:

খ্রিষ্ট: যোহনের সুসমাচারে 'খ্রিষ্ট' (মশীহ) প্রসঙ্গ বহু স্থান দখল করেছে। যোহন সেকালের খ্রিষ্টবিশ্বাসী পাঠকের কাছে উপযোগী উপায় নিবেদন করতে চান সে যেন অবিশ্বাসীর অভিযোগ ও যুক্তি খণ্ডন করতে পারে ও আপন বিশ্বাসে বলবান থাকে (৭ ও ৯ অধ্যায় বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য)।

ঈশ্বরের পুত্র: এতে প্রচারিত হয় যে যিশুর ঘোষিত ঐশপ্রকাশ ঈশ্বর থেকেই আসে (৩:১৭; ৫:২৫; ১০:৩৪-৩৬) এবং পুত্র বলে যিশুই একমাত্র ঐশজীবন বিতরণকারী (৩:১৬, ১৮)। যোহন অনুসারে এটিই হল যিশুর শ্রেষ্ঠ নাম ('পুত্র' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

বিশ্বাস ও অনন্ত জীবন লাভ করাই হল সুসমাচারের উদ্দেশ্য দু'টো। এইভাবে সেই মুখ্য কথা প্রতিধ্বনিত হয় যা অনুসারে বিশ্বাসী অনন্ত জীবন পেয়েই গেছে। উপরন্তু,

‘জীবন’ হল সুসমাচার পুস্তকের শেষ কথা। সুতরাং, অন্যান্য কথার চেয়ে এই কথাটি উপসংহারস্বরূপ ব্যক্ত করে পুনরুত্থিত যিশুর ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসের প্রকৃত তাৎপর্য: পুনরুত্থিত যিশুই জীবন, ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসও জীবন।

তাঁর নামে বলতে ‘যিশুতেই’ বোঝায় (৩:১৮; ১ যোহন ৩:২৩; ৫:১৩); কিন্তু এর অর্থ মরমিয়া অর্থ নয় বরং সেই অন্তরঙ্গ সংযোগ লক্ষ করে যা ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখার মাধ্যমে সৃষ্ট (৩:১৫)। এইভাবে যোহন আর একবার ঘোষণা করতে পারেন যে, যিশুকে জানাটা তাত্ত্বিক ও কাল্পনিক নয় বরং পরিত্রাণদায়ী জানা: যিশু ঐশআত্মপ্রকাশের মাধ্যমেই মানুষকে পরিত্রাণ করেন, যিশুর এই আত্মপ্রকাশ গ্রহণেই মানুষ পরিত্রাণ পায়; ঐশপ্রকাশকর্তা হওয়ায়ই যিশু মানুষের পরিত্রাণ সাধন করেন, ঐশপ্রকাশকর্তারূপে যিশুকে গ্রাহ্য করায়ই মানুষ পরিত্রাণ পায়।

সুতরাং, ‘সুসমাচার’ প্রকৃতপক্ষে পরিত্রাণদায়ী ঐশপ্রকাশ বা শুভসংবাদ। মাংসে আগত ঐশপ্রকাশকর্তা ও ঈশ্বরের পুত্র সেই যিশুই মৃত্যুকবলে পতিত মানুষের জীবনদাতা, এবং এই মর্মেই তিনি খ্রিষ্ট (মশীহ)। এই ঐশজীবন পাবার জন্য মানুষের পক্ষে একমাত্র পথ হল বিশ্বাস। বিশ্বাস জাগরিত, বলবান ও গভীর করাই ‘সুসমাচার’ পুস্তক লেখায় যোহনের উদ্দেশ্য (‘বিশ্বাস’ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

সম্পাদকমণ্ডলীর উপসংহার

(২১ অধ্যায়)

সকল শাস্ত্রবিদ্‌গণ একথা সমর্থন করেন যে, এই অধ্যায় যোহনের প্রত্যক্ষ লেখা নয়। ব্যাখ্যা সূচনায় এবং অন্যত্রও বলা হয়েছিল যে, যোহনের সুসমাচার সম্পাদকমণ্ডলী দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। এই শেষ অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে সেই সম্পাদকমণ্ডলীর কাজ: যোহনের শিষ্যেরা তাঁর প্রচারিত অপরাপর কাহিনী অবগত ছিলেন, এজন্য তাঁর রচনা শেষে সেই কাহিনীগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটা বেছে প্রথম লেখায় যোগ দিলেন যাতে পাঠকগণ সুসমাচারের মহত্তর জ্ঞানলাভে উপকৃত হন।

আপন লেখায় যোহন খ্রিষ্টকেন্দ্রীভূত একটা দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করেছিলেন; অপর দিকে এই অধ্যায় মণ্ডলীগত একটা দৃষ্টিকোণ অনুধাবন করে; দৃষ্টিকোণটা অসাধারণ মাছ-ধরা বর্ণনায়, আহার বৃত্তান্তে এবং পিতর সম্বন্ধীয় মন্তব্যগুলিতে প্রমাণিত।

বলা বাহুল্য যে এই অধ্যায় যোহনের প্রত্যক্ষ লেখা না হলেও তবু নূতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পবিত্র শাস্ত্র বলে অর্থাৎ পবিত্র আত্মার অনুপ্রাণিত লেখা বলে এবং পরিত্রাণদায়ী ঐশপ্রকাশ বলে পরিগণিত হওয়া প্রয়োজন।

তিবেরিয়াস সাগরের তীরে যিশুর দর্শনদান (২১:১-১৪)

২১ [১] পরবর্তীকালে যিশু শিষ্যদের কাছে আর একবার আত্মপ্রকাশ করলেন,
তিবেরিয়াস সাগরের তীরে। তিনি এভাবেই আত্মপ্রকাশ করলেন: [২] শিমোন
পিতর, যমজ বলে পরিচিত থোমাস, গালিলেয়ার কানা গ্রামের নাথানায়েল,
জেবেদের ছেলেরা ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্য দু'জন একসঙ্গে ছিলেন।
[৩] শিমোন পিতর তাঁদের বললেন, 'আমি মাছ ধরতে যাব।' তাঁরা তাঁকে বললেন,
'আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।' তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও নৌকায় উঠলেন। কিন্তু
সেই রাতে কিছুই ধরতে পারলেন না।

[৪] তখন সবে ভোর হয়েছে, এমন সময়ে সাগর-তীরে যিশু দাঁড়িয়ে আছেন। তবু শিষ্যেরা বুঝতে পারলেন না যে, তিনি যিশু। [৫] যিশু তাঁদের বললেন, 'বৎস, তোমরা কিছু ধরেছ কি?' তাঁরা তাঁকে উত্তর দিলেন, 'না।' [৬] তিনি তাঁদের বললেন, 'নৌকার ডান দিকে জাল ফেল, মাছ পাবে।' তাই তাঁরা জাল ফেললেন এবং প্রচুর মাছের কারণে জালটা আর টেনে তুলতে পারছিলেন না। [৭] যে শিষ্যকে যিশু ভালবাসতেন, তিনি পিতরকে বললেন, 'উনি প্রভু!' শিমোন পিতর যখন শুনলেন যে, উনি প্রভু, তখন গায়ে কাপড় জড়ালেন—তিনি তো খালি গায়ে ছিলেন—আর সাগরে ঝাঁপ দিলেন। [৮] কিন্তু অন্যান্য শিষ্যেরা নৌকায় করে এলেন মাছে ভরা জালটা টানতে টানতে; ডাঙা থেকে তাঁরা দূরে ছিলেন না, আনুমানিক দু'শো হাত।

[৯] ডাঙায় উঠলে তাঁরা দেখলেন, সেখানে কাঠকয়লার আগুন, তার উপর চাপানো কয়েকটা মাছ, পাশে কিছু রুটি। [১০] যিশু তাঁদের বললেন, 'যে মাছ তোমরা এইমাত্র ধরেছ, তার কয়েকটা নিয়ে এসো।' [১১] তাই শিমোন পিতর নৌকায় উঠে জালটা ডাঙায় টেনে তুললেন: জাল একশ' তিপ্পান্নটা বড় বড় মাছে ভরা ছিল, অথচ এত মাছেও জালটা ছিঁড়ল না। [১২] যিশু তাঁদের বললেন: 'এসো, খেতে বস।' শিষ্যদের মধ্যে কেউই তাঁকে জিজ্ঞাসা করার সাহস পাচ্ছিলেন না, 'আপনি কে?' কারণ তাঁরা জানতেন যে, তিনি প্রভু।

[১৩] যিশু কাছে এগিয়ে এলেন, এবং রুটি নিয়ে তাদের দিলেন, মাছও সেইভাবে দিলেন। [১৪] মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার পর এ-ই হয়েছিল যিশুর তৃতীয় আত্মপ্রকাশ।

এই অংশে গৃহীত বর্ণনার মুখ্য প্রসঙ্গ তিনটি: পুনরুত্থিত যিশুর সামনে পিতর ও প্রিয় শিষ্যের ব্যবহার, অসাধারণ মাছ-ধরা ও যিশুর সঙ্গে শিষ্যদের আহার।

পিতর ও প্রিয় শিষ্য দু'জনেই তীরে দাঁড়িয়ে থাকা যিশুকে দেখতে পান, কিন্তু এবারও প্রিয় শিষ্যই প্রথম যিশুকে চেনেন। এই দিকে প্রিয় শিষ্য পিতরের চেয়ে মহান। তা সত্ত্বেও এমন কতকগুলো ইঙ্গিত রয়েছে যা পিতরেরও মাহাত্ম্য লক্ষ করে। তিনিই মাছ ধরায় নেতৃত্ব নেন (২১:৩), অবিলম্বে জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রভুর দিকে সাঁতার দেন (২১:৭) এবং মাছে ভরা জাল তীরে টেনে আনেন (২১:১১)। রচয়িতা যেন উভয়

শিষ্যের প্রশংসা করতে চান: প্রভুকে চিনবার জন্য প্রিয় শিষ্যই প্রশংসিত, তৎপরতার জন্য পিতরই প্রশংসার পাত্র। কিন্তু তবু প্রধান প্রসঙ্গ হল অসাধারণ মাছ-ধরাটা: যিশু বিনা, শিষ্যদের পরিশ্রম অনর্থক (২১:৩), কেবল যিশুর সাহায্যেই তাঁরা কৃতকার্য হন: সুতরাং কেবল যিশুর বাণী গুণেই প্রৈরিতিক কাজ ফলপ্রদ। একদিন স্বয়ং যিশু বলেছিলেন, 'আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না' (১৫:৫); যিশু বিনা খ্রিষ্টমণ্ডলী অনুর্বরা, যিশু থাকলে সে উর্বরা। যিশুর কথায় পাওয়া-মাছের প্রাচুর্য মণ্ডলীর বাণীপ্রচারকর্ম ও একতার দিকে অঙুলি নির্দেশ করে: জাল হল সার্বজনীন মণ্ডলীর প্রতীক, যে মণ্ডলী নিজের ক্রোড়ে ঈশ্বরের বিক্ষিপ্ত সন্তানদের (১১:৫২) এবং অন্যান্য মেষঘেরির মেষগুলোকে সংগ্রহ করে, এবং জালটা যে ছিঁড়ে যায় না এতে সার্বজনীন মণ্ডলীর একতা নির্দেশিত। সুতরাং প্রভুর বাণীই মণ্ডলীকে উর্বরা, সার্বজনীন ও একতাবদ্ধ করে। খ্রিষ্টমণ্ডলীর একমাত্র কাজ: সে যিশুর বাণীর প্রতি বাধ্য থাকবে।

অবশেষে, প্রভুর সঙ্গে শিষ্যদের আহারের কথা উল্লিখিত; তাঁর পুনরুত্থানের পর যিশু যা করেন তা অবশ্যই বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত: শিষ্যদের সঙ্গে যিশুর সাহচর্য এক দিকে পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী সাহচর্যের সদৃশ এবং অন্য দিকে অপূর্ব ও নব সাহচর্য বা নব সংযোগ। এই বর্ণনা যে বিদায় ভোজ এবং আদিখ্রিষ্টমণ্ডলী দ্বারা উদ্‌যাপিত রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অসাধারণ মাছ-ধরা বর্ণনার সঙ্গে সংযোজনের মাধ্যমে প্রভুর 'দান' অধিকতর স্পষ্টভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে: প্রভুর 'দানসমূহ' তাঁর ভালবাসা ও অধিকারের পরিপূর্ণতা থেকে আসে; কিন্তু মাছ ও রুটি অর্থাৎ মানবীয় ও বাহ্যিক চাহিদা ও দাবি (৬:২৬) মেটানোর উপায় নয়, বরং সেই দানে নিহিত যিশুর সঙ্গে সংযোগই ও যিশুর দেওয়া ঐশজীবনই প্রভুর দানের মুখ্য জিনিস। এ দিক দিয়ে তিনি এখনও আপন বিশ্বাসীমণ্ডলীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন।

যিশু ও পিতর (২১:১৫-১৯)

২১ [১৫] তাঁরা খাওয়া শেষ করলে পর যিশু শিমোন পিতরকে বললেন, ‘যোহনের ছেলে শিমোন, এদের চেয়ে তুমি আমাকে কি বেশি ভালবাস?’ তিনি তাঁকে বললেন, ‘হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।’ যিশু তাঁকে বললেন, ‘আমার মেষশাবকদের যত্ন নাও।’ [১৬] দ্বিতীয়বার তিনি পুনরায় তাঁকে বললেন, ‘যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?’ তিনি তাঁকে বললেন, ‘হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।’ তিনি তাঁকে বললেন, ‘আমার মেষগুলি পালন কর।’ [১৭] তৃতীয়বার তিনি তাঁকে বললেন, ‘যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?’ যিশু যে তৃতীয়বার ‘তুমি কি আমাকে ভালবাস?’ এই কথা তাঁকে বলেছিলেন, তাতে পিতর দুঃখ পেলেন; তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, আপনি সবই জানেন; আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।’ যিশু তাঁকে বললেন, ‘আমার মেষগুলির যত্ন নাও। [১৮] আমি তোমাকে সত্যি সত্যি বলছি, তুমি যখন যুবক ছিলে, তখন তোমার যেখানে ইচ্ছে নিজেই কোমর বেঁধে চলাফেরা করতে; কিন্তু তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তোমার হাত দু’টো বাড়িয়ে দেবে, এবং অন্য একজন তোমার কোমর বেঁধে তোমার যেখানে ইচ্ছা নেই সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে।’ [১৯] পিতর যে কী ধরনের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবেন, এই কথায় যিশু তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁকে বললেন, ‘আমার অনুসরণ কর।’

যিশুর যন্ত্রণাভোগের সময় পিতর তিন বার করে তাঁকে অস্বীকার করেছিলেন, এখন পুনরুত্থিত যিশু তাঁকে নতুন করে নিযুক্ত করেন। যিশু যে পিতরকে ক্ষমা করেছেন শুধু একথা নয় (পাপের ক্ষমা আগের দৃশ্যেই পরোক্ষভাবে নির্দেশিত, কেননা একই ভোজে অংশ নেওয়াটাই প্রাপ্ত অপরাধ-ক্ষমা বোঝায়); এখানে বিশেষভাবে পিতরের কাছে ন্যস্ত করা প্রৈরিতিক অধিকার এবং যিশুর অনুকরণে তাঁর মৃত্যুর উপর আলোকপাত করা হয়। যে শিষ্য দুর্বলতাবশত অপরাধী হয়েছিলেন, আপন স্বাধীন ভালবাসা ও অধিকারেই যিশু তাঁকে সর্বোচ্চ দায়িত্বে উন্নীত করেন। যোহনের সুসমাচারের শুরুতেই যিশু তাঁকে ‘কেফাস’ (অর্থাৎ শৈল) নাম দিয়েছিলেন (১:৪২), আর এখনই সেই নাম দেওয়ার

উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়, অর্থাৎ সেই নাম মণ্ডলীর জীবনে পিতরের ভূমিকা নির্দেশ করে। তাছাড়া যিশু তাঁর মৃত্যুর কথা (১৩:৩৬) পুনরায় ঘোষণা করেন, এই মৃত্যুতেই পিতরের মর্যাদা: যে শিষ্য অহঙ্কার ও অন্যায়-আত্মনির্ভরশীলতা বিসর্জন দিলেন তিনি এখন যিশুকে অনুসরণ করতে সমর্থ। সুতরাং, পুনরুত্থিত যিশু পিতরকে প্রৈরিতিক অধিকার দান করে ও আপনাকে অনুসরণ করতে আহ্বান করে তাঁকে পুনরায় নিযুক্ত করা ব্যতীত তাঁকে নবীভূতও করে তোলেন।

যিশুর মেষগুলো পালন করার যে দায়িত্ব পিতরকে দেওয়া হয়েছে, সেই দায়িত্বের কি তাৎপর্য, তা এখানে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা যাক। ১০ অধ্যায়ের কথা স্মরণে রেখে একথা বলে শুরু করতে পারি যে, যিশুই উত্তম মেষপালক যাঁর হাতে পিতা আপন মেষগুলো ন্যস্ত করেছেন। যিশুর কাজ এই যে, তিনি মেষগুলোকে ডাকবেন, তাদের আগে আগে চলতে তাদের চড়াবেন এবং তাদের রক্ষা করার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেবেন (১০:১-৪, ১০, ১৫)। এখন, পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার সময়, পুনরুত্থিত যিশু পিতরের হাতে সেই দায়িত্ব ন্যস্ত করেন পিতরই যেন বিশ্বস্তভাবে তাদের পোষণ করেন। যিশুর আদর্শেই অর্থাৎ নিজ প্রাণ বিসর্জন পর্যন্তই পিতর আপনার তত্ত্বাবধানে রাখা মানুষকে রক্ষা ও চালনা করবেন। কয়েকটি মেষ শুধু নয়, সমস্ত মেষপালই তাঁর হাতে ন্যস্ত হওয়াতে অনুমান করা যায় সকল বিশ্বাসীর উপর পিতর ও তাঁর উত্তরসূরীগণ বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত।

বর্ণনা শেষে 'অনুসরণ' ধারণাও ইঙ্গিত করা হয়: পুনরুত্থিত যিশু মানুষকে নিজের সঙ্গে পূর্ণ সংযোগের জন্য আহ্বান করেন, এই সংযোগ এমন যা সাক্ষ্যমরণেই সিদ্ধিলাভ করে। পুনরুত্থিত যিশুর অনুসরণ করা এবং তাঁর সঙ্গে পূর্ণ জীবন্ত সংযোগে অধিষ্ঠিত হওয়া মানে পৃথিবীস্থ যিশুর পথে চলা, সেই যে পথ ক্রুশের পথ বা ক্রুশমার্গ। কথিত আছে পিতর রোম নগরীতে মাথা নিচের দিকে ও পা উপরের দিকে অবস্থায় ক্রুশবিদ্ধ হয়ে সাক্ষ্যমরত্বের মর্যাদা লাভ করেন।

যিশুর সেই প্রিয় শিষ্য (২১:২০-২৩)

২১ [২০] ফিরে তাকিয়ে পিতর দেখলেন, যে শিষ্যকে যিশু ভালবাসতেন, সান্ধ্যভোজের সময়ে যিশুর বুকের দিকে মাথা কাত হয়ে যিনি বলেছিলেন, 'প্রভু, কে আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে?' তিনি তাঁদের পিছু পিছু আসছেন।
[২১] তাঁকে দেখে পিতর যিশুকে বললেন, 'প্রভু, এর কী হবে?' [২২] যিশু তাঁকে বললেন, 'আমার যদি ইচ্ছা হয় যে, আমি না আসা পর্যন্ত সে থাকবে, তাতে তোমার কী? তুমি আমার অনুসরণ কর!' [২৩] তাই ভাইদের মধ্যে কথাটা রটে গেল যে, সেই শিষ্যের মৃত্যু হবে না; আসলে যিশু পিতরকে বলেননি: সেই শিষ্যের মৃত্যু হবে না, কিন্তু বলেছিলেন, 'আমার যদি ইচ্ছা হয় যে, আমি না আসা পর্যন্ত সে থাকবে, তাতে তোমার কী?'

সম্ভবত সেইকালে প্রিয় শিষ্যের মৃত্যু সম্বন্ধে একটা ভুল জনশ্রুতি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উল্লিখিত অংশটির উদ্দেশ্য সেই ভুল জনশ্রুতি মুছিয়ে দেওয়া। যিশুর ইচ্ছা সেই শিষ্য থাকবেন; কিন্তু 'থাকবেন' এর অর্থ এই নয় যে প্রিয় শিষ্য কখনও মরবেন না, বরং তাঁর 'সুসমাচার' পুস্তকের মধ্য দিয়েই তিনি খ্রিষ্টমণ্ডলীতে জীবিত ও সক্রিয় হয়ে 'থাকবেন'।

উপসংহার (২১:২৪-২৫)

২১ [২৪] ইনিই সেই শিষ্য, যিনি এই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন ও তা লিপিবদ্ধ করেছেন; আর আমরা জানি, তাঁর সাক্ষ্য সত্য। [২৫] কিন্তু আরও অনেক কিছু আছে যা যিশু সাধন করলেন; প্রত্যেকটার কথা বিস্তারিত ভাবে লিখতে হলে আমি মনে করি না যে, তা-ই নিয়ে লেখা পুস্তকগুলো সমগ্র জগতেও ধরত।

সুসমাচারের শেষ বাণী প্রিয় শিষ্যকেই সুসমাচার পুস্তকে লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যের উৎপত্তি এবং তার বিশ্বাসযোগ্যতার সাক্ষী বলে নির্দেশ করে। ২০ অধ্যায়ে গৃহীত যে উপসংহার

তা এখানে কাব্যিক ভাষায় পুনরাবৃত্তি করা হয়: এই পুস্তকে যিশুর সাধিত কয়েকটা কাজই শুধু সংগৃহীত করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট

যোহনের সুসমাচারের বর্তমান তাৎপর্য

সম্ভবত এই ব্যাখ্যা শেষে, যে ব্যাখ্যায় মূলপুস্তকের কথা ও রচয়িতার বিবিধ ঐশতাত্ত্বিক ধারণা যথাসাধ্য স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করা হয়েছে, পাঠকগণের মধ্যে কয়েকজনের মনে এই প্রশ্নের উদয় হল: বর্তমানকালে যোহনের সুসমাচারের তাৎপর্য কী?

যোহন যে আপন লেখায় সমকালীন মানুষ, জগৎ ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টি রাখেন একথা সত্য; কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে, যিশুর দেওয়া পরিত্রাণদায়ী শেষ ও চরম ঐশপ্রকাশের উপর স্থাপিত তাঁর বিশ্বাসের মাধ্যমে তিনি নির্দিষ্ট এক কাল ও স্থানের খ্রিষ্টমণ্ডলীর গণ্ডি অতিক্রম করতে সমর্থ হলেন। খ্রিষ্টের দেওয়া ঐশপ্রকাশ শেষ ও চরমই প্রকাশ, তা-ই বলে সঙ্কুচিত করা যায় না, বরং তার মর্মার্থতা অসীম ও চিরস্থায়ী।

১। প্রথম বাধাবিঘ্ন হতে পারে ইতিহাসের সঙ্গে সুসমাচারের সম্পর্ক, কেননা বর্তমানকালের মানুষ ঘটনাসমূহের বাস্তব রূপের দিকেই বিশেষভাবে মন ফেরায়। কিন্তু, ইতিহাস বিষয়ে যোহনের দৃষ্টিকোণ স্বকীয়। তিনি বিশ্বাসের চোখেই সকল ঘটনা দেখেন এবং সেই অনুসারেই খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য সেগুলো ব্যাখ্যা করেন। যদিও আমরা ঐতিহাসিক যিশু সম্বন্ধে সবকিছু জানতাম, তবুও তাঁর নিগূঢ় মর্ম বা রহস্য থেকে অধিক দূরে বঞ্চিত হতাম যেহেতু সেই মর্ম বা রহস্য বিশ্বাসের মাধ্যমেই মাত্র গ্রহণযোগ্য। এর প্রমাণ হল সেইকালের ইহুদীরা: তারা ঐতিহাসিক যিশুকে কত বার না দেখেছিল, অথচ খ্রিষ্টোপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকল। খ্রিষ্টোপলব্ধি বিশ্বাসের মাধ্যমেই শুধু অর্জনীয় এবং এজন্যই এমন গভীর দৃষ্টিকোণের প্রয়োজন যা যিশুর বাণী ও ক্রিয়াকলাপ নতুন আলোতে আলোকিত করে। এই গভীর দৃষ্টিকোণ দান করাই যোহনের উদ্দেশ্য; বলা

বাহুল্য যে তেমন দৃষ্টিকোণ তারই কাছে মাত্র বিশ্বাসযোগ্য, যে তা ঐশপ্রকাশ বলে গ্রহণ করে। যোহন অনুসারে, যিশুর প্রতি মানুষের একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র আছে এবং সেই প্রতিক্রিয়া একান্ত ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিময় একটা সিদ্ধান্ত: হয় আমি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করি, না হয় তাঁকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করি। হয় যিশু সুসমাচারের পাঠকের কাছে আলো ও জীবন, দরজা ও পথ হয়ে দাঁড়ান, না হয় তিনি পাঠকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বোধের অতীত হয়ে থাকেন। যে-যিশুতে ঈশ্বর বিশ্বাসীর কাছে উত্তমরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, সেই যিশু অবিশ্বাসীর পক্ষে এমন অনতিক্রমণীয় বিঘ্নস্বরূপ যা তাকে ঈশ্বর থেকে বঞ্চিত করে।

২। সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের ধারণায়ও পৃথিবীস্থ যিশু পিতার কাছে উন্নীত ও গৌরবান্বিত যিশুর আলোতেই উপস্থাপিত, অর্থাৎ শুধু ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত খ্রিষ্ট বলে তাঁকে গ্রহণ করলেই তাঁর কথা বোধগম্য হয়ে ওঠে; খুবই সাধারণ ভাষা প্রয়োগ করলেও যিশু বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই মাত্র মানুষের উপলব্ধির পাত্র। যোহন ঠিক এই ধারণার উপর জোর দেন: বিশ্বাস না থাকায় যিশুকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। পৃথিবীস্থ যিশুতেই এখন সেই স্বর্গস্থিত যিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব, যে যিশু একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মানুষের কাছে দাবি রাখেন। এজন্যই যোহনের লেখায় যিশুর ভাষা এমন যা বিশ্বাসীর পক্ষেই শুধু বোধগম্য, এবং তাঁর চিহ্নকর্মগুলোও এমন যেগুলোর নিহিত অর্থ বিশ্বাসের চোখেই মাত্র প্রকাশ্যমান; তিনি মানুষের মাঝে এমনভাবে চলাফেরা করেন যেন অন্য একটা জগতের অধিবাসী। এই যিশু এই জগতে বিচরণকারী একটি দেবতা নন, বরং একটি মানুষ যাঁর মধ্যে ঈশ্বর আপন ভালবাসার খাতিরে সকল মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ করেন। আবার, পৃথিবীস্থ যিশু ঐশগৌরবে উন্নীত সেই স্বর্গস্থ যিশুও নন: ক্রুশ-ক্ষণেই অর্থাৎ জগতে তাঁর কর্মসাধনের পরেই যিশু ক্রুশ অতিক্রম করে ঐশগৌরবে খ্রিষ্ট বলে প্রবেশ করলেন। যেহেতু বিশ্বাসীদের পক্ষে যিশু এখন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যার ফলে তিনি স্বর্গস্থিত হয়েও একাধারে তাদের মাঝে উপস্থিত, সেজন্যই তারা পৃথিবীস্থ যিশুর বাণী গৌরবান্বিত প্রভু ও সদাবর্তমান খ্রিষ্টের বাণী বলেই শুনবে (এই কারণেই সদৃশ সুসমাচারত্রয়ের সাধারণ ভাষা অপেক্ষা যোহনের সুসমাচারের যিশুর ভাষার ভঙ্গি অধিক গাম্ভীর্যপূর্ণ)। ঐতিহাসিক যিশুর দিকে ফিরে তাকিয়ে যে দৃশ্য পাই, এবং সদাবর্তমান

প্রভুর দিকে তাকিয়ে যে দৃশ্য পাই, দৃশ্য দু'টো একটামাত্র দৃশ্য হয়ে যায়: ইতিহাস অর্থাৎ অতীতকাল এবং বর্তমানকাল, এই কাল দু'টো যিশুতে একীভূত হয়, কেননা ইতিহাস এবং বিশ্বাস পরস্পর বিরোধী বস্তু নয়।

৩। যিশুর ভাষা শুধু নয়, যোহনের ভাষাও কঠিন ও দুরূহ। আধুনিককালে বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রভাব এমন বিস্তার লাভ করেছে যে যোহনের ব্যবহৃত ভাষায় অন্তর্নিহিত ও প্রচ্ছন্ন সত্য উদ্ঘাটন করা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট কঠিন: মানবপুত্র, চরম ঐশপ্রকাশ, আমিই আছি, আলো প্রভৃতি কথার অর্থ ধরা নিঃসন্দেহে সামান্য ব্যাপার নয়। কিন্তু এতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, ঈশ্বর বিষয়ে মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করা অসাধ্য; যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একান্তভাবে সংযুক্ত এবং মানুষের কাছে আত্মদান করলেন, শুধু সেই যিশুর মাধ্যমে এবং তাঁর মধ্যেই ঈশ্বরোপলব্ধি প্রাপ্য। যোহনের লেখায়, যিশু দূরবর্তী ও অজ্ঞেয় ঈশ্বরকে মানুষের নিকটবর্তী ও জ্ঞাত করেন। যে যোহনের কঠিন ভাষার সম্মুখীন হয়ে নিরুৎসাহী না হয়ে বরং যিশুর কথার গভীর অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে, সে সেই অর্থ বুঝতে অর্থাৎ জীবনদাতা, ত্রাণকর্তা ও প্রেমময় ঈশ্বরের উপস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে।

৪। যোহনের সুসমাচারের মাহাত্ম্য এই যে, সেই সুসমাচার তার গভীরতম জিজ্ঞাসায় মানুষকে পরীক্ষা ও আহ্বান করে: আমরা কোথা থেকে আসি? কোথায় যাই? আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি? এই সকল ধরনের জিজ্ঞাসার উত্তর যিশুতেই সূচিত। যিশুর অনুসরণ করে আমরা অন্ধকারে চলি না বরং জীবনের আলো লাভ করি। মৃত্যু বাস্তব বটে, কিন্তু বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তা অতিক্রম করা সাধ্য কেননা যিশুই পুনরুত্থান ও জীবন, যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে সে মৃত্যুবরণ করলেও জীবিত থাকবে। বিশেষভাবে পথ বলেই যিশু এজগতে তীর্থযাত্রী মানুষের সামনে দাঁড়ান ও সেই যাত্রার লক্ষ্য বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। বাস্তবিক, সত্য ও জীবন হওয়ায় যিশু মানুষের পক্ষে পথ, কেননা তিনি শুধু পথ নির্দেশ করেন এমন নয় বরং তাকে সেই পথ ধরে চালনাও করেন। গ্রীক জ্ঞান-মার্গপন্থীদের বৈষম্যে তিনি পরিত্রাণদায়ী জ্ঞান শুধু নয়, আপন জীবনও দান করেন, যে জীবন মৃত্যুকে অতিক্রম করে পরাজিতও করে। এই

বর্তমান জীবন থেকেই তিনি এই জীবন বিশ্বাসীকে দান করেন এবং সেই জীবনের যে যে উপাদান, যেমন প্রকৃত মুক্তি, আনন্দ, শান্তি ইত্যাদি উপাদানসমূহও দান করেন।

৫। যোহনের ঐশতাত্ত্বিক অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বর্তমানকালেই চরমকালও উপস্থিত। কিন্তু এবিষয়ে এমনটি মনে করব না যে, ইতিমধ্যে ঐশজীবন পেয়ে গেছি বলেই দায়িত্বহীনভাবে এই জগতে জীবনযাপন করব। যোহনের ধারণা সম্পূর্ণরূপে বিপরীত: নিজের আন্তর শক্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মানুষ জগতে যিশুর প্রকৃত সাক্ষী হবার জন্যই অনুপ্রেরণা পাবে। জগতের চলাফেরা মানুষের কাজকর্ম সাধনের উপর নির্ভর করে; যে-বিশ্বাসী যোহনের প্রস্তাব গ্রহণ করে, সে বর্তমান জীবনের জন্য যিশুতে শক্তির সন্ধান পায় ও তার মনোযোগ ভ্রাতৃপ্রেমের দিকে ফেরানো হয়, যে-ভ্রাতৃপ্রেম (বা পারস্পরিক ভালবাসা) অচিন্তনীয় ও বাস্তব ফলগুলোতে ফলবান হওয়ার কথা, কেননা যিশুর মত ও যিশু গুণে খ্রিষ্টভক্তের পক্ষে খ্রিষ্টভক্তদের কল্যাণের জন্য শুধু নয়, সমগ্র জগতেরই জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়া আবশ্যক, যে-জগৎকে ঈশ্বর এতই ভালবেসেছেন যে তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন এবং যে-জগৎকে যিশু ক্রুশের উপর থেকে নিজের কাছে আকর্ষণ করতে ইচ্ছা করেন। এই সীমাহীন ভালবাসাই যিশুর শিষ্যদের প্রমাণ-পত্র। কিন্তু, যোহনের বিবেচনায়, বাহ্যিক পরিকল্পনা প্রয়োগের চেয়ে খ্রিষ্টভক্ত ঈশ্বরের হাতে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত জীবনযাপনের মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে জগৎকে পিতার জন্য জয় করবে। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর পরম বিজয়জনিত আস্থাই জগতের মধ্যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীর দায়িত্বপূর্ণ সংগ্রাম প্রভাবান্বিত করবার কথা। চরমকালের মানুষ হয়ে জীবনযাপন করা মানে, এখন এই বর্তমান জীবনকালেই দায়িত্বপূর্ণভাবে যিশুর প্রেরিতজনরূপে আত্মনিয়োজিত হওয়া। যোহনের সুসমাচার এই সুযোগ আমাদের অর্পণ করতে চায় আমরা যেন এই পরম সত্যগুলো ধ্যান করে আমূল রূপান্তরে রূপান্তরিত হয়ে এই জীবনকাল থেকে যিশুর প্রকৃত অনুগামী হই এবং ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ সংযোগেই যিশুর অনুসরণ করতে পারি।